# লালবাজার

নটরাজন

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬১

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :

অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :

মানসী প্রেস

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

অতীতের লালবাজার

লালবাজার চত্বরে সেকালের পুলিশভ্যান
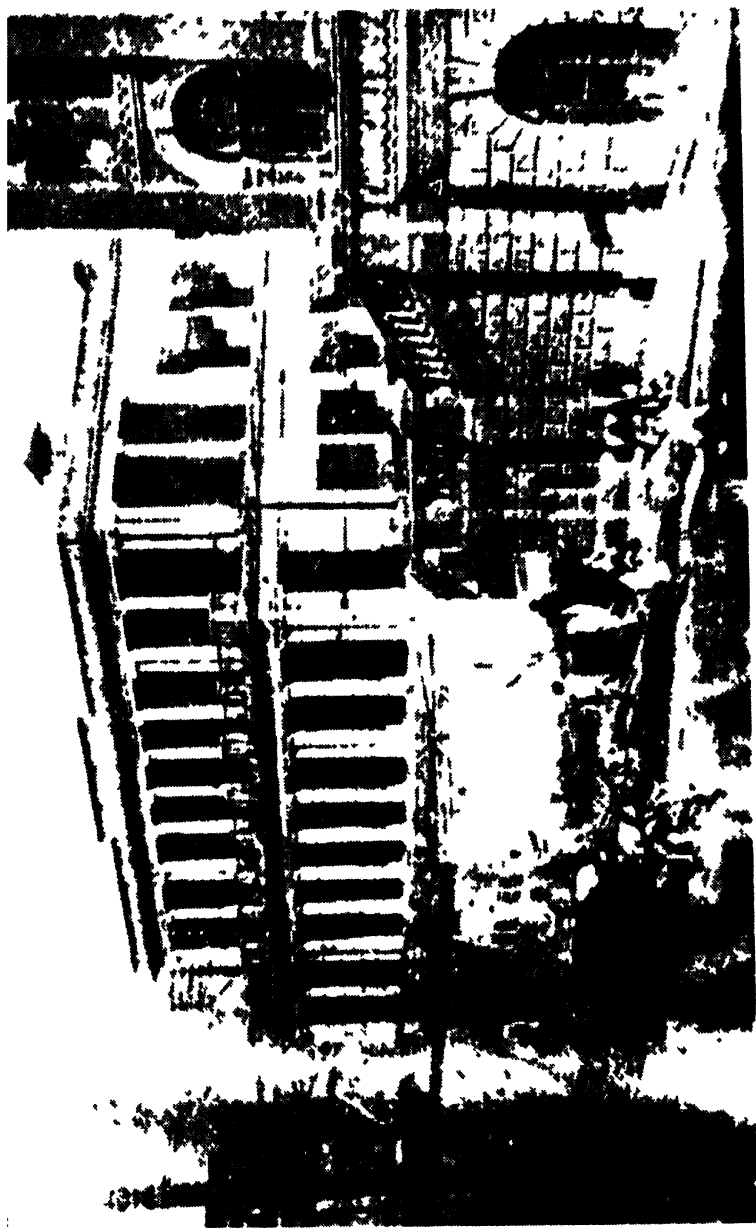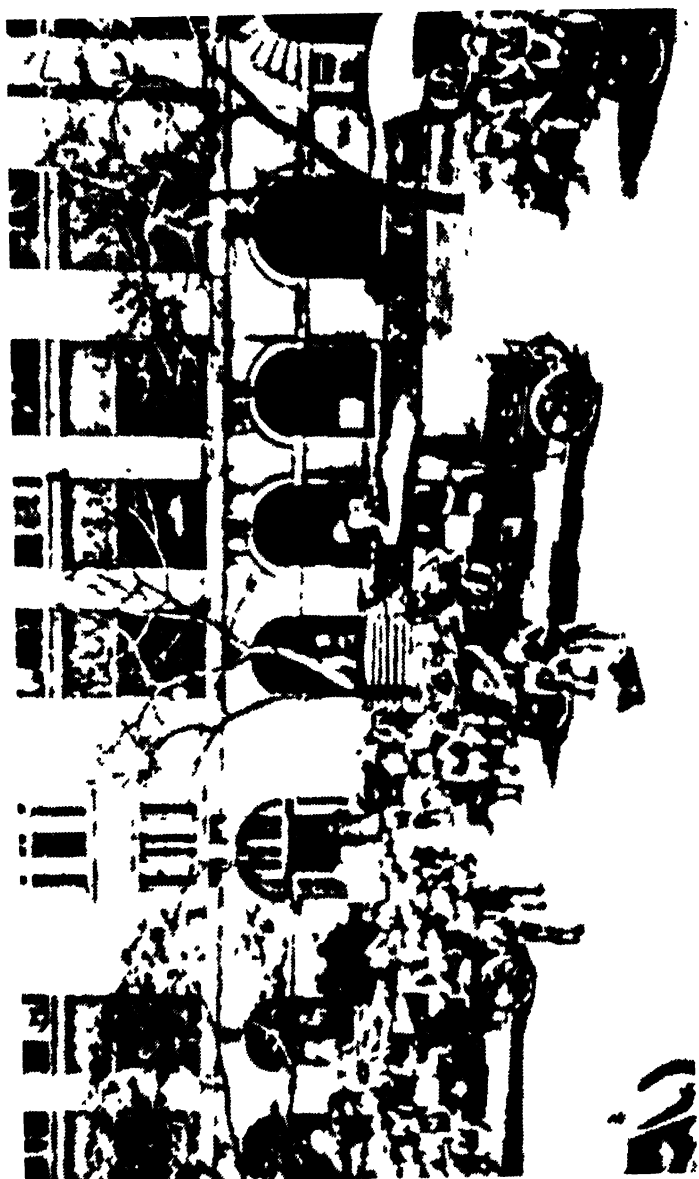
পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদার

মহাবিপ্লবী সুভাষ

পুলিশ কমিশনার হার্ড উইক

যুক্তবাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সুহারাওয়ার্দি

পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট

শহীদ দীনেশ মজুমদার

পুলিশ কমিশনার কল্‌সন

বিপ্লবী বীণা দাস
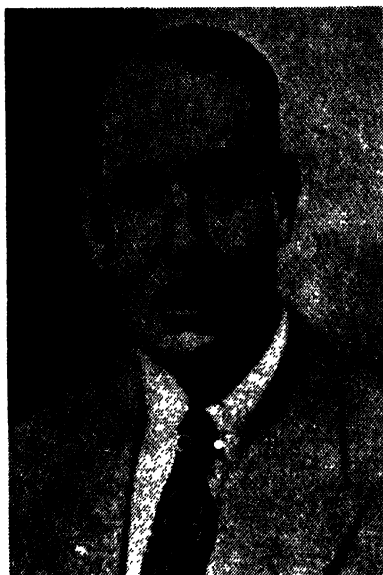
## দু'চার কথা

বাংলার বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তথা স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। মহানগরী কলকাতার বুকে সেদিন যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার কথাও লেখা হয়েছে অনেক। কিন্তু তার সবগুলোই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা। সেই সংগ্রাম ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মোকাবিলা করতে গিয়ে জনসাধারণের চোখের আড়ালে কলকাতার পুলিশ বাহিনীর অন্দরমহলে যে কর্মচাঞ্চল্য সেদিন জেগে উঠেছিল তার কথা কেউই কোথাও লিপিবদ্ধ করেন নি। বস্তুত, এ সম্পর্কে সরকারী দলিলপত্রে তেমন কিছু কোনদিনই ছিল না এবং যাও বা ছিল তাও ছিল সেই সব লেখকবৃন্দের এক্তিয়ারের বাইরে। অগ্নি-যুগে একদিকে ছিলেন একদল মৃত্যুভয়হীন নরনারী ও তার পাশাপাশি অহিংস দেশপ্রেমিকের দল, আর অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের একান্ত বশম্বদ পুলিশ বাহিনী। এই গ্রন্থে লালবাজারের পুলিশ মহলের কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে মহানগরী কলকাতার বুকে সংঘটিত বিপ্লবী ও অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীগুলোর ওপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। সহিংস ও অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনীর পাশাপাশি লালবাজারের কর্মকাণ্ডের বিবরণও পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। যেহেতু এই সম্পর্কে সরকারী দলিলপত্রে তেমন কিছু পাওয়া যায় না সেইহেতু পুলিশ মহলের কার্যাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে সেকালের এমন কিছু পুলিশ অফিসারের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে যাঁরা বৃদ্ধ অশক্ত অবস্থায় এখনও বেঁচে আছেন। কাজেই তথ্যগত ভুলভ্রান্তি থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া, প্রয়োজন-বোধে যেমন পরিস্থিতির উদ্ভাবন করতে হয়েছে, তেমনি সংলাপ ও কিছু কিছু কাল্পনিক পুলিশ-চরিত্রেরও সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা—সংগ্রাম ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কাহিনীগুলোকে একটুও বিকৃত করা হয় নি।

কাল্পনিক একটি প্লটকে ঘিরে মহানগরী কলকাতা ও লালবাজারের ঐতি-হাসিক ইতিবৃত্ত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী সম্বলিত এই গ্রন্থখানি উপন্যাসের ঢংয়ে লেখা হলেও যেমন পুরোপুরি উপন্যাস নয়, তেমনি ঐতিহাসিক কোন গ্রন্থও নয়। আবার ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তাও নয়। বরঞ্চ বলা চলে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস-আশ্রিত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্বলিত পুলিশী উপন্যাস। 'সোনার পাথর বাটি' কথাটা অর্থহীন হলেও 'সোনা-বাঁধানো পাথর বাটি' যেমন অসম্ভব নয়, এই বিচিত্র গ্রন্থখানিও অনেকটা তেমনি। তবে এর স্বাদ কেমন তা বিচার করতে পারবেন একমাত্র এর পাঠকবৃন্দ।

লালবাজার।

নীল নয়, হলুদ নয়, এমনকি কালোবাজারও নয়। লালবাজার।

লাল, শুধুই লাল। লালপাগড়ীর দৌলতে গোটা লালবাজার এককালে লালে লাল হয়ে থাকত। কিন্তু আজ আর তা নেই। লালপাগড়ীর বদলে আজ শুধুই গাঢ় নীল টুপি।

পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিং একদিন ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'সব লাল হো যায়গা।' মানচিত্রে ব্রিটিশ ভারতের লাল রঙের পাশে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যের অন্য রঙের দিকে তাকিয়ে হয়তো কথাটা বলেছিলেন তিনি, অথবা হয়তো ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতে যে রক্তগঙ্গা বইবে সেই আশঙ্কার কথাই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন ওই ক'টি শব্দের মধ্য দিয়ে—'সব লাল হো যায়গা।'

মহানগরী কলকাতার বুকে এই বিখ্যাত লালবাজার কি দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেমন কিছু করেছিল কোনদিন? নাগরিক জীবনে কি তেমন কোন বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল এই লালবাজার?

ইতিহাস এর জবাব দেবে। সেদিনের ইতিহাসের রক্তমাখা পাতার প্রতিটি ছত্রে লেখা আছে এই লালবাজারের কথা। বাংলার তো বটেই, সারা ভারতের এমন কোন সর্বভারতীয় নেতা বোধহয় অবশিষ্ট ছিলেন না যিনি নাকি ব্রিটিশ রাজশক্তির এই শক্ত ঘাঁটি লালবাজারে একটি বারের জন্যে পদার্পণ করেন নি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে লালবাজারের সেই গাঢ় টকটকে লাল রঙ কিন্তু আর নেই। ব্রিটিশ রাজশক্তির এককালের প্রধান হাতিয়ার আজ জনগণ-নির্বাচিত সরকারের মস্তবড় সহায়। এককালের জন-মানস-বিচ্ছিন্ন লালবাজার আজ আর ঠিক তেমন বিচ্ছিন্ন নেই। তবুও লালবাজার লালবাজার-ই। মহাকবি বাল্মীকি যদি সত্যি হন, তাহলে দস্যু রত্নাকরও সত্যি।

বড় দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে দশটা বাজতেই অফিসের লম্বা করিডোরে বেঞ্চিতে উপবিষ্ট মানুষগুলোর মধ্যে সামান্য একটু চাঞ্চল্য জেগে উঠেই আবার স্তিমিত হয়ে এলো। এখনও সময় হয় নি। কর্মচারীদের হাজিরার সময় দশটা হলেও পনেরো মিনিট গ্রেস। তারপরেও পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিক করে ম্যানেজ করার ব্যবস্থা আছে। কাজেই সাড়ে দশটা নাগাদ যে কর্মচারীটিকে সীটে পাওয়া যাবে তাকে তো রীতিমত পাংচুয়াল বলা যেতে পারে।

একাউন্টেন্ট জেনারেল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পেনশন পেমেন্ট কাউন্টার।

এখানকার খদ্দেররা অধিকাংশই পলিতকেশ, স্খলিত নখ-দন্তের মালিক। কিন্তু এককালে এদের দাপটেই সরকারী অফিসের ঘরে ঘরে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। বিলিতি-দিশী সাহেবদের অনেকেই থাকত এদের মুঠোয়। কিন্তু কালের চাকার আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরা আজ জীর্ণ শীর্ণ প্রায়-পরিত্যক্ত একদল মানবগোষ্ঠী মাত্র। যৌবনমদমত্তা বাসবদত্তা আজ কুরূপা এক বৃদ্ধা। জগতের কোন টাইম-মেশিনের সাধ্য নেই ওদের সেই পূর্ব-গৌরব আবার ফিরিয়ে দিতে পারে। ওদের সেই আসনগুলো আজ অধিকার করে রয়েছে নবাগতরা। একদিন আবার তারাও এসে ঠিক এমনিভাবে লাইন দেবে এখানে। ট্র্যাডিশন সমানে চলছে—চলবে।

কর্মহীন পুরুষের সঙ্গে একমাত্র নিঃসন্তান নারীর তুলনা চলতে পারে। সংসারে প্রয়োজনের নিরিখে দুজনেই যেন তুল্য-মূল্য। আছ ভালো, না থাকো তো তেমন একটা ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। সন্তানহীনা নারীর যেমন সাংসারিক কাজ-কর্মের ক্ষমতাটুকুই কেবল সম্বল, তেমনি এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মহীন পুরুষের একমাত্র সম্বল কেবল ওই পেনশনের টাকা ক'টা—ডিভ্যালুয়েশন্ হতে হতে যার আসল মূল্য এখন নামমাত্রে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাসের একটা নির্দিষ্ট দিনে এই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা এখানে আসেন তাঁদের পেনশনের টাকা নিতে। এই একটা দিন তাঁরা তাঁদের সংসারে ভি আই পি. না হোক অন্তত আই. পি অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট পার্সন। সকালে উঠেই পক্ককেশে কিংবা টাক-মাথায় তেল-জল দিয়ে জামাকাপড় পরে পেনশন কার্ডখানা সাবধানে পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। সেকালের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের এই সামান্য পুনরাবৃত্তিটুকুই যেন সেই মুহূর্তে অসামান্য হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে। অফিসের কাজ-কর্ম চালু হতে সেই এগারোটা সাড়ে-এগারোটা। কিন্তু সকাল ন'টা থেকেই কাউণ্টারের সামনে এসে ভিড় করতে থাকেন তাঁরা। বেতো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না তাঁদের। বসার জন্যে বেঞ্চির বন্দোবস্ত আছে। মাসের এই নির্দিষ্ট দিনটিতে সেকালের দু'একজন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়। বসে বসে হাই তুলতে তুলতে চলে অতীত-রোমন্থন। আবার কোন মাসে তাঁদের মধ্যে কাউকে অনুপস্থিত দেখলেই বুকটা ধক্ করে ওঠে। মনে পড়ে যায় নিজের বয়সের কথা।

প্রতি মাসের তিন তারিখে বৃদ্ধদের এই লাইনের প্রথম মানুষটি হচ্ছেন একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধ। ঝড় হোক জল হোক লাইনের প্রথম স্থানটি তাঁর নির্দিষ্ট। এই দীর্ঘ দিনেও কেউ তাঁকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি। মানুষটির বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায়, দু'এক বছর বেশিও হতে পারে। রোদে পুড়ে জলে ভিজে গায়ের এককালের ফর্সা রঙ তামাটে হয়ে গেছে। মাথার পাতলা চুল সম্পূর্ণ সাদা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, সারা মুখে শিথিল চামড়ার ভাঁজ, কুঞ্চিত চোখের কোণ, প্রশস্ত কপালে বলিরেখার সাবলীল গতিপথ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। ছ'ফুট দুই ইঞ্চির এই দীর্ঘকায় মানুষটি এককালে যে ঋজু হয়ে লম্বা পা ফেলে বেশ দাপটের সঙ্গেই চলে-ফিরে বেড়াতেন তা তাঁর একালের চাল-চলনেও বোঝা যায়।

পেনশনের টাকা নিতে এসে বেশ কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় এই বৃদ্ধদের। এই সময়টুকু কেউ বসে গল্প করে কাটান, কেউ বা বসে বসেই ঢুলতে থাকেন। কিন্তু গল্পই করুন কিংবা ঝিমুনিই আসুক, কান দুটো তাঁদের সর্বদাই সজাগ। পেমেণ্ট কাউণ্টারের ওপাশের অল্পবয়সী কেরানীটি নাম ধরে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে যান।

দীর্ঘকায় এই মানুষটি কিন্তু তেমন কোন কথা বলেন না কারুর সঙ্গে। বসে বসে ঝিমোনও না। ঘোলাটে চোখদুটো মেলে কেবল স্থির হয়ে বসে থাকেন। কাউণ্টারের কেরানীবাবু কাগজপত্র ঠিক করে প্রথমেই ডাকে, মিস্টার ম্যাল্‌কম। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান এই দীর্ঘদেহী মানুষটি। পরনে তাঁর সেই চিরাচরিত পোশাক—পায়ের ফোল্ডের কাছে ছেঁড়া একটা ঢলঢলে সাদা রঙের ক্রিজহীন প্যাণ্ট, রিস্ট ও ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া একটা মলিন ফুলশার্ট, পায়ে একজোড়া ক্যাম্বিশের শ্যু, হাতে একখানি লাঠি। ঢিলে প্যাণ্টটা কোমরের কাছে যেমন-তেমন করে একটা জীর্ণ চামড়ার বেল্ট দিয়ে জড়ানো।

কেরানীবাবুটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ম্যাল্‌কমের শিথিল ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে ওঠে। প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে বলে ঘোলাটে চোখের তারায় জেগে ওঠে আনন্দের চিহ্ন। পেনশনের কাগজে সই করতে গিয়ে কেরানী-বাবুটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, ইয়োর ফাউণ্টেন পেন প্লীজ!

—এটা কিন্তু আপনার ভারি অন্যায় মিস্টার ম্যালকম, একটু মুচকি হেসে কৃত্রিম রাগের সুরে বলতে থাকে কেরানীবাবুটি, পুরো একটি বছর ধরে আপনাকে একটা কলম কিনতে বলছি। কিন্তু—

ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা তিন ভাষাতেই অবলীলায় কথা বলতে পারেন ম্যালকম। কেরানীবাবুর দিকে তাকিয়ে তেমনি লজ্জিত সুরে জবাব দেন, ঠিক —ঠিক। প্রতি মাসেই ভাবি একটা কলম কিনব, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি জানেন, ঠিক মনে থাকে না।

—বেশ তো, পেনশন নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আজই একটা কলম কিনে নেবেন। কত আর দাম? একটা টাকা খরচ করলেই একটা মোটামুটি চলনসই কলম হয়ে যাবে। একালে এই একটা মাত্র বস্তুর দাম সত্যিই কমেছে। বলতে বলতে কেরানীবাবুটি আবার একটু মুখ টিপে হাসে। সে ভালমতই জানে, ম্যাল্‌কম কিছুতেই কলম কিনবেন না।

—সারটেনলি। ম্যাটার অফ এ রুপি। এক টাকাতেই একটা কলম পাওয়া যায়। সেদিন কলেজ স্ট্রিটে দেখলাম টাকায় দুটো করে কলম বিক্রি হচ্ছে। মাথা নেড়ে বলে ওঠেন ম্যাল্‌কম।

অল্পবয়সী কেরানীবাবুটি এই সেকশনে বেশ কয়েক বছর কাজ করছে। তাই এই বৃদ্ধ পেনশন হোল্ডারদের অনেকের সঙ্গেই বেশ ভাব হয়ে গেছে তার। কাউকে মৃদু ধমক দেয়, কাউকে দেয় উপদেশ, আবার কারুর সঙ্গে একটু-আধটু রসিকতা করতেও ছাড়ে না। ঠাকুর্দা-নাতি সম্পর্ক আর কি!

সেদিন পেনশনের কাগজপত্র ঠিক করে অভ্যাসবশেই ডেকে উঠল কেরানী-

বাব্‌, মিস্টার ম্যাল্‌কম—

ম্যাল্‌কম সাড়া দেন না। তার বদলে বেঞ্চির প্রথমে বসা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে নিকেলের চশমার ফাঁকে কেরানীবাবুটির দিকে তাকিয়ে ফোক্‌লা দাঁতে একটু হেসে বলে ওঠেন, ম্যাল্‌কম নয়, আমি পার্বতী চক্রবর্তী আজ প্রথম।

প্রায় অঘটনই বলা যেতে পারে। ম্যাল্‌কমের জায়গা আজ দখল করেছেন অন্য একজন।

—সে কি দাদু, আপনি আজ আমাদের ম্যাল্‌কম সাহেবকে ল্যাং মেরে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন! এই ছোটখাটো দেহ নিয়ে ওই বিরাট লম্বা সাহেবকে হটিয়ে দিলেন কেমন করে, দাদু?

এই সময় আর একজন রসিক বৃদ্ধ মন্তব্য করেন, বাঃ, ওঁর নাম যে পার্বতী। ওসব সাহেব-সুবো তো ওঁর কাছে কিছুই নয়। এতদিন নেহাত ইচ্ছে করেন নি, তাই। নইলে উনি প্রতি মাসেই সাহেবকে হটিয়ে দিতে পারেন। কি বলেন, পার্বতীবাবু?

বৃদ্ধের কথায় অনেকেই হেসে ওঠেন। হেসে ওঠেন বেঞ্চির মাঝের দিকে বসা স্বয়ং ম্যাল্‌কমও। কেরানীবাবুটি ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে বললে, কি হল সাহেব? আজ আপনার দেরি কেন? তারিখ ভুলে গিয়েছিলেন নাকি?

জবাব দেন ম্যাল্‌কম, নো—নো। তারিখ কি ভুল করতে পারি? যীশুর বদলে মাসভোর যে কেবল এই তারিখটিকেই জপ করি। ফিলিং আনওয়েল। শরীরটা ভালো নেই। তাই—

— ভালো থাকবেন কেমন করে? রাতদিন যদি এই বয়সে পথে পথে ঘুরে বেড়ান তাহলে কি শরীর ভালো থাকতে পারে? গত রবিবার ভরদুপুরে রোদের মধ্যে আপনাকে ভুপেন বোস অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। তার আগে একটা ছুটির দিনে আপনাকে দেখলাম লেক অ্যাভিনিউতে। এই বয়সে কিসের এত কাজ আপনার? কেরানীবাবুটি বললে।

সে কথার জবাব না দিয়ে ম্যাল্‌কম কেবল একটু ম্লান হাসেন। এরা একালের ছেলে। এরা কেমন করে বুঝবে কিসের নেশায় এই সত্তর বছর বয়সেও তিনি রাতদিন কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ান?

পেনশনের টাকা নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ান ম্যাল্‌কম। টাকা পেতে আজ অনেক দেরি হয়েছে। কেরানীবাবুর কোন দোষ ছিল না। কাগজপত্রের গণ্ডগোলের জন্যেই দেরি।

ক'টা বেজেছে এখন? দেড়টা-দুটো? ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে তাকান বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বেলা বোঝবার উপায় নেই। একজন পথচারীকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করেন, টাইম প্লীজ!

—হাফ পাস্ট টু।

ওরে বাবা, আড়াইটে! এখন আর তবে হোমে গিয়ে লাভ কি? আজ তো আর বরাতে লাঞ্চ জুটবে না। হোম মানে, হোম ফর্‌ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্‌ ওল্ড মেন্‌ এবং লাঞ্চ মানে একমুঠো ভাত, একটুখানি ডাল, খানিকটা আলুভাজা,

আর এক টুকরো পেঁয়াজ। মাঝে-মধ্যে মাছের টুকরোও জোটে, আর মাংস তো মাসে একটি দিন মাত্র। এর সঙ্গে অবশ্যি দুবেলা দু'কাপ চা-ও পাওয়া যায়। এই খাওয়া এবং থাকা নিয়েই তো মাসে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয় হোমের ক্যাশিয়ারের কাছে।

না, এ নিয়ে কোন অনুযোগ নেই ম্যাল্কমের। কেউ কেউ অবশ্যি আড়ালে-আবডালে বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু ম্যাল্কম জানেন এই বাজারে পঞ্চাশ টাকায় একটা মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয় না। নেহাত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং গভর্নমেণ্ট থেকে কিছু অনুদান পাওয়া যায় বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। তাই ম্যাল্কমের অন্তত এ নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। এ যুগে সহায়-সম্বলহীন বুড়োদের জন্য এমন একটা ঠাঁই পাওয়া গেছে বলেই তো তাঁর মত মানুষ এখনও বেঁচে আছে। নইলে কবে কবরের তলায় চলে যেতে হত।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে প্যাণ্টের পকেটে হাত দেন ম্যাল্কম। হাতে ঠেকে পেনশেনের টাকাটা। সাতষট্টি টাকা তেত্রিশ পয়সা। যৌবনে সরকারের সেবা করেছেন বলে সরকার বৃদ্ধ বয়সে এই টাকাটা দিচ্ছেন। যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিনই দেবেন। হ্যাঁ, তিনি কৃতজ্ঞ, সরকারের কাছে বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ।

রাজভবনের দক্ষিণ দিকের ফুটপাথ দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকেন ম্যাল্কম। এখন আর তাড়াতাড়ি হাঁটবার সামর্থ্য নেই। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন পা দুটো অবাধ্য হয়ে উঠছে। তাই তো পায়ের পেশীর ক্ষমতাদৈন্য হাতের লাঠিখানা দিয়ে পুষিয়ে নিতে হচ্ছে আজকাল।

বাঁদিকে রাজভবন, আর ডানদিকে গড়ের মাঠ। মাঝখানে সুন্দর মসৃণ রাজপথ। প্রতি মুহূর্তে মোটরগাড়ি যাচ্ছে এই পথে। রাস্তা পার-হওয়া একটা শক্ত ব্যাপার। শহর কলকাতার এই জায়গাটুকু বাস্তবিকই সুন্দর। রাজভবনের কাছে বলেই হয়তো কর্পোরেশনের কর্তাদের এদিকে একটু বিশেষ নজর। কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে রাস্তাঘাটের যে হাল তাতে মাঝে-মধ্যে ওই কর্পোরেশনের বাড়িটাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে ম্যাল্কমের। আজকাল নাকি শহরের দিকে দিকে একটা রব উঠেছে মহানগরীকে কল্লোলিনী তিলোত্তমা করে তুলতে হবে। হ্যাঁ, তিলোত্তমাই বটে! বর্ষার জলে হাবুডুবু খাওয়া তিলোত্তমা।

বড্ড খিদে পেয়েছে। সকালে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খান নি ম্যাল্কম। ভেবেছিলেন টাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি হোমে ফিরে এসে লাঞ্চ খাবেন। কিন্তু আজ আর বরাতে লাঞ্চ খাওয়া নেই। কাজেই, কিছু খেতে হলে নগদ পয়সা দিয়েই কিনে খেতে হবে। কিন্তু কি খাবেন তিনি? মোটে তো সাতষট্টি টাকা তেত্রিশ পয়সা। তা থেকে পঞ্চাশ টাকা চলে গেলে হাতে থাকবে সতেরো টাকা তেত্রিশ পয়সা। এই টাকা ক'টা দিয়েই সারা মাস চালাতে হবে তাঁকে। জামা-কাপড়, ধোপা-নাপিত, হাতখরচা, সব কিছুই ওই সতেরো টাকা তেত্রিশ পয়সার মধ্যে।

সেকাল ও একালের কলকাতা। না, বাঁদিকের ওই রাজভবনের তেমন কোন

পরিবর্তনই হয়নি। ব্রিটিশ গভর্নরদের আমলে যেমন ছিল আজও প্রায় তেমনই আছে। ডাইনে গড়ের মাঠের অবশ্যি কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তবে তাও তেমন কিছু নয়। শহরের অন্যান্য প্রান্তে কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছে যথেষ্ট। তার চাইতেও বেশি ঘটেছে শহরের মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন। সত্তর দশকে দাঁড়িয়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম যেন এই মানসিক পরিবর্তনের থেই খুঁজে পান না। সবকিছুই যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে।

ফুটপাথ জুড়ে বসে একজন হিন্দুস্থানী কাটা শশা বিক্রি করছিল। পথ-চারীদের অসুবিধের দিকে নজর নেই তার। দুপয়সা রোজগার হলেই তার হল। পুলিশেরও বয়ে গেছে এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে নাক গলাতে। কিন্তু ম্যালকম্‌ জানেন—শুধু জানেনই না, বেশ ভালভাবেই জানেন, এককালে ফুটপাথ-ব্যবসায়ীরা এই শহরে কি ভয়ে ভয়েই না ব্যবসা করত। ধরা পড়া মানেই হেভী ফাইন্‌। এখন বোধহয় আর ওসব হয় না। ধরাই পড়ে না, ফাইনের প্রশ্ন তো পরের কথা।

হিন্দুস্থানী শশাওয়ালার দিকে চোখ পড়তেই সাদা ভুরু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কমের। হঠাৎ তিনি হাতের লাঠি ঠুকে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন, এই হটো হিঁয়াসে।

লোকটা প্রথমটায় বোধহয় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এ আবার কে এলো মাতব্বরি করতে? এই বুড়োটা পুলিশের কেউ নাকি?

—এই, তুম বহেরা হ্যাঁয়? বাত নেহি শুনতা? হটো জলদি। আবার তেড়ে ওঠেন ম্যালকম।

লোকটাও এযুগের শশাওয়ালা। কাজেই বিনা প্রতিবাদে সরে যাবার পাত্র সে নয়। লোকটি এবার উঠে দাঁড়িয়ে একটু আমতা আমতা করে বললে, কিঁউ হটেগা জী?

—কিঁউ নেহি হঠেগা ওই আগে বোলো। কিস্‌কা লিয়ে ফুটপাথ হ্যায়—তুম্‌হারা ব্যওসাকে লিয়ে, ইয়া আদমীকো যানা আনাকে লিয়ে?

—আদমীকো যানেকা তো থোড়া রাস্তা হ্যায়।

—নেহি নেহি, থোড়াসে নেহি চলেগা। পুরা রাস্তা মাংতা। যাও, হটো হিঁয়াসে।

লোকটা আরও একটু সময় বুড়ো সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে কি যেন ভাবে। সাদা চামড়ার মানুষ বলে চট করে কড়া কিছু বলতেও ঠিক ভরসা হয় না, আবার এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও নতুন করে দোকান সাজাতেও মন চায় না।

ইতিমধ্যে দু'চারজন পথচারীও জুটে গেছে সেখানে। কি হয়েছে—কি হয়েছে, দাদা? ঝামেলা কিসের? এ ব্যাটা খোট্টা আপনাকে ঠকিয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এরা লোক বুঝে ঠকায়। দেখেছে একজন বুড়োমানুষ তাই দিব্যি ঠকিয়েছে। আর একজন মন্তব্য করে।

বুড়োমানুষকে বুড়ো বললে যারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় ম্যালকম তাদের দলে নন। কিন্তু তাঁর আপত্তি অন্য কারণে। বুড়ো বলে কি তিনি এমনই

অসহায় যে, ওই শশাওয়ালা পর্যন্ত তাকে ঠকাতে পারে—আর তিনি নিজে বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠকবেন? তাঁর সম্পর্কে পথচারীদের এমন ধারণা হল কেমন করে? তিনি বুড়ো হয়েছেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাই বলে মোটেই অসহায় নন। এখনও অনেক যুবা তার সঙ্গে হেঁটে পারবে না।

শহর কলকাতার পথচারীদের স্বভাবও বিলক্ষণ জানা আছে ম্যাল্‌কমের। রাস্তা-ঘাটে এরা ভিড় করতে পারে, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সরস মন্তব্য করতেও ওস্তাদ. এমনকি নিজেদের গা বাঁচিয়ে কোন ব্যাপারে প্রতিবাদ করতেও এদের বাধে না। কিন্তু যেই মুহূর্তে সেই ব্যাপারে নিজেদের জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, হম্বি-তম্বি প্রভৃতি বস্তুগুলো পকেটে পুরে একেবারে হাওয়া। টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় না তাদের।

পথচারীদের মন্তব্যে হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকে বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দেন ম্যাল্‌কম, না-না, আমাকে ঠকাবার সাহস নেই ওর। ওসব কিছু নয়। লোকটা দেখুন পথ জুড়ে ব্যবসা করতে বসেছে। লোকের চলাচলের পথ পর্যন্ত রাখে নি। তাই আমি প্রতিবাদ করতেই আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। আপনারাই বলুন তো, এসব কি ভয়ানক অন্যায় নয়? আপনারা বোধহয় জানেন যে, কজিং ইন্‌কনভিনিয়েন্স টু দি পাব্‌লিক্‌ ইজ অ্যান্‌ অফেন্স আণ্ডার ক্যালকাটা পুলিশ অ্যাক্ট।

—যাঃ বাবা! এ আবার কে এলো রে! ফুটপাথে বসে শশা বেচছে তাতে হয়েছে কি? একজন মন্তব্য করে।

ভিড়ের মধ্য থেকে বলে ওঠে আর একজন, আমরা ভাবলুম কি না কি। এখন যে দেখছি বুড়ো বয়সে সাহেবের মোড়লী করার শখ হয়েছে। কেটে পড়ুন সাহেব। এ সবের জন্য পুলিশ রয়েছে। আপনার মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই।

পুলিশের নাম শুনেই মেজাজটা খাপ্পা হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কমের। পুলিশ না হাতি! দেশে যদি সত্যিই পুলিশ থাকবে তাহলে পথে-ঘাটে এসব হয় কেমন করে? আসলে পুলিশ থেকেও নেই। তারা সবাই চোখ বন্ধ করে বসে আছে। নইলে কি এই শহরটার এমন দুর্দশা হয়! আর, বলিহারি এ যুগের পাব্‌লিকের মনোভাব! কোথায় প্রতিবাদ করবে, তা নয়, এসব সমর্থন করছে।

একটু যেন দমে যান ম্যাল্‌কম। ততক্ষণে ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। শশাওয়ালাও জনসমর্থন পেয়ে আবার গ্যাঁট হয়ে বসার উপক্রম করতেই ম্যাল্‌কম আবার চড়া সুরে বলে ওঠেন, ও নেহি হোগা। তুমকো যানেই পড়েগা। নেহি তো, ম্যাঁয় পুলিশ লে আয়গা।

ভ্যালা বিপদ তো! কোথাকার এক বুড়ো সাহেব এসে ঝামেলা বাধিয়ে দিয়েছে। একটু সময় চিন্তা করে শশাওয়ালা। তারপর কি মনে করে এখান থেকে সরে পড়াই সাব্যস্ত করে। বিরক্ত মুখে ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে লোকটা তার বসার চটখানা ভাঁজ করতে শুরু করে।

সারামুখে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি ছড়িয়ে পড়ে ম্যাল্‌কমের। যাক্‌, এতক্ষণে শুভবুদ্ধি ফিরেছে লোকটার।

ভয়ানক খিদে পেয়েছে ম্যাল্‌কমের। সেই সঙ্গে জলতেষ্টাও। গোটা দুই শশা কিনলে ভালো হত। কিন্তু লোকটাকে উৎখাত করে আবার তারই কাছে শশা চাইতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে।

শশার ঝাঁকাটা মাথায় নিয়ে লোকটা সবে দু' পা এগিয়েছে হঠাৎ তাকে পিছু ডাকেন ম্যাল্‌কম, এই, ঠাহ্‌রো !

ভ্রূ-কুঁচকে লোকটা ফিরে তাকায়।

পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ম্যাল্‌কম বললেন, দো'ঠো শশা দেও, লেও পয়সা।

লোকটা একটু সময় ম্যাল্‌কমের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে ওঠে, নেহি বেচেগা, জী। বলেই হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে যায়।

যাক্‌ গে। সিকিটা পকেটে ফেলে ফুটপাথ ঘেঁসে এসে দাঁড়ান ম্যাল্‌কম। সামনেই জেব্রা দাগ। এই দাগ ধরেই রাস্তা পার হয়ে সামনের ওই কার্জন পার্কের দিকে যেতে হবে তাঁকে। মেট্রো সিনেমার পাশের গলিতে একটা প্যাটিসের দোকান থেকে একখানা প্যাটিস্‌ কিনে তিনি খাবেন। শশার চাইতে প্যাটিস্‌ অনেক ভালো। কথাটা মনে হতেই হাসি পায় তার—গ্রেপ্‌স আর সাওয়ার !

নাঃ, বড় পরিশ্রান্ত লাগছে আজ। কার্জন পার্কের এক নির্জন কোণে একটা গাছের ছায়ায় এসে বসেন ম্যাল্‌কম। জায়গাটি ঠিক নির্জন নয়। অফিস-পালানো পিওন ও দারোয়ানেরা দিব্যি নরম ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে দিবা-নিদ্রা উপভোগ করছে। কয়েকটা ভিখিরির ছেলে ঘুর-ঘুর করছে এদিক-ওদিক।

হাতের লাঠিখানাকে পাশে শুইয়ে রেখে অলস ভঙ্গিতে ধর্মতলার দিকে তাকিয়ে থাকেন ম্যাল্‌কম। সেকাল ও একাল। কি ছিল আর কি হয়েছে। সেকালে এই কার্জন পার্কেরই ছিল কি নাম-ডাক। নরম ঘাসের গালিচা, সুন্দর ফুলের বাগান। পথচারীদের সাহস ছিল না একটি ফুল ছোঁয়। বোধহয় তেমন ইচ্ছেও ছিল না কারুর। একালের মত সেকালে প্রয়োজন কখনও সৌন্দর্যকে গ্রাস করতে উঠে-পড়ে লাগে নি।

তবুও সেই কার্জন পার্ক আজও আছে। জীর্ণ জরাগ্রস্ত কুরূপা হলেও সে আছে যেমনটি নাকি আছে শহর কলকাতা স্বয়ং। সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে এবং চূড়ান্ত অবহেলার মধ্যে কলকাতা কিন্তু আজও কলকাতাতেই আছে। বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের জীবনের সত্তরটি বছর কেটেছে এই শহরে। এর প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে তাঁর জীবনভোর পরিচয়। এর খানা-খন্দভরা রাস্তাঘাট আজও তাঁকে আকর্ষণ করে। তাই তো তিনি সুযোগ পেলেই পথে পথে ঘুরে বেড়ান। এর কলকোলাহল, হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কেমন যেন একটা মাদকতা আছে, যা নাকি তিনি পথ চলতে চলতে উপভোগ করেন। সব কিছু হারিয়েও এই হতশ্রী শহরটার মধ্যে তিনি খুঁজে পান এমন একটা প্রাণের স্পন্দন, একটা মমতার স্পর্শ, যা নাকি কাউকে বলে বোঝানো যায় না। কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। আর, এই মমত্ববোধটুকুই একদিন ম্যাল্‌কমের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে

দিয়েছিল, ফেলে দিয়েছিল তাঁকে একাকীত্বের কঠিন প্রান্তরে, যার জের আজও তিনি টেনে চলেছেন।

সহসা ম্যাল্‌কমের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানি মুখ। তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও সেই মুখখানি কিন্তু তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। মেরিয়া —তাঁর আদরের মেরিয়া। দীর্ঘ বারোটি বছর তিনি ঘর করেছিলেন ওই মেরিয়ার সঙ্গে। বড় সাধ করে দু'জনে মিলে একদিন ঘর বেঁধেছিলেন। ভেবেছিলেন এই বাঁধন একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনদিন কেউ ছিন্ন করতে পারবে না। কিন্তু কোথা দিয়া কি যেন হয়ে গেল। আজ তিনি নিজেই বা কোথায়, আর কোথায় বা তাঁর সেই মেরিয়া!

আচ্ছা, মেরিয়াও কি আজ তাঁর মত একা? বোধহয় না। হয়তো কোন একটা ভালো চাকরি-বাকরি জুটিয়েছে, হয়তো একজন সঙ্গীও জুটিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে। হয়তো স্বামী-পুত্র নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসার করছে। বেশ সুখেই আছে হয়তো। তাই থাক। সুখেই থাক মেরিয়া। তাঁর সঙ্গে সেদিন সম্পর্ক ছিন্ন করে ভালই করেছিল মেরিয়া। নইলে এখানে তার দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকত না। আচ্ছা, ম্যাল্‌কমের কথা কি তার একবারও মনে পড়ে না? কোন এক অবসর সময়ে এক মুহূর্তের জন্যেও কি তাঁকে মনে পড়ে না মেরিয়ার?

যাক্‌গে ওসব কথা। বারোটি বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য করতে নিষ্ঠার কোন অভাবই ছিল না ম্যাল্‌কমের। তাঁর অদেয় কিছুই ছিল না মেরিয়াকে। তবুও মেরিয়া চলে গেছে। তবে হ্যাঁ, একটি কথা তিনি বরাবর গোপন করেছিলেন মেরিয়ার কাছে। রুমা—সেই কালো মেয়ে রুমার কথা!

অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে রুমা—রুমা বাইজি। ওর কথা মনে পড়লে আজও সারা দেহ-মনে কেমন যেন এক অতীন্দ্রিয় আবেগ অনুভব করেন ম্যাল্‌কম। কেমন যেন এক ছায়াশীতল আবেশ। সেই আবেশে আজও যেন চোখদুটো তাঁর বুজে আসে। কান পাতলে আজও যেন তিনি স্পষ্ট শুনতে পান তার সেই মধু-ঝরা কণ্ঠের সঙ্গীত—"বলে দে সখী, বলে দে, কোথায় গেলে শুনতে পাব সেই পাগল করা বাঁশির সুর"। কানুর বিরহে উন্মাদিনী রাধা কানুর আশা ত্যাগ করেছে, এখন সে কেবল তাঁর বাঁশির পাগল করা সুর শুনতে পেলেই সন্তুষ্ট। একদিন যে সুর তাকে পাগল করে তুলেছিল, হায়, সেই সুরও আর সে শুনতে পায় না। তাই তো সে আকুল হয়ে সেই সুরের ঠিকানা খুঁজে বেড়ায়।

এ সব কথা খ্রীস্টধর্মী ম্যাল্‌কম শুনেছেন ওই রুমা বাইজির মুখে। হিন্দুদের দেব-দেবীর অনেক কথাই তিনি তার কাছে শুনেছেন। কিছু ভালো লেগেছে, কিছু লাগে নি। কিন্তু কানুর সেই বৃন্দাবন-লীলার কাহিনী অপূর্ব লেগেছে তাঁর। আর সেই জন্যে বোধহয় দায়ী রুমার সেই প্রাণ-মাতানো কণ্ঠস্বর।

সেই রুমা বাইজিই বা আজ কোথায়? কুটিল রাজনীতির বলি হয়েছে সে। একদল হিংস্র পশু কুরে কুরে খেয়েছে তাকে। অবশেষে—

না। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা মনে পড়লে আজও ম্যাল্‌কম শিউরে ওঠেন।

তাই তিনি মনে করতে চান না সেই দৃশ্য। তার বদলে সেখানে ফুটিয়ে তুলতে চান রুমা বাইজির অন্য একখানি চিত্র—মলমলের চাদরের ওপর বসে গান গাইছে রুমা। সাথে সঙ্গত চলছে হারমোনিয়াম, সারেঙ্গী ও তবলার। তানপুরায় গাল লাগিয়ে একমনে রুমা গেয়ে চলেছে সেই গান—"বলে দে সখী, বলে দে, কোথায় গেলে শুনতে পাব সেই পাগল করা বাঁশির সুর"। চোখ বুজে গান গাইছে রুমা, আর দু'চোখের কোল বেয়ে জল ঝরছে তার।

নাঃ, আর এসব চিন্তা নয়। লাঠিখানা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ান ম্যাল্‌কম। তারপর কার্জন পার্কের মধ্যে সরু পায়ে চলা রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন।

চারিদিকে ময়লা আবর্জনা। শালপাতার ঠোঙা, কাগজের টুকরো, ফলের খোসা—পার্কের অবস্থা দেখে দারুণ বিরক্তি বোধ করেন ম্যাল্‌কম। শ্রদ্ধা জানাবার চমৎকার নমুনা বটে! কার্জন পার্ক যেদিন থেকে সুরেন ব্যানার্জী পার্ক হল সেদিন থেকেই বোধহয় সরকারী তত্ত্বাবধানে এর এই হাল। রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারো না তো নতুন নামকরণের এত ঘটা কেন? এ যেন সেই ধার্মিক ব্রাহ্মণের গরু পোষার মত ব্যাপার। গরুকে খাওয়াবার মুরোদ নেই, কিন্তু রোজ দু'বেলা সেই হাড় জিরজিরে গরুর পায়ে জল ঢেলে পুজো করার ঘটা।

ম্যাল্‌কমের আগে আগে হেঁটে চলেছে চার-পাঁচটি তরুণ। তাদের মাথায় লম্বা চুল, পরনে অতি আধুনিক পোশাক। আনন্দে উচ্ছল সেই তরুণেরা নিজেদের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে গল্প করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে, একটু দাঁড়া, ভাই। বলেই সেই তরুণটি পার্কের মধ্যেই একটা সরু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেকে হালকা করতে থাকে। তার দেখাদেখি আরও একজন গিয়ে দাঁড়ায় তার পাশে।

দৃশ্যটা দেখেই সাদা ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কমের। এ কি অন্যায়? পার্কের মধ্যে এ কেমন নোংরামি! এটা কি মগের মুল্লুক হয়ে উঠল নাকি?

দু'পা এগিয়ে গিয়ে হাতের লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে ম্যাল্‌কম চেঁচিয়ে ওঠেন, স্টপ্—স্টপ্! পার্কটাকে এমন নোংরা করছ কেন তোমরা? ইট ইজ পাব্‌লিক নুইসেন্স। ইট ইজ অ্যান্ অফেন্স আণ্ডার ক্যালকাটা পুলিশ অ্যাক্ট।

ব্যাস্ আর যায় কোথায়! হৈ-হৈ করে ছেলেরা এসে ঘিরে ধরল বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমকে। এরা তো আর অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী শশাওয়ালা নয়। এ যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বাধীন দেশের নাগরিক এরা। দেশের ভবিষ্যৎ ভালোমন্দ যে এদেরই হাতে।

—আপনি বলার কে? অয়েল ইওর ওন মেশিন। ভালোয় ভালোয় সট্‌কে পড়ুন, নইলে মুশকিল হবে বলে দিচ্ছি।

অন্য একজন আরও একধাপ উঁচুতে ওঠে—শালা বুড়ো হাবড়া, রংবাজি করার আর জায়গা পাও নি! এক ঝাপটায় টেংরি খুলে নেব, বুঝলে?

একটু যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন ম্যাল্‌কম। তবুও তিনি আবার বলতে চেষ্টা করেন, ইট ইজ ক্লিয়ার পাব্‌লিক নুইসেন্স—

এই সময় ওদের মধ্যে একটি তরুণ গম্ভীর চালে বলে ওঠে, আরে যেতে দে, দেখতেই তো পাচ্ছিস্ লোকটা পাগল। একটা পাগলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ,

কি ? চল্—চল্, ওদিকে ম্যাটিনি শো শুরু হয়ে গেল।

হাসতে হাসতে দলটি এগিয়ে যায়। আর ঘোলাটে চোখ মেলে সেইদিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। পাগল ? হ্যাঁ, সে পাগলই বটে ! পাগল না হলে এসব ব্যাপারে কেউ কি মাথা গলাতে যায় ?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। প্যাটিস খাওয়া আর হয় নি ম্যাল্‌কমের। তার বদলে সুরেন ব্যানার্জী রোডে একটা উড়ের দোকানে ঢুকে একপ্লেট ঘুগনী ও এক কাপ চা খেয়েছেন তিনি। না, আর দেরি নয়। এবারে ফিরতে হবে। নইলে রাতের খাওয়াও আর বরাতে জুটবে না।

হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে দাঁড়ান বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। রাস্তার ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে অসহায় ভঙ্গিতে। বাদুড়ঝোলা বাসে-ট্রামে অফিস ফেরত ঠাসাঠাসি যাত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে, আর বোধহয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছে।

কিন্তু কেন এই জ্যাম ? কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি ? না, অ্যাক্সিডেন্ট নয়। লাল শালুর ফেস্টুন হাতে দীর্ঘ শোভাযাত্রা চলেছে দাবী আদায় করতে। অফিস-ফেরত যাত্রীদের এমনি কষ্ট না দিলে তাদের দাবীর প্রতি জনসমর্থন আদায় হবে কেমন করে ?

ফুটপাথে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোলাটে চোখ মেলে শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। হঠাৎ তিনি নিজের মনেই বলে ওঠেন, অবস্ট্রাক্টিং পাব্‌লিক রোড ইজ এ্যান অফেন্স আণ্ডার ক্যালকাটা পুলিশ অ্যাক্ট। ইয়েস, ইট ইজ ডেফিনিটলি অ্যান অফেন্স।

## ॥ দুই ॥

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন ম্যাল্‌কম। ফেরার সময় বাসে চাপতে ইচ্ছে হল তাঁর। কি মনে করে উঠে বসলেন একটা দশ নম্বর বাসের দোতলায়। দুপুরের বাস, অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। অনেক দিন পরে বাসে চাপতে বেশ ভালই লাগছিল তাঁর। দোতলায় বসে শহরটাকে দেখতে দেখতে চলছিলেন ম্যাল্‌কম।

গড়িয়াহাট পর্যন্ত টিকিট থাকলেও কি মনে করে ম্যালকম্ নেমে পড়লেন পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে। ময়দানে ঢুকে একটা বেঞ্চির ওপর বসে তিনি তাকিয়ে রইলেন দূরের গাছপালার দিকে। হাওড়া স্টেশন থেকে পার্ক সার্কাস ময়দান—হাওড়া স্টেশন টু পার্ক সার্কাস ময়দান। কেমন যেন একটা লিঙ্ক রয়েছে এই দুটো জায়গার মধ্যে। কিন্তু কিসের সেই লিঙ্ক—কি রকম সম্পর্ক ? পকেট থেকে একটা তোবড়ানো সিগারেট বের করে দেশলাই জেলে আগুন ধরান ম্যাল্‌কম। তারপর নিজের মনেই খুঁজতে থাকেন সেই লিঙ্ক—মিসিং লিঙ্ক।

হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে তাঁর। বহুকাল আগেকার কথা। সেটা বোধ হয় উনিশশো আঠাশ সাল। আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার সেই কাহিনী।

বেলা দশটা নাগাদ একখানা গাড়ি লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই গেটের পুলিশ প্রহরীরা জুতোর গোড়ালিতে শব্দ করে কড়া হাতে স্যালুট দিল গাড়ির আরোহীকে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা লাল-বাজারের পুলিশ মহলে একটা সাড়া পড়ে গেল—সি. পি.—সি. পি.। আজ একটু তাড়াতাড়িই এসেছেন সি. পি.।

গাড়ি থেকে ইয়ংম্যানের মত লাফিয়ে নামলেন সি. পি. অর্থাৎ পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট। পরেন খাকি ইউনিফর্ম। হাতে চামড়া মোড়া একখানা ব্যাটন্। কোমরে ঝুলছে রিভলভার।

গাড়ি থেকে নেমে এক মুহূর্ত দাঁড়ান কমিশনার টেগার্ট। এই সময়টুকুর মধ্যেই একবার চোখ বুলিয়ে নেন চারিদিকে—কে কোথায় কি করছে, কনস্টেবলরা কে কেমন পোশাকে কোথায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে, পুলিশভ্যান-গুলো কেমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, ডিউটিরত সার্জেণ্ট কোন্ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, ঝাড়ুদার পেছনের চত্তরটা কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছে প্রভৃতি ব্যাপারগুলো দেখে নিতে ওই এক মুহূর্তেই যথেষ্ট।

খুশি মুখে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান টেগার্ট। লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী কনস্টেবল্ প্রেজেণ্ট আর্ম ভঙ্গিতে সেলাম জানায় তাঁকে। সেখান থেকে সোজা দোতলায় নিজের ঘরে।

চার্লস টেগার্টের গায়ের রঙ ঠিক সাদা ধবধবে নয়, অনেকটা দুধের সঙ্গে আলতা-মেশানো রঙ, তবে আলতার ভাগ যেন একটু বেশি। খাঁটি আইরিশ রক্ত তার দেহে - সেই আইরিশ রক্ত যা নাকি ছিল আয়ারল্যাণ্ডের মহান নেতা ডি' ভ্যালেরার শরীরে। নিজের জাতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে ব্রিটিশ রাজ-পুরুষদের হাতে একদিন যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল ডি' ভ্যালেরাকে। সেই দেশের মানুষ চার্লস টেগার্ট এদেশে এসে হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির একটা মস্তবড় স্তম্ভ কলোনিয়াল রুলের একজন প্রধান ব্যক্তি, এবং স্বদেশী, বিশেষ করে বিপ্লবীদের যম। লম্বা-চওড়া পুরুষ, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, একটু চৌকো ধরনের মুখ, তীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল চোখজোড়ায় বুদ্ধির ছাপ।

সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। দোতলায় নিজের অফিসরুমে বসে কাগজপত্র দেখছেন চার্লস টেগার্ট। ডাইনে-বাঁয়ে দু'খানা ঘরে ডেপুটি কমিশনার -হেড-কোয়ার্টার, ও ডেপুটি কমিশনার ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্ট। সাদা পোশাক পরা আর্দালী কনস্টেবলেরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ফাইলপত্র নিয়ে যাতায়াত করছে সাহেবদের ঘরে। সিঁড়ির মুখে বেয়নেট লাগানো রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে গাড়োয়ালী কনস্টেবল্। আর কমিশনানের ঘরের ঠিক সামনে করিডোরের একপাশে মাটির মূর্তির মত স্থির অচঞ্চল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

কতই বা বয়স ম্যাল্‌কমের। বড়জোর তেইশ কি চব্বিশ। ছ'ফুট দু ইঞ্চি লম্বা। সুগঠিত দেহ। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। চোখের তারার রঙ কটা হলেও চোখ দুটো বড় বড়। গ্রীসিয়ান প্যাটার্নের মুখখানায় কেমন যেন

এক ধরনের ভাবলেশহীনতার ছাপ, যা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কঠোর কাঠন মুখেই লক্ষ্য করা যায়।

সার্জেণ্ট ম্যালকম সৈনিকই বটে, পুলিস ডিপার্টমেণ্টের সৈনিক। মাত্র বছর তিনেক চাকরি হয়েছে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই চেহারায় ও চরিত্রে সে ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নাবিক কলম্বাসের সেই বিখ্যাত উক্তিটিকে যেন সে নিজের চাকরী-জীবনে সত্যি করে তুলতে চায় 'ডিসিপ্লিন্ নোজ নো বাট্'। নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে 'কিন্তু' শব্দটির কোন স্থান নেই। অর্ডার ইজ অর্ডার, দ্যাট্ মাস্ট বি ওবেড্ উইদাউট এনি কোশ্চেন্। যুদ্ধক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সৈনিকের আদর্শ। পুলিশের চাকরিও আধা সৈনিক-বৃত্তি। এখানে যে গুণটির প্রয়োজন সর্বাধিক তার নাম—'ডিসিপ্লিন্'।

একটু পরেই দোতলায় এসে হাজির হয় প্যাণ্ট-কোট-টাই পরা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার। কমিশনারের আহ্বানেই সে দেখা করতে এসেছে তাঁর সঙ্গে। হাতে একটি জরুরী ফাইল।

আই. বি অর্থাৎ ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অনুরূপ কলকাতার জন্যে আছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ। এর কর্তা দুজন ডেপুটি কমিশনার আর সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে খোদ কমিশনারের ওপর। আই. বি-র লোকজনের মত এদেরও কোন উর্দি পরতে হয় না। কেবল রাজনীতি ও রাজনৈতিক অপরাধের মধ্যেই এদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। সাধারণ চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধের ব্যাপারে এদের কোন দায়িত্বই নেই।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি. সি-র দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়েই তাকে স্যালুট করে ম্যাল্কম। তারপর বললে, ইয়েস স্যার ?

—সি. পি-র সঙ্গে দেখা করব। ডি. সি. বললেন।

—ওয়ান মিনিট প্লীজ, স্যার! বলেই সার্জেণ্ট ম্যাল্কম দ্রুতপায়ে গিয়ে ঢোকে সি. পি-র ঘরে। পরমুহূর্তেই বাইরে এসে দরজার একপাশে অ্যাটেন্শান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, ইয়েস স্যার!

স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি. সি সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই ভেতরে থেকে জেগে ওঠে টেগার্টের কণ্ঠস্বর, ইয়েস, কাম ইন্।

মস্তবড় টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি বসে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি সি. ও পুলিস কমিশনার। চার্লস টেগার্টের মুখখানা গম্ভীর। কোন একটা ব্যাপারে যেন তিনি বিশেষ চিন্তিত।

ডি. সি কিছু বলার আগেই টেগার্ট শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন, কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে আপনার রিপোর্ট পেলাম। কিন্তু ওখানকার ভলাণ্টিয়ারদের ব্যাপারটা বাস্তবিকই আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। ওদের মিলিটারী কায়দায় শিক্ষিত করে তোলার অর্থ কি?

—সত্যি স্যার, কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে এর যেন ঠিক মিল নেই।

—আমারও তো সেই জন্যেই দুশ্চিন্তা। পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেস অধিবেশন হবে। সভাপতিত্ব করবেন মতিলাল নেহরু। কিন্তু ভলাণ্টিয়ারদের

মিলিটারী কায়দায় কুচকাওয়াজ করানো হচ্ছে কেন? কি এর উদ্দেশ্য?

—স্যার, ঐ বি. ভি.-দের সম্পর্কে আমার বরাবরই একটু সন্দেহ আছে। ওদের কার্যকলাপ নিয়ে আমি বেশ কয়েকবার হোম ডিপার্টমেণ্টে রিপোর্টও পাঠিয়েছি।

—হ্যাঁ, আমিও তা দেখছি। ইদানীং ওদের পরিচালক তো সুভাষ বোস?

—হ্যাঁ স্যার, বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের সর্বময় কর্তৃত্ব এখন সুভাষ বোসের হাতে। খবর পেয়েছি, এবার কংগ্রেস অধিবেশনে ওই বি ভি.-রাই ভলাণ্টিয়ারের কাজ করবে। তাই ওদের মিলিটারী কায়দায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে।

—সেটাই তো রহস্যময় ব্যাপার। মিলিটারী কায়দায় শিক্ষিত করা কেন? তবে কি এর মধ্যে ওই সুভাষ বোসের অন্য কোনরকম পরিকল্পনা আছে?

—তাও থাকতে পারে স্যার। তবে সে ব্যাপারে সঠিক খবর যোগাড় করতে আরও কিছুদিন লাগবে।

— আচ্ছা. ওদের ব্যাপারে আমাদের সোর্স-ওয়ার্ক কেমন?

—মোটামুটি মন্দ নয় স্যার। দু'একজন খুব ভালো সোর্সও আছে। তবে অধিকাংশই ভেরি হার্ড টু ব্রেক্। দলটা খুবই সুগঠিত। কিন্তু যত সুগঠিতই হোক না কেন. দলের মধ্যে দু'একটা ব্ল্যাকশিপ থাকবেই। তাদেরই আমরা পিক্ আপ্ করে সোর্স করে নিয়েছি।

এমনি সময় বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে এসে ঘরে ঢোকে। ডি. সি.-র হাতে একটা কাপ তুলে দিয়ে নিজে আর একটা কাপ টেনে নেন টেগার্ট। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে আবার বললেন, কংগ্রেস সেসানের সময় এই ভলাণ্টিয়ারদের কম্যান্ড করবে ওই সুভাষ বোস, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি. সি. বললেন, হ্যাঁ। হি হিজ দি জি ও. সি.—জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং ওই সুভাষ বোস নিজে।

ভুরুযুগল কুঁচকে সারা মুখে একটা বিস্ময়সূচক ভাব ফুটিয়ে তুলে টেগার্ট বলে ওঠেন আই সি. একেবারে জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং! পুরো মিলিটারী কায়দায় সব কিছু?

—হ্যাঁ স্যার, শুধু কি তাই? মিলিটারী কায়দায় ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে কেউ কর্নেল, কেউ মেজর, কেউ বা ক্যাপ্টেন। এমনকি স্টাফ অফিসার পর্যন্ত আছে। মিলিটারী কায়দায় প্রত্যেকের ডিউটি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আর এই সমস্ত পরিকল্পনা ওই সুভাষ বোসের।

কথাটা শুনতে শুনতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন চার্লস টেগার্ট। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বলতে থাকেন, হি ইজ জিনিয়াস—হি ইজ ডেঞ্জারাস। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই লোকটিকে নিয়ে একদিন গভর্নমেণ্টকে বিপদে পড়তে হবে। কংগ্রেস পার্টির অহিংস কার্যকলাপ নিয়ে বর্তমানে তেমন চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু ওদের দলে ওই সুভাষ বোসের আচার-আচরণ সত্যিই অন্যরকম।

—অধিবেশন আরম্ভের কয়েক দিন আগে ওরা নাকি রুট-মার্চ করবে। ডি সি. বললেন।

—রুট-মার্চ ? কেন ?

—বোধহয় শহরবাসীর মনে আস্থার ভাব ফুটিয়ে তুলতেই ওদের ঐ রুট মার্চ।

একটু সময় চুপ করে থেকে টেগার্ট জবাব দেন, সম্ভবত তাই। অদ্ভুত পরিকল্পনা ওই সুভাষ বোসের।

— আচ্ছা স্যার, আমরা ওই রুট-মার্চ বন্ধ করে দিতে পারি না ?

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা নাড়েন চার্লস টেগার্ট। তারপর জবাব দেন, না, গভর্নমেণ্ট তাতে রাজী হবে না। গভর্নমেণ্টের বর্তমান অ্যাটিচুড অন্যরকম। এই সময় ওদের ঘাঁটাতে চায় না তারা।

—কিন্তু তাই বলে ওরা মিলিটারী পোশাক পরার অনুমতি পর্যন্ত পাবে ? খবর পেয়েছি যে, ওরা পুরো মিলিটারী ইউনিফর্ম পরেই ডিউটি করবে।

ডি. সি.-কে সংশোধন করে দিয়ে টেগার্ট বললেন, মিলিটারী ইউনিফর্ম নয়, মিলিটারীর অনুকরণে ইউনিফর্ম। তাতে তো কোথাও কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আর. এটা বে-আইনীও নয়। যে-কেউ মিলিটারীর মত পোশাক পরতে পারে, আর তা নিয়ে রাস্তায় মার্চ করতেও বাধা নেই। যতক্ষণ না কোথাও শান্তিভঙ্গ হচ্ছে কিংবা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে ততক্ষণ আমাদের করণীয় কিছুই নেই।

কথাটা শেষ করেই চার্লস টেগার্ট একটা ফাইলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলতে থাকেন, ইউ মে গো নাউ। হাওড়া স্টেশন ও পার্ক সার্কাস ময়দানের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। বুঝতে হবে ঐ ভলাণ্টিয়ারদের আসল উদ্দেশ্য। মোটকথা, আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের নেট-ওয়ার্ক যেন ঠিক থাকে। গভর্নমেণ্টকে যেন আমরা দেখাতে পারি যে, কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যাপারে পুলিশ তরফে যতটুকু করণীয় তার সবটুকুই করা হয়েছে। কোথাও কোন ত্রুটি ঘটে নি। এখন আসল পলিসি গভর্নমেণ্টের।

—ইয়েস স্যার। বলেই উঠে দাঁড়ান স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি. সি.। তারপর অ্যাটেন্‌শান্‌ ভঙ্গিতে টেগার্টকে অভিবাদন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

পার্ক সার্কাস ময়দানে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশন নিয়ে সারা কলকাতা শহরে সাজ-সাজ রব। খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিন নানা ধরনের খবর। জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোতেই এ নিয়ে হৈ-চৈ বেশি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই চৌত্রিশতম অধিবেশন হবে বর্ণাঢ্য। সুভাষ বসুর বি. ভি. দল পুরো সামরিক কায়দায় এর শৃঙ্খলারক্ষার ভার নিয়েছে। সবদিক থেকেই এবারের এই কলকাতার অধিবেশন নাকি স্বাতন্ত্র্য দাবী করবে।

শাসকশ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট কাগজও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তারাও এই আসন্ন অধিবেশন সম্পর্কে কিছু কিছু খবর ছাপছে, তবে সবটাই একটু বক্র-দৃষ্টিতে। কংগ্রেস দলে সুভাষের বিরোধীর অভাব নেই। কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারদের মিলিটারী কায়দা কানুন এবং সুভাষের জি. ও. সি. পদ গ্রহণ করাকে তারা ঠিক ভাল চোখে দেখতে পারছিল না। তারা ইংরেজী জি. ও. সি. অক্ষর তিনটিকে 'গক্' নামে উচ্চারণ করে সুভাষকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে। আর ওই সব শাসকশ্রেণীর কাগজও এমন একটা মজার ব্যাপারকে লুফে নিয়ে তা পরিবেশন

করতে দ্বিধা করলে না।

সেদিন এই 'গক্' কথাটি নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল লালবাজারের 'বার' অর্থাৎ মদের দোকানে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের উত্তর দিকের তেতলা বাড়ির দোতালায় সার্জেণ্ট মেস। কলকাতা পুলিশের অবিবাহিত সার্জেণ্টরা ঐ মেসেই থাকে। ইচ্ছে করে থাকে না, ওখানে থাকাটাই তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। নিচের একতলায় একটা মদের দোকান। পুলিশ ফোর্সের সভ্যরা ঐ মদের দোকানে কম দামে মদ খেতে পারে।

সন্ধ্যের দিকে ডিউটি সেরে সেই মদের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিল চারজন সার্জেণ্ট। ম্যালকমও ছিল তাদের মধ্যে। কথা হচ্ছিল পরের দিন থেকে পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেস অধিবেশনে ডিউটি সম্পর্কে।

ওদের মধ্যে সার্জেণ্ট এণ্টনিরই বিদ্যে বুদ্ধি কিছু বেশি। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। আর সবাই তো জুনিয়র কেম্ব্রিজের চৌকাঠও পার হতে পারে নি। সেই সূত্রে সার্জেণ্ট এণ্টনি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ত, আর দেশের রাজনীতিরও খবর রাখত কিছু কিছু।

ডিসেম্বরের সন্ধ্যে। বাইরে কড়া ঠাণ্ডা। মদের দোকানের একটা প্রকোষ্ঠে বসে সফেন হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সার্জেণ্ট এণ্টনি ম্যাল্কমের দিকে তাকিয়ে বললে, তোর কোথায় ডিউটি পড়ল, জনি ?

ম্যাল্কমের ডাক-নাম জনি। বন্ধুদের মধ্যে তার ঐ জনি নামটার প্রচলনই বেশি।

এক ঢোঁক হুইস্কি গলায় ঢেলে সার্জেণ্ট ম্যাল্কম জবাব দেয়, হাওড়া স্টেশনে।

বলে ওঠে সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট, তোর বরাত খুব ভালো দেখছি। হাওড়া স্টেশনে আর কতক্ষণ থাকতে হবে তোকে ? স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেই তো তোর ছুটি। সোজা চলে আসবি হেডকোয়ার্টারে। আর আমার অবস্থাটা একবার দ্যাখ। সেই সকাল সাতটায়—

গ্র্যাণ্টের কথা শেষ হবার আগেই ম্যাল্কম আবার বললে, হ্যাঁ, সেই আনন্দেই থাক্। হাওড়া থেকে সোজা লালবাজারে ফিরে আসতে দিচ্ছে কে আমাকে ? স্টেশন থেকে পার্ক সার্কাস ময়দান পর্যন্ত প্রসেসনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভ্যান নিয়ে থাকতে হবে। সঙ্গে থাকবে ফোর্স। অবিশ্যি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার থাকবে ফোর্সের চার্জে। রাস্তায় কোনরকম গোলমাল হলে তো আমাকেই পোহাতে হবে সব ঝক্কি-ঝামেলা। এ. সি. তো সেই অবস্থায় হুকুম দিয়েই খালাস। এবার মরতে মরো তুমি।

একটু গম্ভীর চালে রহস্যের সুরে সার্জেণ্ট এণ্টনি বললে, না রে, না। কোন অসুবিধে হবে না তোর। তেমন কিছু হলে খোদ ব্লাডহাউণ্ড গ্যাঁক শব্দে লাফিয়ে পড়বে।

—ব্লাডহাউণ্ড আবার এর মধ্যে আসবে কেমন করে ? কৌতূহলী সার্জেণ্ট নর্টন জিজ্ঞেস করে।

জবাব দেয় এণ্টনী, না ঠিক 'গ্যাঁক' শব্দে নয়, 'গক' শব্দ করে লাফিয়ে

পড়বে।

তার মানে? ম্যাল্‌কম ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে এণ্টনীর মুখের দিকে।

এণ্টনী একবার বন্ধুদের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকায়। বুঝতে পাবে এরা কেউই তার হেঁয়ালিটুকু ধরতে পারে নি। তাই সে এবার বিজ্ঞের সুরে বললে, মিলিটারী পোশাকে সুভাষ বোস কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার্সের জি. ও. সি.-জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং, অর্থাৎ 'গক্‌'। এবার বুঝলি?

এণ্টনীর রসিকতায় এবার সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। এণ্টনীও এমন ভাব দেখায় যেন ব্যাপারটা তার একান্তই মৌলিক ভাবনাপ্রসূত। কিন্তু আসলে সে সেদিনই খবরের কাগজে এটা পড়েছে।

ম্যাল্‌কম সুভাষ বোসের নাম কখনও শোনে নি। সার্জেণ্ট গ্রাণ্ট ও নর্টনের অবস্থাও তার মত। ম্যাল্‌কম তাই এণ্টনীকে জিজ্ঞেস করে, সুভাষ বোস কে?

পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়ে জবাব দেয় গ্র্যাণ্ট, মিলিটারী পোশাক পরে কি কোন সিভিলিয়ান থাকতে পারে? সুভাষ বোস তো একজন মিলিটারী অফিসার।

—এই রে, সেরেছে! বলে ওঠে এণ্টনী, সুভাষ বোসের নাম শুনিস নি? তাকে আবার বলছিস একজন মিলিটারী অফিসার? তোদের জ্ঞান-বুদ্ধি তো সাংঘাতিক! সুভাষ বোস একজন বড় কংগ্রেস নেতা।

—কংগ্রেস নেতা! বিস্মিত কণ্ঠে একযোগে বলে ওঠে সবাই, কংগ্রেস নেতা খদ্দরের ধুতি-জামা আর মাথায় গান্ধী-ক্যাপের বদলে মিলিটারী পোশাক পরবে কেন?

সার্জেণ্ট এণ্টনী হেসে জবাব দেয়, কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের মত ব্যাপার আর কি! হোঁৎকা চেহারার এক কংগ্রেসীর শখ হয়েছে মিলিটারী পোশাক পরবে। সেই পোশাক পরে সার্কাসের ক্লাউনের মত সবাইকে হাসিয়ে বেড়াতে চায় বোধহয়।

—সুভাষ বোস লোকটাকে তুই দেখেছিস কখনও? লোকটা বুঝি দেখতে খুবই বিশ্রী? নর্টন জিজ্ঞেস করে।

—কাগজে দেখেছি নিশ্চয়ই, তবে ঠিক মনে নেই। তা, একটা ব্ল্যাকি নিগারের চেহারা আর কত ভালো হবে? সে তো আর আমাদের জনির মত দেখতে হতে পারে না। বলেই এণ্টনী প্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় ম্যাল্‌কমের দিকে।

নিজের চেহারার প্রশংসায় একটু আনন্দমিশ্রিত বিব্রত ভাব ফুটে ওঠে ম্যাল্‌কমের মুখে। মদের গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে সে আবার বললে, শুনেছি, ওই কংগ্রেস নেতারা নাকি সবাই টেরারিস্ট। গুলি-বন্দুক ছুঁড়তে নাকি খুব ওস্তাদ। ওই সুভাষ বোসও বোধহয় তাই। এ জন্যেই মিলিটারী পোশাক পরতে এত উৎসাহ।

ম্যাল্‌কমের অজ্ঞতায় হেসে ওঠে এণ্টনী। হাসতে হাসতে বললে, নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি। কিছুই খবর রাখিস না। কংগ্রেসী

আর টেরারিস্ট এক নয়। কংগ্রেসীরা মিটিং করে, প্রসেশন করে, আর টেরারিস্টরা লুকিয়ে লুকিয়ে তোর-আমার মত পুলিশ আর বড় বড় বিলিতি অফিসার খুন করে। তবে কংগ্রেসীদের মধ্যেও দু'একটা টেরারিস্ট থাকতে পারে।

এবার সার্জেণ্ট নর্টন ম্যাল্‌কমকে সমর্থন করে বললে, তা হলে তো জনি ঠিকই বলেছে। ঐ সুভাষ বোসও বোধহয় কংগ্রেস দলে তেমনি একজন টেরারিস্ট।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এণ্টনী বললে, অসম্ভব নয়। তবে লোকটা নাকি সাদা চামড়ার লোকদের ভয়ানক ঘৃণা করে। কলেজে পড়ার সময় নাকি একবার একজন সাহেবকে মেরেছিল।

সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট তার গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে গেলাসটা সশব্দে টেবিলের ওপর রেখে বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠে; ব্লাডি নিগার! সাদা চামড়ার লোকদের ঘেন্না করা ? মারধোর করা ? বাগে পাই তো একদিন বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। স্কাউণ্ড্রেল!

গ্র্যাণ্টের কথার ধরনে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারে যে, তার বেশ নেশা হয়েছে। সেই নেশার ঘোরেই সে খাপ্পা হয়ে উঠেছে ওই সুভাষ বোস নামক লোকটার ওপর।

শুধু গ্র্যাণ্ট কেন, এণ্টনীর কথা শুনে ম্যাল্‌কম নিজেও ওই সুভাষ বোসের ওপর বিরক্ত বোধ করে। তার এতকাল ধারণা ছিল, এদেশের লোকেরা সাদা চামড়ার মানুষদের একটু সমীহ করে চলতেই অভ্যস্ত। মুখে যাই বলুক না কেন, মনে মনে তারা জানে বিলেতের লোকেরা তাদের চাইতে সর্ববিষয়েই উন্নত। আর, এদেশের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ যে ব্রিটিশেরই সমগোত্রীয় এ কথা তো সবাই জানে। তাই এণ্টনীর কথায় সেই না দেখা লোকটার ওপর মনটা বিষিয়ে ওঠে ম্যাল্‌কমের। কোথাকার কোন্ সুভাষ বোস, তার কিনা এতবড় সাহস যে, সে আমাদের ঘৃণা করে! এত স্পর্ধা লোকটার!

নিজের মনোভাব আর চেপে রাখতে পারে না ম্যালকম্। বলেই ফেলে সে, তা'হলে তো লোকটা ভয়ানক পাজি!

—শুধু পাজি কেন, বর্বর। হাতের কাছে পেলে লোকটার চোয়ালে একখানা পাঞ্চ বসিয়ে দিয়ে—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট তার হাতের পেশী ফুলিয়ে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে।

এণ্টনী এই সময় বললে, তোরা যা ভাবছিস তা কিন্তু নয়। ওই সুভাষ বোস লোকটার চরিত্র যাই হোক না কেন, লোকটা কিন্তু মোটেই হেঁজিপেঁজি নয়। বিলেতে গিয়ে আই. সি. এস. হয়েছিল। দেশে ফিরে এসে চাকরি না করে রাজনীতি করছে। চাকরি করলে এতদিনে একটা হোমরা-চোমরা অফিসার হতে পারত।

—সাংঘাতিক বোকা তো! নর্টন বলে ওঠে।

মদের আসরে সুভাষ বোসকে নিয়ে আলোচনা আর বেশিদূর এগোয় না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সার্জেণ্ট এণ্টনী দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে ম্যাল্‌কমকে ঠাট্টার সুরে বললে, ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো, এমন একটা চমৎকার সন্ধ্যা তুই

এখানে আমাদের সাথে বসে আড্ডা দিয়ে নষ্ট করছিস ? এদিকে তোর সেই মেরিয়া বোধহয় তোর পথ চেয়ে চেয়ে নিজের চোখদুটোকে প্রায় কানা করে ফেলল।

মেরিয়ার প্রসঙ্গে ম্যাল্‌কমের সুন্দর মুখখানা হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সে ইদানীং জানতে পেরেছে যে, তার বন্ধুবান্ধবেরা মেরিয়ার ব্যাপারটা এতদিনে টের পেরেছে এবং তা নিয়ে সরস আলোচনায় মুখর হয়ে উঠতেও দেরি হয় নি তাদের।

ষোল বছরের সুন্দরী মেরিয়াকে সত্যিই ভালো লাগে ম্যাল্‌কমের। তাই অবসর সময় সে লিণ্টন স্ট্রীটে তাদের বাড়ি একটু-আধটু যাতায়াত করে। একদিন বোধহয় কি একটা ব্যাপারে তাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিল ম্যাল্‌কম, আর তা চোখে পড়েছিল সার্জেণ্ট নর্টনের। সেই থেকেই ওরা এই নিয়ে তার পেছনে লাগছে।

এণ্টনী আবার বললে, একটু বুঝে-সুঝে চলিস জনি, দেখিস আবার বিগড়ে না যায়। পুলিশ সার্জেণ্টের সঙ্গে প্রেম করা তো সোজা ঝক্‌মারি ব্যাপার নয়। শেষে আবার আমাদের ইন্সপেক্টর হুীলের মত কিছু না হয়।

—ইন্সপেক্টর হুীলের আবার কি হয়েছিল ? প্রশ্ন করে নর্টন।

জবাবে বলতে থাকে এণ্টনী, সে এক দীর্ঘ বিয়োগান্ত কাহিনী। একটি মেয়ের সঙ্গে পুরো দশটি বছর ধরে কোর্টশিপ চলেছিল তার। আনুষ্ঠানিক বিয়ে না হলেও বিয়ের কিছুই তাদের মধ্যে বাকি ছিল না। বেশ চলছিল তাদের। হুীল তখনও সার্জেণ্ট, প্রমোশন পায় নি। হঠাৎ মেয়েটির পেটে বাচ্চা আসতেই সে বিয়ের জন্য তাড়া দিতে আরম্ভ করল হুীলকে। হুীলও যথারীতি বিয়ের জন্যে দরখাস্ত করল পুলিশ কমিশনারকে। দরখাস্ত আর মঞ্জুর হয় না, আর বেচারা হুীলও পারে না বিয়ে করতে। এদিকে অনুমতি না নিয়ে সার্জেণ্টের পক্ষে বিয়ে করাও আইন-বিরুদ্ধ। অবশেষে কয়েকমাস পরে হুীল যখন বিয়ের অনুমতি পেল তার আগেই মেয়েটি রাগ করে ওই অবস্থাতেই আর একজনকে বিয়ে করে বসল। আর সেই দুঃখে হুীল আর জীবনে বিয়েই করল না।

এণ্টনী থামতেই জড়িত কণ্ঠে গ্র্যাণ্ট ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে বুঝলি জনি, যা ইচ্ছে কর, কেবল ওই বাচ্চা-টাচ্চার ব্যাপারে একটু সাবধান থাকিস। বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে।

এমন কুৎসিত রসিকতা মোটেই ভালো লাগছিল না ম্যাল্‌কমের। বিশেষ করে মেরিয়ার মত একটি অপাপবিদ্ধা সুন্দরী কিশোরীকে নিয়ে। মেরিয়ার বাবা ফিলিপ পোর্ট কমিশনার্সের একজন অফিসার, লিণ্টন স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে ভাড়া থাকে। একমাত্র মেয়ে মেরিয়া একটি মেয়ে-স্কুলের ছাত্রী। পড়াশুনায় মন্দ নয়।

বছরখানেক আগের ঘটনা। এক্‌স্‌-মাসের ছুটির কলকাতা। সাহেবপাড়া লোকসজ্জায় ধারণ করেছে উৎসবের রূপ। বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স হোটেল-রেস্তোরাঁয় চুকবার মুখে আলো দিয়ে সাজানো এক্‌স্‌-মাস ট্রি। উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা সাহেব-মেমসাহেবরা বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়।

উৎসবের মধ্যমণি পার্ক স্ট্রীট অঞ্চল। সেখানে বার ও রেস্টুরেণ্টে সারারাত ধরে চলছে পান-ভোজন। বিদেশী জাহাজের নাবিকেরা পর্যন্ত এসে ভিড় করেছে এই অঞ্চলে স্ফূর্তি করতে। গভীর রাত পর্যন্ত পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাথে চলেছে তাদের লাগামহীন মত্ত প্রলাপ ও গলা ছেড়ে বিলিতি সুরের সঙ্গীত।

মেরিয়ার বাবা ফিলিপ তার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে এই অঞ্চলে এসেছিল উৎসবে যোগ দিতে। অনেক রাত পর্যন্ত একটা রেস্টুরেণ্টে বসে পান-ভোজন সেরেছে তারা। গভীর রাতে বাড়ি ফিরবার সময়ই তারা পড়ল মুশকিলে। বাড়ি ফিরবে কেমন করে? ট্যাক্সি কোথায়?

দূরত্ব অবিশ্যি খুব একটা বেশি নয়। পার্ক স্ট্রীট থেকে লিণ্টন স্ট্রীট। কিন্তু এই রাতে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে এই পথটুকু হেঁটে যাওয়া তো নিরাপদ নয়। বিশেষ করে রাস্তায় যেখানে এত মাতালের ভিড়।

অনেক চেষ্টার পরে একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসে একটু স্বস্তি বোধ করল ফিলিপ। যাক্ এবার নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফেরা যাবে।

পার্ক স্ট্রীট ধরে সোজা পূর্বদিকে ছুটে চলল ট্যাক্সি। হঠাৎ একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় আসতেই প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল ট্যাক্সির একটা চাকা। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়িটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে বিমর্ষ মুখে ফিলিপের দিকে তাকিয়ে বললে, নসীব খারাপ হ্যায়, জী—

ড্রাইভারের কথায় বোঝা গেল না নসীব কার খারাপ। ফিলিপের, না তার নিজের। কিন্তু চাকা যখন ফেটে গেছে তখন আর গাড়ির মধ্যে বসে থেকে লাভ কি?

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বাধ্য হয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়ায় ফিলিপ। ট্যাক্সি ড্রাইভারও গাড়ির দরজা বন্ধ করে নতুন চাকার খোঁজে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন উপায় কি? এই নির্জন জায়গায় আর একটা ট্যাক্সি যোগাড় কর একেবারেই অসম্ভব। আবার এদের নিয়ে এই পথটুকু হেঁটে যাওয়াও সমীচীন নয়।

হঠাৎ ফিলিপ লক্ষ্য করে, তিন-চারজন ষণ্ডামার্কা চেহারার যুবক হৈ-হুল্লো করতে করতে তাদের দিকেই আসছে। কণ্ঠে তাদের আদিরসাত্মক ইংরেজি গানের কলি।

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে ফিলিপ। তাকিয়ে দেখে তার স্ত্রীর মুখখান শুকিয়ে উঠেছে। কন্যা মেরিয়া বাপের একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। স্ত্রী ফিস্ ফিস্ করে স্বামীকে বললে, চলো, আমরা ফের ট্যাক্সির মধ্যে গিয়ে বসি

—কি করে যাবে? ট্যাক্সির দরজা যে বন্ধ। আর, তাতে লাভ কি হবে ওদের যদি কোন বদ মতলব থাকে তা'হলে তো ওরা ট্যাক্সির ওপরও হাম করতে পারে। তার চাইতে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। দেখা যাক কি হ

লোকগুলো প্রায় কাছে এসে পড়েছে। ওদের দেখতে পেয়ে তাদের গা উৎসাহ যেন আরও বেড়ে উঠেছে। হাঁটতে হাঁটতে একজন আর একজ

গায়ের ওপর প্রায় ঢলে পড়ে হি-হি করে হেসে উঠছে।

বেঁটে-খাটো মানুষ ফিলিপ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় মনটা অস্থির হয়ে ওঠে তার।

যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই। লোকগুলো কাছে এসে আরও বেশি মাতলামি শুরু করে দেয়। চোখ তাদের মা-মেয়ের ওপর। একজন ফিলিপের একেবারে কাছে এসে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি কি?

একটা ঢোক গিলে গম্ভীর কণ্ঠে ফিলিপ জবাব দেয়, একটা ট্যাক্সি যোগাড় করে দিতে পারলে খুবই খুশি হবো।

—ট্যাক্সি · ট্যাক্সি ! ট্যাক্সির আর অভাব কি? অনেক ট্যাক্সি আছে। আসুন আমাদের সঙ্গে। বলেই লোকটা আঙুল তুলে একটা সরু রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

মেয়ের হাত ধরে শক্ত কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে মা। আর, দ্রুত চিন্তা করতে থাকে ফিলিপ।

রাস্তার গ্যাসের আলোয় ফিলিপের মুখখানা দেখে তারা বোধহয় বুঝতে পারে লোকটা খুব ভয় পেয়েছে। তাই ওদের মধ্যে আর একজন এবার বলে ওঠে, কিছু ভয় নেই। আসুন আমাদের সঙ্গে। বেশ তো, আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি একা আসুন আমাদের সঙ্গে। এরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকুক। ট্যাক্সি নিয়ে এসে এদের তুলে নিয়ে যাবেন। আসুন—আসুন আমাদের সঙ্গে। বলতে বলতে লোকটা প্রায় ফিলিপের গায়ের ওপর এসে পড়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে আসে একখানা পুলিশ ভ্যান। ফিলিপ লাফিয়ে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমেই দু'হাত তুলে পুলিশ ভ্যানটাকে থামাতে চেষ্টা করে।

ভ্যানটা এসে কাছে দাঁড়াতেই ভোজবাজীর মত উধাও হয়ে যায় সেই মাতাল লোকগুলো। ভ্যান থেকে নেমে আসে সার্জেণ্ট ম্যালকম।

—এই রাতে মেয়েদের নিয়ে এখানে কেন? ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করে।

আঙুল তুলে ট্যাক্সিটা দেখিয়ে ফিলিপ জবাব দেয়, ট্যাক্সিটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই—

—ড্রাইভার কোথায়?

—কোথায় যেন চলে গেছে।

—যে লোকগুলো এইমাত্র পালিয়ে গেল, ওরা কারা?

ফিলিপ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ম্যাল্‌কমের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, আমাদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কতকগুলো মাতাল আমাদের ওপর হামলা করার চেষ্টা করছিল। আপনি সময়মত না এলে নির্ঘাত বিপদে পড়তাম।

—কোথায় থাকেন আপনারা?

—লিণ্টন স্ট্রীটে।

একটু সময় চিন্তা করে ম্যাল্‌কম। পার্ক স্ট্রীটের এই অঞ্চলে সারারাত

মোবাইল ডিউটি তার। উৎসবের রাতে পথচারীদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্যই এই ডিউটি। সবাই যখন আনন্দ করে, পুলিশকে তখন করতে হয় ডিউটি। রাতে যখন মানুষ ঘুমোয়, পুলিশকে তখন জেগে থাকতে হয়।

ম্যাল্‌কম ফিলিপকে বললে, চলুন, আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

হাতে যেন স্বর্গ পায় ফিলিপ। কৃতজ্ঞতায় তার স্ত্রীর চোখে প্রায় জল এসে পড়ে।

ভদ্রতার খাতিরে ফিলিপ বললে, আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো?

গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দেয় সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম, অসুবিধে একটু হলেও কোন উপায় নেই, কারণ আপনারা বিপদগ্রস্ত।

মা ও মেয়েকে ড্রাইভারের পাশে নিজের আসনে বসিয়ে ফিলিপকে নিয়ে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম্ উঠে বসে গাড়ির পেছন দিকে। ফিলিপ একটু আপত্তি করতেই ম্যাল্‌কম পেছনে বসা কনস্টেবলদের দেখিয়ে বলে ওঠে, এখানে আপনার স্ত্রী ও মেয়ের অসুবিধে হতে পারে। চলুন, এইটুকু তো মাত্র পথ।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে আসে ফিলিপ ও তার স্ত্রী। সঙ্গে তাদের কন্যা মেরিয়া। অবশেষে অনেক ধন্যবাদের মধ্য দিয়ে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম গাড়ি নিয়ে ফিরে যায় তার ডিউটিতে।

ঘটনাটা হয়তো এইখানেই শেষ হয়ে যেত। পুলিশের জীবনে এমন কত ঘটনাই তো ঘটে থাকে যায় হিসেব রাখলে তাদের চলে না। কিন্তু পরের দিন গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেল এমন একটা বস্তু যার সূত্র ধরে আর একদিন সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমকে আসতে হল ফিলিপের বাড়িতে।

সারারাত ডিউটি করে খুব সকালে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম সবে লালবাজার ফিরে এসেছে। গাড়ির দরজা খুলে নামতে যাবে হঠাৎ পাশ থেকে ড্রাইভার বলে ওঠে, এ কেয়া চিজ ছোড়কে যাতে হেঁ, সাব্?

ঘুরে দাঁড়ায় ম্যাল্‌কম। গাড়িতে আবার কি ফেলে রেখে যাচ্ছে সে? হাতে একখানা ছোট লাঠি ছাড়া আর কিছুই তো তার সঙ্গে ছিল না।

ম্যাল্‌কম ঘুরে দাঁড়াতেই ড্রাইভার একটা প্যাকেট তুলে দেয় তার হাতে। নতুন প্যাকেট। একটা বইয়ের দোকানের নাম ছাপা রয়েছে তার ওপর।

প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে পড়ে দু'খানা বই। ফরেন পাবলিকেশনের বিলেতে ছাপা ছোটদের বই।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। নিশ্চয়ই সেই মেয়েটির বই এক্‌স-মাস উপলক্ষে বোধহয় তার বাবা কিনে দিয়েছিল। কিন্তু বাড়ি নিয়ে যেতে পারে নি। ভুলে ফেলে গেছে গাড়িতে।

বই দু'খানা হাতে নিয়ে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম সোজা চলে যায় সার্জেণ্ট মেসের দিকে। সেদিন দুপুরে আর ঘুম হলো না ম্যাল্‌কমের। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শেষ করলে বই দু'খানা। চমৎকার বই। ছোটদের উপযুক্তই বটে। সেদিন বিকেলে তার ডিউটি না থাকলে হয়তো বই দু'খানা সে ঐ দিনই ফেরত দিয়ে আসত তার মালিককে।

পরের দিন বিকেলটা তার অফ্ ডিউটি। পোশাক ছেড়ে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরে সার্জেণ্ট ম্যাল্কম বেরিয়ে পড়ল লিণ্টন স্ট্রীটের উদ্দেশে। সঙ্গে সেই বই দু'খানা।

দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল মেরিয়া। চোখে তার বিস্ময়। সেদিন রাতে পুলিশের পোশাকের আড়ালে থাকা তাদের উদ্ধারকর্তাকে বাস্তবিকই সে আজ চিনতে পারে নি।

—কাকে চাই? জিজ্ঞেস করে মেরিয়া।

ম্যাল্কম কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মেরিয়ার মুখের দিকে। একটি সুন্দরী বালিকা—সদ্যফোটা একটি ম্যাগ্নোলিয়া ফুল যেন।

মেরিয়া আবার বললে, আমার বাবা মিস্টার ফিলিপ বাড়ি নেই। আপনি কি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চান?

ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে ম্যাল্কম কোন জবাব না দিয়ে কেবল বই দু'খানা তুলে দেয় মেরিয়ার হাতে।

আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে মেরিয়া। আগের দিনটি বইয়ের শোকে কেটেছে তার। বাপ ফিলিপ কথা দিয়েছে যে, দু'একদিনের মধ্যেই সে ঠিক ঐ বই দুটোই আবার কিনে এনে দেবে। কিন্তু তাতেও মনে ঠিক স্বস্তি পায় নি মেরিয়া। তার বাবার দেওয়া এক্স্-মাসের উপহার এমনি ভাবে হারিয়ে গেল!

খুশিতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মেরিয়ার। সারা মুখে হাসির ঝিলিক তুলে সে ড্রইংরুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসায় ম্যাল্কমকে। তারপর খবর দেয় তার মাকে।

সেই প্রথম পরিচয়। তারপর থেকে সময় পেলেই ম্যাল্কম আসত মেরিয়াদের বাড়ি। মেরিয়ার বাবা-মাও খুশি হত বয়সে তরুণ এই সার্জেণ্টের সঙ্গে কথা বলে। আর এই মেরিয়ার ব্যাপারেই ম্যাল্কমের বন্ধুরা যখন-তখন ঠাট্টা করত তাকে।

সকাল থেকেই হাওড়া স্টেশন লোকে-লোকারণ্য। কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরু আসছেন। হাওড়া স্টেশন বেঙ্গল পুলিশের এলাকায় হলেও শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকতে হবে বলে কলকাতা পুলিশের ফোর্সও সেখানে হাজির।

উপস্থিত সার্জেণ্ট ম্যাল্কমও। আগের রাতে লালবাজারের 'বারে' বসে বন্ধুদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তার রেশ তখনও তার মনে স্পষ্ট। মিলিটারী পোশাক পরা কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার্স ও তাদের সেই 'গক' সুভাষ বোস সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব নিয়েই সে গিয়েছিল ডিউটিতে। এণ্টনীর কথামত সে ভেবেছিল স্টেশনে একটা সার্কাসের আবহাওয়া সে দেখতে পাবে। মিলিটারী পোশাকে অনভ্যস্ত ভলাণ্টিয়ারেরা উপস্থিত লোকদের হাসির খোরাক জোগাবে। আর, তাদের সেই 'গক' ছোঁৎকা চেহারায় মিলিটারী পোশাক পরে সার্কাসের ক্লাউনের মত চলাফেরা করবে।

কিন্তু স্টেশন চত্বরে ঢুকে তার সব ধারণা পাল্টে গেল। হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে অদ্ভুত শৃঙ্খলার সঙ্গে চলাফেরা করছে ভলাণ্টিয়ার্স। খাঁটি সৈনিকের মত তাদের আচার-আচরণ। অফিসারদের পোশাক-আশাক ও তাদের

চলা-ফেরাও তেমনি। সব চাইতে চমৎকার তাদের সেই 'গক'-এর ভাব-ভঙ্গি। এণ্টনী সেদিন ডাহা মিথ্যে বলেছিল। আশ্চর্য সুন্দর চেহারা সুভাষ বোসের। গায়ে মিলিটারী পোশাক, পায়ে বুট, মাথায় টুপি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমায় একজন উঁচু দরের মিলিটারী অফিসার বলেই মনে হচ্ছিল তাঁকে।

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুভাষের দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাঁর প্রতিটি চাল-চলন। একেবারে নিখুঁত। এতটুকু কৃত্রিমতা নেই কোথাও। একজন কংগ্রেসী নেতা কি করে যে এমন নিখুঁত মিলিটারী চাল-চলন আয়ত্ত করতে পারল তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিল ম্যাল্‌কম। প্যারেড গ্রাউণ্ডে পুলিশ প্যারেডের সময় পুলিশ কম্যাণ্ডারের চাল-চলনও বোধহয় এত নিখুঁত হয় না।

স্টেশনের একপ্রান্ত থেকে প্লাটফর্ম পর্যন্ত পাতা রয়েছে লাল কার্পেট। দুদিকে সারিবন্ধ ভলাণ্টিয়ার্স। তাদের পেছনে হাজার হাজার দর্শক।

চৌত্রিশতম কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ট্রেনের কামরা থেকে নেমে এসে কার্পেটের ওপর দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনতা বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠল—বন্দেমাতরম্‌!

নেতারা একে একে এগিয়ে গিয়ে মালা পরালেন সভাপতিকে। সাদা ধুতি-চাদর ও মাথায় টুপি পরা পণ্ডিত মতিলাল স্মিতহাস্যে নমস্কার করলেন সবাইকে। ঠিক এই সময় জেগে উঠল সুভাষের কণ্ঠস্বর, ভলাণ্টিয়ার্স, এ্যাটেন্‌শন!

ভলাণ্টিয়ারেরা একযোগে এ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে দাঁড়াল। তাদের পায়ের বুটের গোড়ালি একযোগে শব্দ করে উঠল—খট্‌। ঠিক সেই মুহূর্তে মিলিটারী ভঙ্গিতে সুভাষ এগিয়ে গেলেন কংগ্রেস সভাপতির দিকে। হাতের ব্যাটনখানা বাঁ-হাতের বগলের নিচে রেখে কড়া হাতে স্যালুট দিলেন তাঁকে। আর সেই সময় ভলাণ্টিয়ারদের হাতের বিউগল বেজে উঠল একযোগে।

বিউগলের আওয়াজ থামতেই আবার সুভাষের কণ্ঠস্বর,—ভলাণ্টিয়ার্স, ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড মার্চ!

এক স্টেপ সরে দাঁড়াল সবাই। নেতাদের সঙ্গে লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললেন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল। সঙ্গে কম্যাণ্ডার সুভাষ।

ঠিক এমনি সময় স্টেশনের বাইরে তোপধ্বনি জেগে উঠল—বুম্‌—বুম্‌—বুম্‌।

একাদিক্রমে চৌত্রিশবার তোপ দাগা হল চৌত্রিশতম কংগ্রেস অধিবেশনকে স্মরণ করে।

পুলিশ সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। কিছুক্ষণের জন্যে যেন নিজের অস্তিত্বের কথাও ভুলে গিয়েছিল সে। চারিদিকে কেমন যেন এক সামরিক আবহাওয়া। সেই আবহাওয়ায় অভ্যর্থনা করা হল কংগ্রেস সভাপতিকে। ত্রুটিহীন মিলিটারী আদব-কায়দা। আর এর প্রধান হোতা—জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং সুভাষচন্দ্র বোস।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের ব্যবস্থা দেখে চমকে উঠ্‌লো সার্জেণ্ট

ম্যাল্‌কম। এ কি এলাহী কাণ্ড! গাড়ি তো নয়, যেন একখানি রথ। আর সেই রথখানিকে টেনে নেওয়ার জন্যে একটি-দুটি নয়, চৌত্রিশটি ঘোড়া প্রস্তুত— চৌত্রিশতম কংগ্রেস অধিবেশনের স্মারক হিসাবে।

প্রসেশন—মিছিল—শোভাযাত্রা। কংগ্রেস অধিবেশনের ইতিহাসে সব-চাইতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শত শত অশ্বারোহী, মোটর সাইকেল ও সাইকেল আরোহী নিয়ে বিরাট সেই বাহিনী, হাজার হাজার পদাতিক ও মেয়ে ভলান্টিয়ারের দল। শত শত মোটর গাড়ি। সেই সঙ্গে রণবাদ্য ও বিউগল। সভাপতির সেই চৌত্রিশ ঘোড়ার রথের ঠিক সামনেই একখানা খোলা জীপের ওপর দাঁড়িয়ে বিশাল মিছিলটিকে পরিচালনা করছিলেন সুভাষ। মিছিলের একেবারে শেষদিকে পুলিশ বাহিনীর গাড়ি। তারই একখানা গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। গায়ে তার সাদা ইউনিফর্ম, মাথায় সাদা হেলমেট, চিবুকের সঙ্গে আটকে রয়েছে চিনস্ট্র্যাপ। মাথার হেলমেটের সঙ্গে লাগানো ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতিকৃতি সূর্যের আলোয় চকচক করছে।

সুভাষের ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন-শক্তি দেখে মুগ্ধ হলেও একটা কথা বারে বারে কাঁটার মত খচ-খচ করছিল সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের মনে। সুভাষ সাদা চামড়াদের ঘৃণা করে—নিদারুণ সেই ঘৃণা। কথাটা মনে হতেই মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কমের। সুভাষের প্রতি মুগ্ধ ভাবটুকু যেন তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। এই বিরাট মিছিলের সামিল হতে পেরে একটু আগে যে মনটা তার বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল সেই মনটাই আবার ভারি হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণায়। এই মিছিলের প্রতিটি লোক সম্রাটের শত্রু। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে চায় এরা। এদের মিছিলে যোগ দিয়ে সে কিছুতেই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে পারে না। গৌরব নয়, ডিউটি। পুলিশের ডিউটি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সেই কাজ করতেই সে পুলিশ ভ্যানে চড়ে মিছিলে সামিল হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোন মনোভাবের অধিকারী হতে সে চায় না। সি পি চার্লস টেগার্টের নির্দেশ—প্রসেশন মাস্ট বি পীসফুল। কোনরকম হাঙ্গামা-হুজ্জত যেন না হয়। কমিশনারের সেই নির্দেশ পালন করতেই পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে সে চলেছে।

স্টেশন থেকে পুরানো হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে মিছিল এসে পড়ল স্ট্র্যাণ্ড রোডে। সেকালে হাওড়া ব্রীজের মাঝখানটা খুলে নিয়ে হুগলী নদীতে বড় বড় জাহাজ-স্টিমারের যাতায়াতের পথ করে দেওয়া হত। সারা দিন-রাতে একটা নির্দিষ্ট সময় ব্রীজ দিয়ে লোক পারাপার হতে পারত। একালে গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটার খবরের মত সেকালে ওই হাওড়া ব্রীজ খোলা ও বন্ধ হওয়ার সময়ের খবর থাকত সংবাদপত্রের পাতায়। কিন্তু এইদিন কংগ্রেস মিছিলের জন্যে ব্রীজ খোলা ও বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। সারা দিনে জনসাধারণের জন্যে প্রায় খোলাই হল না ব্রীজ। অবশেষে মিছিল ব্রীজ পার হয়ে এপারে আসতেই ব্রীজের মাঝখানটা খুলে দিয়ে দুপাশে ভিড় করে থাকা জাহাজ-স্টিমারের জন্যে পথ করে দেওয়া হল।

কংগ্রেস মিছিলের জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা কিন্তু ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের। একদল রাজদ্রোহীর জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা কেন?

সরকার এদের এত তোয়াজ করে চলবে কেন? হোক না কংগ্রেস দল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল, হোক না পণ্ডিত মতিলাল নেহরু একজন শ্রেষ্ঠ নেতা, হোক না সুভাষ বোস একজন শ্রেষ্ঠ সাংগঠনিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তোয়াজ করে এদের পায়া ভারি করে তোলার কোন মানে হয় না।

এগিয়ে চলেছে বিরাট শোভাযাত্রা। রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ। শোভাযাত্রার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে সবাই মুগ্ধ। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে মাঝে মধ্যে জয়ধ্বনি উঠছে—বন্দেমাতরম্। কংগ্রেস সভাপতির সেই রথের মাথায় উড়ছে চরকা-লাঞ্ছিত তে-রঙা পতাকা। ভেতরে সভাপতি মতিলাল মাঝে মাঝে হাত নেড়ে জনসাধারণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের জবাব দিচ্ছিলেন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে মিছিল। পুলিশ ড্রাইভারের পাশে সামনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম। হঠাৎ তার মনে হল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু আকাশে তো একফোঁটা মেঘ নেই, তা'হলে বৃষ্টি শুরু হল কেমন করে?

না, বৃষ্টি নয়। ফুল—শত সহস্র ফুলের পাপড়ি বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে মিছিলের ওপর। উঁচু বাড়ির জানালা ও অলিন্দে দাঁড়িয়ে শত শত মহিলা অঞ্জলি ভরে ফুল ছড়াচ্ছে মিছিলের ওপর। কেউ কেউ মিছিলকে স্বাগত জানাচ্ছে শাঁখ বাজিয়ে।

দৃশ্যটা কিন্তু ভালই লাগছিল ম্যাল্‌কমের। মেয়েদের এই ফুল ছড়িয়ে অভ্যর্থনা করার রীতির মধ্যে যেন এক মিষ্টি সুর জড়িয়ে আছে—আছে এক ব্যঞ্জনাময় ছন্দ। আবেগ-জড়িত কণ্ঠে মাঝে মাঝেই তারা জয়ধ্বনি করে উঠছে—বন্দেমাতরম্!

দীর্ঘ মিছিলের ওপর অফুরন্ত পুষ্পবৃষ্টি। কেবল মিছিলের শেষদিকেই কোন ফুল নেই। পুলিশ ভ্যানগুলো আসতেই জানালা ও অলিন্দে দাঁড়িয়ে-থাকা মহিলারা নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয়। পুষ্পবৃষ্টির বদলে প্রায় অগ্নিদৃষ্টি মেলে বিরক্ত মুখে ভ্যানগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা যেন তাদের সেই নীরব দৃষ্টি মেলে বলতে চায়—এমন সুন্দর মিছিলের সঙ্গে তোমরা কেন, বাপু? সুন্দর হাঁসের দলে তোমাদের মত বকের উপস্থিতি একান্তই বেমানান।

সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম কিন্তু ব্যাপারটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। পুরনারীদের এই পক্ষপাতিত্বটুকু মোটেই ভাল লাগে না তার। একটু আগে দেখা তাদের ফুল ছড়িয়ে অভ্যর্থনা করার সুন্দর চিত্রটা যেন সেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় তার চোখের সামনে থেকে। তার ফর্সা মুখের চোয়াল দুটো একটু দৃঢ় হয়ে ওঠে। মনে মনে হয়তো বলে, তোমাদের হাতের ফুল আমাদের না পেলেও চলবে। আমরা পুলিশ—ব্রিটিশ রাজশক্তির রক্ষক আমরা। আমাদের চাকরির পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ দর্শকদের মধ্য থেকে একটি লোক দৌড়ে এসে কংগ্রেস সভাপতির গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করতেই ভলান্টিয়ারদের মধ্যে কয়েকজন দৌড়ে এসে বাধা দেয় তাকে। শুরু হয় ঠেলাঠেলি। লোকটিও এগিয়ে যাবে, ভলান্টিয়াররাও তাকে যেতে দেবে না।

লোকটি মাতাল। আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, মাথায় টোপি, নাকের নিচে একটি নাতিদীর্ঘ গোঁফ, গলার দু'দিকে ঝুলছে একখানা চাদর। মুখে মদের গন্ধ, আর সাইড-পকেটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা মদের বোতল।

লোকটির মুখে কেবল একটি কথা, পাপ করেছি—ভয়ানক পাপ। পণ্ডিত-জীর পা ছুঁয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি। আপনারা আমাকে যেতে দিন তাঁর কাছে। বলতে বলতে লোকটি মদের ঘোরে টলতে থাকে।

মিছিল কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই, এগিয়ে চলেছে। ভলাণ্টিয়াররা কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না সেই মাতাল লোকটিকে। লোকটি তখন জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে, আমার পকেটে মালের বোতল আছে। এই মাল দিয়ে আমি পণ্ডিতজীর পা ধুয়ে সেই পায়ে চুমু খাব। আমাকে আপনারা যেতে দিন তাঁর কাছে। এই যে আপনারা আমাকে আটকেছেন, এর ফল কিন্তু মোটেই ভাল হবে না বলছি। ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন। গাড়ি যে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

মিছিলের পাশে বেশ একটি জটলার সৃষ্টি হয়। একখানা পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়ায় সেখানে। ভ্যান থেকে নেমে আসে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে সে দাঁড়ায় লোকটির সামনে। তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, এই, কেয়া হুয়া? কি হয়েছে তোমার?

পুলিশ দেখে একটু থমকে যায় লোকটা। নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে তেমনি জড়িত কণ্ঠে জবাব দেয়, তেমন কিছু নয়, সাহেব। আমি কোন অন্যায় করি নি। কেবল পণ্ডিতজীর একটু পায়ের ধুলো নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর এই সাঙ্গোপাঙ্গরা—

—তুমি মদ খেয়েছ? উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ম্যাল্‌কম।

একটা উচ্যাঙ্গের হাসি হেসে লোকটি জবাব দেয়, তা একটু খেয়েছি, সাহেব। তবে বিশ্বাস করো, আমি মোটেই মাতাল হই নি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করে ম্যাল্‌কম। আবার বললে, পণ্ডিতজী এখন পায়ের ধুলো দেবেন না। এখন সরে পড়ো। ঝামেলা করলে বিপদ হবে।

—সে কি, তাঁর পায়ের ধুলো যে আমার চাই! নইলে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে কেমন করে?

—অপরাধ! কি অপরাধ করেছ তুমি?

—ভয়ানক অপরাধ, সাহেব। সাংঘাতিক অপরাধ।

—কি অপরাধ বলই না!

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লোকটা মনে মনে কি যেন হিসেব করে। তারপর তেমনি জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে থাকে, আমি তোমাদের ইন্‌ফর্মার, সাহেব। তোমাদের কাছ থেকে পয়সা খেয়ে অনেক গোপন খবর জোগাড় করে তোমাদের দিয়েছি। পাপ করেছি আমি—ভয়ানক পাপ। আজ পণ্ডিতজীর পা ছুঁয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

লোকটির কথায় উপস্থিত জনতা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। কঠিন হয়ে ওঠে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের মুখখানা। হঠাৎ সে একটা প্রচণ্ড

ধমক দিয়ে ওঠে তাকে, হঠো—হঠ্ যাও হিঁয়াসে। ভাগো ইডিয়েট কাঁহাকা—!

ধমক খেয়ে লোকটি গুটি-গুটি সরে পড়বার চেষ্টা করে। ম্যাল্কমও আর দেরি না করে গিয়ে উঠে বসে পুলিশ ভ্যানে।

বাকি রাস্তাটুকু বসে বসে কেবল ঐ মাতাল লোকটার কথাই চিন্তা করে ম্যাল্কম। মাতাল লোকটা পুলিশের ইন্ফর্মার। কিসের টানে সে আজ বুঝতে পেরেছে যে, পয়সার বিনিময়ে পুলিশকে খবর দেওয়াটা অন্যায়? কিসের প্রয়োজনে সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে লোকটা পণ্ডিতজীর পা ছুঁতে এত উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল? না কি, সবটাই কেবল ঐ তরল পদার্থের প্রতিক্রিয়া?

হাওড়া থেকে পার্ক সার্কাস ময়দান। দীর্ঘপথ পরিক্রমার পরে শেষ হল সেই মিছিল। খবর গেল লালবাজারে—নির্ঝঞ্ঝাটে প্রসেশন গিয়ে পেঁছেছে ময়দানে। খবর পেয়ে পুলিশ কমিশনারের ঘরে চার্লস টেগার্ট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। যাক. ভালয়-ভালয় সবকিছু মিটেছে। সুভাষ বোসের বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স মিলিটারী পোশাক পরলেও কোথাও মিলিটারী মেজাজ দেখায় নি।

একটু পরেই ঝন্-ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে টেলিফোন। চার্লস টেগার্ট টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিতেই ওপাশ থেকে ভেসে ওঠে মিসেস্ টেগার্টের কণ্ঠস্বর, তুমি অফিসেই আছ?

—ইয়েস, ডার্লিং। বলেই মনে মনে একটু হাসেন টেগার্ট।

ওপাশ থেকে মিসেস টেগার্ট আবার বললেন. তুমি কি আজ খুব ব্যস্ত?

—কেন বল তো!

—আজ যদি একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পার তো একবার মার্কেটিংয়ে বেরোব তোমাকে নিয়ে।

মনে মনে আবার একটু হাসেন টেগার্ট। তারপর জবাব দেন. আই শ্যাল ট্রাই. ডার্লিং। বলেই ছেড়ে দেন টেলিফোন।

মিসেসের এই টেলিফোনের অর্থ জানেন টেগার্ট। মহিলাটি সর্বদা তাঁর স্বামীর চিন্তায় অস্থির। কংগ্রেস প্রসেশনে কোন হাঙ্গামা হুজ্জত হয়েছে কিনা এবং তাতে তাঁর স্বামী জড়িয়ে পড়েছেন কিনা সেই চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেই মহিলা টেলিফোন করেছিলেন। আর সে কথা স্বামীর কাছে গোপন করতে গিয়েই বলেছিলেন মার্কেটিংয়ের কথা।

তিনদিন ধরে চলবে কংগ্রেস অধিবেশন। অধিবেশনের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সুভাষের বি. ভি-দের হাতে। পুলিশী ব্যবস্থাও যথেষ্ট। পুলিশের ক্যাম্প বসেছে সেখানে। বিরাট ফোর্স মবিলাইজ করতে হয়েছে সরকারের নির্দেশে। মাঝে-মধ্যে খোদ টেগার্ট গিয়ে পরিদর্শন করে আসছেন সেই পুলিশী ব্যবস্থা।

বেলা প্রায় তিনটে। অধিবেশন বন্ধ আছে এখন। নেতারা সব স্নানাহার করতে গেছেন। বিকেল চারটায় আবার অধিবেশন শুরু।

সার্জেণ্ট ম্যাল্কমের মোবাইল ডিউটি। পুলিশ ভ্যানটাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে পার্কের এককোণে একটা গাছের ছায়ায় বেঞ্চির ওপর বসে বিশ্রাম করছিল সে। তার ডিউটি শেষ হতে আরও একটি ঘণ্টা বাকি। সার্জেণ্ট

সাহেবের হেলমেট ও লাঠিখানা রয়েছে ড্রাইভারের পাশে। এই সুযোগে পুলিশ ড্রাইভারও স্টিয়ারিং এর ওপর ঝুঁকে পড়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল।

অলস দৃষ্টি মেলে অধিবেশন স্থলের দিকে তাকিয়ে ছিল ম্যাল্‌কম। ভলান্টিয়ারদের অনেকেই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নিজেদের স্নানাহার নিয়ে। হঠাৎ ম্যাল্‌কম লক্ষ্য করে জি. ও. সি-র বেশে সুভাষ বোস ধীর পদক্ষেপে এদিকেই আসছেন! সঙ্গে আরও কয়েকজন অফিসার। কথা বলতে বলতেই আসছিলেন তারা।

কম্যাণ্ডারকে দেখে ডিউটিরত ভলান্টিয়াররা এ্যাটেনশান ভঙ্গিতে অভিবাদন করে তাঁকে। সুভাষও হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানান।

সুভাষকে দেখেই তাঁর ওপর মনটা কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠেছিল ম্যাল্‌কমের। অমন সুন্দর চেহারা, অমন বলিষ্ঠ ভঙ্গি। কিন্তু এই লোকটিই নাকি সাদা চামড়াদের নিদারুণ ঘৃণা করে।

সেদিন সন্ধ্যায় লালবাজারে বসে সার্জেণ্ট এণ্টনীর কথা বোধহয় ঠিকমত বুঝতে পারে নি ম্যাল্‌কম। কিংবা এন্টনী নিজেই হয়ত বুঝতে পারে নি সুভাষের সাদা চামড়াদের ঘৃণা করার আসল অর্থ। সরকার-ঘেঁষা সংবাদপত্রে সে যা পড়েছিল কেবল তা-ই সে সেদিন বলেছিল বন্ধুদের। সুভাষ সাদা চামড়ার মানুষ মাত্রকেই ঘৃণা করেন না। তাদের সঙ্গে কোন শত্রুতাই নেই তাঁর। সুভাষ কেবল সেই সব সাদা চামড়ার লোকদেরই ঘৃণা করেন যারা ভারতবর্ষে বিট্রিশ রাজত্ব টিঁকিয়ে রাখতে গিয়ে জনসাধারণের ওপর অমানুষিক অত্যাচার, অকথ্য নির্যাতন চালায়। সুভাষ কেবল তাদেরই পছন্দ করেন না যারা এদেশের মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না — তারা সাদাই হোক আর কালোই হোক, তাদের ওপর তিনি খড়্গহস্ত। মানুষ নামধেয় কোন্ ব্যক্তি নিজের দেশবাসীর ওপর বিদেশীর অত্যাচার সহ্য করতে পারে?

দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছেন সুভাষ, আর স্থির অচঞ্চল ভঙ্গিতে সেই দিকে তাকিয়ে আছে ম্যাল্‌কম। না, উঠে দাঁড়াবার কোন গরজ নেই তার। সুভাষ একদল বেসরকারী ভলান্টিয়ার্সের কম্যাণ্ডার, আর সে নিজে কলকাতা পুলিশের সার্জেণ্ট। খোদ সি. পি. পছন্দ করেন তাকে। তার কি গরজ পড়েছে সুভাষকে দেখে উঠে দাঁড়াবার?

ম্যাল্‌কম উঠে তো দাঁড়ালই না, বরঞ্চ বসে বসেই ভাবতে লাগল, এই সময় ঐ লোকটির চোখের সামনে একটা সিগারেট টানতে পারলে যেন ওই সাদা চামড়া-বিদ্বেষী লোকটাকে বেশ খানিকটা অপমান করা যেতো।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের বাক্সটা চেপে ধরে ম্যাল্‌কম। তারপর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভঙ্গিতে টানতে থাকে।

একেবারে কাছে এসে পড়েছেন তাঁরা। সুভাষের কিন্তু ম্যাল্‌কমের দিকে মোটেই নজর নেই। ম্যাল্‌কম সিগারেট টানতে টানতে একেবারে কাছ থেকে লক্ষ্য করছিল তাঁকে। সত্যিই অপূর্ব চেহারা। ব্যক্তিত্ব যেন ফুটে বের হচ্ছিল তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে।

এবার একেবারেই কাছে এসে পড়েছে দলটি। হঠাৎ কি যেন হল ম্যাল্কমের। অনেকটা নিজের অজান্তেই হাতের সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েই সে উঠে দাঁড়ায়। মাথায় হেলমেট নেই। কাজেই, খালি মাথায় রীতি অনুযায়ী এ্যাটেন্শন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে অভিবাদন করে সুভাষকে। তার পায়ের বুটে শব্দ হয় – 'খ্‌ট'।

এতক্ষণে সুভাষ চোখ তুলে তাকান ম্যাল্কমের দিকে। তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে সামান্য একটু হাসি। কোন কথা বলেন না তিনি। কেবল হাত তুলে প্রত্যাভিবাদন করে সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যান।

সহসা যেন লজ্জায় কুঁকড়ে ওঠে সার্জেণ্ট ম্যাল্কম। এ কি করে বসল সে? কেন সিগারেট ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন করতে গেল সুভাষকে? সেই মুহূর্তে তার মনোরাজ্যে এমন কি ঘটেছিল যা নাকি তার সেই সংকল্পকে নিমেষে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল? লোকটি জাদু জানে নাকি, না এও এক ধরনের মেস্‌মেরিজম?

মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল ম্যাল্কম কাজটা করে ফেলে। তার এই কাণ্ড কেউ দেখে ফেলেছে নাকি? অসম্ভব কিছু নয়। কাছে-দূরে অনেকেই তো রয়েছে। সার্জেণ্ট নর্টনের ডিউটিও তো এদিকে। অবসন্ন ভঙ্গিতে পার্কের বেঞ্চির ওপর বসে থাকে ম্যাল্কম। পেছনে তাকিয়ে দেখে গাড়ির স্টিয়ারিং-এর ওপর মাথা রেখে ড্রাইভার নিদ্রামগ্ন।

এমনি সময় একজন ভলাণ্টিয়ার ম্যাল্কমের কাছে এসে বললে, ওদিকে জলের ব্যবস্থা আছে। চটপট হাত-মুখে ধুয়ে নিন। খাবার আসছে।

– খাবার! কিসের খাবার? ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে ম্যাল্কম।

– সেকি, সকালে জলখাবার পান নি আপনি?

—জলখাবার! আমি জলখাবার খেতে যাব কেন? আমি তো সকালের দিকে এদিকে ছিলামই না।

- ও, তাই বলুন! একটু আশ্বস্ত ভঙ্গিতে বলতে থাকে ছেলেটি, কম্যাণ্ডারের হুকুম, কেবল ভলাণ্টিয়ার্স নয়, পুলিশের মধ্যেও যারা এখানে ডিউটিতে থাকবে তাদেরও জলখাবার ও দুপুরের খাবার দিতে হবে। তেমন ব্যবস্থাই হয়েছে আমাদের কিচেনে।

হঠাৎ রাগে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে সার্জেণ্ট ম্যাল্কমের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বেশ চড়া সুরে সে জবাব দেয়, আপনাদের দেওয়া খাবার আমরা খাব কেন?

—বারে, জি. ও সি.'র হুকুম যে! ছেলেটি নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দেয়।

ঠোঁটের কোণে একটু শুকনো হাসি ফুটিয়ে তুলে ম্যাল্কম ঠাট্টার সুরে বললে, আপনাদের জি. ও. সি.'-র হুকুম খাবার দেওয়ার, আর আমাদের জি. ও. সি.'-র হুকুম সেই খাবার না খাওয়ার।

—আপনাদেরও জি. ও. সি. আছেন নাকি এখানে? কই, দেখি নি তো তাঁকে!

হেঁয়ালির সুরে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, আছেন বৈকি, তবে তাঁকে সব সময় চোখে দেখা যায় না। তিনি হচ্ছেন খোদ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট।

—আমাদের দেওয়া খাবার খেতে আপনাদের বারণ আছে নাকি ?

-নিশ্চয়ই আছে। আপনাদের খাবার কেন খাব আমরা ?

বিস্ময় প্রকাশ পায় ছেলেটির কণ্ঠে। সে বললে, খাবারের তো কোন জাত নেই।

জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, কে বললে জাত নেই ? আপনাদের দেওয়া খাবার যে স্বদেশী খাবার। ও জিনিস আমরা ছুঁতে পারি না।

স্বদেশী খাবারকে অবহেলা করার কৃতিত্ব দিয়ে সুভাষ বোসকে স্যালুট করার মত অবিমৃশ্যকারিতার লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করেছিল সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। এতে অনুশোচনার পরিমাণ কিছুটা কমলেও মনটা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠল না। তবুও খানিকটা হাল্কা মন নিয়েই সে উঠে দাঁড়ায়। একবার তাকায় নিজের হাত-ঘড়ির দিকে। সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। লালবাজার ফিরে যেতে সেই চারটাই বাজবে।

পরের দিন সকালে লালবাজারের সার্জেণ্ট-মেসে বন্ধুরা ছেঁকে ধরল ম্যাল্‌কমকে। গ্র্যাণ্ট তখনও তার বিছানায়। আগের দিন রাতে পান-ভোজনের পরিমাণ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল বলে তখনও তার ঘুম ভাঙে নি। তা'ছাড়া তেমন একটা তাড়াও ছিল না তার। অনেক দেরিতে তার ডিউটি।

চায়ের টেবিলে নর্টন মুখ টিপে একটু হেসে ম্যাল্‌কমকে বললে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তুই বাড়ি চলে যা, জনি। সার্জেণ্টের চাকরি তোর পোষাবে না।

কৌতূহলী এণ্টনী জিজ্ঞেস করে, কেন, কি হল রে!

—কি হয় নি তাই আগে বল। তেমনি হেসে নর্টন আবার বললে।

কিছুই বুঝতে না পেরে ম্যাল্‌কম কেবল তাকিয়ে থাকে নর্টনের মুখের দিকে।

এবার এণ্টনী নর্টনকে ধমকে ওঠে, হেঁয়ালি ছাড়। কি হয়েছে তাই বল না! ওকে চাকরি ছাড়তে বলছিস কেন ?

নর্টন জবাব দেয়, টম্‌-ডিক্‌-হ্যারি যে কেউ মিলিটারীর মত একটা পোশাক পরলেই যদি তার সামনে এ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তবে তার সার্জেণ্টের চাকরি না করাই ভাল। বলেই নর্টন আগের দিন পার্ক সার্কাস ময়দানে ম্যাল্‌কমের সুভাষ বোসকে অভিবাদন করার ঘটনাটা আনুপূর্বিক বলে দেয়।

ব্যাস, আর যায় কোথায়! এণ্টনী ও উপস্থিত আরও কয়েকজন বন্ধু ছেঁকে ধরে ম্যাল্‌কমকে। বললে, সে কিরে, সুভাষ বোসকে দেখে এ্যাটেন্‌শন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি ? কেন, চাকরি যাবার ভয়ে নাকি ?

এণ্টনীর কথায় সবাই হেসে ওঠে একসঙ্গে। এমনি সময় হাই তুলতে তুলতে বেড-রুম থেকে সোজা চায়ের টেবিলের কাছে এসে গ্র্যাণ্ট জিজ্ঞেস করে, কি হল রে, সাত সকালেই এত হাসির ফোয়ারা কেন ?

—আর বলিস কেন ? বলেই নর্টন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বললে তাকে।

কথাটা শুনে গ্র্যাণ্ট কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ম্যাল্‌কমের মুখের

দিকে। তারপর হঠাৎ ডান হাতের তর্জনী নিজের ঠোঁটের ওপর রেখে কৃত্রিম সুরে বলে ওঠে, চুপ - চুপ! জোরে বলিস না। একথা সি. পি. টেগার্টের মত লোকের কানে গেলে জনির আর চাকরি থাকবে না। প্রসিডিং করে ছাড়বেন।

উপস্থিত সবাই কৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গ্র্যাণ্টের দিকে। ঠাট্টার সুরে বলতে থাকে গ্র্যাণ্ট, তোরা বুঝি ভাবছিস সুভাষ বোসের সামনে এ্যাটেন্‌শন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই সি পি. রাগ করবেন? মোটেই তা নয়। চার্লস টেগার্ট যখন শুনবেন যে, সুভাষ বোসের মত একজন টপ্ র‍্যাঙ্কের মিলিটারী অফিসারের সামনে পোশাক পরে থাকা সত্ত্বেও সার্জেণ্ট ম্যালকম স্যালুট না করে কেবল এ্যাটেন্‌শন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনই তিনি রেগে উঠবেন।

গ্র্যাণ্ট থামতেই আবার একটা হাসির ঢেউ ওঠে সেখানে। লজ্জায় সঙ্কুচিত ম্যাল্‌কমের পক্ষে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না।

এই সময় নর্টন আবার বলে ওঠে, না—না, এতে কোন দোষ নেই জনির। জনির মাথায় তখন হেলমেট ছিল না।

—ও, তাই বল্! বলেই গ্র্যাণ্ট একটা কৃত্রিম স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে চায়ের একটা কাপ তুলে নেয় নিজের হাতে।

এণ্টনী এবার স্বাভাবিক সুরে ম্যাল্‌কমকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা জনি, সত্যি করে বল্ তো, তখন তোর কি হয়েছিল? হঠাৎ তুই তাঁর সামনে এ্যাটেন্‌শন হতে গেলি কেন? ঘাবড়ে গিয়েছিলি নাকি?

লজ্জিত সুরে একটু আমতা আমতা করে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, না, ঠিক ঘাবড়ে যাবার মত কিছু হয় নি। ভেবেওছিলাম উঠে দাঁড়াব না। কিন্তু লোকটি কাছে আসতেই কেমন যেন—

—ঘাবড়ে গেলি, কেমন?

—না, তা নয়। তাঁর পার্সোনালিটি—

—পার্সোনালিটি না হাতি, বলতে থাকে নর্টন, আমিও তো ওখানে ডিউটিতে ছিলাম। ওই সুভাষ বোস তো আমার কাছ দিয়েও কতবার যাতায়াত করেছে। কিন্তু কৈ, আমি তো তোর মত কিছু করতে যাইনি। সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টেনেছি।

নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, তোর পার্সোনালিটি বোধহয় ওই সুভাষ বোসের চাইতেও বেশি।

আবার একটা হাসির ঢেউ ওঠে সেখানে। অপ্রতিভ নর্টন আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

সেদিন দুপুরে দোতলায় সি. পি-র ঘরের সামনে ডিউটি করতে করতে ওই কথাটাই মনে মনে পর্যালোচনা করছিল ম্যাল্‌কম। সুভাষ বোসের চোখের দৃষ্টিতে কোন জাদু ছিল, নাকি মেস্‌মেরিজম্ জাতীয় কোন কিছু? বোধহয় না। ওসবে তেমন একটা বিশ্বাস নেই ম্যাল্‌কমের। মানুষটির পার্সোনালিটিই সেদিন অভিভূত করেছিল তাকে। পার্সোনালিটি—ব্যক্তিত্ব। সেদিন এ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে অভিবাদন করেছিল সুভাষ বোসকে নয়, তাঁর

ব্যক্তিত্বকে। তার নিজের সবকিছু সংকল্প সেদিন কুটোর মত ভেসে গিয়েছিল ওই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে।

## ॥ তিন ॥

নৈবেদ্যর সঙ্গে যেমন কলার সম্পর্ক, জমিদারের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ পাইক-বরকন্দাজের, এককালের ব্রিটিশ ভারতের শক্ত ঘাঁটি শহর কলকাতার সঙ্গে লালবাজারের সম্পর্কও অনেকটা তেমনি। বহুবছর আগে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা নামে তিনটি অখ্যাত গ্রামকে একত্রিত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে শহরের পত্তন করেছিল সেই শহর কলকাতার সঙ্গে সাহেব জমিদার হলওয়েলের তৈরি 'টাউন গার্ডে'র সম্পর্ক কিন্তু সেকালে তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। 'টাউন গার্ড' শব্দটির অর্থ শহরের চৌকিদার। গ্রামবাংলার অনুকরণে শহর কলকাতার জন্যে তাদের সৃষ্টি।

যোলশ' ছিয়াশি সাল। কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির একখানি ঘরে বিরস-মুখে বসে আছেন ইংরেজ বণিকদের নেতা জব চার্নক। তাঁকে ঘিরে গম্ভীর মুখে কুঠির অন্যান্য কর্মকর্তারা। একটু আগেই আলোচনা চলছিল। সেই আলোচনা চলতে চলতে এক জায়গায় এসে ঠেকে গিয়েছিল তারা।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে একজন কর্মকর্তা বলে উঠল, এখন তবে উপায়?

জবাব দেয় আর একজন, উপায় তো আর কিছুই দেখছি না। এখন একমাত্র পথ খোলা রয়েছে ঢাকায় গিয়ে নবাব শায়েস্তা খাঁর কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরা।

—তাতে কি কোন ফল হবে? দেশীয় ব্যবসায়ীদের কথা বিশ্বাস না করে নবাব কি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন? তা'ছাড়া, সত্যি বলতে কি, আমাদের বিরুদ্ধে দেশীয় ব্যবসায়ীরা নবাবের কাছে যে অভিযোগ করেছে তার কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও সবটা তো মিথ্যে নয়। সত্যিই তো আমরা নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দিয়েছি।

—কিন্তু তাই বলে নবাব একতরফের কথা শুনেই আমাদের বিরুদ্ধে এত বেশি অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়ে বসলেন! নবাবের আদেশ প্রতিপালন করতে হলে তো আমাদের ব্যবসাপত্র গুটিয়ে ফেলতে হবে।

এতক্ষণে বক্তার দিকে মুখ তুলে তাকান জব চার্নক। তারপর গম্ভীর সুরে বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে। দেশীয় ব্যবসায়ীরা তো তাই চায়, নবাবের নিজেরও ঠিক তাই ইচ্ছে।

—আমারও মনে হয়ে, ঢাকায় নবাবের দরবারে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করা উচিত। আর একজন কর্মকর্তা অভিমত প্রকাশ করে।

জবাব দেন জব চার্নক, তাতে কোন ফল হবে না। মাঝখান থেকে আমরা অর্থদণ্ড আদায় দিতে অস্বীকৃত হলে তিনি আমাদের বন্দী করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য তো যাবেই, সেই সঙ্গে আমাদের জান-প্রাণ নিয়েও টানাটানি হবে তখন।

—তা'হলে আর কোন্ পথ খোলা আছে আমাদের ?

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করেন জব চার্নক। তারপর বললেন, এই কাশিম-বাজার কুঠিতে আমাদের তেমন কোন জোর নেই। এখানে আমাদের সেপাই-সান্ত্রীও কিছু নেই। কাজেই নবাব ইচ্ছে করলে আমাদের এখানকার মালপত্র সহজেই দখল করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সামান্যতম বাধা দেবারও উপায় নেই আমাদের। কিন্তু আমাদের হুগলি কুঠির অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে আমাদের যথেষ্ট জোর আছে, সেপাই-সান্ত্রীও আছে। কাজেই আমার ইচ্ছে গোপনে এখানকার মালপত্র সরিয়ে দিয়ে আমরা সবাই চলে যাই সেখানে। অর্থ আদায় তো দূরের কথা, সেখানে নবাব আমাদের কিছুই করতে পারবেন না।

—তাই বলে আমরা এখান থেকে চোরের মত পালিয়ে যাব? একজন কর্মকর্তা প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে।

জব চার্নক তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তা'হলে নবাবের অর্থদণ্ড যাতে কার্যকরী হয় সেইজন্যে আপনি একা এখানে উপস্থিত থাকুন।

একটু থেমে জব চার্নক আবার বলতে থাকেন, শুনুন, ভুলে যাবেন না যে, আমরা এদেশে এসেছি ব্যবসা করতে। বীরত্ব দেখাতে নয়। এদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে দু'পয়সা ঘরে তুলতে পারলেই আমরা খুশি। ইয়োরোপের বাজারে ঢাকার ও মুর্শিদাবাদের মসলিন ও রেশমের প্রচুর চাহিদা। তা'ছাড়া বারুদ তৈরির জন্যে বিহারের সোরার চাহিদাও কম নয়! এসব ছেড়ে দিয়ে নবাবের কাছে বীরত্ব দেখাতে গেলে লাভের চাইতে লোকসানই হবে বেশি। অবিশ্যি নবাব শায়েস্তা খাঁ আমাদের যে অর্থদণ্ড করেছেন তা যদি আমরা পুরো-পুরি দিয়ে দিতে পারতাম তাহলে সেটাই হত সব চাইতে ভালো। আমাদের পক্ষে তা যখন কোনমতেই সম্ভব নয় তখন এ ছাড়া আমি তো আর অন্য পথ দেখি না। কথাটা শেষ করেই জব চার্নক পর্যায়ক্রমে উপস্থিত কর্তাব্যক্তিদের মুখের দিকে তাকান।

অবশেষে তাই ঠিক হল। ব্যবসার খাতিরে শিকেয় তোলা রইল বীরত্ব। রাতের অন্ধকারে নৌকা বোঝাই পণ্যসামগ্রী পাচার হতে লাগল হুগলির কুঠিতে। সবশেষে সবাইকে নিয়ে জব চার্নকও একদিন পাড়ি দিলেন হুগলিতে। ফাঁকা পড়ে রইল কাশিমবাজারের কুঠি।

ইংরেজ বণিকদের হুগলির কুঠি বেশ সুরক্ষিত ও সশস্ত্র। তা'ছাড়া এখানকার মোগল ফৌজদার আবদুল গণির শক্তি-সামর্থ্যও তেমন কিছু নয়। কাজেই জব চার্নক এখানে এসে দিব্বি ব্যবসা পরিচালনা করতে লাগলেন নিশ্চিন্ত মনে।

বেশিদিন কিন্তু এমনি চলল না। ঢাকা থেকে নবাব শায়েস্তা খাঁর হুকুম এল ফৌজদার আবদুল গণির কাছে—ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকে পাওনা অর্থ আদায় কর, আর ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ার অপরাধে বন্দী কর ওদের নেতা জব চার্নককে।

ইংরেজরাও এবার প্রস্তুত। বাংলার মাটিতে বণিক ইংরেজের মানদণ্ড তখনও রাজদণ্ড না হয়ে উঠলে কি হয়, হাতিয়ার হয়ে উঠতে কতক্ষণ? ফৌজদার আবদুল গণির সঙ্গে ইংরেজদের খণ্ডযুদ্ধ হল এখানে-ওখানে এবং তার পরিণতিতে হেরে গেল মোগল ফৌজদার।

বিজয়ী ইংরেজরা তখন আনন্দে আত্মহারা। কুঠিতে মদের ফোয়ারার সঙ্গে দিশী বারবণিতাদের নিয়ে চলছে আনন্দের হুল্লোড়। তিন 'ম'কারের দৌলতে কালো রমণীদের পায়ের কাছে সাদা কৌমার্যের গড়াগড়ি। কিন্তু এর মধ্যে একটিমাত্র ব্যক্তি কেবল স্থির অচঞ্চল। তিনি হচ্ছেন বণিক-নেতা জব চার্নক। নিজের ঘরে বসে চিন্তায় ম্রিয়মাণ তিনি। ওরা যতই আনন্দ উৎসব ফুর্তি করুক, তিনি জানেন এ আনন্দ মোটেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হবার নয়। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করার পরিণাম কোন কালেই ভাল হয় না।

হলও ঠিক তাই। খবর এল ঢাকা থেকে, নবাব শায়েস্তা খাঁর সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে হুগলির দিকে। এবার—এবার তবে উপায়? এ তো আর হীনবল মোগল ফৌজদার আবদুল গণির সঙ্গে এখানে-ওখানে খণ্ডযুদ্ধ নয়। খোদ নবাবের সেনাদল এগিয়ে আসছে হুগলির দিকে। ওদের সামনে ইংরেজ বণিকদের মুষ্টিমেয় সিপাই-সান্ত্রী তো খড়-কুটোর মত উড়ে যাবে।

এমনি সময় কুঠির একজন কর্মকর্তা এসে বললে. ঢাকা থেকে নবাব-সৈন্যরা ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে।

একটু ম্লান হেসে জবাব দেন জব চার্নক. আমি তা জানতাম। নবাব শায়েস্তা খাঁ যে এর পরেও চুপ করে থাকবেন না এ তো জানা কথা। নবাবের সঙ্গে ঝগড়া করে আর যাই হোক, ব্যবসা করা চলে না। নিজেদের বোকামির প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতেই হবে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে নবাবের শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার শাস্তি আমাদের পেতেই হবে।

—তবে. এখন কি করব আমরা?

একটু সময় চিন্তা করেন জব চার্নক। তারপর জবাব দেন. মেয়েমানুষ নিয়ে নাচানাচি বন্ধ করতে বল ওদের। তারপর নৌকো সাজাতে বল। এখান থেকে পাততাড়ি গুটানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

—কোথায় যেতে হবে আমাদের?

—আপাতত হুগলি নদী দিয়ে দক্ষিণ দিকে নৌকো ভাসাব। নতুন কুঠির জন্য একটা ভাল জায়গা বেছে বের করতে হবে।

একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কুঠির সেই কর্মকর্তা। মুখখানা মলিন হয়ে ওঠে তার। তারপর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে. হুগলির মত এমন একটা চমৎকার বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলবার মত আর কোন জায়গা কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

একটু দৃঢ় শোনায় জব চার্নকের কণ্ঠস্বর। জবাব দেন তিনি, পাওয়া যাবে কিনা জানি না। তবে চেষ্টা করে দেখা ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই। নবাব-সৈন্যরা আমাদের হুগলি-ছাড়া করতে এগিয়ে আসছে। এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে [illegible] মার খাওয়ার মধ্যে আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

কাজেই হুগলির আশা আমাদের ত্যাগ করতেই হবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন জব চার্নক। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মত আবার বলতে থাকেন, সেদিন এখানকার একটি লোকের মুখে শুনলাম হুগলী নদীর কাছাকাছি সুতানুটি নামে নাকি একটি গ্রাম আছে। জায়গাটা নাকি ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে খুবই উপযোগী। একবার ওই গ্রামটা দেখতে যেতে হবে। সম্ভব হলে ওখানেই তৈরি করতে হবে আমাদের নতুন কুঠি।

শুধু সুতানুটি নয়, কাছাকাছি আরও দুটি গ্রাম গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটি গ্রামই ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে আদর্শ। হুগলি নদীর তীরে এই গ্রাম তিনটি সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে উপযুক্ত নাব্য নদীখাতের ওপর অবস্থিত। এই নদীকে গোটা গাঙ্গেয়-উপত্যকার বাণিজ্যপথ হিসেবে ব্যবহার করা চলবে। তা'ছাড়া নিরাপত্তার দিক থেকেও এই গ্রাম তিনটি আদর্শ বাণিজ্য-কেন্দ্রের উপযোগী—উত্তরে চিৎপুরের খাঁড়ি, দক্ষিণে আদিগঙ্গা, পুবে লবন-হ্রদ, আর পশ্চিমে হুগলি নদী।

গ্রাম তিনটি দেখে খুবই খুশি হলেন জব চার্নক। সদলে কিছুদিন বাস করলেনও এখানে। কিন্তু বেশিদিন তিনি এখানে থাকতে পারলেন না। খবর পেয়ে নবাব-সৈন্যরা ধেয়ে আসছে এদিকে। কাজেই একদিন দলবল নিয়ে তাঁকে রওনা হতে হল উড়িষ্যার বালেশ্বরের দিকে।

পুরো চারটি বছর কেটে গেছে তারপর। এই চার বছরে হুগলি নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজধানী দিল্লীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত যমুনা দিয়েও কম জল বয়ে যায় নি এই সময়ের মধ্যে। ঢাকার নবাবী মসনদে শায়েস্তা খাঁর পরে বসলেন ইব্রাহিম খাঁ।

সম্রাটের নির্দেশে শান্তিপ্রিয় ইব্রাহিম খাঁ জব চার্নককে খবর পাঠালেন বাংলাদেশে ফিরে আসতে। জব চার্নক তখন সুদূর মাদ্রাজে। বাংলার নবাবের আহ্বান গিয়ে পৌছল তাঁর কাছে। বার্ষিক তিন সহস্র টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেন তিনি।

অনিশ্চয়তার শেষ হল এতদিনে। আর চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো নয়। খোদ নবাবের আহ্বান, আর সেই সঙ্গে দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের অনুমতি। কাজেই এবার বুক ফুলিয়ে এসে হাজির হলেন জব চার্নক বাংলার মাটিতে।

ষোল শ' নব্বুই সালের চব্বিশে আগস্ট রবিবার। হিন্দুমতে রবিবার নিষ্ফলা বার হলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে যে এই বারটি শুভ হয়েছিল, বাংলার পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। বেনিয়া ইংরেজ হয়ে উঠেছিল দেশের রাজা। কিন্তু সেদিন কলকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক আর বেঁচে ছিলেন না। কলকাতায় সেন্ট জনস চার্চের সমাধিক্ষেত্রে, সতীদাহ থেকে উদ্ধার করা নিজের হিন্দু-স্ত্রীর পাশে তিনি তখন চিরনিদ্রায় শায়িত।

সেই রবিবার ঠিক দুপুরে মাথার ওপর প্রখর সূর্য। সুতানুটি গ্রামের মানুষেরা সেদিন চমকে উঠে দেখল নদীর পাড়ে এসে ভিড়েছে একখানি একখানি করে অনেকগুলো নৌকো। প্রতিটি নৌকোর মাথায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে

ইংলণ্ডের পতাকা।

নৌকো থেকে ধীরে ধীরে নামলেন জব চার্নক। সঙ্গে ইংরেজ বণিক ও কর্মচারীর দল। দেহে তাদের ঝলমলে পোশাক, চোখে-মুখে আনন্দ-উল্লাস, চালচলনে আধিপত্য বিস্তারে সংকল্প।

সুতানুটির শত শত অধিবাসী নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল ইংরেজ বণিকদের সেই জয়যাত্রা দেখতে। হ্যাঁ, জয়যাত্রাই বটে! যেন এই তিনটি গ্রামকে জয় করে ফেলেছে তারা। আজ যেন সেই বিজিত রাজ্য অধিগ্রহণের দিন। অধিগ্রহণ করতে এসেছেন বণিক-নেতা জব চার্নক।

গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা মাঠের মধ্যে পোঁতা হল একখানা উঁচু বাঁশ। দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াল ইংরেজ কর্মচারীরা। তাহাদের মধ্যে ছিল সেপাই-সান্ত্রী, ছিল কেরানী—কর্তাব্যক্তি, ছিল বিউগ্‌লার। বাঁশের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা হাতে জব চার্নক।

গ্রামের লোক এসে চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ফিরিঙ্গীদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে। খবর পেয়ে এসে হাজির হল কলকাতার শেঠ ও বসাক উপাধিধারী ব্যবসায়ীরা, এল আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ বণিকেরা যারা অনেক আগে থেকেই এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করছিল এখানে।

সামরিক কেতায় একসঙ্গে বেজে উঠল অনেকগুলো বিউগল। তাতে বিজয়ের সুর। সেই সুর ছড়িয়ে পড়ল সারা সুতানুটি গ্রামে। সঙ্গে সঙ্গে জব চার্নক উঁচু বাঁশের মাথায় তুলে দিলেন ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা।

হুগলি নদীর অনুকূল হাওয়ায় পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে সেই পতাকা। সঙ্গে বিউগলের বিজয় সুর। সেদিন সেই সুর বায়ু-তরঙ্গে ভেসে ভেসে বোধহয় ছড়িয়ে পড়েছিল সুতানুটির সীমানা ছাড়িয়ে গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামেও। সেখান থেকে বোধহয় গোটা বাংলাদেশ হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে। সম্ভবত ভারত-বর্ষ ছাড়িয়ে সুদূর ব্রিটেনের আকাশে-বাতাসেও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সুর। নইলে হয়তো ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হত অন্যভাবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতি—এই দুটো জিনিসই একসাথে চলতে লাগল ব্রিটিশ বণিকদের বুদ্ধির জোরে। দুটো বস্তুর এই সাঁড়াশী-আক্রমণে নতুন গড়ে ওঠা আদি কলকাতার আদি ব্যবসায়ী আর্মেনীয় ও পর্তুগীজরা হয়ে পড়ল কোণঠাসা। ব্যবসা থেকে অর্থ, আবার অর্থ থেকে প্রতিপত্তি। হুগলি নদীর পাড় বরাবর গড়ে উঠল ছোটবড় 'ওয়্যার হাউস' বা গুদামঘর। তারই আশে-পাশে ইংরেজ-বসতি। ইংরেজ-তনয়রাও তখন কিছু কিছু করে আসতে আরম্ভ করেছে এদেশে। সাবেক কালের সেই কলকাতায় কোথাও বা কাঁচা-মাটির রাস্তা, কোথাও বা পড়েছে ইঁটের টুকরো। দিশী ব্যবসায়ীরাও পিছিয়ে নেই। মধু-লোভী মৌমাছির মত তারাও এসে আসর জাঁকিয়ে বসতে আরম্ভ করছে শহর কলকাতায়। এমন কি চোর-জোচ্চোরেরাও পিছিয়ে নেই। তারাও এসে ঘুর-ঘুর করতে শুরু করেছে আশে-পাশে। সুযোগ পেলেই এটা-ওটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। অবস্থা তেমন অনুকূল হলে রাতের অন্ধকারে গুদামঘরে সিঁদ কেটে ঢুকে দামী দামী মালপত্র নিয়ে সরে পড়ার সুযোগও যথেষ্ট।

বণিক-নেতা জব চার্নকের তখন বনেদী জমিদারী মেজাজ। ধূমপানের এদেশীয় প্রথাটা তাঁর বড়ই প্রিয়। দামী গড়গড়ায় লম্বা নল লাগিয়ে তিনি ধূমপান করেন। দারুণ গ্রীষ্মে দিশী চাকরেরা বড় বড় হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করে তাঁকে। প্রয়োজনে হুঁকা-বরদারেরা সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর। পান-ভোজনেও ততদিনে তিনি অনেকটা দিশী মেজাজ তৈরী করে ফেলেছেন।

গ্রীষ্মের দুপুর। তাই ঘরে টেঁকা দায়। একফোঁটা হাওয়া নেই কোথাও। এমন কি হুগলি নদীর পারেও যেন হওয়ার তরঙ্গ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কোন এক অজ্ঞাত কারণে।

ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন জব চার্নক। দিশী চাকরেরা রাস্তার পাশে একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থগাছের ছায়ায় সাহেবের জন্যে তৈরি করে দিল এক সুদৃশ্য বিছানা। মখমলের তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় সেই নরম বিছানায় বসে নিমীলিত নয়নে গড়গড়ার নল মুখে পুরে ধূমপান করতে লাগলেন জব চার্নক।

হঠাৎ একজন দিশী চাকর ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে, দাঙ্গা - সাংঘাতিক দাঙ্গা, হুজুর !

চোখ মেলে তাকালেন জব চার্নক। তারপর গড়গড়ার নল মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে স্পষ্ট বাংলায় জিজ্ঞেস করেন, দাঙ্গা ! কোথায় দাঙ্গা ?

—ঐ তো হুজুর, নদীর পাড়ে দু'দল সাহেবের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধেছে। নৌকো-বাঁধা বড় বড় লোহার চেন দিয়ে একদল আর-এক দলকে বেধড়ক পেটাচ্ছে, হুজুর !

—হুঁ ! চিন্তিত মুখে গড়গড়ার নল আবার মুখে পুরে দেন জব চার্নক। তারপর আবার আগের মত নিমীলিত নয়নে ধূমপান করতে থাকেন। এটা কিছু নতুন জিনিস নয়। নিশ্চয় দু'দল ইয়োরোপীয় জাহাজের নাবিক পেট পুরে মদ গিলে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়েছে। আজকাল শহরে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। মাঝে মাঝে স্ত্রীলোক নিয়েও ঝগড়া-কাজিয়া বেধে যায়। তার ওপর চোর-ছ্যাঁচোড়ের উৎপাত তো লেগেই আছে। নাঃ, একটা কিছু ব্যবস্থা করা একান্তই দরকার। বিলিতি সাহেবদের একজনের আচরণে যে গোটা শ্বেতাঙ্গ সমাজের সম্মান নষ্ট হয় তা ঐ বোকাগুলো বোঝে না। আর বুঝবেই বা কেমন করে ? পেটে কি বিদ্যে আছে ? করে তো জাহাজের খালাসীর চাকরি। সাহেব বলে তো সবাই আর দিগ্‌গজ নয়। তা'ছাড়া এদেশে এসে পা দিলেই কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে ওরা। বিলেতের মাটিতে যে কাজ করতে লজ্জা পেত সেই কাজ ওরা এখানে অবলীলায় করে বসে।

কিন্তু কি ব্যবস্থা করতে পারেন জব চার্নক ? ইয়োরোপীয়দের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও তাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তিনি ?

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর কোম্পানির সুপারিশ পাঠালেন জব চার্নক যে শহর কলকাতার জন্যে 'ভিলেজ ওয়াচম্যান' দরকার। সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা ও শহরের মানুষের, বিশেষ করে ইয়োরোপীয়দের ধন-সম্পত্তি

রক্ষার জন্য গ্রাম-বাংলার চৌকিদারের মত এখানেও একদল চৌকিদারের প্রয়োজন।

সৃষ্টি হল 'ভিলেজ ওয়াচম্যান' অর্থাৎ খবরদারী করার জন্যে এক দল চৌকিদার। দিশী লোককে দিয়ে ইয়োরোপীয়দের ওপর খবরদারী করা চলে না। কাজেই ভিলেজ ওয়াচম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হল একদল ইয়োরোপীয়কে। এই ওয়াচম্যানেরাই হল পরবর্তী কালে কলকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেবের 'টাউন গার্ড' অর্থাৎ একালের কলকাতা পুলিশ—যাদের প্রধান ঘাঁটি ওই লালবাজার।

চোখের দৃষ্টি খানিকটা অস্পষ্ট হয়ে এলেও এখনও চশমার প্রয়োজন হয় না বৃদ্ধ ম্যালকমের। অবে আজকাল বাস-ট্রামের নম্বর পড়তে একটু অসুবিধাই হয়, কিন্তু তাতে তেমন কিছু যায় আসে না তার। কারণ পারতপক্ষে বাসে-ট্রামে সে চড়েই না। যতদিন পা দু'খানায় সামান্যতম জোর থাকবে ততদিন চড়ার দরকারও হবে না।

যথারীতি শহর-পরিক্রমার বেরিয়েছে ম্যালকম। উদ্দেশ্যহীন এই পরিক্রমা। গায়ে সেই চিরাচরিত পোশাক, হাতে লাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে ফুটপাথ ধবে হেঁটে চলেছে। বাঁ দিকে রাজভবনের পূর্ব ফটক। ডিম্বাকৃতি সেই ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে একজন কনস্টেবল। কোমরে গোঁজা রিভলবার।

ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ম্যালকম। তারপর গলা বাড়িয়ে রাজভবনেব ভেতরের দিকে ঘোলাটে চোখ মেলে তাকায়। না. প্রায় কিছুই পরিবর্তন হয়নি। তার নিজের যৌবন বয়সে এই রাজভবনটাকে দেখতে যেমন ছিল আজও প্রায় তেমনিই আছে। যৌবন বয়সে কেন, তার ছেলেবেলায়ও সে এই রাজভবনকে প্রায় এমনই দেখেছে। তখন একে বলা হত গভর্ণর হাউস, আর আজকাল বলা হয় রাজভবন।

ছেলেবেলায় ম্যালকম তার মায়ের হাত ধরে অনেকবার এদিকে এসেছে। কতটুকুই বা পথ। পার্ক স্ট্রিট থেকে গভর্ণর হাউস। এই পার্ক স্ট্রিটেই একটা অন্ধকার বাড়ির একতলায় তারা থাকত। তারা মানে, সে আর তার মা। বাবার চেহারা মনে নেই ম্যালকমের। চেষ্টা করলেও মনে করতে পারে না। জীবনে দু'একবারের বেশি সে দেখে নি তাকে। তার বাবা নাকি রেলে চাকরি করত। থাকত বিহার অঞ্চলে। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে আছে বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই তার মা যেন বিরক্ত হত। একটু বড় হয়ে সে জানতে পেয়েছিল তার বাবা-মায়ের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না। তার মাকে ডিভোর্স করে তার বাবা আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে ওই বিহার অঞ্চলেই থাকত। কলকাতায় প্রায় আসতই না। তার মা একটা সওদাগরী অফিসে কাজ করত।

কিন্তু তাই বলে ছেলের প্রতি এতটুকু অযত্ন ছিল না তার মায়ের। ওই মায়ের স্নেহেই সে বড় হয়েছে। ছেলেবেলায় তার কোন আবদারই অপূর্ণ রাখত না তার মা। মাঝে মাঝে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মা চোখের

জল ফেলত। তার সেই উষ্ণ চোখের জল গড়িয়ে পড়ত ম্যালকমের মাথায়, কিন্তু সে বুঝতে পারত না কেন তার মা শুধু শুধু কাঁদত। তবে মাকে কাঁদতে দেখলেই বাবার ওপর কেন যেন ভীষণ রাগ হত তার। মাঝে মাঝে ভাবত বড় হয়ে সে তার বাবাকে একহাত দেখে নেবে।

ছেলেবেলায় একটা মিশনারী স্কুলে তাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল তার মা। কেবল খ্রীষ্টানদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল ঐ স্কুল। অনেক বাঙালী খ্রীষ্টানের ছেলে-মেয়েরাও পড়ত ঐ স্কুলে। ওদের সঙ্গে মিশে মিশে ছেলেবেলা থেকেই বাংলাটা বেশ ভালই আয়ত্ব করেছিল ম্যাল্‌কম।

বাঙালী ছেলে-মেয়েদের সাথে তার এই অতিরিক্ত মেলামেশা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তেমন পছন্দ করত না। একবার তার চাইতে বয়সে বড় একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাত্র তাকে ধমকে দিয়েছিল। বলেছিল, তুই একটা স্যাভেজ - বর্বর!

— কেন? জিজ্ঞেস করেছিল ম্যালকম।

জবাবে সেই ছাত্রটি বলেছিল, স্যাভেজ না হলে তুই ওই স্যাভেজদের সঙ্গে এত মেলামেশা করছিস কেন?

সরল চোখদুটি মেলে ম্যাল্‌কম বলেছিল, তা কেন হবে? ওরা স্যাভেজ হতে যাবে কেন? ওরা তো বাঙালী।

ছাত্রটি আবার বলেছিল, কালো আদমী মাত্রই স্যাভেজ।

—তা'হলে তোমার গায়ের রং তো আমার চাইতে খানিকটা ময়লা, তবে কি আমার তুলনায় তুমি স্যাভেজ?

--শাট্ আপ্, ইডিয়েট! ম্যাল্‌কমকে ধমকে উঠেছিল সেই ছাত্রটি। বলেছিল, ওরা বাঙালী-ইন্ডিয়ান। আর, আমরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। ওরা আমাদের কেউ না। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বিলেতের রাজা-রাণীর। ওই কালো বাঙালীদের সাথে আমাদের মেলামেশা করা উচিত নয়।

বিলেতের রাজা-রাণীর সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে ছোট্ট ম্যালকমের বুকখানি গর্বে আনন্দে ভরে উঠেছিল। বিলেতের রাজা-রাণী এ দেশের সম্রাট-সম্রাজ্ঞী। স্কুলের প্রার্থনা-সঙ্গীতে 'গড্ সেভ দি কিং' গানটিতেও ওই 'রাজা-রাণীর' বন্দনা। স্কুলের বইতেও সে তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়েছে। বালক মনের লাগামহীন কল্পনার রঙ দিয়ে রাঙিয়ে তাদের সম্পর্কে নিজের মনে একটা সুন্দর চিত্রও সে তৈরী করে ফেলেছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু সে এর আগে কোনদিন শোনে নি যে, এদেশের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে রয়েছে সেই রাজা-রাণীর সম্পর্ক। কাজেই এমন একটি খবরে তার বালক মনটি পুলকিত হয়ে ওঠবারই কথা। বিলেতের রাজা-রাণী তাদের নিজেদের মানুষ। তা'হলে কি বিলেত দেশটাও তাদের নিজেদের দেশ?

কথাটা সে জিজ্ঞেস করেই বসল সেই উঁচু ক্লাসের ছাত্রটিকে। জবাবে সেই ছাত্রটিও বেশ ভারিক্কি চালে বললে, আরে তুই যে দেখছি কিছুই জানিস না। ইংলণ্ড দেশটাই তো আমাদের নিজেদের দেশ। কালোদের এই দেশটা আমাদের দেশ হতে যাবে কেন?

—তা'হলে কি একদিন আমরা সবাই ওই ইংলণ্ডে চলে যাব ?

এবার একটু ভেবে জবাব দেয় ছাত্রটি, যাওয়াই তো উচিত। আমার বাবা তো বলেছে সিনিয়র কেম্ব্রিজটা পাস করলেই নাকি আমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবে। কি মজা বল দেখি! বিলেত—লন্ডনে থাকব। বড় চাকরি করব। নিজে গাড়ি চালাব।

—গাড়ি পাবে কোথায় ?

—বারে, কোন খবরই তুই রাখিস না। বিলেতে যে সকলেরই নিজের নিজের গাড়ি আছে। বিলেত তো আর এদেশের মত ভিখিরীর দেশ নয়। ওদেশে সবাই বড়লোক।

চোখ দুটো বড় করে ম্যাল্‌কম সেই ছাত্রটির কথা শুনছিল, আর শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বিলেত নামক স্বর্গরাজ্যটি যে এদেশের চাইতে লক্ষ-কোটিগুণ ভাল এই ধারণাটা সেদিন বদ্ধমূল হয়েছিল তার ছোট্ট মনের মধ্যে। সেই দিনই প্রথম তার মনের কোণে অঙ্কুরিত হয়েছিল সাদা-কালোর পার্থক্যের বীজ। ওরা কালো, ওরা নিকৃষ্ট। আমরা সাদা, আমরা ওদের চাইতে শ্রেষ্ঠ—এই ধারণা নিয়েই সে সেদিন ছুটির পরে বাড়ি ফিরেছিল।

বাড়ি ফেরার পথেও কেবল ঐ প্রসঙ্গই মনে পড়ছিল ম্যালকমের। সেই ছেলেটিকে তার বাবা বিলেত পাঠাবে। তার নিজের তো তেমন কোন বাবা নেই। থাকলেও সে এদিকে আসে না। তা'হলে কি তার নিজের পক্ষে কোনদিন বিলেত যাওয়া সম্ভব হবে না? বোধহয় না। তার মা-র তো তেমন পয়সা নেই। আজ ছ'মাস ধরে বলে বলে সে তার মা-র কাছ থেকে একটা খেলনা বন্দুক আদায় করতে পারছে না।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাইনিং টেবিলে খেতে বসে ম্যাল্‌কম পাকড়াও করল তার মাকে। বলল, বড় হয়ে আমি বিলেত যাব, মা। বল তুমি, আমাকে বিলেত পাঠাবে তো ?

—সেকি রে, হঠাৎ তোর বিলেত যাবার শখ হল কেন ?

—বারে, ওটাই তো আমাদের নিজেদের দেশ। ওখানেই তো আমাদের রাজা-রাণী থাকে।

মা ছেলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, একথা তোকে কে বলেছে রে, জনি ?

—সবাই তো বলে। আজ স্কুলে সিনিয়র স্মিথও তো সেই কথাই বললে। এই কালো মানুষের বিশ্রী দেশে আমরা থাকব কেন? ওরা তো সব স্যাভেজ।

—তোদের স্কুলের সিনিয়র স্মিথ একথা বললে ?

—বললেই তো! ওদের চাইতে আমরা অনেক বড়—অনেক ভাল।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে মা আবার জিজ্ঞেস করে, কিসে আমরা ভাল বল্ তো ?

ম্যালকম এবার বিপদে পড়ে। কালো মানুষদের চাইতে সাদারা যে বড় ও ভাল তা ঐ সিনিয়র স্মিথ তাকে বলেছে, কিন্তু কেন ভাল সে কথা তো

বলেনি। আর সে-ও তা জিজ্ঞেস করেনি।

তবুও দমবার পাত্র নয় ম্যালকম। নিজের মনেই একটা যুক্তি খাড়া করে।সে বললে, বারে, ওদের গায়ের রঙ যে কালো। আর আমরা তো সাদা।

—তাতে কি হয়েছে? বলতে থাকে তার মা, সেদিন তো তুই 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন' বইটা পড়ে বলেছিলি যে, কালো হলেও ঐ টম্‌কাকা লোকটা নাকি খুবই ভাল।

জবাব দেয় ম্যালকম, হ্যাঁ, ভাল বটে। তবে বড় তো নয়। টম্‌কাকা তো একজন ক্রীতদাস।

মা বুঝতে পারে তার জনি এতদিনে ভাল ও বড়র মধ্যে পার্থক্যটুকু বুঝতে শিখেছে। তাই সে আবার বললে, পাশের বাড়ির জনদের যে অ্যাকোয়ারিয়াম আছে তার মাছগুলোর মধ্যে নাকি সেই 'ব্ল্যাক্ মলি' মাছটাই সবচাইতে তেজী। একথা তো তুই-ই বলেছিলি। তা'হলে?

এবার একটু বিপদে পড়ে ছোট্ট ম্যালকম। ছুটির দিনে সে প্রায়ই যায় ওদের বাড়ি। আর বসে বসে কেবল সেই 'ব্ল্যাক্ মলি' মাছটার কসরৎ দেখে। অতগুলো মাছের মধ্যে ঐ মাছটাই তার সবচাইতে প্রিয়।

তবুও একবার শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে সে জবাব দেয়, এদেশের রাজা-রাণী তো আমাদের লোক। তাঁরাও তো আমাদের মতই সাদা।

—ও তাই বুঝি! মা আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে। ম্যালকম কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তার প্রশ্নের জবাব সে এখনও পায়নি। তার মা তাকে বিলেতে পাঠাবে কিনা সেই খবরটা যোগাড় করতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। আগামীকাল স্কুলে গিয়ে সিনিয়র স্মিথকে বলতে হবে—হ্যাঁ, আমিও বিলেত যাব। বড় হলে আমার মা আমাকেও বিলেত পাঠাবে।

ম্যালকম এক পিস পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে আবার জিজ্ঞেস করে, বল মা, বড় হলে আমি বিলেত যাব তো?

জবাব দেয় তার মা, তা না হয় যাবি। কিন্তু তুই না সেদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়ে বলেছিলি যে, এই কলকাতা শহরটা নাকি খুব ভাল।

—ভালই তো, বলতে থাকে ম্যালকম, কি সুন্দর ঐ গড়ের মাঠ, কি বিউটিফুল ঐ ইডেন গার্ডেন! আচ্ছা মা, ইডেন গার্ডেনে রোজ সন্ধ্যাবেলা ওরা অমন সুন্দর বাজনা বাজায় কেন?

—যারা বেড়াতে যায় তাদের আনন্দ দেবার জন্যে। জবাব দেয় তার মা।

—সত্যি, চমৎকার বাজনা, মা। ওয়াণ্ডারফুল! আমিও বড় হয়ে অমনি বাজনা বাজাব।

ছোট ছেলে ম্যালকম। ইডেন গার্ডেনে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা গোরাদের বাজনার চমৎকার সুর মনে পড়তেই সে ভুলে যায় তার ভবিষ্যৎ বিলেত যাবার প্রসঙ্গ। আঙ্কল টম্‌স কেবিনের টম্‌কাকার দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী কিংবা, ব্ল্যাক মলি' মাছটির জলের ভেতর অপূর্ব কসরৎ তাকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যেতে না পারলেও ইডেন গার্ডেনের সেই বাজনার সুর কিন্তু সহজেই সেই কাজটুকু সম্পন্ন করে।

এই সময় তার মা তাড়া দেয় তাকে, ও কি. চুপ করে বসে রইলি কেন? বড় হলে যা হবার হবি, এখন তো খেয়ে নে।

মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে ম্যালকম আবার কাঁটা-চামচ হাতে তুলে নেয়।

একদিন স্কুল থেকে ফিরেই বালক ম্যালকম তার মাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা, টঁ্যাস মানে কি?

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তার মা গম্ভীর সুরে পাল্টা প্রশ্ন করে, তুই কোথায় শুনলি এই কথাটা?

সেকথার জবাব না দিয়ে ম্যালকম আবার বললে. বলই না, মা। টঁ্যাস কথাটা কি কোন খারাপ শব্দ?

—কি করে জানলি তুই?

একটু সময় চুপ করে থেকে অপরাধীর সুরে ম্যালকম বললে, আজ টিফিনের সময় খেলতে গিয়ে একটা বাঙালী ছেলের সঙ্গে মারামারি করেছি। আমার কোন দোষ ছিল না। খেলতে গিয়ে ও পড়ে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে শুধু শুধু স্কাউণ্ড্রেল বলে গালাগাল দেয়। আমিও রেগে গিয়ে ওকে একটা ঘুষি লাগিয়ে দিই। রোগা পটকা ছেলেটা আমার সঙ্গে পারবে কেন? দৌড়ে পালিয়ে যেতে যেতে আমাকে বলতে থাকে—টঁ্যাস—দো-আঁশলা। আচ্ছা মা, দো-আঁশলা কথাটাও কি খারাপ?

ম্যালকমের মা খানিকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর জবাব দেয়, হঁ্যা বাবা, ঐ দুটো শব্দই খুব খারাপ ধরনের গালাগাল।

ম্যালকম খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করে। তারপর নিজের বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের ঘুষি বসিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, ঠিক আছে মা. আমি কালই স্কুলে গিয়ে ফাদারের কাছে নালিশ করব যে, ও আমাকে 'টঁ্যাস' আর 'দো-আঁশলা' বলে গালাগাল দিয়েছে। আচ্ছা মা. এই কথা দুটোর অর্থ কি?

ম্যালকমের মা একটু সময় চিন্তা করে। 'টঁ্যাস' শব্দটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে একটা এদেশীয় চলতি গালাগাল। আর, 'দো-আঁশলা' শব্দের অর্থ 'বর্ণসঙ্কর'। দুটো কথাই সম্মানহানিকর। কিন্তু এর অর্থ সে কেমন করে বোঝাবে তার ছেলেকে? তাই সে কেবল বললে, না বাবা. এ নিয়ে আর ফাদারের কাছে নালিশ করে ঝঞ্ঝাট বাধাতে যেও না তুমি। ঐ ছেলেটা নিশ্চয়ই খারাপ। ওর সাথে আর কখনও তুমি কথা বলো না।

—ঠিক বলেছ, মা। ঐ কালো বাঙালীগুলো সবাই খারাপ।

—না বাবা, সবাই খারাপ হবে কেন? কেউ কেউ খারাপ। জবাব দেয় তার মা।

আর একটু বড় হয়ে ম্যালকম এই শব্দ দুটোর অর্থ বুঝতে পেরেছে। রাস্তা-ঘাটে অনেকের মুখেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে এই শব্দদুটোর প্রয়োগ সে শুনেছে। যখনই শুনেছে তখনই রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে। সেই সঙ্গে শহর কলকাতায় এই বাঙালী সমাজের ওপর তার মনটা

খাপ্পা হয়ে উঠেছে। তার ওপর সাদা-কালোর অহমিকাটুকু তো ছিলই। এই দুয়ে মিলে ছেলেবেলা থেকেই গোটা বাঙালী সমাজের সঙ্গে একটা কমপ্লেক্স ও সেই সঙ্গে একটা মেকি আভিজাত্যবোধ জন্ম নিয়েছিল তার মনে।

রাজভবনের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে বৃদ্ধ ম্যালকম—আজকাল রাজভবনের প্রতিটি গেট পাহারা দেয় একজন কি দুজন করে কনস্টেবল। কিন্তু সেকালে এমন ছিল না। সন্ত্রাসবাদীদের যুগ সেটা। গোটা বাংলাদেশ জুড়ে তখন রক্তের হোলি উৎসব। পরাক্রান্ত ব্রিটিশ-সিংহের সাথে একদল মৃত্যুভয়হীন দামাল ছেলে-মেয়ের মরণপণ লড়াই। তাই সেকালে গভর্ণর হাউসের প্রতিটি গেটে চার-পাঁচজন করে সশস্ত্র কনস্টেবল মোতায়েন। প্রত্যেকের হাতে থ্রি-ও-থ্রি রাইফেল। তাতে লাগানো ঝকঝকে সঙ্গীন। সদা সতর্ক তাদের দৃষ্টি। একটু কিছু সন্দেহ হলেই তারা রাইফেলের সেফ্‌টি ক্যাচ খুলে দিয়ে পোজিশন নিয়ে দাঁড়াবে।

রাজভবন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে তাকায় বৃদ্ধ ম্যালকম। একালের প্রাণচঞ্চল মহানগরী কলকাতা। ফুটপাথে পথচারীর ভিড়। শব্দ করতে করতে পৃথিবীর আধুনিক শহরগুলো থেকে বিতাড়িত বাস-ট্রাম কলকাতার বুক চিরে সগর্বে চলেছে সেকালের ছ্যাকড়া গাড়ির মত। প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে সরকারী মালিকাধীন ডবল ডেকার। যাত্রীর ভিড়ে একদিকে হেলে পড়েছে সেই দ্বিতল বাস।

অলস দৃষ্টি মেলে সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ ম্যালকম। তারপর ধীর মন্থর পায়ে হাঁটতে থাকে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে।

লালবাজার আর লালদীঘি। শহর কলকাতায় এই দুটি জায়গাই বোধহয় সবচাইতে লাল। তাই ওদের ঐ নাম। একালের মহানগরীর ট্রাফিক পোস্টের লাল আলোর কথা ছেড়ে দিলেও আরও একটা লাল বস্তু রয়েছে এখানে—লালবাড়ি, অর্থাৎ রাইটার্স বিল্ডিংস। এই তিন লালের ত্র্যহস্পর্শ ব্রিটিশ আমলেও ছিল, এই আমলেও আছে। আর বোধহয় ভবিষ্যতেও থাকবে।

হাঁটতে হাঁটতে রাইটার্স বিল্ডিংসের কাছে এসে দাঁড়ায় ম্যালকম। এদিকটায়ও ভিড়। সামনে লালদীঘি। দীঘির পাড়ে ট্রামলাইন। তারও উত্তরে ভি. আই. পি.দের মোটরগাড়ি রাখার বিশেষ গ্যারেজ।

বৃদ্ধ ম্যালকম অলস দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চলে যায় অনেক বছর পেছনে। হ্যাঁ, এই তো সেই জায়গা। লালদীঘির এই উত্তর পাড়েই তো সেদিন ঘটেছিল সেই ঘটনা। কোন্ সাল সেটা? উনিশশো তিরিশ? ঠিক, তিরিশই বটে। শুধু সাল কেন, তারিখ ও মাসটাও স্পষ্ট মনে আছে ম্যাল্‌কমের। আগস্ট মাসের পঁচিশ তারিখ।

সেদিনও ঠিক আজকের মতই লোকজন চলাচল করছিল এই তল্লাটে। ঘন্টি বাজিয়ে চলছিল ট্রাম। আর, হর্‌ন্ বাজানো নিষিদ্ধ বলে হর্‌ন্ না বাজিয়েই দ্রুত যাতায়াত করছিল সেকালের বেসরকারী বাস। সেদিনকার এই ডালহৌসী

স্কোয়ার অঞ্চল ঠিক আজকের মতই ছিল কর্মচঞ্চল। সেদিন কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, বেলা এগারোটা নাগাদ সেখানে এমন একটা ভয়ানক নাটকের অবতারণা হবে।

তারও আগে বেলা আটটা নাগাদ সেন্ট্রি ডিউটি বদল হল দুই নম্বর কিড স্ট্রীটের বাড়িতে। এই সেই বাড়ি যেখানে ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের অনেক বছর পর্যন্ত মহানগরী কলকাতার নগরপাল অর্থাৎ পুলিশ কমিশনার বাস করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন স্কচ, কেউ আইরিশ, কেউ বা খাঁটি ইংরেজ। সবশেষে ভারতীয় সি. পি-দের মধ্যেও অনেকে বাস করেছেন এই দুই নম্বর বাড়িটিতে।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটায় সি. পি. চার্লস টেগার্ট এসে বসলেন তাঁর ডাইনিং রুমের টেবিলে ব্রেকফাস্টের জন্যে। একটু পরেই দরজার পাশে দেখা গেল মিসেস টেগার্টকে। চার্লস মৃদু হেসে আহ্বান জানালেন তাঁকে! মিসেস টেগার্ট এসে স্বামীর উল্টো দিকের চেয়ারে বসতেই ধোপদুরস্ত উর্দিপরা নেপালী বেয়ারা এসে সেদিনকার ইংরেজি খবরের কাগজখানা দিয়ে গেল চার্লসের হাতে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে টেগার্ট দ্রুত চোখ বুলোতে লাগলেন তার ওপর। গোটা পৃথিবীর খবর রয়েছে তাতে। কিন্তু এত খবর পড়ার মত সময় কোথায় কলকাতার পুলিস কমিশনারের? কেবল বেছে বেছে ইম্পর্টেন্ট খবরগুলো পড়তে লাগলেন তিনি। আর স্ত্রী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর দিকে।

ব্রিটিশ রাজশক্তির একটা মস্ত স্তম্ভ চার্লস টেগার্ট। আর ঠিক সেই জন্যেই তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তার সীমা নেই তাঁর স্ত্রীর। ইয়োরোপীয়ান মহলে সন্ত্রাস-বাদীদের যম বলে কথিত চার্লস টেগার্টের সম্মান যত বাড়ে, তার স্ত্রীর মনের ভয়ও বাড়তে থাকে সেই অনুপাতে। বলা তো যায় না কখন কি হয়? বাগে পেলে ঐ ছেলেগুলো কিছুতেই রেহাই দেবে না তাঁর স্বামীকে। ব্রিটিশ রাজ-শক্তির গর্ব খর্ব করতে তারা বদ্ধপরিকর।

একটু পরেই তক্‌মা-আঁটা মুসলমান বাবুর্চি এসে হাজির হল প্রাতরাশের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে। খাবারের ডিশগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে সে চলে যেতেই টেগার্ট খবরের কাগজখানা একপাশে সরিয়ে রেখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, লেট আস বিগিন।

—ইয়েস। বলেই মিসেস টেগার্ট স্বামীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে এনে খাবারের দিকে নজর দেন।

খেতে খেতে মিসেস টেগার্ট বললেন, আজকের কাগজে কিছু ইম্পর্টেন্ট খবর আছে নাকি?

ইম্পর্টেন্ট খবর বলতে তাঁর স্ত্রী কি বোঝাতে চাইছেন সে কথা অজানা নয় টেগার্টের। এতকাল একত্রে বাস করে স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে তিনি ভাল রকমেই ওয়াকিবহাল।

স্ত্রীর প্রশ্নে এক পিস রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে টেগার্ট জবাব দেন,

রোজই যে খবর থাকে আজও তাই আছে। গোটা বাংলাদেশে অনেকগুলো সন্ত্রাসবাদী ছোকরা ধরা পড়েছে। ঢাকা ও বরিশালে পুলিশ সন্ত্রাসবাদীদের দুটো ঘাঁটি আবিষ্কার করেছে।

স্বামীর জবাবে খুশি হওয়ার কোন লক্ষণ ফুটে ওঠে না স্ত্রীর মুখে। পরিবর্তে একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নেমে আসে মুখের ওপর। মাথা নিচু করে ডিমের পোচের ওপর গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে তিনি বললেন, আমার তো মনে হয় আমাদের এখন একটু সংযত হয়ে চলা উচিত।

স্ত্রীর কথায় চার্লস টেগার্টের চৌকো মুখের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট অথচ তীক্ষ্ম চোখজোড়া মুহূর্তের জন্যে আরও একটু ছোট হয়ে ওঠে। মাথার বাঁ দিকের পাতলা চুলের পরিপাটি সিঁথির ওপর আলগোছে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, হোয়াট ডু ইউ মীন? সংযত হয়ে চলা বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?

মিসেস টেগার্ট তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, নো—নো, আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। আমি বলতে চাইছি যে, দেশের যে পরিস্থিতি তাতে গভর্ণমেণ্টের একটু বুঝে-শুনে চলা উচিত। গভর্ণমেণ্টের পলিসির জন্যে ব্রিটিশ নাগরিকেরা এদেশে চাকরি করতে এসে এক এক করে প্রাণ দেবে এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়?

একটু সময় চিন্তা করে জবাব দেন টেগার্ট, আমি গভর্ণমেণ্টের পলিসি-মেকার নই। সরকারী পলিসিকে কাজে পরিণত করাই আমার ডিউটি। আমি পুলিশ অফিসার। যাতে এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয় সেইদিকে নজর রেখেই আমাকে কাজ করতে হবে। আর সেই কাজ করতে গিয়ে সবকিছু বাধা-বিপত্তি দূরে সরিয়ে দিতে হবে আমাকে। গভর্ণমেণ্টও তাই আশা করেন আমার কাছে।

— কিন্তু তা করতে গিয়ে নিজের দিকটা পুরোপুরি ভুলে গেলে চলবে কেন? ডোণ্ট ফরগেট, ঐ বিপ্লবীদের নজর রয়েছে তোমার ওপর। সুযোগ পেলে ওরা কিছুতেই ছাড়বে না।

চাপা ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসেন চার্লস টেগার্ট। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, তা আমি জানি। প্রথম সুযোগেই যে ওরা আমার মৃত্যু ঘটাতে চাইবে তা আমার মোটেই অজানা নয়। কিন্তু আমি নিরুপায়। সবকিছু আমি সহ্য করতে পারি, পারি না কেবল ভীরু অপবাদ সহ্য করতে। সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে চার্লস ভীরুর মত আচরণ করছে একথা শোনার চাইতে মৃত্যুও আমার কাছে ভাল।

টেগার্টের কথায় মিসেস টেগার্ট কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। রিটায়ার করতে তাঁর স্বামীর আর একটিমাত্র বছর বাকি। কিন্তু মিসেস টেগার্টের জীবনে এই একটিমাত্র বছরই যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। তাঁর নিজের বয়সও কম হয়নি। প্রসাধনের সাহায্যে দেহের প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ঢাকতে চেষ্টা করলেও মনের প্রৌঢ়ত্ব তিনি ঢাকবেন কেমন করে? এই বয়সে স্বামীর জন্যে দুশ্চিন্তা হলেও কথায় কথায় তা তাঁর কাছে প্রকাশ করাটা ঠিক যেন মানায় না। শত হলেও তিনি ইংরেজ ঘরণী। তার ওপর পুলিশ কমিশনার চার্লস

টেগার্টের স্ত্রী।

কিন্তু সেই মুহূর্তে মনের আবেগ কিছুতেই দমন করতে পারেন না মিসেস টেগার্ট। চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে তাঁর। রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছতে মুছতে তিনি জবাব দেন, তুমি বড়ই স্বার্থপর, চার্লস। নিজের কথাই কেবল ভাবছ। আমার কথা একবারও মনে পড়ছে না তোমার।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিব্রত বোধ করেন চার্লস টেগার্ট। তারপর হাল্কা সুরে বললেন, ও - নো নো, মাই ডার্লিং, আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। আমি সর্বদাই তোমার কথা চিন্তা করি।

—তাই যদি করো তো নিজের সম্বন্ধে তুমি এত উদাসীন কেন? সাবধানতা মানে তো ভীরুতা নয়?

—কে বললে আমি অসাবধানী?

—তোমার আচরণই তা বলছে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত বিশ্বাস ভাল নয়। নিজের গাড়িতে তুমি গার্ড পর্যন্ত নিয়ে চলাফেরা কর না। এটা কি সাবধনতার লক্ষণ?

প্রাতরাশ শেষ হয়েছিল টেগার্টের। ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে মৃদু হেসে বললেন, নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে বলেই আমার গার্ডের প্রয়োজন হয় না। তা'ছাড়া বাংলাদেশের কোন জেলার এস. পি. কিংবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর আক্রমণ হয়েছে বলে শহর কলকাতার বুকের ওপর বসে পুলিশ কমিশনারকে আক্রমণ করার সাহস ঐ সন্ত্রাসবাদী ছেলেগুলোর যে হবে না সে সম্পর্কে তোমাকে আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

মিসেস টেগার্টও ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, আই অলসো হোপ সো। তাই যেন হয়। লর্ড যেসাস ওই ছেলেগুলোর মনে যেন এই শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলেন।

এবার দৃঢ়কণ্ঠে টেগার্ট বললেন, হ্যাঁ, তাই হবে। সন্ত্রাসবাদী ঐ ছেলেরা যদিও ভীরু নয় মোটেই, কিন্তু তাই বলে প্রাণের ভয় ওদেরও আছে।

প্রাতরাশের পরে চার্লস টেগার্ট এসে বসেন তার পার্লার অর্থাৎ বৈঠক-খানায়। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত সরকারী ফাইল। কোনটার ওপর 'সিক্রেট' বলে স্ট্যাম্প মারা, কোনটায় বা 'আর্জেন্ট' অথবা 'মোস্ট আর্জেন্ট'। এবার একটু একটু করে প্রতিটি ফাইল দেখতে হবে তাঁকে। কোনটা হয়তো এসেছে চীফ সেক্রেটারীর কাছ থেকে, খোদ গভর্ণরের নিজস্ব সেক্রেটারীয়েটের ফাইলও রয়েছে তার মধ্যে। তা'ছাড়া ডিপার্টমেন্টের ফাইল তো আছেই। এর প্রতিটি ফাইল মনোযোগ দিয়ে দেখে লিখতে হবে নিজের অভিমত। কাউকে বা দিতে হবে হুকুম, কাউকে বা হুকুম অমান্যের জন্যে শাস্তি। ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রধান কেন্দ্র কলকাতার পুলিশ কমিশনার। প্রচন্ড দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তাঁর কাঁধে।

ঘন্টা দুয়েক ধরে চলবে এই ফাইল দেখা পর্ব। তারপর ধড়াচূড়ো পরে সোজা লালবাজার।

বেলা প্রায় দশটা। কাল সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। আজ অবিশ্যি এখনও

একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি, তবে আকাশের মুখ ভার। হালকা জল-মেঘের আনাগোনা সারাটা আকাশ জুড়ে। যে-কোন সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

দুই নম্বর কিড স্ট্রীটের বাড়ির গেটে রাইফেল হাতে দুজন আর্মড পুলিশের কনস্টেবল। স্থির হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। নড়ছে না একচুলও —যেন দুটি পাথরের স্ট্যাচু।

একটু পরেই রাস্তায় জেগে ওঠে মোটর সাইকেলের শব্দ। অপেক্ষাকৃত নির্জন এই এলাকা। কাজেই যে-কোন শব্দ অনেক দূর থেকেই শোনা যায়।

মোটর সাইকেলের শব্দ কানে যেতেই পাহারারত কনস্টেবলরা ঘাড় ঈষৎ উঁচু করে তেমনি দৃঢ় ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে থাকে। এই শব্দের অর্থ তারা জানে। সি. পি-র বাড়ির গার্ড ডিউটি চেক্ করতে আসছে সার্জেন্ট সাহেব। কড়া মেজাজের সার্জেন্ট। পোশাক-পরিচ্ছদে এতটুকু ত্রুটি দেখলেই সোজা রিপোর্ট করে দেবে।

অনুমান মিথ্যে নয় ডিউটিরত কনস্টেবলদের। হুস করে গেটের সামনে এসে দাঁড়ায় একখানা মোটরসাইকেল। লাল রঙের সেই মোটর সাইকেল থেকে নেমে আসে সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম। পরনে তার সার্জেন্ট ব্রীচেস। মাথায় হেলমেট। থুতনির সঙ্গে বাঁধা হেলমেটের চিনস্ট্র্যাপ, কোমরে রিভলবার।

সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম প্রহরী দুজনের সামনে এসে দাঁড়াতেই সঙ্গীন লাগানো রাইফেল টেনে এনে দেহের সঙ্গে লাগিয়ে এ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়ায় তারা। ম্যাল্‌কমও প্রতি-নমস্কার করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। না, এতটুকু খুঁত নেই কোথাও। ওদের পায়ের বুট পর্যন্ত জেল্লা তুলে ঝিলিক মারছে, চকচক করছে কোমরের বেল্ট, আর তার সঙ্গে লাগানো ব্রিটিশ ক্রাউন মার্কা পেতলের তকমা।

খুশি হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় সার্জেন্ট ম্যালকম। এবার বাড়ির পেছন দিকের ডিউটিরত কনস্টেবলদের ডিউটিও চেক করতে হবে। এতদিন সি. পি-র বাড়িতে পালা করে দুজন কনস্টেবল ডিউটিতে থাকত। ইদানীং তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দুজনের জায়গায় চারজন করা হয়েছে। দিনকাল ভাল নয়। কখন কোথা দিয়ে কি বিপদ আসবে কেউ বলতে পারে না।

এই নতুন ব্যবস্থায় চার্লস টেগার্টের তেমন একটা মত ছিল না। মিসেস টেগার্টের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, কি হবে ওদের সংখ্যা বাড়িয়ে? সংখ্যা বৃদ্ধি করে কি সবসময় শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো যায়?

জবাবে স্বামীর মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে মিসেস টেগার্ট বলে উঠেছিলেন, দ্যাট্‌স্ রাইট। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত যে, দুজোড়া চোখের চাইতে চারজোড়া চোখ অনেক ভাল? পারলে আমি গোটা বাড়িটাকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু তাতে তো তুমি রাজি হবে না। তাই কেবল আর দুজন কনস্টেবলের ব্যবস্থা করতে বলছি।

—এত ভয় তোমার? মিসেসের দিকে তাকিয়ে চার্লস মুখ টিপে হাসেন।

একটু ম্লান হেসে মিসেস টেগার্ট জবাব দেন, হ্যাঁ, নিজের জন্যেই আমার ভয় বটে!

টেগার্ট আবার বললেন, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমার জন্যে এত দুশ্চিন্তা করে নিজের শরীর খারাপ করা ছাড়া আর কি উপকার হবে তোমার, বলতে পার?

—তা জানি না। কিন্তু আমার সর্বদাই ভয় করে তোমাকে নিয়ে। চারিদিকে যে সব কান্ড হচ্ছে তাতে—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যান মিসেস টেগার্ট।

খানিকক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন চার্লস। তারপর বললেন, আচ্ছা, তোমার বুঝি মনে হয়, সারা কলকাতার মানুষগুলো আমাকে মারবে বলে রাত দিন বসে বসে ষড়যন্ত্র করছে?

—না, তা মনে হবে কেন? তবে এটা তো ঠিক যে, এদেশের লোকেরা কেউ তোমাকে পছন্দ করে না, কারণ তুমি অত্যাচারী?

দৃঢ়কন্ঠে চার্লস প্রতিবাদ জানান, না আমি অত্যাচারী নই মোটেই। তবে দেশের সন্ত্রাসবাদীদের ক্ষেত্রে আমি ভয়ানক কঠোর। গায়ের জোরে যারা এদেশ থেকে ব্রিটিশ রাজত্ব উচ্ছেদ করতে চায় তাদের ওপর আমি সত্যিই নির্মম। কিন্তু এদেশের সাধারণ নাগরিক যারা শান্তিতে বসবাস করতে চায়, আমি তাদের সত্যিকারের বন্ধু। তাদের সুখ-শান্তিতে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেইদিকে দৃষ্টি রেখে কলকাতার মত একটা আন্তর্জাতিক শহর থেকে আমি গুন্ডা উচ্ছেদ করেছি। বলতে গেলে এই শহরের গুন্ডার বংশ ধ্বংস করেছি আমিই। রাতের অন্ধকারেও এখন পথচারীরা নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারে। এর পরেও কি বলবে যে, এই শহরের মানুষেরা কেবল আমার অমঙ্গলই কামনা করে?

—না, তা হয়তো করে না। তবে—

—তবে কি?

—সাধারণ মানুষ সহজ সরল। তারা অত প্যাঁচ বোঝে না। শহরের গুন্ডা দমনের জন্যে তারা নিশ্চয়ই দুহাত তুলে তোমাকে আশীর্বাদ করে, বাহবা দেয়। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আমি তা দিতে পারছি না।

—কেন? মোটা ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে চার্লসের।

স্বামীর এই 'কেন'র জবাবে সহসা কোন উত্তর দেন না বুদ্ধিমতী মিসেস টেগার্ট। এই মুহূর্তে তাঁর নিজের মনের কথা স্বামীর গোচরে আনা চলে কিনা তাই বোধহয় মনে মনে ভাবতে থাকেন।

স্ত্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে তাঁকে তাড়া দেন চার্লস,, ওকি, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও।

মিসেস টেগার্ট আরও কিছু সময় চুপ করে থাকেন। তারপর হেসে জবাব দেন, এদেশীয় খবরের কাগজগুলো কিন্তু তোমার এই গুন্ডা দমনের ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যা করে।

—হ্যাঁ, আমি তা জানি। তারা বলে, এদেশের সন্ত্রাসবাদীদের সায়েস্তা

করতে গিয়েই নাকি আমি গুণ্ডা দমন করছি, কারণ ঐ গুণ্ডাদের মাধ্যমেই সন্ত্রাসবাদীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে, কেমন?

মিসেস টেগার্ট জবাব দেন না। চার্লস আবার জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, ওদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তোমার নিজের কি মনে হয়?

মৃদু হেসে জবাব দেন মিসেস টেগার্ট, এক ঢিলে দুটো পাখীকে ঘায়েল করতে পারা তো বাস্তবিকই বুদ্ধিমানের কাজ। আর, পুলিশ কমিশনার হিসাবে তুমি যে খুবই দক্ষ ও বুদ্ধিমান একথা তো সবাই জানে।

যাই হোক মিসেসের আর্জি ওরফে আজ্ঞাই প্রতিপালিত হল। সেইদিনই লালবাজারে গিয়ে চার্লস টেগার্ট টেলিফোন তুলে সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি কমিশনারকে হুকুম দিলেন, আজ থেকে আমার বাড়িতে দুজনের বদলে চারজন করে আর্মড্ গার্ড মোতায়েন করুন।

বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করে পেছনের দিকে এসে দাঁড়ায় সার্জেণ্ট ম্যালকম। মনে মনে ভাবতে থাকে—খোদ সি. পি.-র সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল। সি পি. যদিও তাকে পছন্দ করেন তবুও ডিপার্টমেণ্টের সেই আপ্তবাক্য অনুযায়ী ঘোড়ার পেছনে আর সুপিরিয়র অফিসারের সামনে না পড়াই ভাল।

দুই নম্বর কিড স্ট্রিটের বাড়ির আর্মড্ গার্ড চেক্ করা শেষ হল সার্জেণ্ট ম্যাল্কমের। তাদের খাতায় সই-সাবুদ করে ফেরার পথে হঠাৎ বাগানের কাছে দেখা হয়ে গেল মিসেস টেগার্টের সঙ্গে। মিসেস টেগার্ট তখন ঘুরে ঘুরে তাঁর বাগানের ফুলের চারাগুলো পরীক্ষা করছিলেন।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে অনেক সময় খোদ সাহেবের চাইতে তার গৃহিণীকে বেশি সমীহ করতে চলতে হয়। সাহেবের মেজাজ বিগড়োলে যদি বা পার পাওয়া যায়, মেমসাহেবের মেজাজ বিগড়োলে আর রক্ষে নেই। নির্ঘাৎ পানিশমেণ্ট কিংবা ব্যাড পোস্টিং। সেই গল্পে আছে না, সাহেব ও মেমসাহেব পাশাপাশি বসে আছে। একজন নিম্নতম কর্মচারী এসে সাহেবকে একবার মাত্র সেলাম জানায়, আর মেমসাহেবকে দু'বার। সাহেব কারণ জিজ্ঞেস করতেই কর্মচারীটি হাত কচলে জবাব দেয়, আজ্ঞে স্যার, মেমসাহেবকে একটা সেলাম করেছি, আর একটা আগাম সেলাম করে রাখছি ওনার পেটের বাচ্চাকে। ভবিষ্যতে তিনিও তো আপনার মতই একজন সাহেব হবেন।

মিসেস টেগার্ট অবিশ্যি ওই ধরনের মহিলা নন। কে তাঁকে স্যালুট দিল না দিল তাতে তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

মিসেস টেগার্টের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সার্জেণ্ট ম্যালকম এ্যাটেনশন হয়ে তাঁকে স্যালুট করে। তিনিও সামনের দিকে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে প্রতি নমস্কার জানিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য একটু হেসে বাগানের অন্যদিকে চলে যান।

মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিতে দিতে সার্জেণ্ট ম্যালকম ভাবতে থাকে ওই মিসেস টেগার্টের কথা। আজ নিয়ে ঐ মহিলার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে তার। লক্ষ্য করেছে. প্রতিবারই মিসেস টেগার্ট ঠোঁটের কোণে একটু হাসি

ফুটিয়ে তাকে প্রতি-নমস্কার করেন। কিন্তু তাঁর ঐ হাসিটুকু বরাবরই কেমন যেন একটু ম্লান। মহিলাটির শান্ত সৌম্য মুখখানির ওপর ঐ ম্লান হাসিটুকু বেমানান বলেই মনে হয় সার্জেণ্ট ম্যালকমের। তবে কি মিসেস টেগার্ট তাঁর পারিবারিক জীবনে সুখী নয়? শহর কলকাতার দুর্ধর্ষ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে অসুখী হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

বেলা সাড়ে দশটা। ধড়াচুড়ো পরে চার্লস টেগার্ট রেডি। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর নিজস্ব বিলিতি মোটরগাড়ি। স্টিয়ারিংয়ের ওপর হাত রেখে স্থির হয়ে বসে আছে পুলিশ ড্রাইভার।

স্মিতমুখে সামনে এগিয়ে আসেন মিসেস টেগার্ট। চার্লস দু'পা এগিয়ে এসে নিত্যকার মত স্ত্রীর ঠোঁটে একবার চুমু খান। স্বামীর ঠোঁটের স্পর্শে চোখ জোড়া সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মিসেসের। পরক্ষণেই একটা বিষাদের ছায়া নামে তাঁর সারা মুখে। ওই মানুষটিকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

চার্লস টেগার্ট বিদায় জানান স্ত্রীকে। মিসেসও মৃদু কণ্ঠে তার জবাব দেন। পরক্ষণেই টেগার্ট দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসেন তাঁর গাড়ির কাছে। আর্দালী সেলাম জানিয়ে দরজা খুলে দিতেই যুবকের মত এক লাফে গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেন চার্লস। পুলিশ ড্রাইভার স্টার্ট দেয় গাড়িতে।

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায়। মিসেস টেগার্ট খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন সেই দিকে। পরক্ষণেই একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে চলে যান ভেতরে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হবে সেই বেলা দেড়টায় লাঞ্চ খাওয়ার সময়।

দুই নম্বর কিড্ স্ট্রীট থেকে লালবাজার। এই পথটুকু পার হতে দশ থেকে পনেরো মিনিটই যথেষ্ট। লালদীঘির উত্তরপাড়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সেই হিসেবই করছিল দুটি যুবক — দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেন। একটু দূরে ভিড়ের মধ্যে আরও কয়েকজন যুবক। সকলেই প্রস্তুত।

অফিস-টাইম তখন। ডালহৌসী এলাকায় পথচারী ও গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদীদের যম চার্লস টেগার্টের জন্যে অপেক্ষা করছিল বাংলার দামাল ছেলে দীনেশ ও অনুজা। টেগার্টের জীবনের আজ শেষ দিন। এতটুকু ভুল-চুক নয়। অব্যর্থ লক্ষ্য তাদের। সেই লক্ষ্যের বলি হবে কলকাতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। এত দিনের এত অত্যাচারের আজ শোধ তুলবে তারা। গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত থর-থর করে কেঁপে উঠবে আজ। খবর পেয়ে হয়তো কেঁপে উঠবে বাকিংহাম প্যালেসের সিংহাসনখানাও।

স্পষ্ট হিসেব, নিখুঁত প্রস্তুতি। প্রতিদিন ঠিক সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে এখানে আসে পুলিশ কমিশনারের বিলিতি গাড়িখানা। গাড়ির নম্বরটাও তাদের মুখস্থ। একদিন দুদিন নয়, দিনের পর দিন এখানে দাঁড়িয়ে তারা লক্ষ্য করেছে গাড়িখানা। গাড়িতে কোন গার্ড থাকে না। সামনের সীটে বসে গাড়ি চালায় পুলিশ ড্রাইভার, আর পেছনের সীটে ঠেস দিয়ে বসে থাকেন চার্লস টেগার্ট।

কিন্তু আজ একি হল? তাদের সমস্ত প্ল্যানটাই মাটি হয়ে যেতে বসেছে

নাকি? তারা যে আজ প্রস্তুত হয়েই এসেছে। প্রস্তুত কেবল চার্লস টেগার্টের জীবন নিতেই নয়, প্রয়োজনে নিজেদের জীবন দিতেও। কিন্তু আজ হল কি? গাড়ির দেখা নেই কেন? এদিকে যে সময় বয়ে যায়।

ঠিক পাশাপাশি নয়, পরস্পরের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দীনেশ ও অনুজা। দূরে অন্যরা। সকলের মুখেই ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার রেখা। কি হল আজ? এগারোটা বাজতে পাঁচ। এখনও দেখা নেই কেন টেগার্টের গাড়ির? তবে কি সে আজ আসবে না? না কি কোনরকম খবর পেয়ে লোকটি আজ অন্যদিক দিয়ে চলে গেছে লালবাজার? কিন্তু এমন তো হবার কথা নয়।

ভিড়ের মধ্যে অনুজার দিকে তাকায় দীনেশ। অনুজাও তাকায় তার দিকে। এতক্ষণে তাদের মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির চিহ্ন। একজনের প্রাণ নিতে না পারার আক্ষেপ। প্রয়োজনে নিজেদের প্রাণ দিতে না পারার বিরক্তি।

গাড়িতে বসে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন চার্লস টেগার্ট নিজেও। এসপ্লানেড থেকে ডালহৌসী ঢোকার মুখেই ট্রাফিক জ্যাম। একখানা ঘোড়ার গাড়ির একদিকের চাকা খুলে যেতেই একপাশে কাত হয়ে পড়েছে গাড়িটা। আর, তারই পরিণতিতে রাস্তার ওপর হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়েছে একটা ঘোড়া। ভয় পেয়ে অন্য ঘোড়াটাও আরম্ভ করছে পরিত্রাহি চিৎকার। গাড়ির আরোহী ভদ্রলোক একদল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে হুটোপুটি শুরু করে দিয়েছে। ফুটপাথ থেকে ছুটে গিয়ে কিছু পথচারী কাচ্চা-বাচ্চা সমেত ওই ভদ্রলোককে যতটা না সাহায্য করতে পারছে তার চাইতে বেশি করছে হাঁক-ডাক। আর গোটা ব্যাপারটা মিলে ট্রাফিক জ্যাম। বেচারী ট্রাফিক কনস্টেবল্ কেবল অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোজপুরী ভাষায় খিস্তি-খেউড় করছে।

ভ্রূ-যুগল কুঁচকে ওঠে চার্লস টেগার্টের। কনস্টেবলের আর দোষ কি? এমন একটা পরিস্থিতিতে ওই বেচারী একা আর কি করতে পারে? এখনই লালবাজার গিয়ে কিছু পুলিশ পাঠাতে হবে এখানে। টহলদারী সার্জেন্টরাই বা এইসময় কোথায়? কৈফিয়ৎ তলব করতে হবে তাদের। এরকম পরিস্থিতিতেই যদি তাদের দেখা পাওয়া না যায় তবে আর তাদের পেছনে মোটা টাকা খরচ করা কেন? আর কলকাতার ঘোড়ার গাড়িগুলোও হচ্ছে তেমনি। যেমন হাড়-জিরজিরে ঘোড়া, তেমনি মান্ধাতার আমলের গাড়ি। এগুলো রাস্তায় চলার লাইসেন্স কেমন করে পায় সেটাই আশ্চর্য। এরও একটা বিহিত করা প্রয়োজন।

বিহিত তো না হয় পরে করা যাবে, কিন্তু এখন তিনি লালবাজার যাবেন কেমন করে। নিজের হাতঘড়ির দিকে একবার তাকান চার্লস টেগার্ট। এগারোটা বাজতে দশ। আরও কতক্ষণ এখানে এমনিভাবে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে? অন্য কোন পথ ধরে যাওয়ারও তো আর সুযোগ নেই।

টেগার্টের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। অবশ্য সুপ্রসন্ন না বলে অপ্রসন্ন

বলাই ভালো। এখানে আরও কিছুক্ষণ আটকে থাকলে তাঁর দেরি দেখে দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেন দলবল নিয়ে হয়তো চলেই যেত। সেদিনকার মত ত্যাগ করতে হত তাদের পরিকল্পনা। কিন্তু তা আর হল না। সামনের প্রাইভেট কারের ড্রাইভার অনেক কসরৎ করে ভিড় কেটে বেরিয়ে যেতেই টেগার্টের গাড়িখানাও অনুসরণ করে তাকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশ কমিশনারের গাড়ির ওপর চোখ পড়তেই মুখখানা পাংশু হয়ে ওঠে ট্রাফিক কনস্টেবলটির। সর্বনাশ, পুলিশ কমিশনার স্বয়ং! আর বুঝি তার চাকরিটি থাকে না।

বাঘে-কুমীরে লড়াইয়ের আগের মুহূর্ত। জলের টানে ডাঙার বাঘ চলেছে জলের দিকে, আর ডাঙার টানে জলের কুমীর চলেছে ডাঙার দিকে। মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে তাদের। তারপর—

না, জলের টান নয়, ডাঙার টানও নয়। আসল টান হচ্ছে নিয়তির। সেই নিয়তির আমোঘ বিধানেই পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলছে তারা। চার্লস টেগার্ট এগিয়ে চলেছেন ডালহৌসীর দিকে, আর আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে পথচারীদের ভিড়ে মিশে সদলবলে এক-পা দু-পা করে এগিয়ে চলেছে দীনেশ ও অনুজা। আজ আর বোধহয় এল না সেই লোকটা। কপাল ওর ভালোই বলতে হবে। আরও কয়েক ঘণ্টা এই পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় বেঁচে থাকবার ছাড়পত্র পেয়ে গেল ওই চার্লস টেগার্ট।

কিন্তু ওকি? লালদীঘির পাড়ের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে কার গাড়ি? টেগার্টের গাড়িই তো বটে। মুহূর্তে শিকারী বেড়ালের মত সতর্ক হয়ে ওঠে দীনেশ মজুমদার। তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে তার চোখের দৃষ্টি। হ্যাঁ, কুখ্যাত কমিশনার চালর্স টেগার্টের বিলিতি মডেলের গাড়িখানাই এগিয়ে আসছে এদিকে।

অনুজার সঙ্গে আবার চোখে চোখে কথা হয় দীনেশের। পা চালিয়ে দীঘির উত্তর পাড়ের ফুটপাথে এসে পজিশন নেয় তারা। দলের অন্য সবাইও পজিশন নেয় নিজের নিজের জায়গায়। পকেটে হাত দিয়ে তারা অনুভব করে সেই ভয়ঙ্কর বস্তু—বোমা।

আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। না, কোনরকম ভুল-ভ্রান্তি নয়। উনিশ শ' আট সালের তিরিশে এপ্রিল মজঃফরপুরের ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের সামনে কুখ্যাত কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ভুল করে মিস ও মিসেস কেনেডিকে হত্যা করে যে ধরনের মনস্তাপে ভুগেছিল, আজ তার বাইশ বছর চার মাস পরে তেমন কোন ভুল করতে আর প্রস্তুত নয় দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেন। দূর থেকে গাড়ির ভেতর তারা স্পষ্ট দেখতে পেযেছে চার্লস টেগার্টকে। চিনতে এতটুকু ভুল হয়নি তাদের। সেদিন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ভুল করেছিল রাতের অন্ধকারে, আজ দীনেশ ও অনুজা ভুল করবে না দিনের আলোয়। লগ্ন আসন্ন।

ফুটপাথে পথচারীর ভিড়, রাস্তায় যানবাহনের। টেগার্টের গাড়িখানা আরও উত্তরে এসে পড়েছে। নিঃশঙ্ক চিত্তে গাড়ি চালাচ্ছে পুলিশ ড্রাইভার। ভেতরে একপাশে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছেন চার্লস টেগার্ট।

সেই মুহূর্তে কি চিন্তা করছিলেন টেগার্ট? লালবাজারের পুলিশ দপ্তরের

কথা—দুই নম্বর কিড স্ট্রীটের বাড়িতে মিসেস টেগার্টের কথা—না কি, নিজের জীবন-কথা ?

ততক্ষণে নিজের পকেট থেকে সেই ভয়ংকর বস্তুটি উঠে এসেছে দীনেশের হাতে। চোখের তারায় জ্বলছে তার প্রতিশোধের আগুন। প্রস্তুত অনুজাও।

হঠাৎ ডালহৌসী পাড়াকে আলোড়িত করে জেগে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছে দীনেশ মজুমদার। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিস্ফোরণের শব্দ। কিন্তু এ শব্দটা ফুটপাথের ওপরেই, টেগার্টের গাড়ির দিকে নয়।

উড়ন্ত পাখীকে তীর ছোঁড়ার মত শক্ত না হলেও চলন্ত গাড়ির আরোহীকে বোমা মেরে ঘায়েল করাও খুব একটা সহজ কাজ নয়। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। হলও ঠিক তাই। দীনেশের বোমা এসে লাগল গাড়ির বনেটের ওপর ড্রাইভারের কাছে। আহত হল পুলিশ ড্রাইভার। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরে গিয়ে ধাক্কা মারল ফুটপাথে।

দীনেশের সঙ্গে সঙ্গে অনুজাও যদি ঠিক মত বোমা ছুঁড়তে পারত তাহলেও হয়তো কার্যসিদ্ধি হত তাদের। কিন্তু হায়, বিধি বাম। মিসেস টেগার্টের বিলিতি নোয়া-সিঁদুরে জোর প্রচণ্ড। সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে গেলেন চার্লস টেগার্ট! বোমা ছোঁড়ার সুযোগ আর পেলই না অনুজা। তার আগেই সেই ভয়ঙ্কর বোমা ফাটলো তার নিজেরই হাতে।

বোমার শব্দে আতঙ্কিত পথচারীরা ছুটছে এদিক-ওদিক। দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তার যানবাহন। রাইটার্স বিল্ডিংসের বারন্দায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে কর্মচারীরা। মাথায় পসরার ঝাঁকা নিয়ে পালাচ্ছে ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা। চারিদিকে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বোমা ছুঁড়েই ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল দীনেশ মজুমদার। দলের অন্যরাও তখন গা-ঢাকা দিয়েছে। ফলাফল দেখার আর সুযোগ ছিল না তাদের। এমন কি অনুজার দিকে তাকাবারও সময় ছিল না। তেমন কিছু করতে গেলে ধরা পড়তে হত তাদের। ধরা পড়ো না, মুক্ত থাকো। মুক্ত থেকে দিনের পর দিন বিলিতি অত্যাচারী মানুষগুলোর জীবন দুর্বিসহ করে তোল—এই হচ্ছে বিপ্লবীদের কর্মপ্রণালী।

ধরা পড়েছিল দীনেশ মজুমদার। অন্যরা পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু অনুজা সেন ? সে তখন কোথায় ? সে-ও কি পালাতে চেয়েছিল ?

হ্যাঁ, চেয়েছিল। কিন্তু পালাবার সামর্থ্য তার তখন কোথায় ? বোমার টুকরোয় তার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত। সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। অবসন্ন হয়ে আসছে দেহটা। ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে তার। ইচ্ছে করছে এখনই ফুটপাথের ওপর লুটিয়ে পড়তে।

কিন্তু লুটিয়ে পড়লে তো চলবে না এই সময়! বাঁচতে চেষ্টা করতে হবে। সেই চেষ্টা বিফল হলেও কোন দুঃখ নেই। প্রয়োজনে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিতে তো প্রস্তুত হয়েই সে এসেছিল। তবে দুঃখ তার অন্য কারণে। এমন নিরামিষ

মৃত্যু সে কল্পনাও করতে পারে নি। অন্তত টেগার্টের দিকে হাতের বোমাটা ছুঁড়তে পারলেও মনটাকে খানিকটা সান্ত্বনা দিতে পারত। কিন্তু তার একান্তই দুর্ভাগ্য, তাও হল না।

ফুটপাথ প্রায় ফাঁকা। সেই ফাঁকা ফুটপাথে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে অনুজা সেন। সামনেই রেলিং-ঘেরা লালদীঘি। চলবার আর ক্ষমতা নেই তার। এমনকি দাঁড়িয়ে থাকারও নয়। এখনই সে টলে পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে রেলিংটা ধরে ফেলে অনুজা। তারপর রেলিংয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা নিচু করে স্থির হয়ে থাকে। যন্ত্রণা—সারা দেহে তখন অসহ্য যন্ত্রণা তার।

না, এবার আর কোন যন্ত্রণা নেই। অনুভব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে অনুজা সেন। চোখের ওপর নেমে আসছে একটা গাঢ় অন্ধকারের পর্দা। এই পর্দার ওপারেই যেন স্বাধীনতার হাতছানি। পরাধীনতার গ্লানি আর অনুভব করতে হবে না তাকে। সে স্বাধীন—সে মুক্ত।

গাড়ি এসে ধাক্কা মারল ফুটপাথে। যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে সামনের সীটের ওপর লুটিয়ে পড়ল পুলিশ ড্রাইভার। ব্যাপারটা বুঝে নিতে কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র সময় লাগল চার্লস টেগার্টের। পরক্ষণেই এক ঝটকায় গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লেন তিনি। হাতে তাঁর উদ্যত রিভলবার, আঙুল ট্রিগারের ওপর।

কিন্তু কোথায় সেই আততায়ী? ফুটপাথ ধরে ছুটে চলা ঐ পথচারীদের মধ্যে আসল অপরাধী কে? কার দিকে তাক করে তিনি গুলি ছুড়বেন? কাকে মারতে গিয়ে কাকে মেরে বসবেন তিনি?

সহসা দীঘির রেলিংয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা অনুজা সেনের দিকে নজর পড়তেই রাস্তা পার হয়ে যুবকের মত দৌড়ে চলে এলেন চার্লস টেগার্ট। হ্যাঁ, দলের একটাকে পাওয়া গেছে এতক্ষণে।

অনুজার দিকে রিভলবার তুলে ধরে চাপা গম্ভীর কন্ঠে বলে ওঠেন টেগার্ট, হ্যাণ্ডস্ আপ।

কিন্তু কে হাত তুলবে? সেই মুহূর্তে পুলিশ কমিশনারের আদেশ মান্য করতে বয়েই গেছে অনুজার। সে তখন ওপারের স্বপ্নে বিভোর।

—হ্যাণ্ডস্ আপ! এবার একটু জোরেই বলে ওঠেন চার্লস টেগার্ট।

সেই আদেশের জবাবে এতক্ষণে অনুজা সেনের ঠোঁটের কোণে জেগে ওঠে এক টুকরো হাসি। পরক্ষণেই সে বিড় বিড় করে বলে ওঠে. বন্দেমাতরম্!

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে অনুজা সেনের রক্তাক্ত দেহটার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে হতাশ ভঙ্গিতে হাতের রিভলবার নামিয়ে নেন চার্লস টেগার্ট। হয়তো মনে মনে বলেন—ইট্ ইজ নো গুড টু কিল এ ডাইং ম্যান।

রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে থেকে লালবাজার। ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্টোনস্ থ্রো' ডিসট্যান্স। এই দূরত্বটুকু পার হতেই আসল খবরের ওপর অতিরঞ্জনের ছাপ পড়ে। মুখে মুখে রটে যায় খবরটা—পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট নিহত হয়েছেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে!

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম লালবাজারের চত্বরে সবে মোটরসাইকেল থেকে নেমেছে, হঠাৎ একজন কনস্টেবল ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয়, ডাকুলোগ্‌ কমিশনার সাবকো খতম্‌ কর দিয়া !

সি. পি-র লালবাজারের আসার সময় হয়েছিল। গেটের প্রহরী কনস্টেবল থেকে শুরু করে দোতলায় ডেপুটি কমিশনারেরা পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। যে-সে সি. পি. নয়, খোদ চার্লস টেগার্টের মত সি. পি.—একটু এদিক-ওদিক হলে তিনি ডেপুটি কমিশনারকেও বিলাতি সাহেব বলে রেহাই দেবেন না। রিপোর্ট চলে যাবে সোজা গভর্ণমেণ্টের কাছে। তারপরই শহর কলকাতা থেকে সেই বিলিতি সাহেবকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ হয়ে বদলী হতে হবে পূর্ববঙ্গের কোন জল-কাদা ঘেরা জেলায়।

কনস্টেবলটির মুখে টেগার্টের নিহত হবার খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। একটু আগে পর-পর দুটো বিস্ফোরণের শব্দের কারণ এতক্ষণে সে বুঝতে পারে।

—কাঁহা, ডালহৌসীমে ? ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করে কনস্টেবলটিকে।

—জী, হাঁ। রাইটার্সকা নজদিগমে। জবাব দেয় কনস্টেবল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার গর্জে ওঠে ম্যাল্‌কমের মোটরসাইকেল, তীরবেগে সে বেরিয়ে যায় লালবাজারের গেট দিয়ে।

ততক্ষণে লালবাজারে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে সেই ভয়ঙ্কর খবর—ডাকুলোগ কমিশনার সাবকো খতম কর দিয়া—সি. পি. ইজ কিল্ড বাই দি টেররিস্টস—সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করেছে চার্লস টেগার্টকে।

লালবাজারে দোতলা ও তেতলার সিঁড়িতে খটখট বুটের শব্দ। নিচে নেমে আসছে ছোট-বড় অফিসারেরা ছুটে আসছে ডিউটিরত সার্জেণ্ট ও কনস্টেবলেরা।

চোখের পলকে এক প্ল্যাটুন আর্মড্‌ ফোর্সের কনস্টেবল বন্দুক হাতে ছুটল রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে। রিভলবার উঁচিয়ে ছুটল অফিসারেরা। বিদ্যুৎ-গতিতে বেরিয়ে গেল দু'তিনখানা কালো রঙের পুলিশ-ভ্যান। সকলের চোখেই আতঙ্ক, সকলের মুখেই চাপা উত্তেজনা—এত সাহস ঐ সন্ত্রাসবাদী ছোকরাদের ! খোদ চার্লস টেগার্টকে হত্যা করল তারা !

পুলিশের ছোটাছুটি দেখে লালবাজার অঞ্চলের দোকানদারেরা ঝপাঝপ বন্ধ করল তাদের দোকানের ঝাঁপ। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তাড়াতাড়ি পা চালাল পথচারীরা। বলা তো যায় না, গুলি চলতে কতক্ষণ ? আরে বাবা, পুলিশ কমিশনার হত্যা ! পুলিশ কি এবার ছেড়ে কথা কইবে পাবলিককে ? যত্তসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ! ছোকরাগুলো ব্রিটিশ তাড়াবার নামে এখানে-ওখানে ফুটফাট করবে, আর মরতে মরণ জনসাধারণের।

গোটা ডালহৌসী পাড়া তখন পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। সাদা-কালো মিলিয়ে শত শত পুলিশ উপস্থিত সেখানে। গোটা এলাকাটাকে করডনিং করা হয়েছে। দলের অন্যান্যরা ততক্ষণে সরে পড়েছে। কেবল পালাতে পারেনি

দীনেশ মজুমদার। ধরা পড়েছে সে পুলিশের হাতে। আর অনুজা সেনের রক্তাক্ত অচৈতন্য দেহটা তখনও হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে লালদীঘির ঘেরা রেলিংয়ের ওপর।

যাক্, বাঁচা গেল। খবরটা তাহলে সত্যি নয়। চার্লস টেগার্ট নিহত হননি। এমনকি তাঁর গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। সবটাই গুজব। আহত হয়েছে মাত্র ড্রাইভার কনস্টেবলটি।

সার্জেণ্ট ম্যাল্কম যখন মোটরসাইকেল থেকে লাফিয়ে নেমে সি. পি.-র সামনে এসে দাঁড়াল তার আগেই রাইটার্স বিল্ডিংসের সিকিউরিটি গার্ডের সার্জেণ্ট ও কনস্টেবলেরা এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

সি. পি-কে অক্ষতদেহে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল ম্যাল্কমের। তার মন হল, এই মুহূর্তে ভদ্রতার খাতিরে সি পি-কে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু ব্যাপারটা খোশামোদের পর্যায়ে পড়বে কিনা তাই ঠিক করতে না পেরে সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ তার নজর পড়ে অনুজার রক্তাক্ত দেহটার দিকে। মনে মনে একটু চমকে উঠে সার্জেণ্ট ম্যাল্কম সেইদিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে জেগে ওঠে টেগার্টের কণ্ঠস্বর, স্টপ্ সার্জেণ্ট। জাস্ট এ্যারেঞ্জ ফর এ ভেহিকেল্। ওকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। সেই সঙ্গে আমার ড্রাইভারকেও হাসপাতালে পাঠাও।

ততক্ষণে লালবাজার থেকে পুলিশ ফোর্স ও অফিসারেরা এসে হাজির হয়েছে। চার্লস টেগার্ট পর্যায়ক্রমে তাদের সকলের মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদু অথচ গম্ভীর সুরে বলে ওঠেন, লালবাজারকে অরক্ষিত রেখে আপনারা সবাই যে দেখছি এসে পড়েছেন। ইচ্ছে করলে টেররিস্টরা বোধহয় বাড়িটাকে এবার উড়িয়ে দিতে পারে, কি বলেন?

অফিসারদের কারুর মুখে কোন কথা নেই। সত্যি, এমনিভাবে একযোগে সকলের চলে আসাটা ঠিক হয় নি।

টেগার্ট এবার ডি সি, ডি ডি-র দিকে তাকিয়ে বললেন, অন্তত টেলিফোন ধরার জন্যে কাউকে রেখে এসেছেন তো?

কোন জবাব না দিয়ে সাহেব ডি. সি কেবল মাথা নিচু করে থাকে। স্পষ্টবক্তা চার্লস টেগার্ট যে এই সময় এখানে দাঁড়িয়েও এমন মিষ্টিসুরে তাদের ডিউটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন তা সে ধারণা করতে পারে নি।

এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। এল পুলিশ-ভ্যান। সার্জেণ্ট ম্যালকম ও আরও কয়েকজন সার্জেণ্ট ও কনস্টেবল মিলে ধরাধরি করে ভ্যানে তুলল অনুজার দেহটা। সেই সঙ্গে আহত ড্রাইভার কনস্টেবলকেও তোলা হল গাড়িতে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মহূর্তে অনুজার চাপা ঠোঁটজোড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন জ্ঞান হারাবার পূর্বমুহূর্তেও সে উচ্চারণ করেছিল শেষ অক্ষরটিতে হসন্ত দেওয়া সেই প্রিয় শব্দটি—বন্দেমাতরম্!

পুলিশ-ভ্যান চলে গেল মেডিকেল কলেজের দিকে। সঙ্গে গেল সার্জেণ্ট ম্যাল্কম। গাড়ির ভেতর বসে ম্যাল্কম বারে বারে অনুজার রক্তাক্ত দেহটার

দিকেই তাকাচ্ছিল। কি বলে একে— দেশপ্রেম না পাগলামী? এখানে ওখানে বোমা ছুঁড়ে ওরা ব্রিটিশ-সিংহকে কাবু করবে বলে মনে করেছে নাকি? তা কি সম্ভব? কিন্তু সম্ভব হোক কিংবা না হোক, ওরা তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। আর বিশ্বাস করে বলেই ওরা দেশের নামে এমন অবহেলায় জীবন বিসর্জন দিতে পারে।

না, এই মুহূর্তে ম্যালকম এতটুকু বিদ্বেষ অনুভব করছে না ওই ছেলেটার ওপর। কিন্তু সে অনুভব করছে না বলে যে আর কেউ অনুভব করত না এমন নয়। অন্য কেউ হলে হয়তো এমন একটা পরিস্থিতিতে গাড়ির মধ্যেই ওই অচৈতন্য দেহটায় বুটের ঠোক্কর দিত। আর তা জানত বলেই ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে সি. পি. চার্লস টেগার্ট অনুজার দিকে তাকিয়ে ম্যাল্‌কমকে বলেছিলেন, লেট হিম ডাই ইন পীস - ওকে শান্তিতে মরতে দিও।

আশ্চর্য চরিত্র ওই চার্লস টেগার্টের। যে টেগার্ট সেদিন অনুজা সেনের বেলায় বলেছিলেন, লেট হিম ডাই ইন পীস, সেই টেগার্টই কিন্তু মাত্র তিনটি মাস পরেই রাইটার্স বিল্ডিংসের করিডোরে দাঁড়িয়ে একজন বীরের অচৈতন্য দেহে জুতোর চাপ দিয়ে তার হাতের আঙুল থেঁতলে দিয়েছিলেন অনায়াসে। সেদিন বোধহয় তিনি তাঁর বিবেক বলে বস্তুটিকে পকেটে পুরে রেখেছিলেন বলেই অমন একটা ঘৃণ্য কাপুরুষোচিত কাজ করতে পেরেছিলেন।

অনুজার ভাগ্য ভালো। বেঁচে উঠে বিচারের নামে একটা লোক-দেখানো প্রহসনের মধ্য দিয়ে তাকে ব্রিটিশ সরকারের ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয় নি। এমনকি মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষকেও বিব্রত করতে হয় নি। হাসপাতালে পৌঁছে সার্জেন্ট ম্যাল্‌কমের তত্ত্বাবধানে তার দেহটাকে যখন নামানো হল তার কয়েক মিনিট আগেই গাড়ির মধ্যে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিল অমর শহীদ অনুজা সেন।

ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে পায়ে হেঁটে সোজা লালবাজার চলে এলেন চার্লস টেগার্ট। সঙ্গে অন্য অফিসারেরা। ডালহৌসীতে তখন চলছে পথচারী-নিগ্রহ। যুবক মাত্রকেই চেপে ধরা হচ্ছে। ভালোমত সার্চ করা হচ্ছে তাদের। দু'একজন অতি-উৎসাহী অফিসার আবার সন্দেহ ভাজন যুবকদের হাতের গন্ধ শুঁকে পরীক্ষা করে দেখছে কোন বারুদের গন্ধ আছে কিনা। ভাগ্যিস, সেকালে 'ডার্মাল-নাইট্রেট' পরীক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। তাহলে হয়তো ঐ সন্দেহভাজন প্রত্যেককেই সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হত।

টেগার্ট লালবাজারে ঢুকতেই সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে। না, আজ আর কোন ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব নয়। কৌতূহল। মরা মানুষটা এখনও বেঁচে আছে খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল সবাই। এমনকি উত্তর-দিকের বাড়িটার ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্টদের কোয়ার্টারের বারান্দায় মেয়েরাও এসে দাঁড়িয়েছিল।

চার্লস টেগার্ট দোতলায় উঠে গিয়ে নিজের ঘরে বসতেই একটার পর একটা টেলিফোন আসতে থাকে। চিফ সেক্রেটারী, হোম সেক্রেটারী থেকে শুরু করে গভর্ণরের এডিকং পর্যন্ত কুশলবার্তা নিয়ে তাঁর এই 'মিরাকুলাস এস্‌কেপের

জন্যে অভিনন্দন জানায় তাঁকে।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবতে থাকেন চার্লস টেগার্ট—দুই নম্বর কিড্ স্ট্রীটে কি এখনও খবরটা পোঁছয় নি? তিনি কি নিজে যেচে খবরটা দেবেন তাঁর স্ত্রীকে?

ভাবতে ভাবতেই এসে গেল সেই টেলিফোন। অন্যপ্রান্ত থেকে ভেসে আসে মিসেস টেগার্টের কম্পিত কণ্ঠস্বর—হাউ আর ইউ, মাই ডিয়ার?
এপাশ থেকে জবাব দেন চার্লস টেগার্ট, আই এ্যাম কোয়াইট ওয়েল, অল-রাইট মাই ডার্লিং। ডোণ্ট ওরি।

## ॥ চার ॥

অনেকদিন পরে লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। গোটা কলকাতা চষে বেড়ালেও ইচ্ছে করেই সে এই রাস্তাটা এড়িয়ে চলে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাই সে কাটিয়েছে এই পুলিশ হেড-কোয়ার্টারের চৌহদ্দীর মধ্যে। যৌবনের মধুর দিনগুলি সে এখানেই অতি-বাহিত করেছে। এই বাড়িটির প্রতিটি ইট-কাঠের টুকরোর সঙ্গেই সে পরিচিত। তাই, প্রতিটি মুহূর্তেই তাকে আকর্ষণ করে এই বাড়িটি। কিন্তু এখানে এলেই তার মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। অতীতের মধুর স্মৃতিকে আড়াল করে এসে দাঁড়াতে চায় তার জীবনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কাহিনীগুলি যার কথা মনে পড়লেই তার ঘোলাটে চোখ দুটো আজও ছল ছল করে ওঠে। তাই তো সে আজকাল এড়িয়ে চলতে চায় লালবাজারকে।

কিন্তু এড়াতে চাইলেই সব সময় এড়ানো চলে না। কাছাকাছি এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন হয়তো হঠাৎ একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম! সেদিন আর ভাবনা-চিন্তা করতে ইচ্ছে করে না, ভালো লাগে না বিচার-বিবেচনা করতে। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত নিজের অজ্ঞাতসারেই পায়ে পায়ে এসে হাজির হয় এখানে।

আজও তেমনি অনেকটা নিজের অজান্তেই এখানে এসে হাজির হয়েছিল বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। উল্টোদিকের বাস স্টপে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে পুলিশ হেড-কোয়ার্টারের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে ঘোলাটে চোখ মেলে। লোকজন যাতায়াত করছে গেট দিয়ে। মাথায় ট্রাফিক পুলিশের সাদা হেল্‌মেট আর হাতে লাল কাপড়ের ওপর পেতলের 'আর. পি,' অর্থাৎ রিজার্ভ পুলিশের তকমা এঁটে ডিউটি করছে কনস্টেবলেরা।

ওদের মত বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমেরও একবার ইচ্ছে করে ভেতরে ঢুকতে। ইচ্ছে হয় ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখতে। সি. পি-র ঘরখানা কি তেমনিই আছে? ডি. সি ও এ. সি.-রা কি এখনও দোতলায় সেই সাবেক কালের মতই বসে? একতলার অফিস ঘরগুলোও কি তেমনিই আছে? এই দীর্ঘ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরেও কি কোন পরিবর্তন হয় নি এই বাড়িটার? উত্তর দিকের বাড়িটায় কি এখনও সার্জেণ্ট ও ইন্সপেক্টরেরা সপরিবারে বাস করে? একতলায় কি

সেই 'বার'টা এখনও আছে ?

না, ভেতরে ঢুকবে না বৃদ্ধ ম্যাল্কম। ঢুকতে গেলেই হয়তো জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হবে তাকে। কে আপনি—কি জন্যে এসেছেন—কার সঙ্গে দেখা করতে চান প্রভৃতি হরেক রকম প্রশ্নের জবাব দিতে হবে হয়তো। তার চাইতে ভেতরে না ঢোকাই ভালো। এককালে গট্ গট্ করে ভেতরে ঢোকার মুখে যারা এ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাকে স্যালুট করত, আজ তেমন একদল লোকের কাছে তাকে কৈফিয়ত দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। হয়তো তারা আজ তার কথা বিশ্বাস করতেই চাইবে না। তার চাইতে এই ভালো। কাছের চাইতে দূর ভালো। দূরের চাইতে চোখের আড়াল হওয়া আরও ভালো। কিন্তু সে চোখের আড়াল হতে পারছে কৈ? যত দিন সে এই মায়াবিনী শহরটার মায়ার বাঁধন কেটে অন্য কোথাও চলে যেতে না পারছে ততদিন তাকে ইচ্ছে না থাকলেও ঘুরে ঘুরে আসতেই হবে এখানে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ ম্যাল্কম। বিরাট বাড়িটার বাইরের চেহারা একরকমই আছে। এতটুকু বদলায়নি। ভেতরের চরিত্র কতটুকু বদলেছে তার খবর সে অবশ্যি রাখে না। বাড়িটার মাথার ওপর উড়ছে তেরঙ্গা পতাকা। এককালে ওখানে উড়তো ইউনিয়ন জ্যাক।

বৃদ্ধ ম্যাল্কমকে হাঁ করে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাসযাত্রী ও পথচারীদের মধ্যে কেউ কেউ কৌতূহলী চোখে তাকায় তার দিকে। কিন্তু ম্যাল্কমের কোনদিকে খেয়াল নেই। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বাড়িটার দিকে।

বাসস্টপে বাসের জন্যে প্রতীক্ষারত ভিড়ের মধ্যে দুটি তরুণের কথোপকথন সহসা কানে আসে ম্যাল্কমের। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা বল্ তো, লালবাজারের পুলিশ দফতরের এই বাড়িটার নম্বর কত ?

যেন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন শুনছে এমনি ভঙ্গিতে অপর তরুণটি জবাব দেয়, দূর বোকা, লালবাজারের এই পুলিশ দপ্তরের আবার নম্বর আছে নাকি ?

প্রতিবাদের সুরে প্রশ্নকর্তা বলে ওঠে, সে কি, এই লালবাজার স্ট্রীটের প্রতিটি বাড়িরই যখন একটা করে নম্বর আছে তখন পুলিশ দপ্তর বলে কি এর কোন নম্বর থাকবে না ?

—তা, জানি না। কখনও কারুর মুখে এই বাড়িটার কোন নম্বরের কথা শুনি নি। লালবাজার স্ট্রীটের ওপর যত বাড়ি-ঘরই থাক না কেন, 'লালবাজার' বলতে বোঝায় একমাত্র এই পুলিশ দপ্তরকেই।

—তা বোঝাক, কিন্তু এর একটা নম্বর নিশ্চয়ই আছে।

—থাকতে পারে। তবে প্রয়োজন হয় না বলে অনেকেই তা জানে না। যেমন নাকি রাজভবনের নম্বর নিয়ে কেউ কখনও মাথা ঘামায় না। শুধু রাজভবন কেন, সেক্রেটারীয়েট, জি. পি ও প্রভৃতি কলকাতার অনেক বাড়ির নম্বর অনেকেই জানে না, কারণ দরকার হয় না। আচ্ছা, তুই জানিস এই বাড়িটার নম্বর ?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ছেলেটি জবাব দেয়, জানি। সতের নম্বর

লালবাজার স্ট্রীট।

ম্যাল্‌কম আর চুপ করে থাকতে পারে না। এই বয়সে ভুলকে শুদ্ধ করে দেবার স্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক। তাই একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে অযাচিতভাবে সে স্পষ্ট বাংলায় বলে ওঠে, না, ভুল হলো। সতের নয়, আঠারো—আঠারো নম্বর লালবাজার স্ট্রীট।

হ্যাঁ, আঠারো নম্বরই বটে। সেকালের অনেকগুলো নম্বরওয়ালা বাড়ির সমষ্টি এই বর্তমান আঠারো নম্বর লালবাজার স্ট্রীট।

একালে লালবাজার আর লাল নয়, লালদীঘির জলও লাল নয় মোটেই। কিন্তু এককালে এই অঞ্চলটা সত্যি সত্যি লালে লাল হয়ে উঠত। সেদিন লালের প্রস্রবণ বইত এই এলাকায়। গাঢ় লাল হয়ে উঠত লালদীঘির স্ফটিক স্বচ্ছ জল।

সেকালে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি গ্রামই ছিল সাবর্ণ গোত্রীয় গাঙ্গুলী বংশীয় প্রাচীন জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারির মধ্যে। একালের লালদীঘির পশ্চিম পাড়েই ছিল সাবর্ণ চৌধুরীদের বিখ্যাত কাছারিবাড়ি। ইটের গাঁথুনির পাকা বাড়ি। অনেকগুলো মহল ছিল তাতে। বাহিরমহলে ছিল ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর। এখানে বসেই জমিদারের কর্মচারীরা দপ্তরের লেখাপড়ার কাজ করত। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল এখানে! অন্যান্য মহলের কোনটা ছিল পাইক বরকন্দাজদের জন্যে নির্দিষ্ট, কোনটা বা পাল্কি-বেহারাদের জন্যে। অন্দরে একখানি সুসজ্জিত ঘর নির্দিষ্ট ছিল খোদ জমিদারের নিজের ব্যবহারের জন্যে। কোন কাজ উপলক্ষ্যে সুদূর বড়িষা থেকে পাল্কিতে চেপে তিনি আসতেন এখানে। প্রয়োজনে রাত কাটাতে হলে তিনি এই ঘরেই থাকতেন। লোকজন, চাকর-বাকর নিয়ে বড়িষার চৌধুরীদের এই কাছারিবাড়ি সর্বদাই গম্‌গম্‌ করতো সেকালে।

জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের তত্ত্বাবধানে সেকালে এই অঞ্চলে একটি বাজার বসতো। সাময়িক বাজার। ফাল্গুন মাসে শীতের শেষে 'দোল' উৎসবের নির্দিষ্ট দিনটি যতই এগিয়ে আসত, ততই জমজমাট হয়ে উঠত এই বাজার। এখানে কিন্তু চাল-ডাল, তেল-নুন বিক্রি হতো না। বিক্রি হত কেবল আবির-কুমকুম প্রভৃতি দোল উৎসবের বিভিন্ন উপকরণ। দূর দূর গ্রাম থেকে ব্যাপারীরা এসে আবির-কুমকুমের সওদা করে নিয়ে যেত এখান থেকে।

দোল উৎসব উপলক্ষ্যে জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীরা দুহাতে পয়সা খরচ করতেন। বস্তা বস্তা আবির, ঘটি ঘটি কুমকুম ছড়িয়ে দেওয়া হতো রাস্তায় ও দীঘির পাড়ে। উৎসবের দিন সেই আবির-কুমকুমে মাখামাখি হত শত শত মানুষ। হিন্দুদের এই দোল উৎসবের ঘটা দেখে সেকালে ফিরিঙ্গী বণিকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। মনে মনে হিসেব কষতো—কি সম্পদশালী এই দেশটা! সামান্য একটা উৎসবে কি পরিমাণ পয়সা খরচ করে এরা!

উৎসব শেষে স্নানের পালা। শত শত মানুষ এসে নামত এই দীঘির জলে। তাদের হুটোপুটি ও দাপাদাপির শব্দে এই অঞ্চলের আকাশ-বাতাস অনেক রাত অবধি মুখরিত হয়ে থাকত। লাল হয়ে উঠত কাকচক্ষুর মত দীঘির পরিষ্কার

জল। সেই থেকে আবির কুমকুমের এই বাজার হল লালবাজার, আর দীঘিটি হল লালদীঘি।

সেকালের সেই সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারি আজ আর নেই, কিন্তু লালবাজার ও লালদীঘি আছে। তিনটি শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রাম—সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার একক অস্তিত্ব আজ আর না থাকলেও আছে মহানগরী কলিকাতা। এককালে এই রাজরাজেশ্বরী ঐশ্বর্যময়ী কলিকাতাই হয়ে উঠেছিল গোটা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। সেদিন ইংরেজ বণিকেরা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে তুলেছিল এই মহানগরীকে।

ষোল শ' নব্বই সালের আগস্ট মাসের এক রবিবার জব চার্নকের নেতৃত্বে ইংরেজ বণিকেরা খুব ঘটা করে ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম করে এসে বেশ জাঁকিয়ে বসল এই অঞ্চলে। তখনও তাদের হাতে কেবল বণিকের মানদণ্ড। রাজদণ্ডের কথা তখন তাদের মাথায় থাকলেও মুখে তা কখনই উচ্চারণ করত না দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের ভয়ে। ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে করতে তারা ওৎ পেতে বসে রইল সুযোগের অপেক্ষায়।

অবশেষে সেই সুযোগ এল মাত্র ছ'টি বছর পরেই। মেদিনীপুরের দুর্ধর্ষ জমিদার শোভা সিংহ একটির পর একটি ভূখণ্ড দখল করে বাড়িয়ে তুললেন নিজের জমিদারি। অবশেষে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করে এগিয়ে এলেন হুগলি পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, হুগলি নদীর দুই পাড়ে ঘাঁটি বসিয়ে জোর করে আদায় করতে শুরু করলেন নৌ-বাণিজ্যের শুল্ক।

এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের দরবারে গিয়ে আর্জি নিয়ে হাজির হল ইংরেজ দূত—বাংলা দেশে শোভা সিংহের অত্যাচারে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। বিপন্ন হয়ে পড়েছে আমাদের কুঠিগুলো। নিজেদের ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্যে আমাদের দুর্গ তৈরি করার অনুমতি দিন।

দুটি বছর অনেক কাকুতি-মিনতির পরে মিলল সেই অনুমতি। ঢাকার নবাবী মসনদে তখন ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশশান। ইংরেজ দূত ছুটল দিল্লী থেকে ঢাকায়।

নবাব আজিমুশশান জিজ্ঞেস করেন ইংরেজ দূতকে, কোথায় দুর্গ তৈরি করতে চান আপনারা?

আভূমি নত হয়ে নবাবকে অভিবাদন করে জবাব দেয় ইংরেজ দূত, কলিকাতা অঞ্চলে।

নবাব আবার প্রশ্ন করেন, কিন্তু ঐ অঞ্চলটা তো বড়িষার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারির মধ্যে। তাঁরা ওখানে আপনাদের দুর্গ তৈরি করতে দেবেন কেন?

একটু হেসে জবাব দেয় ইংরেজ দূত, সম্রাটের অনুমতি আমরা পেয়েছি। এবার বাংলার নবাবের অনুমতি পেলেই আমাদের আর কোন বাধা থাকবে না।

মাথা নেড়ে জবাব দেন আজিমুশশান, তা হয় না। আমার অনুমতি পেলেই আপনারা অন্যের জমিদারিতে দুর্গ তৈরি করতে পারেন না। এজন্যে সেই জমিদারের নিজস্ব অনুমতি চাই। পারবেন আপনারা সাবর্ণ চৌধুরীদের

রাজি করাতে ?

একটু সময় চিন্তা করে জবাব দেয় ইংরেজ দূত, নবাব অনুমতি দিলে জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের রাজি করাতে মোটেই বেগ পেতে হবে না আমাদের। বলেই সেই ইংরেজ দূত চোখের ইঙ্গিত করতেই ইংরেজ বণিকেরা সারিবন্ধ হয়ে দরবারে ঢুকে নবাবের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে নানারকম দিশী-বিলিতি মূল্যবান উপঢৌকন, আর সেই সঙ্গে নবাবকে ভেট দেওয়া হয় নগদ ষোল হাজার টাকা।

নবাব আজিমুশশান তো খুব খুশি। দুর্গ তৈরি করতে অনুমতি দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে একথাও বলে দিলেন যে, সাবর্ণ চৌধুরীদের রাজি করাবার ভার প্রধানত ইংরেজদের ওপর থাকলেও তিনি নিজেও তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করবেন।

শুরু হল টানা-পোড়েন। চৌধুরী বংশের বিদ্যাধর রায়চৌধুরী ছিলেন তখন সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি গ্রামের মালিক। তিনি কিছুতেই ইংরেজদের নিজের জমিদারিতে দুর্গ তৈরি করতে দেবেন না। আর ইংরেজরাও নাছোড়বান্দা। অবশেষে ইংরেজরা ওই তিনখানি গ্রাম কিনে নিতে চাইল নগদ দামে। বিদ্যাধর রায়চৌধুরী প্রথমটায় এতেও রাজি ছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন এর পেছনে সায় রয়েছে খোদ নবাবের তখন রাজি হলেন। অনেক দর-কষাকষির পরে মাত্র তেরশ' টাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিনে নিল এই গ্রাম তিনখানি, যার সম্মিলিত রূপ হচ্ছে আজকের এই মহানগরী কলকাতা। আর সেই দুর্গ-ই ছিল পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম, যার অস্তিত্ব আজ আর নেই।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের কথা। কলকাতার জমিদার তখন হলওয়েল সাহেব। তাঁর টাউন গার্ড অর্থাৎ শহরের রক্ষীবাহিনী তখনও আজকের লালবাজারের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে নি। লালদীঘির পাড়ে সেই সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারি বাড়িটাই তিনি ব্যবহার করতেন নিজের দপ্তরখানা হিসেবে। নগর কোটাল বা শহরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদ সৃষ্টির পর থেকে হলওয়েল সাহেব তার দপ্তরখানাও তৈরি করে দিলেন এই কাছারিবাড়ির মধ্যে। জমিদার হলেও হলওয়েল সাহেব ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী, আর এই পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিল আবার জমিদারের কর্মচারী।

টাউন গার্ডের সাহায্যে শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল এই নগর-কোটালের ওপর। জমিদার হলওয়েল সাহেব প্রতিদিন এই কাছারিবাড়িতে বসে কেবলমাত্র প্রজাদের অভিযোগই শুনতেন না, সেই সঙ্গে অপরাধীর বিচারও করতেন।

একটু একটু করে পদোন্নতি ঘটতে লাগল ইংরেজদের। এদেশে এসেছিল বণিক হয়ে। ধীরে ধীরে বণিকের পোশাকের ওপর চড়াল জমিদারের পোশাক। অবশেষে পলাশীর যুদ্ধের পর জমিদারের পোশাকের ওপর চাপাল রাজপোশাক। সুবে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মীরজাফর তো তখন কেবল হাতের পুতুল।

সেকালে এই লালবাজার স্ট্রীটের নাম ছিল ইস্টার্ণ রোড। ইংরেজদের দেওয়া

নাম। এরই দক্ষিণে ছিল একটি সুন্দর নাট্যশালা। সেকালের 'রোপ ওয়াক' অর্থাৎ বর্তমান মিশন রো'র এককোণে ছিল ইংরেজদের তৈরী এই নাট্যশালাটি। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে ইংরেজ বণিক ও রাজপুরুষেরা এখানে এসে জুটত আনন্দলাভের আশায়।

ইস্টার্ণ রোড—সেকালের কলকাতার সবচাইতে কর্মচঞ্চল এই এলাকা। পরিবার-পরিজন ছেড়ে দীর্ঘদিন সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ইউরোপীয় নাবিকরা এসে আড্ডা গাড়ত এই অঞ্চলে। স্ফূর্তি করবার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত তারা। এদেশে আর বিলিতি জেনানা কোথায় পাওয়া যাবে? তাই দিশি জেনানা দিয়েই তারা সেকালে মিটিয়ে নিত তাদের প্রয়োজন। এখানে-ওখানে মদের দোকান। আবগারী ব্যবস্থা বলে কোন কিছু ছিল না সেদিন। তাই রাতদিন সেখানে ছুটত মদের ফোয়ারা। সেই সঙ্গে মারামারি, খুনোখুনিও লেগে থাকত প্রায়ই। অভাব ছিল না চুরি, ডাকাতি, রাহাজানিরও। বিশৃঙ্খল সেই অবস্থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে তখন ডাক পড়ত সেই টাউন গার্ডের গোরা সার্জেণ্টদের। লম্বা-চওড়া সেই সার্জেণ্টরা সেকালের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে মোকাবিলা করত তাদের। এই ছিল সেকালের পুলিশ ব্যবস্থা।

সেকালের অপরাধীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র। লালবাজার ও বর্তমান চিৎপুরের মিলনস্থলটি সেকালে ছিল শহরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই চিৎপুর রাস্তাটিই তখন সংযোগ রক্ষা করে চলত শহরের উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণ অংশের। এখানেই অপরাধীকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে বসানো হত 'পিলর'। একটা উঁচু টেবিলের মত বস্তুর ওপর একখানা বড় আকারের কাঠের টুকরো দাঁড় করানো থাকত। তাতে থাকত তিনটি ফুটো। অপরাধীকে সেই টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে ঐ বড় ফুটো দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হত তার মাথাটা, আর অন্য দুটো ফুটোয় কব্জি পর্যন্ত তার দুটো হাত। তারপর সেই ফুটো-গুলোকে এমনভাবে ছোট করে দেওয়া হত যে, অপরাধী তার মাথা ও হাতদুটো টেনে বার করে আনতে তো পারতই না, এমনকি নড়াচড়া করতে গেলেও প্রচণ্ড ব্যথায় ক'কিয়ে উঠত। এমনি অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। তার পায়ের কাছে কাগজে লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হত তার অপরাধের ফিরিস্তি। পথচারীরা এসে ভিড় করে দাঁড়াত সেই 'পিলর'-এর কাছে, পড়ত সেই ফিরিস্তি, টিটকারি দিত অপরাধীকে। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেক সময় কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ত। তখন তাকে ধরাধরি করে সরিয়ে আনা হত সেখান থেকে।

সেকালের শহর কলকাতার টাউন গার্ড অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী ছড়িয়ে ছিল লালবাজার অঞ্চলের অনেকগুলো বাড়িতে। কোনটায় ছিল তাদের কোয়ার্টার, কোনটায় বা অফিস। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সবগুলো বাড়িকে এক করে দিয়ে সৃষ্টি হলো কলকাতা পুলিশের বর্তমান হেডকোয়ার্টার, যার ঠিকানা আঠারো নম্বর লালবাজার স্ট্রীট। এককালে সমাজবিরোধীদের লীলাভূমি সেই লালবাজারই আজকের এই পুলিশ দপ্তর।

লালবাজারের পুলিশ দপ্তরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে

ম্যাল্‌কমের চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে একখানি ছবি। জাঁদরেল পুলিশ অফিসার কলকাতা পুলিশের সেই বিখ্যাত সি পি. চার্লস টেগার্টের তেমন অসহায় মূর্তি সে আর কোনদিন দেখেছিল বলে মনে করতে পারে না।

ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্টের ওপর আক্রমণের নায়ক দীনেশ মজুমদার ধরা পড়লেও অন্যদের খোঁজ তখনও পায় নি পুলিশ। আহত অনুজা সেনকে হাতে পেয়েও তাকে কাজে লাগাতে পারল না তারা। তার আগেই সে তাদের ফাঁকি দিয়ে পরপারে চলে গেছে। আর দীনেশের মুখ থেকে কথা বের করা তো একেবারেই অসম্ভব। কাজেই এখন একমাত্র ভরসা ইন্‌টেলিজেন্স্‌ ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের খবর। তাদের খবরের ওপর ভিত্তি করেই গোটা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে পুলিশ। অবশেষে পাওয়া গেল দলের আরও দুজনের নাম—অতুল সেন, শৈলেন নিয়োগী।

কতই বা বয়স হবে দীনেশের! তেইশের বেশী কিছুতেই নয়। এই বয়সের একটি ছেলে যে এত কঠিন হতে পারে তা বোধহয় ধারণার বাইরে ছিল পুলিশের। আণ্ডার ট্রায়াল প্রিজনার হিসেবে জেলের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও একটি কথাও বের করা গেল না তার মুখ থেকে। মুখে যেন কুলুপ এঁটে বসে আছে ছেলেটা। অবশেষে সে একবার মাত্র বললে, না, আমি ও অনুজা ছাড়া আর কেউ ছিল না আমাদের দলে।

—না—না। চিৎকার করে ওঠে প্রশ্নকর্তা, অনুজা সেন মারা গেছে বলেই তার নাম করলে। কিন্তু আমরা জানি আরও কয়েকজন ছিল তোমাদের সঙ্গে। অন্তত দুটি নাম তো আমরা জোগাড় করেছি।

ঠোঁটের কোণে একটু হেসে প্রশ্নকর্তা আবার বলতে থাকে, শুনতে চাও তাদের নাম? অতুল—অতুল সেনও ছিল তোমাদের দলে। আর ছিল শৈলেন নিয়োগী।

আর কোন জবাব নয়। মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে দীনেশ।

পাওয়া গেল না অতুল কিংবা শৈলেনকে। সেই সঙ্গে দলের আসল ঘাঁটিরও কোন খোঁজ মিলল না। এমনকি এই ক'জন ছাড়া দলে আর কে কে ছিল তারও হদিশ পাওয়া গেল না।

এদিকে গভর্ণমেন্ট থেকে কড়া নির্দেশ—ক্রাশ দি টেররিস্টস্‌—সন্ত্রাস-বাদীদের ধ্বংস করো। গুঁড়িয়ে দাও ওদের ঘাঁটি।

এই বিষয়টি নিয়েই সেদিন লালবাজারে কমিশনার টেগার্টের ঘরে বসেছিল পরামর্শসভা। পঁচিশ তারিখ আক্রমণ হয়েছিল টেগার্টের ওপর। আর সভা বসেছিল তার চার দিন পরে, অর্থাৎ ঊনত্রিশ তারিখে।

পরামর্শ সভায় উপস্থিত সমস্ত ডেপুটি কমিশনারেরা। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি. সি.-ও উপস্থিত। জোর আলোচনা চলছিল তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে। কি করা হবে এবার? কেমন করে এই সন্ত্রাসবাদী ছেলেগুলোর মোকাবিলা করা হবে? কেমন করে খুঁজে বের করা হবে ওদের গোপন ঘাঁটিগুলো?

দোতলার বারান্দায় ডিউটিরত সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম। পা'দুটো একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে স্থির হয়ে আছে সে। এর মধ্যে দু' তিনজন পুলিশ

কমিশনারের সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সে ফিরিয়েও দিয়েছে। বলেছে, সি· পি ইজ ভেরি বিজি ইন এ কন্‌ফারেন্স, অন্যসময় এসে দেখা করবেন।

ম্যাল্‌কমের ওপর তেমনি নির্দেশই ছিল। একতলার সিঁড়ি থেকে দোতলার সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত ছ'জন রাইফেলধারী সেপাই মোতায়েন রয়েছে। সি· পি-র ওপর আক্রমণের পরের দিন থেকেই এখানে এমন সতর্কতা। রাস্তায় গেটের সামনেও পুলিশের কড়াকড়ি, জিজ্ঞাসাবাদ না করে কাউকেই আর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি প্রেসম্যানদের ওপরেও এমনি কড়াকড়ি। ওই সন্ত্রাসবাদী ছেলেগুলোকে আর বিশ্বাস নেই। দিন-দুপুরে খোলা রাস্তায় যারা সি পি· চার্লস টেগার্টকে আক্রমণ করার মত হিম্মত রাখে তারা যে-কোন মুহূর্তে খোদ লালবাজারে ঢুকে একটা কিছু অঘটন ঘটাতে পারে। বিশেষ চেষ্টা করেও যারা সেদিন টেগার্টকে মারতে পারে নি, তারা যে কোন সময় আবার সেই চেষ্টা করতে পারে। নিজেদের জীবনের ভয় যারা করে না, তাদের পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়।

আলোচনা সভায় ডি. সি· স্পেশাল ব্রাঞ্চ এক সময় বললে, আমার মনে হয় জুরিসডিকশানের প্রশ্নে আমাদের কাজকর্মে নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধা ঘটেছে।

টেগার্ট তীক্ষ্দৃষ্টিতে তাকান ডি সি.-র দিকে। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, কিসের জুরিসডিকশানের কথা আপনি বলেছেন?

জবাব দেয় স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি সি, আমি বলছি বেঙ্গল ও ক্যালকাটা পুলিশের জুরিসডিকশানের কথা। যতদূর খবর পেয়েছি সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে অনেকেই বেঙ্গল পুলিশের জুরিসডিকশানের মধ্যে থাকে, কিন্তু তাদের অ্যাক্‌টিভিটি ক্যালকাটা পুলিশের এলাকায়। এই জন্যেই এদের সম্পর্কে সব কিছু খবর জোগাড় করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

চাপা ঠোঁটের কোণে একটু হেসে টেগার্ট জবাব দেন, কেন, আপনার ওয়াচারদের কি বেঙ্গল পুলিশের এলাকায় গিয়ে খবর জোগাড় করতে বারণ আছে? না কি, কলকাতার এলাকার বাইরে আপনাদের কোন সোর্স নেই?

—না স্যার, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ডি· সি, তা নয়। তবে কাজের কিছু অসুবিধা ঘটে—

এই সময় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডি সি. বলে ওঠে, আমি মনে করি বেঙ্গল ও ক্যালকাটা পুলিশ যদি একযোগে রেইড্ করে তাহলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে।

—কেমন ধরনের রেইডের কথা বলছেন আপনি? জিজ্ঞেস করেন চার্লস টেগার্ট।

—জয়েন্ট রেইড্, স্যার। টেররিস্টদের সম্পর্কে ইনফর্মেশন ওয়ার্ক আউট করতে জয়েন্ট রেইডের প্রয়োজন। আমার মনে হয় আজকে আমাদের এই আলোচনায় যদি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার লোম্যান উপস্থিত থাকতেন তাহলে খুবই ভালো হত।

মৃদু হেসে জবাব দেন চার্লস টেগার্ট, আমারও প্রথমে তেমনি ইচ্ছেই ছিল। ভেবেছিলাম, আলোচনা করবো রাইটার্সে আই. জি. পি-র ঘরে বসে। সেই

মর্মে টেলিফোনও করেছিলাম তাঁকে। কিন্তু শুনলাম তিনি নাকি ঢাকা গেছেন। কাজেই ওই ব্যবস্থা আপাতত মুলতবী রেখেছি। ঢাকা থেকে উনি ফিরে এলে আলোচনা করব। তা যাই হোক, আমাদের এদিকের খবর কি? ঐ দীনেশ মজুমদার ছেলেটা মুখ খুলেছে নাকি? স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি, সি-র দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেন চার্লস টেগার্ট।

একটু লজ্জিত সুরে জবাব দেয় ডি সি, আই অ্যাম সরি, স্যার। ছেলেটার কাছ থেকে একটা কথাও বের করা যায় নি। এ ভেরি হার্ড নাট টু ব্রেক। ভাঙবে তবু মচকাবে না।

—আই সী! চিন্তিত মুখে ডি সি-র দিকে তাকিয়ে থাকেন টেগার্ট। তারপর আবার জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এটা কি আপনাদের পাকা খবর যে, সেদিন ওরা ঐ চারজনই মাত্র আমার গাড়ি অ্যাটাক করেছিল?

—হুঁ্যা স্যার, স্পটে সেদিন ওই দীনেশ, অনুজা, অতুল ও শৈলেন ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। তবে গোটা ষড়যন্ত্রের পেছনে আরও অনেকেই ছিল। তাদের আমরা এখনও ঠিক ট্রেস করতে পারি নি। অ্যারেস্ট চালিয়ে যাচ্ছি চারিদিকে। দেখা যাক ফল কি দাঁড়ায়। ঐ অতুল ও শৈলেন ছেলেদুটোকে পেলেও না হয়—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় ডি. সি.।

টেগার্ট বলে ওঠেন, ইয়েস, ঐ অতুল ও শৈলেনকে আমাদের ধরতেই হবে। দীনেশের কাছ থেকে যখন কিছুই জানা যাবে না তখন ঐ ওরাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

টেগার্টের মনে মনে হয়তো আশা ছিল দীনেশ তাদের নিরাশ করলেও অতুল কিংবা শৈলেন হয়তো তা করবে না। কিন্তু তিনি বড় বেশি আশা করেছিলেন সেদিন। বাংলার বিপ্লবীদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়েও তিনি সেদিন আশা করেছিলেন, যে কাজ দীনেশ মজুমদার করে নি, সেই কাজ খুলনা জেলার সেনহাটির অতুল সেন কিংবা শৈলেন করবে। ধরা পড়ে তারা সবকিছু গুপ্তকথা বলে দেবে পুলিশকে। কিন্তু এ যেন সেই 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদির' মত ব্যাপার। অতুল কিংবা শৈলেন এখনও ধরাই পড়ে নি। ধরা পড়বে কিনা তারও কিছু ঠিক নেই। কিন্তু এর মধ্যেই তাদের কাছ থেকে খবর জোগাড় করার কথা চিন্তা করছেন টেগার্ট। ওদের প্রত্যেকেই যে অগ্নিযুগের আগুনের এক-একটি ফুলকি একথা চার্লস টেগার্টের চাইতে বেশি কে আর জানতেন?

টেবিলের ওপর টেগার্টের সামনে একখানা খোলা ম্যাপ—শহর কলকাতার মানচিত্র। তার ওপর বিশেষ জায়গায় লাল পেন্সিলের দাগ। এই জায়গা-গুলোই সন্ত্রাসবাদীদের সম্ভাব্য ঘাঁটি। এখানেই সাদা পোশাকের পুলিশের সবচাইতে কড়া নজর—চব্বিশ ঘন্টা ওয়াচ্।

চার্লস টেগার্ট তাঁর হাতের পেন্সিলের পেছনটা নিজের ঠোঁটের ওপর লাগিয়ে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন সেই ম্যাপের দিকে। তারপর একসময় মুখ তুলে তাকিয়ে বলে ওঠেন, অল রাইট। আরও বিস্তৃতভাবে আমাদের জাল ফেলতে হবে। গোটা শহরের অলিগলিতে ওয়াচ্ বসাতে হবে। দেখতে হবে

একটা চুনোপুঁটিও যেন পালাতে না পারে। বলেই তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি. সি-র দিকে তাকান।

—ঠিক আছে, স্যার। জবাব দেয় ডি সি.।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। টেগার্ট ডি. ডি.-র ডেপুটি কমিশনারের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, আমাদের আজকের এই আলোচনার একটা রিপোর্ট তৈরি করবেন। আই জি. পি. মিস্টার লোম্যান ঢাকা থেকে ফিরে এলেই তাঁর কাছে এই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে আর একটা আলোচনা সভার জন্যে রিকোয়েস্ট করব তাঁকে।

—অল রাইট স্যার, তাই হবে।

কিন্তু হায়, সেদিন কে বুঝতে পেরেছিল যে, পুলিশের আই. জি. পি. অর্থাৎ ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার লোম্যান আর কোনদিনই কলকাতায় ফিরবেন না। সেই যাওয়াই তাঁর অগস্ত্যযাত্রা। ঢাকার এক তরুণ মেডিক্যেল স্টুডেণ্টের অব্যর্থ লক্ষ্য সেদিন এমন একটা কাণ্ড করে বসবে যাতে গোটা বাংলার পুলিশমহল তো বটেই, এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নড়বড়ে ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠবে থর-থর করে। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে যারা ভীরু কাপুরুষ, যারা মরার আগে বারে বারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবে যে, ব্রিটিশ রাজশক্তি যতই কেন না শক্তিশালী হোক, এদেশের মানুষের ক্ষাত্রতেজ তার চাইতেও বেশি শক্তিশালী। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত একটা জাতিকে দাবিয়ে রাখার মত শক্তি এ জগতে কারুরই নেই। তারা তাকিয়ে দেখবে যে, বহুবিজ্ঞাপিত ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সমানে লড়বার ক্ষমতা এদেশের ছেলেদের যথেষ্টই আছে।

সি. পি চার্লস টেগার্ট ও অন্য অফিসারেরা সেদিন লালবাজারের দোতলায় সুরক্ষিত কক্ষে বসে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি যে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা শহরের মিটফোর্ড হাসপাতালের বাইরে কি অঘটন ঘটছিল।

লালবাজারের দোতলায় পিনড্রপ সাইলেন্স। গায়ে আঁটো-সাটো পোশাক, মাথায় হেলমেট আর কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে করিডোরে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। ভেতরে তখনও চলেছে সেই পরামর্শ সভা। দু'একজন অফিসার ফাইল নিয়ে এঘর-ওঘর করছে। কমিশনারের দু'পাশের ঘর দু'খানা ফাঁকা। সেখানকার ডেপুটিরা তখন খোদ কমিশনারের ঘরে হাজির। কেবল একখানি ঘরে বসে কাজ করছে একজন অ্যাসিসটেণ্ট কমিশনার, আর কোণের ঘরগুলোয় প্রেস সেকশান, ফটোগ্রাফি সেকশান, চিটিং-ফ্রড্‌ প্রভৃতি সেকশানের অফিসারেরাও কর্মব্যস্ত।

এদের মধ্যে প্রেস সেকশানের কাজটাই সবচাইতে মজার। পড়া—পড়া—আর পড়া। এখানকার চাকরি মানেই পড়ার চাকরি। রাশি রাশি পাণ্ডুলিপি পড়ে শেষ করতে হয় তাদের। ব্রিটিশ-বিরোধী কোন লেখা থাকলে সেই পাণ্ডুলিপি আর ছাপাবার অনুমতি মিলবে না। এমনিভাবেই খারিজ হয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির পাহাড় জমে ওঠে এখানে। সুপিরিয়র অফিসারদের অধিকাংশই বিলাতি সাহেব। বাংলা বোঝে না তারা। তাই বাংলা পাণ্ডুলিপির মধ্যে আপত্তি-

কর কিছু থাকলে সেই অংশ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে তার ইংরেজি তর্জমা করে দিতে হয় সাহেবদের। সবচাইতে মজার ব্যাপার হল এখানকার সাধারণ বিদ্যে-বুদ্ধির অধিকারী অফিসারেরা দেশের দিকপাল পণ্ডিতদের পাণ্ডুলিপি বিচার করে। তাঁদের সেই অমূল্য রচনা ছাপাবার অনুমতি নিতে হয় এদের কাছ থেকেই। একেই বোধহয় বলে অদৃষ্টের পরিহাস। এদের হাত থেকে খোদ রবীন্দ্রনাথও রেহাই পান নি। আর পাবেনই বা কেন! বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে যে কবি অজস্র প্রবন্ধ ও গান রচনা করতে পারেন, রাউল্যাট বিলের পরিণতিতে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংশ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিবাদে যিনি 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে স্বয়ং বড়লাটকে খোলা চিঠি লিখতে পারেন, তাঁর রচনার মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তব্য থাকা তো মোটেই বিচিত্র নয়। তাই তাঁর নাটক-নভেলের পাণ্ডুলিপি লালবাজারের এই প্রেস সেকশানে নিয়ে এসে পুলিশী দৃষ্টিতে বিচার না করলে চলবে কেন? বিশেষ করে, এই ভদ্রলোকটির রচনার ধরন-ধারণ যেন একটু কেমন কেমন। সব জিনিস সব সময় বোঝাও দুষ্কর। এরই ফাঁকে তিনি কখন কোন্ ব্রিটিশ-বিরোধী কথা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন তার ঠিক কি? তাছাড়া ভদ্রলোকের কলমের ধারও খুব কম নয়। নইলে খোলা চিঠির মাধ্যমে খোদ বড়লাটকে এমন মিষ্টি করে জুতো মারতে পারে ক'জন? কাজেই রেহাই নেই এই ব্যক্তিটিরও।

চার্লস টেগার্ট আজ কতক্ষণ ধরে অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন কে জানে? সি পি. যতক্ষণ অফিসে থাকবেন ততক্ষণ ছুটি নেই সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের। এদিকে সে সেদিন রুমাকে কথা দিয়ে এসেছে যে, আজ সে তার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু সাহেবদের আজ যে মতি-গতি তাতে সে নিজের কথা রাখতে পারবে কিনা কে জানে?

রুমা—রুমা বাঈজী। একদিকে মেরিয়া, অন্যদিকে রুমা। মেরিয়া ম্যাল্‌কমের বান্ধবী। তাকে সে সত্যিই ভালবাসে। ভবিষ্যতে তারা যে একসাথে ঘর বাঁধার পরিকল্পনা করছে এ খবরটাও অনেকেই জানে। বিশেষ করে তার বন্ধুমহল এ নিয়ে তো মাঝে মধ্যেই ঠাট্টা করে ম্যাল্‌কমকে। সত্যি বলতে কি সেই ঠাট্টাটুকু ভালই লাগে তার। একটি নারীমন যে ইতিমধ্যেই সে জয় করে ফেলেছে এটা তার পৌরুষের সার্থক ক্ষমতা বলেই মনে করে ম্যাল্‌কম। তাই বন্ধুদের ওই ঠাট্টাটুকু তার পৌরুষের প্রশস্তি বলে মনে হয়।

মেরিয়া না হয় তার বান্ধবী - প্রিয়তমা, কিন্তু রুমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? এর জবাব ম্যাল্‌কম নিজেও জানে না। তবে এটা তার কাছে খুবই স্পষ্ট যে, মেরিয়ার সঙ্গে তার যে রকম সম্পর্ক সে রকম কোন সম্পর্কের কথা রুমার বেলায় মোটেই খাটে না। রুমা হচ্ছে বাঈজী। ধনী ব্যক্তিদের গান শুনিয়ে সে পয়সা রোজগার করে। বয়সে তরুণী হলেও দেখতে তেমন একটা সুন্দরী বলা চলেনা তাকে। চোখ দুটো টানা হলেও গায়ের রঙটা বেশ কালোই। কালো রঙ কোনকালেই পছন্দ নয় ম্যাল্‌কমের। কালোকে সে ঘৃণা না করলেও পছন্দ করে না মোটেই। কারুর গায়ের বর্ণ কালো দেখলেই তার আফ্রিকার জুলু, কাফ্রী ও নিগ্রোদের কথা মনে পড়ে।

সেই রুমা বাঈজীর সঙ্গেই তার প্রথম পরিচয় ঘটল একটা বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে।

অগ্নিযুগের বাংলাদেশ—অগ্নিযুগের মহানগরী কলকাতা। আজ এখানে বোমা পড়ছে, কাল সেখানে পাওয়া যাচ্ছে পিস্তল কিংবা রিভলবার। পরশু মহানগরীর একপ্রান্তে আবিষ্কৃত হচ্ছে বিপ্লবীদের গুপ্তঘাঁটি কিংবা বোমা তৈরির কারখানা। এমনি করেই এক-একটি দিন অতিবাহিত হচ্ছে। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়ের মত যুবকদের মধ্যে কে যে বিপ্লবী নয় তা বাছাই করাই হয়ে উঠেছে এক মস্ত সমস্যা। ওপর মহল থেকে পুলিশের ওপর একটার পর একটা নির্দেশ আসছে—গ্রেপ্তার কর ওদের, স্তব্ধ করে দাও ওদের অ্যাকটিভিটি। কোনরকম দয়া-মায়া নয়। যারা এদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।

এক রাতে একজন নামী বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে লালবাজার থেকে বেরিয়ে পড়ল একদল পুলিশ। সেই পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব করছিল একজন ইন্সপেক্টর। সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমও ছিল ওদের দলে।

শীতের রাত। সুপ্তিমগ্ন মহানগরী কলকাতা। পুলিশ বাহিনী মানিকতলা অঞ্চলের একটা গলির মধ্যে ঢুকে ঘিরে দাঁড়াল একটা পুরানো আমলের ছোট দোতলা বাড়ি। খবর, ঐ বাড়ির একতলাতেই নাকি পাওয়া যাবে সেই বিপ্লবীকে।

বাড়িটার একতলা অন্ধকার, কিন্তু দোতলায় বন্ধ জানালার ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল অল্প আলো। সেই সঙ্গে একটা সঙ্গীতের সুরও ভেসে আসছিল ওপর থেকে।

ডাকাডাকির পরে একতলার বাসিন্দা ভদ্রলোক আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিয়েই চমকে উঠল সামনে বিরাট পুলিশ বাহিনী দেখে।

ইন্সপেক্টর এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে সেই বিপ্লবীর কথা। শুনে ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে, না তো, ঐ নামের কোন লোককে তো আমি চিনি না!

সেই বাঙালী ইন্সপেক্টর একটু বিদ্রুপের সুরে বললে, সে কি, নামটাও শোনেন নি কখনও?

—আজ্ঞে না। ভদ্রলোক জবাব দেয়।

—বেশ তো, শুনছেন কিনা বোঝা যাবে পরে। আগে আমাদের ভালো করে সার্চ করতে দিন আপনার ঘরগুলো। বলেই ইন্সপেক্টর সার্চ-ওয়ারেণ্ট দেখাবার প্রয়োজন বোধ না করেই সোজা ঢুকে যায় তার ঘরের মধ্যে।

মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভদ্রলোক বলে ওঠে, একি, বলা নেই কওয়া নেই আপনারা এমনি হুট করে ভেতরে ঢুকছেন কেন? বাড়িতে মেয়েছেলে রয়েছে—

—মেয়েছেলে তো থাকবেই। আমরা কি বলছি যে, আপনি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে এখানে একটা আশ্রম বানিয়ে বসে আছেন? ইন্সপেক্টর আবার বিদ্রুপের সুরে বলে ওঠে।

অসহায় দৃষ্টিতে ভদ্রলোক কেবল তাকিয়ে থাকে পুলিশ দলের দিকে।

প্রতিবাদ করা বৃথা। এরা প্রয়োজনে জোর করেই তার বাড়ি সার্চ করবে।

তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিন্তু পাওয়া গেল না সেই বিপ্লবীকে। মৃদুকণ্ঠে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম দলপতি ইন্সপেক্টরকে বললে, ইন্‌করেক্ট ইন্‌ফর্মেশন, স্যার—

—হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে। বলেই ইন্সপেক্টর হতাশভঙ্গিতে একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর বাড়ির মালিক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি এখানে ভাড়াটে ?

— না, এটা আমার নিজের বাড়ি।

—ওপরতলায় কে থাকে ? ইন্সপেক্টর আবার প্রশ্ন করে।

—একজন ভাড়াটে থাকে ওপরে। ভদ্রলোক জবাব দেয়।

—আচ্ছা, বাইরের ঐ সিঁড়ি ছাড়া ভেতরের এই সিঁড়ি দিয়েও বোধহয় ওপরে ওঠা যায়, কেমন ? প্রশ্নটা করেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর তাকিয়ে থাকে ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

জবাব দেয় বাড়ির মালিক, হ্যাঁ, যায়। তবে ওপরে ভাড়াটে থাকে বলে ভেতরে সিঁড়ির দরজাটা আমরা বন্ধ করেই রাখি।

ইন্সপেক্টর আবার একটু চিন্তা করে। পুলিশ দেখে বাড়ির মালিক সেই বিপ্লবীকে ঐ দরজা দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা তাই বোধহয় চিন্তা করে মনে মনে। তারপর বাড়ির মালিককে আবার বললে, ঠিক আছে, একবার ওপরটা দেখবো আমরা।

—বেশ তো। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে চান।

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে আসে ইন্সপেক্টর। এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই সঙ্গীতের সুর। দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতরে চলছিল গান-বাজনা। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরের বারান্দায়।

মাথার হেলমেট খুলে হাতে নিয়ে দরজার পাশে কান পেতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সেই ইন্সপেক্টর ও সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। স্ত্রী-কণ্ঠের সঙ্গীত। অপূর্ব মিষ্টি কণ্ঠস্বর। একটি ভজন চলছিল ভেতরে—মীরার ভজন।

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের সঙ্গীতপ্রীতি বরাবরের। কিন্তু তা এই দিশি সঙ্গীত নয়। দিশি সঙ্গীতের 'মেলডি' তার কোনকালেই ভালো লাগে না। পথে-ঘাটে জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দী গানের সুর কখনও আকৃষ্ট করতে পারে নি তাকে। এর চাইতে ইউরোপীয় সঙ্গীতের 'হার্মনি' তার কাছে অনেক শ্রুতিমধুর।

ম্যাল্‌কমের মা-ও গান ভালোবাসত। তার একটা পুরানো গ্রামোফোন যন্ত্র ছিল। ছিল কিছু পুরানো রেকর্ডও। তার মধ্যে ছিল পিয়ানোতে বিখ্যাত বেটোভেনের সুর, কোপানের বেহালার সুরের রেকর্ড প্রভৃতি। মার মৃত্যুর পরে ম্যাল্‌কম সেই গ্রামোফোন যন্ত্রটিকে বেশ যত্ন করেই রেখেছিল নিজের কাছে। লালবাজারের সার্জেণ্ট মেসে সেই যন্ত্রটি এখনও তার কাছে আছে। মাঝে মধ্যে অবসর সময়ে সে পুরানো দিনের সেই রেকর্ড এখনও বাজায়। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই সে আধুনিক ইউরোপীয় সঙ্গীত-শিল্পীদের রেকর্ড কিনে আনে। বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে গোল হয়ে নিজের ঘরে বসে শোনে সেই সঙ্গীত। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কম। একটা আনন্দময় অজানা জগৎ যেন সেই

মুহূর্তে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সুরের পাখায় ভর করে সেই জগতে উড়ে যেতে ইচ্ছে হয়। নিজের কণ্ঠে সুর না থাকলেও ম্যাল্‌কম সুররসিক। ইদানীং বিখ্যাত কারুসোর দিকে ঝুঁকেছে ম্যাল্‌কম। ইতালী তথা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গায়ক এনরিকো কারুসো। তাঁর অনেকগুলো গানের রেকর্ডই সে ইতিমধ্যে জোগাড় করে ফেলেছে।

অঘটন আজও ঘটে। বাস্তবিক, একে অঘটন ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? গভীর রাতে সেই পুরানো বাড়িটার দোতলায় বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় সঙ্গীতের একান্ত ভক্ত সার্জেন্ট ম্যাল্‌কমের কানে কেমন যেন এক ব্যঞ্জনাময় স্নিগ্ধ সুরে ধরা দিল সেই মীরার ভজন। এ গান নতুন কিছু নয়। পথে-ঘাটে অনেকবার সে শুনেছে এই ধরনের সুর। কিন্তু কৈ, তখন তো তা ভালো লাগে নি! তবে কি এই পরিবেশটাই তার ভালোলাগার কারণ, না কি গায়িকার কণ্ঠের মিষ্টত্বটুকুই এর জন্যে দায়ী!

সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শুনছিল সেই সঙ্গীত। সহসা ইন্সপেক্টরের চাপা কণ্ঠস্বরে তার সেই তন্ময়তা ভেঙে যায়। ইন্সপেক্টর ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে বললে, লেট আস পুশ দি ডোর। বলেই সে দরজার ওপর হাত লাগায়।

ভেজানো দরজা খুলে যেতেই এক ঝলক্ গোলাপ আতরের মিষ্টি গন্ধ এসে লাগে তাদের নাকে। ভেতরে একখানি মখমলের আসনের ওপর বসে তানপুরা হাতে গান গাইছে একটি তরুণী। দেখবার মত তার পোশাকের পারিপাট্য, মাথায় একখানি ওড়না। ওড়নার ফাঁক দিয়ে জরির সাজে সজ্জিত দীর্ঘ বেণীটি এসে লুটিয়ে পড়েছে তার বুকের ওপর। কানের হীরের দুলজোড়া ঝক্‌মক্ করছিল ঘরের আলোয়। পরনে চুরিদার ও মাথায় লক্ষ্ণৌ ফেজ পরে হারমো-নিয়াম, তবলা ও সারেঙ্গী নিয়ে কয়েকজন সঙ্গত করছিল তরুণীটির সঙ্গে। এপাশে ফরাশের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে কয়েকজন ব্যক্তি বসে বসে পান করছিল সেই সঙ্গীতসুধা, আর মাঝে মাঝে সামনের রেকাবী থেকে তুলে নিয়ে মুখে পুরছিল বেনারসী খুশবাইওয়ালা রাংতামোড়া পানের খিলি।

খোলা দরজার ফাঁকে পুলিশের পোশাক দেখেই চমকে ওঠে ভেতরের মানুষগুলো। তাল কেটে যায় সঙ্গতকারীদের। সারেঙ্গীওয়ালার হাতের ছড় আর চলে না, ঢিমে তালে বেজে ওঠে তবলা, বেসুরো আওয়াজ তোলে হারমোনিয়াম।

চোখ বন্ধ করে গান গাইছিল তরুণীটি। বাদ্যযন্ত্রের বেসুরো আওয়াজ তার কানে যেতেই একটু বাঁকা হয়ে ওঠে তার সুন্দর ভ্রূ-যুগল। বিরক্ত ভঙ্গিতে সে চোখ মেলে তাকাতেই দরজার দিকে নজর পড়ে তার। সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটে তার কণ্ঠনিঃসৃত সুরের।

ততক্ষণে ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। কোন সাড়া-শব্দ নেই কোথাও।

ইন্সপেক্টর ঘরের মধ্যের লোকগুলোর মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের চারিদিক দেখে নেয়। অবশেষে সেই

তরুণী গায়িকার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে হিন্দিতে বলে ওঠে, তুম্ তওফা-ওয়ালী হ্যায় ?

তরুণীটিও ততক্ষণে তানপুরাটা পাশে শুইয়ে রেখেছে। ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের জবাবে শান্ত কণ্ঠে বললে, নেহি জী, ম্যায় বাঈজী হুঁ। তারপর হিন্দী ছেড়ে স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণে আবার বললে, আমার নাম রুমা—রুমা বাঈজী।

ইন্সপেক্টর নিজের ভুল বুঝতে পারে। সঙ্গতকারীদের মুসলমানী পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই তার মনে হয়েছিল তরুণীটি বোধহয় মুসলমান। তাই সে জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটি তওফাওয়ালী কিনা। কিন্তু মেয়েটির জবাবে বোঝা গেল সে কেবল হিন্দুই নয়, বাঙালী হিন্দু।

ইন্সপেক্টর এর পরে সেই বিপ্লবীর কথা তুলতেই রুমা বাঈজী ঠোঁটের কোণে একটু মিষ্টি হেসে জবাব দেয়, না বাবুসাহেব, আমার এখানে ঐ নামে কেউ আসে না।

—এইমাত্র নিচ থেকে কেউ ঢুকেছে এখানে ?

—না। কেউ আসে নি বাবুসাহেব।

—তোমার শোবার ঘরটা একবার দেখব।

—বেশ তো, আসুন না বাবুসাহেব।

মজলিসের ঘরের সঙ্গেই আর একখানা ঘরে থাকে রুমা বাঈজী। তার সঙ্গেই ছোট একখানি রান্নাঘর ও কলঘর। রুমার পিছু পিছু গোটা ওপর তলাটা তন্ন-তন্ন করে খোঁজে তারা। কিন্তু না, পাওয়া গেল না সেই বিপ্লবীকে। কেবল রুমার শোবার ঘরের মেঝেয় কম্বল মুড়ে শুয়ে ছিল এক বৃদ্ধা রমণী। রুমার দেখা-শোনার ভার তার ওপর।

ইন্সপেক্টর যতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল ততক্ষণ সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম একদৃষ্টে তাকিয়েছিল রুমার মুখের দিকে। সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে যে মানুষের চেহারার কোন রকম সাদৃশ্য থাকতে পারে এই তত্ত্বটা এতকাল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল ম্যাল্‌কমের। কিন্তু সেদিন—কেবল সেইদিনই রুমা বাঈজীর সঙ্গীত ও তার চেহারা দেখে ম্যাল্‌কমের কেবলই মনে হচ্ছিল সেই গানের সুর ও রুমার চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কি সেই সাদৃশ্য, কোথায় তার মিল তা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ম্যাল্‌কমের ছিলনা। সাদৃশ্যটা কিন্তু স্পষ্ট চোখের ওপর ভাসছিল তার। তাই সে একদৃষ্টে কেবল তাকিয়েছিল রুমার মুখের দিকে।

সহসা চোখাচোখি হতেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল ম্যাল্‌কম। রুমাও সরিয়ে নিয়েছিল তার আয়ত চোখ জোড়া।

সেদিন বিফল মনোরথ হয়েই ফিরে যেতে হয়েছিল পুলিশ বাহিনীকে। সেই বিপ্লবীর সন্ধান পায়নি তারা। কেবল পুলিশের আগমনে সেদিন অসময়ে ভেঙে গিয়েছিল রুমা বাঈজীর সঙ্গীতের আসর। সেদিন একমাত্র যার কিছু লাভ হয়েছিল সে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। সুর ও সেই সুরের স্রষ্টার চেহারার মধ্যে একটা সাদৃশ্যের অবিশ্বাস্য অনুভূতি নিয়ে সেদিন ফিরে গিয়েছিল সে লালবাজারে।

সুর না থাকলেও তার রেশ থেকে যায়। সেদিন রাতে শোনা রুমা বাঈজীর সেই সঙ্গীতের সুরের রেশ বেশ কয়েকদিন ধরেই ম্যাল্‌কমের মনের আনাচে-কানাচে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। রুমার কথা মনে পড়লেই কেমন যেন একটা আবেগময় স্পন্দন সে অনুভব করত মনের মধ্যে। কিন্তু এই স্পন্দন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। মেরিয়াকে মনে পড়লে তার হৃদয়-তন্ত্রীর যে তারটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠত রুমার বেলায় কিন্তু সেই তারের ঝঙ্কার তো দূরের কথা, তার অস্তিত্বই সে টের পেত না। এ যেন একটি নতুন তার। এর ঝঙ্কারও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

লালবাজারের সার্জেণ্ট মেস। অবিবাহিত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টরাই থাকে এখানে। কাজেই হৈ-হুল্লোড় লেগেই থাকে প্রায় সর্বক্ষণ। তবে লাগামহীন কোন কিছু চলার উপায় নেই। শত হলেও পুলিশ হেডকোয়ার্টার লালবাজার। পাশে ও মাথার ওপরে তিনতলায় অ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনার ও ইন্সপেক্টর, সার্জেণ্টদের কোয়ার্টার। সামনের বিল্ডিংয়ের তিনতলায় ডি. ডি. ও হেডকোয়ার্টারের ডেপুটি কমিশনারের বাসস্থান। তাছাড়া খোদ পুলিশ কমিশনারের নাকের ডগায় বসে মাত্রা ছাড়া হৈ-হুল্লোড় চলে না। খাঁটি বিলিতি সাহেবরা 'ডিসিপ্লিন' শব্দটিকে যথেষ্টই শ্রদ্ধা করে।

ম্যাল্‌কম কোনকালেই তেমন একটা হৈ-চৈ পছন্দ করে না। গ্রীষ্মের দুপুরে অফ-ডিউটি সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট ও নর্টন যখন খালিগায়ে শুধুমাত্র আণ্ডার ওয়্যার পরে ডাইনিং স্পেসে হাত ধরাধরি করে বলড্যান্স নাচে এবং অন্যেরা পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নৃত্যনৈপুণ্য দেখে হেসে হেসে বাহবা দেয়, কিংবা অন্য একজন মুখে আঙুল ঢুকিয়ে কড়া মেজাজে সিটি দিয়ে ওঠে, তখন নাইট ডিউটি করে এসে ঘুমুবার ইচ্ছে থাকলেও ঘুমুতে পারে না ম্যাল্‌কম। উঠে এসে যোগ দিতে হয় ওদের দলে। একজন যখন বাথরুমে ঢুকে সাওয়ার খুলে দিয়ে লা-লা-লা শব্দে একটা জনপ্রিয় সুর ভাঁজতে শুরু করে এবং মুহূর্তে যখন সেই সুর মেসের অবশিষ্ট বাসিন্দাদের মুখে ধ্বনিত হতে থাকে তখন ম্যালকমের পক্ষে চুপ করে থাকা আর সম্ভব হয় না। বেসুরো গলায় সেও লা-লা-লা শব্দে গেয়ে ওঠে সেই জনপ্রিয় গান। তাছাড়া নিজের টুকিটাকি কাজকর্মের মধ্যে গুনগুন করে বিখ্যাত কারুসোর গানের সুর ভাঁজতে ভালই লাগে ম্যাল্‌কমের।

সেদিনও ম্যাল্‌কম নিজের ঘরে খালিগায়ে বসে ইউনিফর্মের রুপোলী বোতামগুলো পরিষ্কার করছিল, আর অন্যমনস্কভাবে গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছিল। হঠাৎ সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, হ্যাল্লো জনি, তুই যে দেখছি আজকাল দিশি গান গাইতে শুরু করেছিস। কারুসোকে ছেড়ে এবার তানসেনকে ধরলি নাকি? তানসেন যে একজন ফেমাস ইণ্ডিয়ান গায়ক ছিলেন এ খবরটা গ্র্যাণ্টের জানা ছিল। এবং এই সুযোগে সে নিজের সেই জ্ঞান জাহির করলে ম্যাল্‌কমের কাছে।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ম্যাল্‌কম। প্রায় নিজের অজান্তেই সে ভাঁজছিল রুমা বাঈজীর সেই গানের সুর। নিজেকে তাড়াতাড়ি একটু সামলে নিয়ে সে মৃদু হেসে জবাব দেয়, তানসেন আবার কে? সেদিন যেতে যেতে একটা বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ডে গানটা শুনলাম। দিশি গানের সুর তো, আর

কত ভাল হবে—

ম্যাল্‌কম হাল্কা সুরে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেও গ্র্যাণ্ট কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি দিতে চাইল না তাকে। বললে, তাই বুঝি এমন বিশ্রী সুরটা মনে করে নিয়ে এসে এখানে বসে বসে ভাঁজছিস, কেমন? আসল ব্যাপারটা কি বল তো? তোর মেরিয়া আজকাল এসব গান গাইছে নাকি? কথাটা বলেই গ্র্যাণ্ট মিটি মিটি হাসতে থাকে।

—হ্যাং ইওর ব্লাডি সঙ্‌! যেতে দে ওসব কথা। তোর না আজকে সেক্রেটারিয়েটে ডিউটি ছিল? এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?

কাঁধ নাচিয়ে জবাব দেয় গ্র্যাণ্ট, তোর মেরিয়ার মত আমাদেরও তো এক-আধ জন থাকতে পারে। একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে আজ। তাই শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে নর্টনের ওপর দায়িত্ব দিয়ে পালিয়ে এলাম। বলেই একচোখ টিপে একটা বিচিত্র মুখভঙ্গি করে সেখান থেকে সরে পড়ে গ্র্যাণ্ট।

তিন-চার মাস কেটে গেছে তারপর। রুমা বাঈজীর গানের সুর প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ম্যাল্‌কম। সেই সঙ্গে রুমাকেও। সেদিন যতই কেন না ভাল লাগুক, একজন অপরিচিত বাঈজী ও তার গানের সুর মনে করে বসে থাকার মত কোন কারণ ঘটে নি সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবার দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে।

বাবুঘাটে গঙ্গার পাড়ে স্নানার্থী নরনারীর প্রচণ্ড ভিড়। সেখানেই সকাল থেকে ডিউটি পড়েছিল সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের। ডিউটি করতে করতে ভাবতে থাকে ম্যাল্‌কম—হিন্দুদের স্নানপর্বের আর শেষ নেই। কোথায় কোন্‌ মহাকাশে চলছে সূর্যগ্রহণ আর এখানে হাজার হাজার নরনারী এসেছে স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে। সূর্যগ্রহণের সঙ্গে স্নানপর্ব আর তার সঙ্গে মানুষের পাপ-পুণ্যের যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারল না সে। হিন্দুদের রীতিনীতিই বিচিত্র।

সহসা একজন হিন্দুস্থানী কনস্টেবল ভুঁড়ি দুলিয়ে এসে তাকে বললে, এক ঔরৎ আপকো বোলাতী হ্যায়, সাব।

—ঔরৎ! কাঁহা ঔরৎ?

—উধার, ঐ পেড়কা সামনে খাড়ি হুই হ্যায়, সাব।

ভুরুযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কমের। এখানে আবার কোন্‌ ঔরৎ তাকে ডাকতে এলো?

গঙ্গার পাড়ে যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়। বেশিরভাগই ঘোড়ার গাড়ি ও রিক্সা, দু'চারখানা মোটর গাড়িও আছে। দলে দলে স্নানার্থীরা গাড়ি কিংবা রিক্সা চেপে আসছে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার এসেছে সপরিবারে পুণ্য অর্জন করতে। স্নানের পরে ভিজে জামা-কাপড় গায়ে ছোট ছেলে মেয়েদের কাঁধে চাপিয়ে ফিরে চলেছে তারা। পেছনে ভিজে কাপড়ে একগলা ঘোমটা টেনে ছেলে-কাঁখে হেঁটে চলেছে তার স্ত্রী। কোথাও বা ধবধবে পৈতে গলায় পরুত-ঠাকুরের সঙ্গে পুণ্যার্জনের দক্ষিণা নিয়ে যজমানের বেধে গেছে দারুণ ঝগড়া।

ভিড় ঠেলে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম সেই গাছটির দিকে এগিয়ে যেতেই তার চোখ

পড়ে সেই রুমা বাঈজীর ওপর। সদ্যোস্নাতা তরুণী। ভিজে চুলের রাশি বেয়ে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তার। পরনে একখানা আটপৌড়ে শাড়ি, হাতে একগোছা ভিজে জামা-কাপড়! বড় বড় চোখদুটি মেলে অসহায় ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল সে।

ধড়াচুড়ো পরা সার্জেণ্ট ম্যাল্কমকে এগিয়ে আসতে দেখেই রুমার অসহায় মুখখানা একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রুমার ওপর চোখ রেখে এগিয়ে আসছিল ম্যাল্কম। চিনতে একটুও অসুবিধা হয় নি তার। ভারি সুন্দর লাগছিল রুমাকে। এক স্নিগ্ধ পবিত্রতা যেন রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে গাছের 'নচে। সেদিন রাতে দেখা ঐশ্বর্যময়ী রুমা বাঈজীর স্থান আজ দখল করেছে একটি সাদাসিধে তরুণী—রুমা।

সার্জেণ্ট ম্যাল্কম এগিয়ে গিয়ে স্পষ্ট বাংলায় জিজ্ঞেস করে, আপনি এখানে একা দাঁড়িয়ে? স্নান করতে এসেছিলেন বুঝি?

একটু সময় মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে রুমা। তারপর লজ্জাটুকু কাটিয়ে উঠে একটা ঢোক গিলে জবাব দেয়, হ্যাঁ, এখন দেখছি না এলেই ভালো ছিল। এমন বিপদে পড়তে হতো না।

—কি বিপদ আপনার? জিজ্ঞেস করে ম্যাল্কম।

আবার কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না রুমা। তারপর মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, পাড়ার কয়েকজন মেয়েছেলের সঙ্গে একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এসেছিলাম। কথা ছিল গাড়িটা আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। স্নান করে উঠে ভিড়ের মধ্যে ওদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এখানে এসে দেখি গাড়িখানাও নেই। এদিকের পথ-ঘাটও আমি চিনি না। এই সুযোগে কয়েকটা দুষ্টু-প্রকৃতির লোক আমাকে সাহায্য করতে—। কথাটা শেষ না করেই আবার মাথা নিচু করে রুমা।

—বুঝেছি, সার্জেণ্ট ম্যাল্কম বললে, লোকগুলো কোথায়?

মাথা তেমনি নিচু রেখেই জবাব দেয় রুমা, আপনাকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখেই সরে পড়েছে।

—আই সী!

ম্যাল্কম একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর আবার বললে, গাড়ির গাড়োয়ানকে আসার ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়েছিলেন বুঝি?

মাথা নেড়ে সায় দেয় রুমা।

—ওখানেই ভুল করেছেন। গাড়োয়ানগুলো ভয়ানক পাজি। বেশি ভাড়া পেয়ে অন্য সওয়ারী নিয়ে সরে পড়েছে। তা যাই হোক, গাড়ি ঠিক করে দিলে আপনি একা বাড়ি ফিরতে পারবেন?

এবার মুখ তুলে মৃদু হেসে রুমা জবাব দেয়, আপনি ঠিক করে দিলে গাড়োয়ানের সাধ্য কি আমাকে বিপদে ফেলে?

রুমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ম্যাল্কম এগিয়ে যায়। এখানে গাড়ি জোগাড় করা মুশকিল। তবুও অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে একখানা ঘোড়ার গাড়ি জোগাড় করে সে ফিরে আসতেই রুমা জিজ্ঞেস করে, কোথায় যেতে হবে বলে

দিয়েছেন ?

জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, হ্যাঁ, মানিকতলায় তো ? ভাড়াও ঠিক করে এনেছি।

একটি মেয়েকে একজন গোরা পুলিশ অফিসার গাড়ি জোগাড় করে সাহায্য করছে দেখে আশেপাশের অনেকেই কৌতূহলী চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। তাদের সেই কৌতূহলী দৃষ্টির মধ্যেই গাড়িতে উঠে বসে রুমা।

গাড়ির দরজা ঠেলে বন্ধ করে দেবার আগেই রুমা ম্যাল্‌কমের মুখের ওপর পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বললে, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?

—বলুন। মৃদু হেসে জবাব দেন সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

—একদিন আমার ওখানে আসবেন ? এলে খুব খুশি হবো।

তেমনি হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম. আচ্ছা, দেখা যাবে।

—না, দেখা যাবে নয়। আপনাকে আসতেই হবে। বলুন আসবেন তো ?

অগত্যা সম্মতি দিতে হয় ম্যাল্‌কমকে, ঠিক আছে, সময় করে একদিন যাবো।

গাড়ির দরজা বন্ধ হয়। ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়তেই গাড়ি চলতে শুরু করে। সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ভাবতে থাকে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম—তার ওপর রুমা বাঈজীর এমন বিশ্বাস হলো কেমন করে ? এ কি কেবল সে পুলিশ বলেই ?

কথা রেখেছিল ম্যাল্‌কম। একদিন সময় করে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিল রুমা বাঈজীর বাড়িতে। অবশ্যি সেদিন তার পরনে পুলিশের পোশাক ছিল না।

সাদা প্যাণ্ট-সার্ট, সেই সঙ্গে খয়েরি রঙের একটা সুন্দর নেক্‌টাই। মাথার কুচকুচে কালো চুলের রাশি সামনের দিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কায়দায় অ্যালবার্ট করে আঁচড়ানো, পায়ে চক্‌চকে সু। এই পোশাকে সুঠামদেহী ম্যাল্‌কমকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দরজা খুলে সামনে ম্যাল্‌কমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুমার চোখে-মুখে জেগে ওঠে আনন্দের ঢেউ। সবে প্রসাধন শেষ করেছিল রুমা, কাপড়-চোপড় তখনও পাল্টায় নি। আজ একটু বিশেষ ভাবেই প্রসাধন করেছিল সে। শহরের একজন ধনীর বাড়িতে মাইফেলের আয়োজন হয়েছে। আরও কয়েকজন বাঈজীর সঙ্গে রুমা বাঈজীও মুজরো নিয়েছে সেখানে। মোটা টাকার মুজরো।

খুশির ঢেউ মনেই চেপে রেখে ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হেসে রুমা বলে ওঠে, আসুন—ভেতরে আসুন।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করতে থাকে ম্যাল্‌কম। সেদিন রাতে গায়ে পুলিশের উর্দি ছিল বলে জুতো-পায়েই নিঃসঙ্কোচে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু তাই বলে আজও জুতো-পায়ে ঘরে ঢুকবে কিনা তাই বোধহয় চিন্তা করতে থাকে ম্যাল্‌কম।

ম্যাল্‌কমের মনের কথা টের পেয়ে রুমা তাড়াতাড়ি হাল্কা সুরে বলে ওঠে, কিচ্ছু ভাববেন না। আপনি জুতো পরেই ভেতরে আসুন। আমাদের মত

লোকের কি অত বাছ-বিচার করতে গেলে চলে?

ম্যাল্‌কমকে ভেতরে এনে একটু বিপদেই পড়ে রুমা। তার ঘরে তো একখানিও চেয়ার নেই। এখানে যারা আসে তারা কেউই চেয়ারে বসে না। তাদের জন্যে পাতা থাকে সাদা ধবধবে ফরাস। তার এই অল্পদিনের বাঈজী জীবনে এই প্রথম একজন ব্যক্তি সাহেবী পোশাক পরে এলো তার বাড়িতে। তাই এতদিন নিজের ঘরে চেয়ার রাখার প্রয়োজনই বোধ করে নি সে।

এবার হাসি ফোটে ম্যাল্‌কমের মুখে। রুমার বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে, কিছু ভাববেন না আপনি। আমি এখানেই বসতে পারবো। বলেই রুমা কিছু জবাব দেবার আগেই হাঁটু মুড়ে সে বসে পড়ে ফরাসের ওপর।

রুমার বিব্রত ভাবটুকু কিন্তু কাটতে চায় না। ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে সে বললে, আমি বুঝতে পারছি এভাবে বসতে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। প্যান্ট পরে কি এমনিভাবে বসা যায়? পরক্ষণেই কি মনে করে সে আবার বলে ওঠে, ঠিক আছে। আমার শোবার ঘরে চলুন। সেখানে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসবেন।

বাইরের একটা লোক, বিশেষ করে একটা বেজাত ফিরিঙ্গীকে নিজের শোবার ঘরে এনে বসানোতে তেমন খুশি হয় না রুমার সেই পরিচারিকা। সে এতক্ষণ পাশের ছোট রান্নাঘরে ছিল। এক সময় সে রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে একটু সময় ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ভেতরে চলে যার।

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ম্যালকম রুমাকে বললে, ওকি, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

—হ্যাঁ বসছি, আগে বলুন কি খাবেন।

মৃদু হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, খাবো? কেন খাবো? আপনার এখানে তো খেতে আসি নি।

অল্প পরিচিত একজন সাহেবের কাছে নিজের জড়তাটুকু ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে রুমা। মৃদু হেসে সেও তেমনি জবাব দেয়, তবে কেন এসেছেন?

—আপনি আসতে বলেছিলেন বলেই এসেছি। কেন আসতে বলেছেন তা আপনিই জানেন।

—তাই নাকি? এবার খিল খিল করে হেসে ওঠে রুমা। হাসতে হাসতে বললে, আপনাকে খাওয়াবো বলেই তো আসতে বলেছিলাম।

—কেন খাওয়াবেন? সেদিন গঙ্গার পাড়ে আপনাকে গাড়ি জোগাড় করে দিয়েছিলাম বলে?

—যদি বলি তাই। সেদিন তো আপনি আমার যথেষ্ট উপকারই করেছিলেন।

ম্যাল্‌কম জবাব দেয়, তাহলে বলি, সেই উপকারের বদলে সামান্য খাবার খাইয়ে আপনি পার পেতে চান নাকি? অত সহজে ভুলবার পাত্র আমি নই। ভুলে যাবেন না, আমি পুলিশের লোক! সবকিছু বুঝে-শুনেই এই সন্ধ্যেবেলা এসেছি আপনার কাছে।

ম্যাল্‌কমের জবাবে রুমার চোখজোড়া সতর্ক হয়ে ওঠে। মনে মনে সে চিন্তা করে—কি বলতে চাইছে এই লোকটি।

বলতে থাকে ম্যাল্‌কম, না না, এত সহজে আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে আসি নি আমি। যতদূর জানি আপনাদের গানের আসর বসে সন্ধ্যেবেলা। সেই আসরে বসে বিনে পয়সায় আপনার গান শুনবো বলেই কষ্ট করে এতদূর এসেছি।

রুমা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, সেকি, আমাদের এই বাংলা-হিন্দী গান আপনার ভালো লাগে? আমি তো শুনেছি সাহেবরা ইংরেজি গান ছাড়া আর কোন গান ভালোবাসে না। আপনাদের মতে আমাদের দিশি গান তো নাকি খানিকটা বিলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

—হ্যাঁ, যেমন নাকি আপনাদের মতে আমাদের বিলিতি গান হচ্ছে প্রলাপ, কেমন? যাক্‌ ওসব কথা। আমি আপনার গান শুনতে এসেছি। এখন বলুন, কখন আপনাদের আসর বসছে?

ম্যাল্‌কমের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রুমা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকে। তারপর একসময় মুখ তুলে একটু হেসে বললে, ঠিক আছে, আসর বসুক চাই না বসুক আপনাকে আমি গান ঠিক শোনাবো।

সঙ্গতকারী নেই। কেবল তানপুরাটা হাতে নিয়েই বিছানার ওপর উঠে বসে রুমা বাঈজী। তার মুখের প্রসাধন মুখেই রয়ে গেল। শাড়িটা পাল্টানোর অবসর মিলল না। একজন সাহেব পুলিশ কষ্ট করে তার বাড়িতে এসেছে গান শুনতে। গান তাকে শোনাতেই হবে।

তানপুরার গায়ে গাল ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে সঙ্গত ছাড়াই গান গাইছে রুমা বাঈজী। সেদিন রাতের সেই গানখানা দিয়েই সে শুরু করেছে তার এই একক আসর—'বলে দে, সখী বলে দে, কোথায় গেলে শুনতে পাবো (সেই) পাগল করা বাঁশীর সুর।'

আপন মনে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে রুমা বাঈজী। তার মধুঝরা কণ্ঠের মূর্ছনায় যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক বিরহ-কাতরা নারীর মর্ম-বেদনা। আর তারই মধ্যে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে অভিভূত হয়ে বসে রয়েছে লালবাজারের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

একসময় রুমা একটু থামতেই তার সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা ঘরে ঢুকে বললে, মুজরোয় যাবে না, দিদিমণি? গাড়োয়ান যে অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি নিয়ে এসে বসে আছে।

সহসা চমক ভাঙে ম্যাল্‌কমের। লজ্জিতকণ্ঠে সে বলে ওঠে, অন্য কোথাও বুঝি আসর আছে আপনার? ছি-ছি, আই অ্যাম্‌ ভেরি সরি। আমি জানতাম না। কি লজ্জার কথা, আপনাকে আমি এতক্ষণ ধরে আটকে রেখেছি এখানে—

বৃদ্ধা পরিচারিকা এবার অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ—হ্যাঁ, একজন জমিদারের বাড়িতে আজ মাইফেলের ব্যবস্থা হয়েছে। দিদিমণির তো সেখানেই যাবার কথা। কিন্তু। কথাটা শেষ না করেই সে তেমনি অপ্রসন্ন মুখে তাকিয়ে থাকে

ম্যাল্‌কমের দিকে।

—আই অ্যাম্‌ সরি। আমি এখনই উঠছি। বলতে বলতে ম্যাল্‌কম খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়।

রুমা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। একটা কথাও বলে নি। ম্যাল্‌কম উঠে দাঁড়াতেই সে তার দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, আপনি বসুন। তারপর পরিচারিকাকে বললে, গাড়োয়ানকে গাড়ি নিয়ে ফিরে যেতে বলো, মাসী। আর ওদেরও একটা খবর দাও যে, আমার শরীর আজ ভালো নেই। আমি মাইফেলে যেতে পারবো না। মুজরোর অগ্রিম টাকাটাও সেই সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দাও। বলেই রুমা শান্ত ভঙ্গিতে তানপুরার তারে আঙুল দিয়ে আবার সুরের ঝঙ্কার তোলে।

বয়সে তরুণী এই মনিবটিকে ভালমতই চেনে বৃদ্ধা। একবার মুখের 'না' যে কোনক্রমেই আর 'হ্যাঁ' হবে না একথাও তার অজানা নয়। ম্যাল্‌কম এই সময় কি যেন একটু বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই তেমনি শান্তকণ্ঠে রুমা বললে, আপনি বসুন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার খাটের ওপর বসে পড়ে ম্যাল্‌কম। এ যেন অনুরোধ নয়—আদেশ। এই আদেশ যেন খোদ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের আদেশের চাইতেও কঠিন।

সেই প্রথম। তার পরেও সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম অনেকবার গেছে রুমা বাঈজীর বাড়িতে। সময়-সুযোগ পেলেই সে যায় তার কাছে। কিন্তু কেন যায়, কিসের লোভে যায় তা সে নিজেও বোধহয় জানে না। প্রথম প্রথম মনে হতো সুরের আকর্ষণই এর কারণ। কিন্তু পরে মনে হয়েছে ওটাই সব নয়। ওর বাইরে আরও কিছু আছে। তবে কি সে রুমা বাঈজীকে ভালোবাসে? না-না, তা' নয়। মেরিয়া—একটি সুন্দর গোলাপ ফুলের মত মেয়ে মেরিয়া। ম্যাল্‌কমের সারা দেহ-মন জুড়ে মেরিয়ার অস্তিত্ব। তাকে সে ভালোবাসে—প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসে।

পুরুষের জীবনে সাধারণত একান্ত গোপনীয় বলে কিছু থাকে না। কিন্তু ম্যাল্‌কমের আছে। রুমার সঙ্গে তার এই আশ্চর্য সম্পর্কের ব্যাপারটাই তার জীবনের একান্ত গোপনীয় কথা। একথা কাউকে বলার তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি তার বন্ধুরাও কিছু টের পায় নি কখনও। নিজের জীবনের এই একান্ত গোপনীয় কথাটি রত্ন-খচিত একটি কৌটায় পুরে সে রেখে দিয়েছে তার মনের সিন্দুকের এমন এক গোপনীয় প্রকোষ্ঠে, যার খবর স্বয়ং মেরিয়াও জানে না।

লালবাজারে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের ঘরে তখনও সেই পরামর্শসভা চলেছে, আর বাইরে দাঁড়িয়ে মনে মনে সেই সভার পরিসমাপ্তি কামনা করছে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। সভাশেষে টেগার্ট অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই সেদিনকার মত তারও ডিউটি শেষ হবে। এখান থেকে সোজা সার্জেণ্ট মেসে গিয়ে ধড়াচুড়ো ছেড়ে বেড়িয়ে পড়বে মেরিয়ার বাড়ির দিকে।

চায়ের সরঞ্জাম সমেত ট্রে নিয়ে একজন আর্দালী সন্তর্পণে সি. পি.-র ঘরে

ঢুকল। এতক্ষণে বোধহয় শেষ হলো সেই পরামর্শ-সভা। এবার কর্তা-ব্যক্তিরা সবাই মিলে হাল্কা মেজাজে চা পান করবেন, তারপর একে একে বেরিয়ে আসবেন ঘর ছেড়ে। সবার শেষে বেরিয়ে আসবেন চার্লস টেগার্ট। এ্যাটেনশন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে কড়া হাতে তাঁকে স্যালুট করবে ম্যাল্‌কম। ঈষৎ মাথা দুলিয়ে প্রত্যাভিবাদন করবেন চার্লস।

সহসা একজন কনস্টেবল্‌ হাতে একখানি কাগজ নিয়ে এসে দাঁড়ায় ম্যাল্‌কমের সামনে। ম্যাল্‌কম চোখ তুলে তার দিকে তাকাতেই কনস্টেবলটি কাগজখানা তার হাতে তুলে দিয়ে বললে, টেলিগ্রাম, স্যার।

—টেলিগ্রাম! কিস্‌কো টেলিগ্রাম? কাগজখানার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করে ম্যাল্‌কম।

জবাব দেয় কনস্টেবল, সি. পি-কো টেলিগ্রাম, সাব। ঢাকা সে আয়া।

ঢাকা থেকে আবার কিসের টেলিগ্রাম এলো! কাগজখানার ওপর চোখ দুটো স্থির রেখে সি পি-র ঘরের দিকে দু'পা এগিয়ে যায় ম্যাল্‌কম। কিন্তু একি দুঃসংবাদ! এমন একটা কাণ্ড ঘটল কেমন করে? বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার লোম্যাল—

না, মারা যাননি মিস্টার লোম্যান। তবে সাংঘাতিকভাবে আহত। আর সেই সঙ্গে আহত হয়েছে ঢাকার এস. পি. মিস্টার হাডসন।

ঢাকায় বাৎসরিক ইন্সপেকশনে এসেছেন মিস্টার লোম্যান। পুলিশ মহলে সাজ-সাজ রব। পুলিশের খোদ বড়কর্তা এসেছেন ঢাকা রেঞ্জ ইন্সপেকশনে। তাঁর ইচ্ছেমত পুলিশের যে-কোন অফিস, রেঞ্জের যে-কোন থানা তিনি ইন্সপেকশন করতে পারেন। তা ছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু জরুরী আলোচনাও আছে এখানকার অফিসারদের সঙ্গে।

দেশের পরিস্থিতি মোটেই সুবিধের নয়। সন্ত্রাসবাদীরা খুবই সক্রিয়। যে-কোন সময় একটা কিছু যদি ঘটে যায় তাহলে হাডসনের লজ্জার আর শেষ থাকবে না। বিশেষ করে, ঢাকা শহরে যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে তাহলে তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী হবে ঢাকার এস পি হাডসন। গভর্নমেন্টের কাছে অযোগ্য প্রতিপন্ন হতে হবে তাকে।

কাজেই পুলিশমহলে জোর প্রস্তুতি। শত শত ডি আই. বি অফিসার, ওয়াচার কনস্টেবলেরা ছড়িয়ে পড়েছে শহরের চারিদিকে। সন্ত্রাসবাদীদের কার্য-কলাপের ওপর তাদের কড়া নজর রাখতে হবে।

মিস্টার লোম্যানের ট্যুর প্রোগ্রাম অত্যন্ত গোপনীয়—টপ্‌ সিক্রেট। তাঁর একান্ত বিশ্বাসী স্টেনোগ্রাফার ছাড়া ট্যুর প্রোগ্রামের খবর একমাত্র জানা আছে এস. পি হাডসনের। প্রোগ্রামের কথা যাতে আগে-ভাগেই সন্ত্রাসবাদীরা জানতে না পারে তার জন্যেই এই সতর্কতা।

হাডসন সর্বদা ছায়ার মত লোম্যানকে অনুসরণ করছিল দুটো মাত্র কারণে। প্রথমত, হাডসন চাইছিল আই. জি. পি. নিজের চোখে দেখুক তার পুলিশী ব্যবস্থা কত ত্রুটিহীন। সে নিজে যে একজন যোগ্য পুলিশ-সুপার সেই প্রমাণই সে রাখতে চেয়েছিল তাঁর কাছে। আর দ্বিতীয়ত, পুলিশ-প্রধানকে একটু তেল

দিতে চাইছিল এস. পি. হাডসন, যাতে তার পুলিশ অফিস পরিদর্শন করে আই. জি. সাহেব খুশি হয়ে ভালো রিপোর্ট দেন।

কার্যসিদ্ধি হলো পুলিশ-সুপার হাডসনের। পুলিশ লাইনের মাঠে পুলিশ বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে খুশি হলেন লোম্যান। এমনকি অফিস ইন্সপেকশনেও তাঁকে খুশি করতে বেগ পেতে হলো না হাডসনের। যে রকম রাজসিক খানাপিনার আয়োজন ও সেই সঙ্গে যে পরিমাণ তৈল মর্দনের ঘটা, তাতে মানুষ তো কোন্ ছার, স্বয়ং দেবতারাও সন্তুষ্ট না হয়ে পারেন না।

পরিদর্শন শেষে পুলিশ-সুপারের ঘরে বসে চা খেতে খেতে লোম্যান রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলকে বললেন, মিস্টার বার্ট এখন কেমন আছেন?

ডি. আই, জি. অত শত খবর রাখেন না। তাই তিনি এস. পি হাডসনের দিকে তাকাতেই হাডসন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, মিস্টার বার্ট এখনও মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল হাসপাতালেই আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে আরও কিছুদিন লাগবে।

—আই সী! কলকাতা ফেরার আগে তাঁকে একবার দেখতে যাবো। লোম্যান বলেন।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। খোদ পুলিশের বড়কর্তার ইচ্ছে হয়েছে মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে যেতে। কাজেই তাঁকে নিরস্ত করবে কে? কিন্তু হাডসনের একবার ইচ্ছে হয়েছিল বলে, স্যার, ওদিকটায় এখন না যাওয়াই ভালো। হোস্টেলের ছেলেগুলো তেমন সুবিধের নয়। যদি একটা কিছু—

না, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এফ. জে লোম্যানকে কিছুই বললে না হাডসন। পাছে নিজে অযোগ্য প্রমাণিত হয় সেই ভয়েই সে কিছু বললে না। পুলিশের বড়কর্তা সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে শহরের কোন একটা এলাকায় যেতে পারবেন না এতে তার অধস্তন কর্মচারী জেলার এস. পি-রই বদনাম।

হাডসন কেবল জিজ্ঞেস করে, আজই যেতে চান, স্যার?

মিস্টার লোম্যান বুদ্ধিমান ব্যক্তি। হাডসনের কথার অর্থ বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় না। হাডসন ঐ প্রশ্ন করে কিছুটা সময় চাইছিল, যাতে সে মেডিকেল স্কুল হাসপাতাল এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা করতে পারে।

একটু হেসে লোম্যান বললেন, অল রাইট, আজ নয়, কাল যাব মিস্টার বার্টকে দেখতে। মানুষটা অনেকদিন অসুখে ভুগছে।

পাকা ব্যবস্থা। মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর কেউ জানে না সেদিন মিস্টার লোম্যান হাসপাতালে আসবেন। অবশ্য খবরটা মিস্টার বার্টকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চারদিকে পুলিশ আর পুলিশ। উর্দিহীন সাদা পোশাকের পুলিশেও ছেয়ে গেছে গোটা এলাকা। হাসপাতালে নিজের কেবিনে শুয়ে পোর্ট-পুলিশের এস পি. মিস্টার বার্ট অপেক্ষা করছিল পুলিশের বড়কর্তার জন্যে। খোদ আই. জি. পি তাকে দেখতে আসছেন হাসপাতালে, এটা তার নিজের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা।

যথাসময় এলেন মিস্টার লোম্যান। সঙ্গে মিস্টার হাডসন। লোম্যানের

গায়ে সেদিন পুলিশের পোশাক ছিল না। কিন্তু হাডসন পুরো ইউনিফর্ম পরে উপস্থিত। আই জি পি-কে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তার এলাকায় ইউনিফর্ম পরে চলাফেরা করতে বিলিতি সাহেবদের বিপদের আশঙ্কা নেই।

গাড়ি থেকে নেমে লোম্যান ও হাডসন সোজা ঢুকে যায় হাসপাতালের মধ্যে। ড্রাইভার ও কনস্টেবলেরা অপেক্ষা করতে থাকে বাইরে।

ঢাকার মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল হাসপাতাল। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় বাগান, এখানে-ওখানে দেবদারু ও অন্যান্য কয়েকটা গাছ।

মিস্টার বার্টের সঙ্গে দেখা হলো লোম্যানের। কথাবার্তা হলো কিছুক্ষণ। তারপর তার আরোগ্য কামনা করে ফিরে চললেন লোম্যান। সঙ্গে হাডসন।

পুলিশ গাড়ির ড্রাইভার উঠে বসেছে তার সীটে, পুলিশ গার্ডরাও যে-যার আসনে উপবিষ্ট। আর্দালী গাড়ির দরজা খুলে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিচে। হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে কয়েক পা মাত্র এগিয়েছেন মিস্টার লোম্যান, পেছনে হাডসন। সহসা—

দেবদারু গাছের আড়ালে মেডিকেল স্কুলের তরুণ ছাত্র বিনয় বসু দাঁড়িয়ে ছিল স্থির হয়ে। হাতে তার উদ্যত পিস্তল। একটা শক্ত কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে সে। হয় লোম্যান, নয়তো সে নিজে। মৃত্যুদেবতাকে যে-কোন একটা ভেট দিতেই হবে। শান্ত সৌম্য চেহারা বিনয়ের। তার চোখে-মুখে এতটুকু উত্তেজনার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ধীর স্থির অচঞ্চল। যেন দেবদারু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে এমনি তার ভাব ভঙ্গি।

মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বিনয় বসু কেবল ডিসেক্সন রুমে অব্যর্থ লক্ষ্যে মৃতদেহের ওপর ছুরি চালাতেই জানে না, পিস্তলের লক্ষ্যাতেও সে অদ্বিতীয়।

লোম্যান ও হাডসন তাদের গাড়ির দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসতেই বিনয়ের পিস্তল পর পর দু'বার গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হলো লোম্যান ও হাডসন। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আশেপাশের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বিনয়।

কবিগুরুর 'হোরি খেলা' কবিতায় যদিও পাঠানেরা যে-পথ দিয়ে এসেছিল সে-পথ দিয়ে ফিরে যেতে পারল না, কিন্তু ইণ্ডিয়ান পুলিশের একজন জাঁদরেল অফিসার এফ. জে লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ-সুপার ই. হাডসন কিন্তু হাসপাতালের যে পথ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই আবার ভেতরে ঢুকল। তবে এবার আর পায়ে হেঁটে নয়, স্ট্রেচারে।

সুইংডোর ঠেলে টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে সি. পি-র ঘরে প্রবেশ করে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। তারপর চার্লস টেগার্টকে স্যালুট করে বললে, আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম ফ্রম ঢাকা, স্যার।

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামখানা গ্রহণ করেন চার্লস টেগার্ট। কাগজখানার ওপর চোখ বুলিয়ে পরক্ষণেই চেয়ার ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে বলে উঠেন, হাউ হরিবল্!

চীফের দেখাদেখি উপস্থিত ডেপুটিরাও ততক্ষণে চায়ের কথা ভুলে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখে-মুখে তাদের আতঙ্কের চিহ্ন। টেগার্ট মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ারে আবার বসে পড়ে প্রায় অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠেন,

লোম্যান এ্যান্ড্ হাডসন সিরিয়াসলি ইন্‌জিওর্ড বাই টেররিস্টস্। লোম্যানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখ্‌নি মেডিবেল হেল্প চাই।

টেগার্টের কথা শেষ হতেই ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে টেলিফোন। টেগার্ট রিসিভারটা তুলে নিতে নিতে বললেন, মোস্ট্ প্রব্যাবলি চীফ্ সেক্রেটারী।

অনুমান মিথ্যে নয় টেগার্টের। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আই সি এস্ চীফ সেক্রেটারীর। তাঁর প্রশ্নের জবাবে টেগার্ট বললেন, ইয়েস স্যার, এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম।

ওপাশ থেকে চীফ্ সেক্রেটারীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, এখনই মেডিকেল হেল্প চাই। আমি স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি সার্জন হর্নেটের নাম সাজেস্ট করেছেন। আপনি কি বলেন?

—খুব ভালো স্যার, এখানকার সব চাইতে বড় এবং অভিজ্ঞ সার্জেন হচ্ছেন তিনি। তাঁকে পাঠাতে পারলেই সব চাইতে ভালো হয়। সেই সঙ্গে কয়েকজন অভিজ্ঞ নার্স।

—ঠিক আছে, আমি সেই ব্যবস্থাই করছি। আপনি ওদের ঢাকা যাবার জন্যে প্লেনে সীটের ব্যবস্থা করুন। ইমিডিয়েট।

—অল রাইট্, স্যার। বলেই টেলিফোন ছেড়ে দেন চার্লস টেগার্ট

## ॥ পাঁচ ॥

ডালহৌসী স্কোয়ার।

কত লিখিত অলিখিত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকা। ওপাশে জি পি ও, এপাশে রাইটার্স বিল্ডিংস ও তার পাশে পুরানো গীর্জা। ইট-কাঠের যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত তাহলে হয়তো এই বাড়িগুলোর দেওয়ালের প্রত্যেকখানি ইট ও কড়ি-জানলার প্রত্যেকটি কাঠের টুক্‌রো সেদিনের প্রতিটি ঘটনার ধারাবিবরণী অবিকল টেপ-রেকর্ডের মত নির্ভুলভাবে একালের মানুষকে শোনাতে পারত। এখানকার মাটির প্রতিটি অণু-পরমাণু বলতে পারত সেদিনকার কথা-কাহিনী, যা নাকি উপন্যাসের চাইতেও রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর। বস্তা বস্তা দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে একালের মানুষকে আর কষ্ট করে সত্যকে উদ্ধার করতে হতো না মিথ্যার বেড়াজাল থেকে।

রাইটার্স বিল্ডিংস—লালবাড়ি। কোন্ কালে সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বিলিতি রাইটার অর্থাৎ সাহেব-কেরানীরা এখানে বসে সরকারী কাজ সমাধা করত, সেই থেকে এই বাড়ির ঐ নাম। এককালে এই শহর কলকাতা যখন ছিল গোটা ভারতের রাজধানী, তখন এই বাড়ি থেকেই পরিচালিত হতো সারা দেশ। পরবর্তী কালেও এই বাড়িটিই ছিল সরকার পরিচালনার প্রধান ঘাঁটি। আজও তাই আছে। বিলিতি সিভিলিয়ানরা আজ আর নেই, আছে দিশি কর্তাব্যক্তিরা। সাহেব-কেরানীকুল আজ অন্তর্হিত, কিন্তু তাদের আসন অলঙ্কৃত করে রয়েছে দিশি কেরানীরা, যাদের বর্তমান নাম 'অফিস অ্যাসিস্টেন্ট'।

সেদিন তেমনি একজন অফিস অ্যাসিস্টেন্টের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়ে

পড়েছিল বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের। অল্পবয়সী ছোকরা, কাজ করে সেক্রেটারীয়েটের হোম-পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে। অ্যাকাউটেণ্ট জেনারেল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের অফিসেই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ম্যাল্‌কমের।

ম্যাল্‌কমের কথায় বিস্মিত কণ্ঠে ছোকরাটি বলেছিল, সেকি! কোন্‌ কালে আপনি রিটায়ার করেছেন, এখনও আপনার পাওনা সেই শ'খানেক টাকার কোন ব্যবস্থা হলো না?

মুখে কেবল একটু হাসি টেনে জবাব দিয়েছিল বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম, সরকারী ব্যাপার, একবার জট পাকালে তা ছাড়াতে যুগ কেটে যায়। আমার পাওনাগণ্ডা বহুকাল আগেই আমি সরকারের কাছ থেকে পেয়ে গেছি। পাই নি কেবল ঐ টাকা ক'টা। আমার আর্থিক অবস্থা তেমন হলে হয়তো ও নিয়ে আমি আর তেমন একটা মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু—

—না না, তা কেন? পাওনা টাকা ছাড়বেন কেন? ঠিক আছে, আপনি একদিন রাইটার্সে আমার কাছে আসুন। পুরানো ফাইল-পত্র ঘেঁটে দেখি কিছু করা যায় কিনা।

সেই ছোকরাটির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন হাঁটতে হাঁটতে রাইটার্সের সামনে এসে দাঁড়ায় ম্যাল্‌কম।

রাইটার্স বিল্ডিংস-বিরাট সরকারী লালবাড়ি। মাথার ওপর তে-রঙা পতাকা উড়লেও এখনও ওর গায়ে লেগে রয়েছে ব্রিটিশ স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন সিংহদ্বার-ঢঙে তৈরী তিনটি ব্যালকনির মাথার ওপর। মুখোমুখি বসে তিন-জোড়া সিংহ যেন পাহারা দিচ্ছে সেই সিংহদ্বার। আরও ওপরে ছাদের ওপর বিরাজ করছেন দেবীরা। বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য ও বিচার—এই চারটি বিষয়ের চারজন দেবী সমান ব্যবধানে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে তাকিয়ে আছেন দক্ষিণ দিকে। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে একদা যে বণিকরা এদেশে এসেছিল তারা রাজদণ্ড হাতে পেয়ে এদেশের মানুষকে প্রকৃত সভ্য করে তুলতে কি পরিমাণ চেষ্টা করেছিল তারই নিদর্শন যেন লেগে রয়েছে মূর্তিগুলোর মধ্যে।

পশ্চিম প্রান্তে বিরাজ করছেন বিজ্ঞানের দেবী। মাঝখানে বসে আছেন তিনি। তাঁর ডানদিকে লম্বা 'রোব' কিংবা 'গাউন' এবং মাথায় স্নাতকের টুপি পরা একজন দাড়িওয়ালা বিলিতি বিজ্ঞানী। বাঁ-হাতে বই। আর দেবীর বাঁদিকে দাঁড়িয়ে একজন ভারতীয়। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে বোতামের বদলে সেকালের ফিতে লাগানো কুর্তা, মাথায় পাগড়ি। দেবীর কৃপাধন্য সেই বিলিতি বিজ্ঞানী যেন ঐ অর্ধনগ্ন ভারতীয়কে বিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলতে চাইছে।

এর পরে বিরাজমানা কৃষির দেবী। দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর ডান-দিকে একজন বিলিতি কৃষক। আর দেবীর বাঁদিকে খালি-গা, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি ও মাথায় ছোট পাগড়ি পরে বসে আছে একজন এদেশীয় কৃষক শ্রেণীর মানুষ। এদেশীয় মানুষটি দেবীর দিকে পিছন ফিরে বসে। তার বসে থাকার ভঙ্গিতে মনে হয় যেন সে রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। আর দেবী যেন তারই দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বোঝাতে চাইছেন তাকে। এদেশের

অবৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত পথের দিকে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টার নিদর্শন বোধহয় এটা।

আরও পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে আছেন বাণিজ্যের দেবী। তাঁর ডানদিকে বসে আছে একজন বিলিতি ব্যবসায়ী। বাঁ-হাতের কাছে পৃথিবীর একটি গ্লোব। এটা বোধহয় পৃথিবীব্যাপী বিলিতি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিদর্শন। দেবীর বাঁদিকে একজন এদেশীয় ব্যবসায়ী। সেকালের ব্যবসায়ীর পোশাক তার গায়ে, মাথায়ও তেমনি পাগড়ি। মূর্তির শিল্পী বোধহয় এদেশীয় মানুষটির চেহারায় রাজস্থানী-ছাপ ফুটিয়ে তুলতে ভুলে গিয়েছিল।

সবশেষে পূর্বদিকে একখানি সিংহাসন অধিকার করে বসে আছেন বিচারের দেবী। আসনের হাতলের ওপর তাঁর হাত দুখানি এমনভাবে স্থাপিত যেন দেবী নিজেই একজন জাঁদরেল বিচারক। দেবীর বাঁদিকে একজন এদেশীয় ব্যবহার-জীবি দাঁড়িয়ে যেন কিছু বলছে, আর ডানদিকে একজন বিলিতি ব্যবহারজীবী বসে বসে গালে হাত দিয়ে যেন তা শুনছে। বাস্তবিক অপূর্ব! বিটিশ রাজ-পুরুষেরা বিচারের নামে প্রহসনের যে নজীর এদেশে রেখে গেছে তার বুঝি তুলনা নেই। তাই তো ওরা সেকালে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিল মহারাজা নন্দকুমারকে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ইলাইজা ইম্পের সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংসের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা তো ওদের মতে কেবল কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না! তাই তো ওরা একালের আইনের মন্ত্র পাঠ করতে করতেই শত শত দেশপ্রেমী যুবককে দিয়েছিল ফাঁসির হুকুম। সেদিন আদালতে প্রমাণের চাইতে প্রয়োজনের কথাই চিন্তা করেছিল বিলেতি বিচারকেরা। এর পরেও কোন্ নিন্দুকেরা বলতে পারে যে, ব্রিটিশ জাতি বিচার-ব্যবস্থাকে সম্মান দেখাতে জানে না?

সব চাইতে মজার ব্যাপার হলো রাইটার্সের মাথার ওপর ঐ দেবীদের পাশে বিলিতি ও দেশীয় মানুষগুলোর পারস্পরিক অবস্থান। এদেশীয় প্রতিটি মানুষের মূর্তি দেবীর বাঁদিকে অবস্থিত, আর ডানদিকে বিলিতি মানুষেরা। তবে কি ওরা চিরকালই এদেশের মানুষকে লেফটিস্ট বলে মনে করতে অভ্যস্ত ছিল? নাকি এদেশের ওপর যে বিধি বাম তাই ওরা প্রকাশ করতে চেয়েছিল ঐ মূর্তিগুলোর মাধ্যমে?

হাতের লাঠিখানার ওপর ঈষৎ ঝুঁকে রাস্তা পার হয়ে ওপাশের ফুটপাথের ওপর এসে দাঁড়ায় ছ'ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা বৃদ্ধ ম্যালকম। তারপর গেট পেরিয়ে চলে আসে ভিতরের দিকে।

অনেকদিন পরে রাইটার্সের ভেতরে ঢুকলো ম্যালকম। না, তেমন কিছু বদলায় নি। তবে চোখে পড়েছে দু'একটা নতুন বাড়ির অস্তিত্ব যা নাকি সেকালে ছিল না। আসল বাড়ি ঠিক তেমনি রয়েছে। তবে আগের চাইতে জীর্ণ, অপরিষ্কার।

দোতলায় ওঠার সাবেক কালের সেই পুরানো সিঁড়ি আজও রয়েছে। খাড়াই লোহার সিঁড়ি। পা রাখার লোহার পাতগুলো জুতোর ঘষায় মসৃণ হয়ে উঠেছে। লোহার হাতলগুলোর অবস্থাও তেমনি।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একবার ওপরের দিকে তাকায় ম্যালকম। মনে মনে হিসেব করে, ওপরে উঠতে হলে তাকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে। একবার মনে হয় ফিরে গিয়ে বাইরের লিফ্‌টের সামনে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই লিফ্‌টের সামনে মানুষের দীর্ঘ লাইনের কথা মনে পড়তেই লিফ্‌টে চড়ার উৎসাহ আর থাকে না। লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করার চাইতে কষ্ট করে হেঁটে ওপরে ওঠা অনেক ভালো।

সিঁড়ি বেয়ে লোকজন উঠছে নামছে। কেউ কেউ এই দীর্ঘদেহী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে আপন কাজে। হাসি-ঠাট্টায় উচ্ছল একদল মেয়ে-কর্মচারী লোহার সিঁড়িতে শ্লিপারের শব্দ তুলে নিচে নেমে এল।

লোহার হাতলের ওপর ভর দিয়ে এক পা এক পা করে ওপরে উঠতে থাকে ম্যালকম। মনে মনে একবার সেই ছোকরাটির নাম উচ্চারণ করে। সহসা তার মনে পড়ে আর একটি দিনের কথা। শীতকালের এমনি এক দুপুরেই তাকে উঠতে হয়েছিল রাইটার্সের এই দোতলায়। না, চেষ্টা করেও সেদিন তারা উঠতে পারে নি। তারা মানে বিরাট পুলিশ ফোর্স। সঙ্গে খোদ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট।

তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে বৃদ্ধ ম্যালকমের। তিরিশ সালের ডিসেম্বর মাসের আট তারিখ। মহানগরীর বুকে ব্রিটিশ শাসকদের নাকের ডগায় সেদিন যে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল, তার কথা মনে পড়লে আজও দেহ-মনে এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনা অনুভব করে ম্যালকম। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা বিশ্বে সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল সেই কাহিনী। প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ শাসকবর্গের সেদিনের সেই নাস্তানাবুদ হওয়ার কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী রাজপুরুষেরা, আর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষসহ সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মুক্তি-পাগল মানুষগুলো। হ্যাঁ, এই চাই। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই একটা মাত্র যুক্তিই বুঝতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোন যুক্তি ওদের বোধগম্য নয়।

উনিশ শ' তিরিশ সালের অগ্নিযুগের বাংলাদেশ। একদল মুক্তি-পাগলের দেহের রক্তে সর্বনাশের নেশা জমেছে। এ নেশা পৃথিবীর ভয়ংকরতম নেশার চাইতেও ভয়ংকর। এ নেশা যাকে ধরে তার আর কোনকালেই মুক্তি নেই। হয় মন্ত্রের সাধন, নয় তো শরীর পতন। এই দুয়ের মাঝখানে আর কোন পথ খোলা থাকে না তাদের।

জবরদস্ত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের ওপর যেদিন বোমা ছোঁড়া হলো কলকাতায়, তার ঠিক চারদিন পরে ঢাকায় ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার লোম্যানকে হত্যা করা হলো। আর তারই একশ' দিন পরে রাইটার্স বিল্ডিংসে ঘটল ওই অঘটন।

এখানকার চাকরি শেষ হয়ে এসেছে চার্লস টেগার্টের। আর মাত্র কয়েক-মাস পরেই তাঁকে বিলেত চলে যেতে হবে। অবসর দিনগুলো তার কাটবে বিলেতের মাটিতেই! সেদিন ইচ্ছে হলে তিনি বৃষ্টিঝরা শীতের দুপুরে

নিজের পার্লারে বসে পর্যালোচনা করবেন বাংলাদেশের মাটিতে নিজের অতীত জীবনের কাহিনী—কীর্তিকলাপের কথা।

কিন্তু সেই সুযোগ তাঁর জীবনে আসবে কি? চারদিকের যা পরিস্থিতি তাতে ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা কে কবে আছে কবে নেই তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে? মিস্টার লোম্যান ঢাকা যাওয়ার আগে কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া? ঘুণাক্ষরেও কি তিনি টের পেয়েছিলেন যে, তাঁর মরণকাঠিটি রয়েছে যার হাতে তার নাম বিনয় বোস?

এই কথাটাই রাতদিন বসে বসে চিন্তা করেন মিসেস টেগার্ট। দু'নম্বর কিড্ স্ট্রীটের প্রহরী-ঘেরা বাড়িতে বসে স্বামীর জন্যে দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম হয় না। কিন্তু যাকে নিয়ে তাঁর এমন দুশ্চিন্তা, সেই লোকটির যেন এসব দিকে তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ নেই। সত্যিই তাই। চার্লস টেগার্ট ভয়ঙ্কর অত্যাচারী, চার্লস টেগার্ট ভয়ঙ্কর সাহসী।

লোম্যানের হত্যার প্রতিশোধ নিতে উঠে-পড়ে লেগেছে ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণী। দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদীদের সমূলে উৎপাটিত করতেই হবে, নইলে দেশের মানুষের কাছে মুখ দেখানোই ভার হয়ে উঠবে। যে করেই হোক ধরতেই হবে বিনয় বোসকে। ফাঁসির দড়িতে তাকে ঝুলিয়ে দিতেই হবে।

সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখন ধরপাকড়। সেদিন যুবক মাত্রই সন্দেহজনক ব্যক্তি। ধরো আর মারো। অত্যাচারে জর্জরিত করে তাদের কাছ থেকে আদায় করো স্বীকারোক্তি।

মিসেস টেগার্ট একদিন স্বামীকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, প্রি-ম্যাচিওর রিটায়ার করা চলে না?

ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে টেগার্ট পাল্টা প্রশ্ন করেন, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

গম্ভীর মুখে মিসেস টেগার্ট বললেন, যদি পেয়েই থাকি তবে কি সেটা অন্যায় হবে বলতে চাও?

—পুলিশ কোডে কাওয়ার্ডিস্ অর্থাৎ ভীরুতা একটা মস্ত বড় অপরাধ, জানো তো?

—পুলিশ কোড তোমার জন্যে, আমার জন্যে তো নয়। আমি তো আর তোমাদের ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি না।

—তা অবশ্য বটে, এবার একটু জোরে হেসে ওঠেন চার্লস, তারপর আবার বলতে থাকেন, আর তো মাত্র কয়েক মাস চাকরি করব, তারপরেই চলে যাব হোমে। এই ক'টা মাস দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

—কেটে গেলে তো বাঁচি। কিন্তু সত্যিই কাটবে কি? কে বলতে পারে যে, আর একটা বিনয় বোস কলকাতার কোন অলিগলিতে তোমার জন্যে ওৎ পেতে বসে নেই?

—তা বটে। তবে কি জানো, আজ হোক কাল হোক ঐ বিনয় বোসেরা একদিন আমাদের হাতে ধরা পড়বেই। সেদিন ওদের ক্লাস করে এদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকে নিরঙ্কুশ করে তুলবো আমরা।

— কিন্তু তার আগে তোমাদের মধ্যে ক'জন ওদের হাতে ক্লাশ হবে তার ঠিক কি ?

—হলে হবে, আগে থেকেই ক্ষয়-ক্ষতির চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলে তো যুদ্ধ করাই চলে না।

—তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে, দেশের টেরীরিস্টদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে রয়েছ ?

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেন টেগার্ট, ডেফিনিট্‌লি। তবে সম্মুখ-সমর নয়, চোরা-গোপ্তা আক্রমণ। সম্মুখ-যুদ্ধের হিম্মৎ ওদের নেই।

স্বামীর ভুল শুধরে মিসেস টেগার্ট বললেন, না তা নয়, হিম্মৎ ওদের যথেষ্টই আছে। তবে তেমন অস্ত্রবল ও প্রস্তুতি নেই। বুড়ি বালামের তীরে কিংবা চট্টগ্রামে যা ঘটেছিল তারপরেও কি বলবে ওদের হিম্মৎ নেই ?

চার্লস টেগার্ট মনে মনে স্ত্রীর কথায় সায় দিলেও মুখে কিছু না বলে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন।

কর্মব্যস্ত লালবাজার, কর্মব্যস্ত লর্ড সিন্‌হা রোডের আই বি এবং এস বি অফিস। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার ঘন ঘন ছুটে আসছে লালবাজারে। প্রায় প্রতিদিন আলোচনা-সভা বসছে কমিশনারের ঘরে। একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের ইঙ্গিত যেন জেগে উঠছে শহর কলকাতার আকাশে-বাতাসে। কিসের যেন একটা প্রস্তুতি। রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে লালকালি দিয়ে লেখা বিভিন্ন ধরনের পোস্টার—মৃত্যু-উৎসবে যোগ দেবার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ। ঐ পোস্টারের ভাষা শহরের নিরীহতম মানুষটির রক্তেও জাগিয়ে তোলে উত্তেজনার বন্যা। রক্ত চাই—আরও রক্ত চাই। স্বাধীনতার দাম মিটিয়ে দিতে হবে রক্ত দিয়ে। এ ছাড়া অন্য কোন সহজ উপায় নেই।

বি ভি—বি ভি—বি ভি—সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে শাসক মহলের মনে কেবল ঐ একটি শব্দ—বি ভি - বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। রক্ত দিতে ও রক্ত নিতে সমান উৎসাহ ওদের। ওরাই কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে ঐ ভয়ঙ্কর মরণ-যজ্ঞের সামিল হতে।

সাদা পোশাক পরা পুলিশে ছেয়ে গেছে শহর কলকাতা। কে যে বি ভি-র সদস্য আর কে যে নয়, তা বিচার করাই যেন একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। তেমনি কে যে পুলিশের চর আর কে যে নয়, তা যাচাই করাও হয়ে উঠেছে দুরূহ। ফুটপাথে মাথার ঝাঁকাটা পাশে রেখে যে লোকটি বসে বসে খৈনি টিপছে তার ঠিকানা হয়তো লর্ড সিন্‌হা রোডের এস বি, অফিস। আবার বোকাসোকা যে গ্রাম্য ছেলেটি একরাশ ধুলোপায়ে এই মাত্র হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে এসে প্লাটফর্মে দাঁড়াল, তার কোমরে হয়তো গোঁজা রয়েছে ভয়ঙ্কর এক পিস্তল। পুলিশের ইন্টেলিজেন্সের ওপর বিপ্লবীদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। এমনিভাবেই আপাত-শান্ত কলকাতা সেদিন ভেতরে ভেতরে থর থর করে কাঁপছে।

লালবাজারে সি. পি. টেগার্টের ঘরে মুহুর্মুহু বেজে উঠছে টেলিফোন। কখনও চীফ সেক্রেটারী, কখনও হোম সেক্রেটারী। বলার কথা সকলেরই

এক। অ্যাক্‌শন—অ্যাকশন। অ্যাক্‌শনের রেজাল্ট দেখতে চাই আমরা। ব্রিটিশ রাজপুরুষদের এমন নির্বিচার হত্যা মহামান্য ভারত সরকার আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নন।

শীতকাল। বেলা বারোটা বেজে মাত্র কয়েক মিনিট হয়েছে। লালবাজার হেডকোয়ার্টার্স সরগম। সি পি. চার্লস টেগার্ট তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন। ডেপুটি ও অ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনারেরাও যে যার ঘরে কর্মব্যস্ত। নিচে উত্তর দিকের খোলা জায়গায় পুলিশের গাড়ি আসছে যাচ্ছে। গেটে যথারীতি বন্দুকধারী প্রহরী।

হঠাৎ ঘরে ঝন্ ঝন্ শব্দে আবার বেজে ওঠে টেলিফোন। টেলিফোনের রিসিভারটা কানে তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে যে কথাগুলো ভেসে আসে তা শুনেই মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন চার্লস টেগার্ট। এও সম্ভব? বিলিতি কোন ম্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শুনছেন না তো তিনি? খোদ বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা? ব্রিটিশ সরকারের শক্ত ঘাঁটি খোদ রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করেছে মাত্র তিনজন সন্ত্রাসবাদী তরুণ যুবক!

রিসিভারটা ছেড়ে দিতেই আবার বেজে ওঠে আর একটা টেলিফোন। এবারও সেই একই কথা - হেল্প—হেল্প - ইমিডিয়েট হেল্প! টেররিস্টরা ভয়ানক কাণ্ড করে চলেছে। সাদা চামড়া দেখলেই গুলি চালাচ্ছে। আহত ও নিহত রাজপুরুষদের সংখ্যা নির্ণয় করা যাচ্ছে না। ইমিডিয়েট পুলিশ হেল্প চাই। টেলিফোনের মাধ্যমে লালবাজারে চার্লস টেগার্টের কাছে যে খবর পৌঁছল তার এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। সেদিন সত্যিই তিনটি তরুণ মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সরকারী শাসনযন্ত্রটাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

রাইটার্স বিল্ডিংস! কড়া পুলিশী-ব্যবস্থা চারদিকে। যে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারলেও সন্দেহজনক কাউকে দেখামাত্র গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ ভেতরে যেতে না পারে তার জন্যে ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই। আর সেকথা জানা ছিল বলেই স্রেফ পোশাকের জোরেই কারুর মনে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক না ঘটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো তিনটি বিপ্লবী তরুণ—বিনয় বোস, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত।

উদ্দেশ্য ছিল তাদের একটিই। ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন—জেল-বিভাগের বড়কর্তা লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল সিম্পসনকে তাদের চাই। দেখতে হবে এই ফৌজী মানুষটি দেহে কত শক্তি ধরে। ক্ষমতার গর্বে গর্বিত এই লোকটিই এ বছর এপ্রিল মাসে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে লবণ আইন ভঙ্গকারী সত্যা-গ্রহীদের ওপর নির্মম অত্যাচার করতে হুকুম দিয়েছিল। জেল ওয়ার্ডারদের এলোপাথাড়ি লাঠি-চার্জের ফলে সেদিন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন দেশবরেণ্য নেতা সুভাষ বোস। যে ব্যক্তি বাংলার দুলাল সুভাষের গায়ের রক্ত ঝরানোর জন্যে দায়ী তাকে নিজের জীবন দিয়েই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অতএব সিম্পসনকে চাই।

বলা নেই কওয়া নেই বিলিতি পোশাক পরা তিনটি যুবক গটমট করে এসে দাঁড়ায় সিম্পসনের অফিসের সামনে। পরক্ষণেই আর্দালীকে এক ধাক্কায় সরিয়ে

দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। বিনা স্লিপে তিনটি যুবকের এমনি অভদ্রভাবে ঘরে প্রবেশ করায় বিরক্ত সিম্পসন হয়তো কিছু বলার জন্যে মুখ তুলেছিল। কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না সে। তার আগেই তিনটি পিস্তল থেকে তিন ঝাঁক গুলি বেরিয়ে এসে আঘাত করল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের ওপরেই টলে পড়ল ক্ষমতার গর্বে গর্বিত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসন।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশের। যে কাজের ভার নিয়ে এখানে এসেছিল সেই কাজ সম্পূর্ণ করেছে তারা। এবার তাদের ফিরে যাবার পালা। কিন্তু ফিরতে চাইলেই তো আর ফিরতে পারা যায় না। গুলির শব্দে গোটা রাইটার্স বিল্ডিংস জুড়ে তখন শুরু হয়ে গেছে হৈ চৈ। মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে একটি কথা– বিপ্লবীরা রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করেছে। খবর পেয়ে নিজের অফিস থেকে রিভলবার হাতে ছুটে এলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার ক্রেগ। সঙ্গে তাঁর সহকারী মিস্টার জোন্স। বিপ্লবীরা অযথা রক্তপাত না চাইলেও যারাই বাধা দিতে আসবে তাদেরই রক্তপাত ঘটাতে পিছ-পা নয় মোটেই। তিনটি যুবকের অব্যর্থ গুলির মুখে সরে পড়তে বাধ্য হলেন ক্রেগ ও জোন্স। আহত হলেন জুডিশিয়াল সেক্রেটারী মিস্টার নেলসন, অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেন ফাইনান্স মেম্বর মিস্টার এ মার।

তিনটি মৃত্যুভয়হীন যুবক তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হাতে তাদের উদ্যত পিস্তল। পালাবার পথ বন্ধ। কিন্তু তাতে মোটেই বিচলিত নয় তারা। পালাতে না পারলে কি করতে হবে তার পরিকল্পনাও তাদের প্রস্তুত। পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা যে প্রায় নেই একথা জেনেই তারা আজ এসেছে এখানে।

রাইটার্সের সামনে ফুটপাথে তখন লোকে লোকারণ্য, কৌতূহলী জনতার ভিড় চারিদিকে। তারই মধ্যে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা নিয়ে তাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়েই উঠে দাঁড়ান চার্লস টেগার্ট। একটু পরেই নিচে জেগে ওঠে পাঞ্জাবী সুবেদার-মেজরের গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর - ফোর্স ফল ইন!

আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শ'খানেক আর্মড কনস্টেবল রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে সারিবন্ধ হয়ে।

—এ্যাটেন্‌শন!

কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। যেন চোখের পলক পর্যন্ত ফেলতে তারা ভুলে যায়।

—স্লোপ আর্ম্‌!

একযোগে শব্দ করে তারা তুলে নেয় রাইফেল। এবার যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

—কুইক্ মার্চ!

বাঁধানো চত্বরে নাল-লাগানো বুটের শব্দ তুলে এগিয়ে চলে পুলিশ বাহিনী। তাদের পুরোভাগে স্বয়ং পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। সঙ্গে ডেপুটি ও

অ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনারেরা ছাড়া আর রয়েছে একদল সার্জেণ্ট—এন্টনী, গ্রাণ্ট্ ও ম্যালকম। সকলের কোমরেই গুলিভর্তি রিভলবার।

লালবাজার স্ট্রীট ধরে মার্চ করে আসছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। দূর থেকেই ভেসে আসছে তাদের বুটের শব্দ। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার আশঙ্কায় রাস্তার ভিড় ততক্ষণে অনেকটাই পাতলা হয়ে আসে।

রাইটার্সের ভেতরে তখন গোলাগুলির সাময়িক বিরতি। প্রস্তুত হচ্ছে বিনয় বাদল দীনেশ। তারা ভাল করেই জানে এখানকার রাজপুরুষেরা আর কেউ এগিয়ে আসবে না। সে মনোবল তাদের ভেঙে গেছে। এখানে এখন যে-যার আপন প্রাণ নিয়ে পালাতেই ব্যস্ত। এবার এগিয়ে আসবে গোটা লালবাজার। হয়তো টেগার্ট নিজেই আসবে ওদের দলপতি হয়ে। কাজেই এখন একটি বুলেটের দামও অনেক। একেবারেই অপচয় করা চলবে না। একমাত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলার কাজেই ব্যবহার করতে হবে প্রতিটি বুলেট।

মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বিনয় বাদল দীনেশ। প্রত্যেকেই তখন নিজের নিজের পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে তারা। মরতে হয় লড়াই করেই মরবে। গুলি যখন ফুরিয়ে যাবে তখন পকেটে আছে পটাসিয়াম সায়ানাইডের বিষাক্ত এম্পুল। এতেও যদি কাজ না হয় তো শেষ বুলেটটি তারা খরচ করবে নিজেদের জন্যে। তবুও ঐ বিটিশ শক্তির কাছে তারা আত্ম-সমর্পণ করবে না।

খোলা পিস্তল হাতে নিজের জায়গায় স্থির হয় দাঁড়িয়ে বিনয় বোধহয় ভাবছিল ঐ টেগার্টেরই কথা। ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের চত্বর থেকে সে মিস্টার লোম্যানকে ফিরে যেতে দেয় নি। আজ এই রাইটার্সের সিঁড়ি থেকেও যদি সে টেগার্টকে ফিরে যেতে না দেয় তবেই তার জীবন হবে ধন্য। একশ' দিনের ব্যবধানে লোম্যান ও টেগার্ট। এর চাইতে কাম্য আর কি হতে পারে তার জীবনে? আজ যদি সে এই কাজটুকু সম্পন্ন করতে পারে তাহলেই সম্পূর্ণ হবে দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেনের আরব্ধ কাজ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাইটার্সের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোয় ফোর্স পোস্টিং শেষ হলো। গুলিভর্তি রাইফেল তাক্ করে দাঁড়িয়ে রইল আর্মড কনস্টেবলেরা। এবার ওপরে উঠতে হবে।

অফিসারদের সামনে এসে দাঁড়ান চার্লস টেগার্ট। প্রত্যেকের মুখের ওপর একবার করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের মধ্যে কে ফোর্স নিয়ে ওপরে যেতে রাজি আছেন? মনে রাখবেন টেররিস্টরা ওপরে তৈরি হয়ে রয়েছে আমাদেরই জন্যে। বলুন, কে রাজি আছেন?

কারুর মুখেই কোন কথা নেই। চাকরি করতে এসে জেনে-শুনে নিজের জীবন দিতে কেউই প্রস্তুত নয়।

—বলুন, কে রাজি আছেন আপনাদের মধ্যে?

তবুও সবাই নিরুত্তর। হঠাৎ সার্জেণ্ট ম্যালকম এক পা এগিয়ে এসে বললে আই এ্যাম রেডি, স্যার।

—আর ইউ? আবার জিজ্ঞেস করেন চার্লস।

—ইয়েস স্যার।

— ড্ ইউ নো দি প্রোব্যাব্‌ল কন্‌সিকোয়েন্স ?

— ইয়েস স্যার। স্পস্ট কণ্ঠস্বর ম্যালকমের।

—অল রাইট, দেন গেট রেডি ইয়ংম্যান। আই শ্যাল অলসো এ্যাকম্পেনি ইউ আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

আর দ্বিধা নয়। এবার অন্য সবাইও দলের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।

গুলিভর্তি রিভলবার হাতে সামনে এগিয়ে চলেছে টেগার্ট ও সার্জেণ্ট ম্যালকম। পাশাপাশি চলছে তারা। পেছনে অন্য অফিসার ও ফোর্স।

রাইটার্সের ভেতরের সেই লোহার সিঁড়ির ওপর পা দিয়ে টেগার্টের একবারও কি মনে পড়েছিল দুই নম্বর কিড্ স্ট্রীটের কথা ? মনে পড়েছিল কি মিসেস্ টেগার্টের সেই আশঙ্কার কথা ? একবারও কি তিনি ভেবেছিলেন যে, আর মাত্র কয়েকমাস পরেই তিনি হোমে ফিরে যাবেন ?

তিনজন মাত্র তরুণ বিপ্লবী, হাতে মাত্র সামান্য তিনটি পিস্তল, আর এদের রিভলবার সমেত আধুনিক রাইফেল।

ইতিহাসের পাতায় ইংরেজিতে যে যুদ্ধের নাম 'ভারান্দা ব্যাট্‌ল্‌' তারই বাংলা নাম অলিন্দ-যুদ্ধ। অসম এই যুদ্ধ। একদিকে তিনটি তরুণ, অন্যদিকে বিরাট পুলিশ বাহিনী।

পুলিশ বাহিনী দোতলার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ রাইটার্সের সেই আপাতস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে ওপর থেকে শুরু হলো গুলিবৃষ্টি। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে এলো নিচের দিকে। এপাশ থেকে পুলিশও দিতে আরম্ভ করল প্রত্যুত্তর। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো ব্রিটিশের সরকারী দপ্তরখানা।

এক মিনিট—দু'মিনিট—তিন মিনিট। দু'দলের কেউই পিছু হটছে না। গোলাগুলির শব্দে রাইটার্সের গোটা বাড়িটা কাঁপছে থর থর করে। পুলিশ বাহিনীর ভারি বুটের চাপে টলমল করছে রাইটার্সের লোহার সিঁড়ি।

অবশেষে দলবল নিয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন চার্লস টেগার্ট। নইলে ক্যাজুয়ালটি হওয়ার সম্ভাবনা। সত্যিই আশ্চর্য ঐ টেরারিস্টদের রণকৌশল! অব্যর্থ ওদের লক্ষ্য। সময় মত সাবধান না হলে একটা গুলি তো তাঁর পাঁজর ভেদ করে চলে গিয়েছিল আর কি! তবে কি ওরা দলে মাত্র তিনজন নয় ? তার চাইতে অনেক বেশি ? নইলে, মাত্র তিনটি যুবক কেমন করে এতক্ষণ ধরে ঠেকিয়ে রাখল তাদের ?

রণে ভঙ্গ দিয়ে নিচে নেমে এলেন চার্লস টেগার্ট মাথা নিচু করে। পরাজয়—সত্যিই তাঁর পরাজয় ঘটেছে ঐ বিপ্লবীদের হাতে। মিসেস্ টেগার্ট সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলেন – বাস্তবিক, লড়াই করার মত হিম্মৎ ওদের আছে। চট্টগ্রামের কথা তিনি শুনেছেন, বুড়ি বালামের তীরের ঘটনা তিনি চাক্ষুষ দেখেছেন. আবার আজ এই মুহূর্তে রাইটার্সে তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁর স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, ওরা সত্যিই দুর্বার। এরকম একদল ছেলে হাতে পেলে তাঁর নিজের দেশের বিপ্লবীনেতা ডি' ভ্যালেরা অনেক আগেই অনেক কিছু করে ফেলতে

পারতেন।

কিন্তু লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকার সময় নেই টেগার্টের। একটা কিছু ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। তাই, ডাক পড়ল রণনিপুণ গোর্খা বাহিনীর।

আবার শুরু হল যুদ্ধ। হাঁটু মুড়ে পজিশন নিয়ে বসে ফায়ার করে চলেছে গোর্খা সেপাইরা। ওপর থেকে সমান বিক্রমে জবাব দিয়ে চলেছে বিনয় বাদল দীনেশ। শূন্য হয়ে আসছে তাদের গুলির ভাণ্ডার। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে গোর্খা সেপাইরা। আর মাত্র একটি করে বুলেট অবশিষ্ট আছে বিনয় ও দীনেশের পিস্তলে। ফুরিয়ে গেলেই তাদের ভাণ্ডার শূন্য। বাদলের সব কটা গুলি আগেই ফুরিয়ে গেছে।

হঠাৎ থেমে গেল ওপরের গুলির শব্দ। পরক্ষণেই জেগে উঠল একটা মিলিত কণ্ঠস্বর—বন্দেমাতরম্। আর পরমুহূর্তেই পর পর দু'টো গুলির শব্দ জেগে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল। আর কোন সাড়া-শব্দ নেই ওপরে।

এতক্ষণে দলবল নিয়ে চার্লস টেগার্ট ওপরে উঠে এলেন। কিন্তু কোথায় তারা? গোটা বারান্দা জুড়ে কেবল ভাঙা কাঁচের সার্শি আর গুলির খোলের ছড়াছড়ি। টেররিস্টদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। অবশেষে পাওয়া গেল তাদের একটা ঘরের মধ্যে। ঘরের মেঝেয় পাশাপাশি পড়ে আছে সাহেবী পোশাক পরা তিনটি দেহ। বাদলের দেহে প্রাণ নেই। পটাসিয়াম সায়ানাইডের বিষে একটু আগেই সে ত্যাগ করেছে শেষ-নিঃশ্বাস। তাড়াতাড়িতে সায়ানাইডের এম্পুল বোধহয় দাঁত দিয়ে ভাঙতে পারে নি বিনয় ও দীনেশ। তাই তারা দু'জন তাদের পিস্তলের শেষ গুলি দু'টি খরচ করেছিল নিজেদের জন্যে। বিনয়ের কপালে ও দীনেশের গলায় সৃষ্টি হয়েছিল গভীর ক্ষত।

বাদল ও দীনেশকে চিনতে না পারলেও বিনয়কে চিনতে কিন্তু মোটেই অসুবিধে হয় নি চার্লস টেগার্টের। ঢাকায় লোম্যানের হত্যাকারীর ছবি তখন বাংলাদেশের প্রতিটি থানায়, প্রতিটি ফাঁড়িতে।

বিনয়ের অচৈতন্য দেহটার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকেন টেগার্ট। অনেক বিনিদ্র রজনী কেটেছে তাঁর এই ছোকরার জন্যে। তাঁর চৌকো মুখের চোয়াল দু'টো একসময় দৃঢ় হয়ে ওঠে, স্ফীত হয়ে ওঠে তার তীক্ষ্ণ নাকের বাঁশি। পরমুহূর্তেই টেগার্ট বিনয়ের দেহটা পরীক্ষা করার ছলে এগিয়ে গিয়ে পায়ের বুটের চাপে তার হাতের আঙুল ভেঙে দেন।

অদ্ভুত চরিত্রের অধিকারী এই চার্লস টেগার্ট। সন্ত্রাসবাদীদের যম বলে কথিত এই ব্যক্তিটি এমনিতে খুবই ভদ্র প্রকৃতির। কোন কারণে হঠাৎ রেগে ওঠা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ—যাকে বলে একজন আদর্শ পুলিশ অফিসার। কিন্তু বিপ্লবীদের ব্যাপারে লোকটি কেবল কঠিনই নয়, সময় সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। কখনও হয়তো দেশের তরুণ বিপ্লবীদের সাহস সংযম, ত্যাগ তাকে মুগ্ধ করে। সেই মুহূর্তে মনে মনে হয়তো তাদের প্রতি মাথা নোয়ান টেগার্ট। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিপ্লবীদের ধ্বংস করতে যে পথ তিনি অবলম্বন করেন তা কেবল নির্মমই নয়, অমানুষিক। তখন তাদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা তাঁর মনেই থাকে না। আসলে দেশের বিপ্লবীদের ব্যাপারে

চার্লস টেগার্টের মনোভাব এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থকে কেন্দ্র করেই রাত-দিন আবর্তিত হতে থাকে। নিজে আইরিশ হয়েও ব্রিটিশের স্বার্থই তাঁর জীবনের শেষ কথা। সেখানে হাত পড়ার সম্ভাবনা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। তাই যে টেগার্ট বুড়ি বালামের তীরে ধান ক্ষেতে মাথার টুপি খুলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন বাঘা যতীনকে, তিনিই আবার কলকাতার অলিন্দ-যুদ্ধের সেনাপতি অচৈতন্য বিনয় বোসের হাতের আঙুল বুট দিয়ে থেঁতলে দিতেও কসুর করেন নি।

রাইটার্স বিল্ডিং থেকে মেডিকেল কলেজ। সেখানেই স্থান পেয়েছে বিনয় ও দীনেশ। শুধু এই দু'জন কেন, দেশের অনেক আহত বিপ্লবীকেই এককালে নিজের কোলে স্থান দিয়েছে সেকালের সেরা হাসপাতাল কলকাতা মেডিকেল কলেজ। কাউকে সেবা-যত্নে আরোগ্য করে তুলে ফাঁসির দড়ি গলায় পরবার জন্যে তুলে দিয়েছে রাজপুরুষদের হাতে, আবার কাউকে নিজের কোলেই চিরবিশ্রামের স্থান করে দিয়ে হতাশ রাজপুরুষদের ফিরিয়ে দিয়েছে নিজের দরজা থেকে।

সৈনিক বিনয় বোস—অলিন্দ-যুদ্ধের অধিনায়ক বিনয় বোস কিন্তু মেডিকেল কলেজের এই খেয়াল-খুশিকে মোটেই আমল দেয় নি। আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা যখন তার উজ্জ্বল সেই মুহূর্তে আঙুল দিয়ে নিজের ক্ষতস্থান ঘেঁটে সেপ্টিক ডেকে এনে সে ফাঁকি দিয়েছে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের। বিখ্যাত অলিন্দ-যুদ্ধের তিন সৈনিকের দু'জনই ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ল। বাকি রইল কেবল দীনেশ গুপ্ত।

দুপুরে লাঞ্চের সময় স্ত্রীর সঙ্গে এই আলোচনাই হচ্ছিল চার্লস টেগার্টের মিসেস্ টেগার্ট এক সময় স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভারি আশ্চর্য লাগছে টেররিস্ট বিনয় বোসের কথা শুনে। কতখানি মনের জোর থাকলে একটি ছেলে হাসপাতালের বেডে শুয়ে এমনিভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে তা ভেবে সত্যিই অবাক হচ্ছি। ওর সম্পর্কে তোমার কি অভিমত ?

প্রশ্নটা করেই মিসেস্ টেগার্ট একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন চার্লসের মুখের দিকে।

জবাব দিতে গিয়ে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করেন টেগার্ট। একটু সময় চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে বললেন, আই রিয়েলি এ্যাড্‌মায়ার হিজ কারেজ —সত্যিকারের বীরকে শ্রদ্ধা করা আমার কর্তব্য।

মিসেস্ টেগার্ট আবার বললেন, এদের ওপর নির্মম অত্যাচার করতে তো তোমার বাধে না !

স্ত্রীর অনুযোগ স্বীকার করে নিয়ে গম্ভীর সুরে টেগার্ট আবার জবাব দেন, দ্যাট্ ইজ অলসো মাই ডিউটি—এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থ দেখাও আমার কর্তব্য। সত্যি বলতে কি, আমি ওদের যতখানি শ্রদ্ধা করি, ঠিক ততখানি ঘৃণা করি।

মিসেস্ টেগার্ট আর কিছু না বলে কেবল তাকিয়ে থাকেন স্বামীর দিকে। তাঁর স্বামী সত্যিই এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ।

শহর কলকাতা তখন তোলপাড়। সকলের মুখেই কেবল একটি কথা—বিনয়-বাদল-দীনেশ। বিনয়-বাদল চলে গেলেও দীনেশ ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ

করছে। এবার ওকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার কি করবে? লোক-দেখানো একটা বিচারের ব্যবস্থা করে ওকে ফাঁসি দেবে?

এমনি দিনে অফ্-ডিউটির মধ্যে সার্জেণ্ট ম্যাল্কম এক দুপুরে এসে হাজির হলো মেরিয়াদের বাড়িতে। অলিন্দ-যুদ্ধের পরে লালবাজারের পুলিশ মহলে ম্যাল্কমের মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে। কর্তব্যপরায়ণ বলে বরাবরই তার সুনাম ছিল। কিন্তু সেদিন সি. পি. চার্লস টেগার্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তাতে সি. পি তার ওপর ভয়ানক খুশি। নগদ টাকা রিওয়ার্ড দিয়েছিলেন তাকে। এই ব্যাপারে বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ একটু ঈর্ষান্বিতও বটে। লালবাজারে তো ইতিমধ্যে রটেই গেছে যে, সি. পি নাকি অনেককে ডিঙিয়ে ম্যাল্কমকে সার্জেণ্ট মেজরের পদে প্রমোশন দেবেন। সেদিনের ঘটনায় উপস্থিত ডেপুটি ও অ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনাররাও খুব একটা খুশি হতে পারছিল না ম্যাল্কমের ওপর। সি.পি-র কথায় তারা যখন সবাই চুপ করে ছিল তখন এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোক্রা যে দুম করে রাজি হয়ে যাবে তা তারা ধারণাই করতে পারে নি। কিন্তু নিজেদের এই অখুশির ভাবটা প্রকাশ করা চলে না, বিশেষ করে খোদ সি. পি. যখন তার সহায়।

ব্যাপারটা বুঝতে না পারার মত বোকা নয় সার্জেণ্ট ম্যাল্কম। কিন্তু তার কিছুই করণীয় নেই। সেদিন কেবলমাত্র বাহবা কুড়োবার জন্যে সে সি. পি.-র কথায় রাজি হয় নি। এটাকে নিজের কর্তব্য বলেই মনে করেছিল সে। কয়েকটা ছেলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকে খুশিমত হত্যালীলা চালিয়ে যাবে এটা সেই মুহূর্তে সে সহ্য করতে পারছিল না। ঐ টেররিস্ট ছেলেগুলো এতই শক্তিধর যে সরকারের মান-সম্ভ্রম এমনিভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে!

ম্যাল্কম বাড়ির ভেতর ঢুকতেই সুন্দরী মেরিয়া ছুটে এসে তার একখানি হাত ধরে কলকণ্ঠে বলে ওঠে, হ্যাল্লো জনি, এতদিনে আমাদের মনে পড়ল?

তারপর সহসা থেমে গিয়ে অভিমানের সুরে আবার বললে, তা, আমাদের আর মনে পড়বে কেন? এখন তুমি একটা কেউকেটা ব্যক্তি!

—তার মানে? কথাটা বুঝতে না পেরে ম্যাল্কম তাকায় মেরিয়ার দিকে।

উচ্ছল নদীর মতো চঞ্চল মেরিয়া ম্যাল্কমের হাতে একটু চাপ দিয়ে সহসা বলে ওঠে, ভেবেছ বুঝি আমরা কিছু শুনি নি? রাইটার্সে সেই টেররিস্টগুলোর সঙ্গে ফাইটিংয়ে তুমি তো পুলিশ বাহিনী পরিচালনা করেছিলে। কেমন দেখলে তো, তুমি না বললেও তোমার সম্বন্ধে আমরা কত খবর রাখি?

—তা তো বুঝলাম, জবাব দেয় ম্যালকম, কিন্তু তোমাদের কে বললে যে, আমি পুলিশ ফোর্স পরিচালনা করেছিলাম? খোদ সি. পি ও অন্যান্য হাই অফিসারেরা উপস্থিত থাকতে আমি কেন ফোর্স পরিচালনা করতে যাবো?

ম্যালকমের কথার ধরনে কেমন যেন একটু খটকা লাগে মেরিয়ার। তাই সে এবার তার ধনুকের মত সুন্দর ভ্রূযুগল সামান্য কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে, সত্যি বলছো?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ম্যালকম সেদিনকার আসল ঘটনাটা বর্ণনা করে।

শুনে যেন হতাশ হয় মেরিয়া। একটু সময় চুপ করে থেকে সে

আবার বললে, ঐ একই কথা হলো। তোমাদের কমিশনার তোমার সঙ্গে না গেলে তোমাকে তো একাই যেতে হতো ?

—কি হলে কি হতো সেটা কোন কথা নয়। আসল কথা, দলের পুরোভাগে আমি ছিলাম, এই পর্যন্ত !

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মেরিয়া। তারপর বললে, সে যাই হোক, তুমি যে গুলি করে একজন টেররিস্টকে মেরেছ এটা তো ঠিক ?

ম্যালকমের আবার বিস্ময়ের পালা। মেরিয়া এসব আষাঢ়ে গল্প কোথায় শুনল ?

মেরিয়ার কাছে নিজের বিস্ময়ের কথা প্রকাশ করতেই সে এবার অনেকটা মরিয়া হয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, কিন্তু তোমাদের গুলিতে ওদের মধ্যে একজন যে নিহত হয়েছে, আর বাকি দুজন হয়েছে আহত একথা তো মিথ্যে নয়।

জবাব দেয় ম্যালকম, না, তাও ঠিক নয়। আমাদের গুলিতে ওদের মধ্যে একজনও নিহত কিংবা আহত হয় নি। একজন মারা গেছে ঠিকই, তবে সে আমাদের গুলিতে নয়, পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে, আর বাকি দু'জন নিজেদের পিস্তল দিয়ে সুইসাইড্ করতে গিয়েছিল।

—কিন্তু আমরা যে শুনলাম—। হতাশ শোনায় মেরিয়ার কন্ঠস্বর।

—না, তোমরা ভুল শুনেছ—গুজব।

একটু সময় থেমে ম্যালকম মেরিয়ার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, তোমার কথায় মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে যেন একটু হতাশ হয়েছ, মেরি।

—না, হতাশ হবো কেন ? তবে—

—আচ্ছা মেরি, আমি নিজের হাতে যদি ওদের মেরে ফেলতাম তাহলেই কি তুমি খুশি হতে ?

কন্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়ে মেরিয়া জবাব দেয়, নিশ্চয়। আলবৎ খুশি হতাম আমি। হয়তো তোমাকে একটা পুরস্কারও দিয়ে বসতাম। কাওয়ার্ডের মত লুকিয়ে লুকিয়ে যাকে-তাকে যখন-তখন ওরা খুন করবে এটা কোন্ সভ্যদেশের গভর্নমেন্ট বরদাস্ত করতে পারে ? দেখতে দেখতে দেশটা যে মগের মল্লুক হয়ে দাঁড়াল। আমাদের যে আর বাড়ি থেকে বেরোবার উপায় রইল না। তোমাদের টেগার্টের মত জাঁদরেল ব্যক্তিও যে এতদিন পারলে না ওদের শায়েস্তা করতে, এটা তোমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষে বাস্তবিকই লজ্জার কথা।

জবাব দেয় ম্যালকম, তা ঠিক। এটা আমাদের ইন্-এফিসিয়েন্সিই প্রমাণ করে। তবে এদের আসল নজর আমাদের দিকে নয়। ওরা কেবল ইউরোপীয়ানদেরই বেছে বেছে খতম করছে।

এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা যে ইউরোপীয়ান নয় একথা মুখে স্বীকার না করলেও ইদানীং মনে মনে সে সম্পর্কে একটু যেন সংশয় দেখা দিয়েছে ম্যালকমের। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হতে আরম্ভ করেছে যে, এই দু'দলের মধ্যে কোথায় যেন একটু ব্যবধান আছে। তারা যতই কেন না নিজেদের খাঁটি ইউরো-পীয়ানদের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করুক তাদের মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম পর্দা

যেন অস্পষ্টভাবে জেগে রয়েছে।

ম্যালকম কিন্তু তেমন কিছু ভেবে কথাটা বলেনি মেরিয়াকে। ঘটনার গতির সঙ্গে নিজের ইদানীংকালের মনোভাবটুকু মিশে গিয়েই কথাটা বেরিয়ে এসেছিল তার মুখ থেকে।

মেরিয়া কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে। বললে, কি বলতে চাইছ তুমি? আমরা আর ইউরোপীয়ানরা আলাদা নাকি? নিজেদের পিতৃভূমি চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি বলেই কি আমরা এদেশের মানুষ হয়ে গেলাম? তাহলে তো আফ্রিকায় যে সব ইউরোপীয়ান বাস করে তাদের সন্তান-সন্ততিরাও সেই দেশেরই মানুষ!

সতর্ক হয়ে ওঠে ম্যালকম। মনে মনে ভাবে, মেরিয়ার কাছে এ ধরনের একটা কথা বলা তার ঠিক উচিত হয় নি। তাই সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করতে গিয়ে বলে ওঠে, না-না, আমি ঠিক সেকথা বলি নি। আমি বলতে চেয়েছি যে, টেররিস্টরা যাকে-তাকে তো আর খতম করছে না। ওদের মতে ইউরোপীয়ানদের মধ্যে যারা অত্যাচারী, বেছে বেছে কেবল তাদেরই খতম করছে।

—তাই বলো, পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে মেরিয়া বলতে থাকে, তবে আমাদেরও সাবধানে থাকা উচিত। বিশেষ করে তোমাকে তো সর্বদাই সাবধানে থাকতে হবে। সেদিন রাইটার্সে পুলিশ দলের সঙ্গে তুমি ছিলে। ওদের দলের লোকেরা তোমাকে হয়তো চিনে রেখেছে। তাছাড়া ওদের মতিগতি কখন পাল্টায় তার কি কিছু ঠিক আছে? দিনের বেলায় ডালহৌসীর মত জায়গায় যারা তোমাদের কমিশনারের ওপর বোমা ছুঁড়তে পারে তাদের পক্ষে তোমাকে টার্গেট করা তো মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। সেদিন বাবাও এই কথাই বলছিলেন।

—কি বলছিলেন তিনি? প্রশ্ন করে ম্যাল্‌কম।

জবাব দেয় মেরিয়া, টেররিস্টদের মধ্যে যে লোকটা সেদিন হাসপাতালে মারা গেল, কি যেন নাম তার?—বিজয়, না-না বিনয়—বিনয় বসু, সেই লোকটা মারা যাবার পরের দিন গোটা কলকাতা শহর জুড়ে কি পোস্টার পড়েছিল জানো তো?

—কি পোস্টার?

—বারে, কিছুই খবর রাখো না দেখছি! পুলিশে চাকরি করে এসব খবর রাখো না?

মৃদু হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, রাখবার সময় কোথায়? আমরা তো আর এস. বি-তে চাকরি করি না। তাই এসব খবর রাখার কোন প্রয়োজনও হয় না। তা, বল তো, কি পোস্টার পড়েছিল?

মেরিয়া একটু চিন্তা করে পোস্টারে লেখা কথাগুলোর সঠিক ভাষা মনে মনে ভেবে নিয়ে জবাব দেয়, বাবা সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে বললেন, শহরের দেয়ালে দেয়ালে নাকি সেদিন লাল কালিতে লেখা পোস্টার পড়েছিল। তাতে নাকি ইংরেজিতে লেখা ছিল—বিনয়স্‌ ব্লাড বেকন্‌স ফর মোর ব্লাড। কি ভয়ানক

কথা বলো দেখি? মোর ব্লাড অফ হ্যুম্? নিশ্চয়ই আমাদের রক্তের কথা বোঝানো হয়েছে। সত্যিই অবাক হয়ে যাই, এসব কথা যারা পাবলিক প্লেসে লিখে রেখে যাচ্ছে তাদের তোমরা কিছু করতে পারছ না কেন?

খানিক্ষণ চুপ করে থেকে ম্যাল্কম জবাব দেয়, তা ঠিক. তবে আমাদের মত চুনোপুঁটির দিকে ওদের নজর আছে বলে মনে হয় না। তাহলে তো ওরা গণ্ডায় গণ্ডায় আমাদের মত লোককে অনেক আগেই খতম করতে পারত।

বিরক্তির সুরে এবার বলে ওঠে মেরিয়া, তোমার যে দেখছি ওদের সম্পর্কে বেশ একটা উঁচু ধারণা, জনি!

—নো-নো, মোটেই তা নয়। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। আমি কেবল সেই ফ্যাক্টের কথাই তোমাকে বললাম। তবে আমার ধারণা, ওরা এখানেই থেমে থাকবে না। ওদের কাজ ওরা করে যাবেই।

—তার মানে আরও ব্লাড শেড হবে, কেমন?

—বোধহয় তাই।

ম্যাল্কমের জবাবে মেরিয়ার চোখের তারায় জেগে ওঠে ভয়ের চিহ্ন। সেই দিকে তাকিয়ে ম্যাল্কম তাকে নিজের দিকে আর একটু টেনে এনে প্রায় তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, ভয় নেই মেরি। আমার জন্যে চিন্তা করো না, আমি ভালোই থাকবো। একজন ফরচুন টেলার আমাকে বলেছে।

—তুমি আবার এসবে বিশ্বাস করো নাকি? মেরিয়া চোখ তুলে ম্যাল্কমের দিকে তাকায়।

মেরিয়ার নরম হাতে একটু চাপ দিয়ে জবাব দেয় ম্যাল্কম, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। শুধু আমার নিজের জীবনের কথাই নয়, তোমার-আমার ভবিষ্যৎ মিলিত জীবন কেমন কাটবে সে সম্পর্কেও সেই ফরচুন টেলার ভবিষ্যৎ বাণী করেছে। আমাদের জীবন খুব সুখেই কাটবে।

ম্যাল্কমের কথায় সুন্দরী মেরিয়ার মসৃণ গাল দু'খানি আপেলের মত রাঙা হয়ে ওঠে। একটু সময় চুপ করে থেকে ম্যাল্কমের হাতের উষ্ণতা অনুভব করতে করতে সে বললে, ও দুষ্টু, সেই জন্যেই বুঝি সেদিন আমার জন্ম-সময়, তারিখ জিগ্যেস করেছিল?

—এক্জাক্টলি তাই। হাসতে হাসতে জবাব দেয় ম্যালকম।

ম্যাল্কমের আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল মাস কয়েক পরেই। বিনয়স ব্লাড বেকন্স ফর মোর ব্লাড—কথাটা যে বিপ্লবীদের হুমকিই শুধু নয়, পরের বছর এপ্রিল মাসের সাত তারিখেই তার প্রমাণ হয়ে গেল। মেদিনীপুরের কুখ্যাত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিহত হলো তাদের হাতে।

দিশাহারা ব্রিটিশ সরকার। কি করে এ উৎপাত বন্ধ করা যাবে? কোন ওষুধেই যে ফল হচ্ছে না। বিশ্বের তাবৎ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাণ্ডারে যত রকম অস্ত্র-শস্ত্র আছে তার প্রত্যেকটিই বিফল হচ্ছে এই বাংলা দেশের ক্ষেত্রে। তবে আর উপায় কি? কাজেই এখন চালিয়ে যাও সেই পুরানো ওষুধ। বাড়িয়ে যাও দমন-নীতি।

মেরিয়া একদিন ম্যাল্কমকে বললে, চলো জনি। আমরা এখান থেকে চলে

যাই। এমন জঘন্য জায়গায় থাকতে আর ভালো লাগছে না।

মেরিয়ার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বিস্মিত কণ্ঠে ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করে, চলে যাবো? কোথায়?

—অন্য কোথাও। এখানে আর নয়। রাত-দিন এমন খুন-জখম আর ভালো লাগছে না।

—অন্য আর কোথায় যাবে, মেরি? এদেশের যেখানেই যাবে সেখানেই প্রায় একই অবস্থা।

—তাহলে চলো বিলেত চলে যাই।

—তার মানে, টেররিস্টদেব ভয়ে এদেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে চাইছ?

—বিদেশ মানে? বব করা সোনালী চুলে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে মেরিয়া, এই বিশ্রী দেশটাই বুঝি আমাদের স্বদেশ? সেখানে নিজেদের লোকজনের মধ্যে থাকতে তো ভালই লাগবে।

মেরিয়ার কথায় স্কুল-জীবনের সেই সিনিয়র স্মিথের কথা মনে পড়ে ম্যাল্‌কমের। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যি ছেলেবেলার অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পেরেছে সেখানে যাওয়াটা তেমন কিছু কঠিন না হলেও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তেমন একটা সহজ ব্যাপার নয়।

ম্যাল্‌কম মেরিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, মুখে বলা যত সহজ সবকিছু ছেড়ে এখান থেকে চলে যাওয়াটা যে তত সহজ ব্যাপার নয়, সেকথা তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

এবার অনুযোগের সুরে মেরিয়া বললে, তোমরা সবাই এক রকম। বাবাও ঠিক ঐ কথাই বলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না এটা এমন কি কঠিন কাজ।

—এখনও ঠিক বুঝতে পারবে না। আরও একটু বয়স বাড়ুক, তখন বুঝতে পারবে। ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হতো তবে এদেশের প্রতিটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারই এদেশ ছেড়ে বিলেতে পাড়ি জমাত, বুঝলে?

—তাহলে এমনিভাবে ভয়ে ভয়েই এখানে থাকতে হবে?

জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, বলেছি তো মেরি, আমাদের মত চুনোপুঁটির কোন ভয় নেই। বিনয়স্ ব্লাড বেকন্‌স ফর মোর ব্লাড—কথাটা আমাদের লক্ষ্য করে বলা হয় নি। যাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তারাই একজন একজন করে খতম হচ্ছে। কাজেই তুমি-আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

ম্যাল্‌কমের কথাটা পুরোপুরি মনঃপূত না হলেও আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে মেরিয়া।

জেলখানায় কন্‌ডেম্‌ড সেলে বসে দিন গুনছে দীনেশ। আলিপুরের দায়রা জজ মিস্টার গার্লিকের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সারা দেশে যে তোলপাড় চলছে এ খবর দীনেশের কানে এসেছে। কিন্তু দীনেশ নির্বিকার। মৃত্যুর সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে যে সত্যিকারের অনুভব করতে পাবে—মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম

সমান। তার কাছে তো জীবন-মৃত্যু কেবল এ-ঘর-ওঘরের ব্যবধান। জীবনের আলোক থেকে মৃত্যুর অন্ধকারের দিকে পা বাড়ানো তো তার কাছে কেবল জীবনের আলোর দিকেই আবার এগিয়ে আসা। কাজেই এতে কোন দুঃখ কিংবা দুশ্চিন্তার কি থাকতে পারে? তবে এরই মধ্যে একটা আনন্দের খবর পেয়েছ সে। তার নিজের হাতে গড়া মেদিনীপুরের যুবশক্তি চুপ করে বসে নেই। এপ্রিল মাসের সাত তারিখে তারা খতম করেছে কুখ্যাত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার পেডিকে।

রক্তেরাঙা ঐ তারিখটির সঙ্গে সমতা রেখেই বোধহয় ঠিক তার তিনটি মাস পরে জুলাই মাসের সাত তারিখ ব্রিটিশ শাসকেরা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসি দিল বাংলা মায়ের দামাল ছেলে দীনেশ গুপ্তকে।

দীনেশের ফাঁসির খবরে কেবল গোটা বাংলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ তখন অসহায় আক্রোশে থর থর করে কাঁপছে। শহর কলকাতার প্রতিটি পার্কে সেদিন এই ফাঁসির প্রতিবাদে আর শহীদ দীনেশের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে জনসভার আয়োজন। সেদিন কলকাতার রাস্তায় নতুন করে কোন পোস্টার না পড়লেও দেশের প্রতিটি বিপ্লবী বোধহয় মনে মনে উচ্চারণ করেছিল একটি কথা—দীনেশস্ ব্লাড বেকনস ফর মোর ব্লাড।

কলকাতার খবরের কাগজগুলো বড় ব্যানারে ছাপল দীনেশের ফাঁসির খবর। বাংলা মাসিক 'বেণু' পত্রিকার 'দীনেশ সংখ্যা' নিঃশেষ হয়ে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। ভয় পেয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর আদেশে নিষিদ্ধ হল সেই বিশেষ সংখ্যা।

লালবাজারও সেদিন প্রস্তুত। আর্মড কনস্টেবলে গিস্ গিস্ করছে লালবাজারের চত্বর। রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটোছুটি করছে পুলিশভ্যান। শহরের অবস্থার যে কোন সময় অবনতি ঘটতে পারে। তখন লালবাজার থেকে ছুটবে এই পুলিশ ফোর্স। তাছাড়া প্রতিটি থানায় তো আগে থেকেই বিশেষ পুলিশ বাহিনী পাঠানো হয়েছে। থানায় থানায় আগেই নির্দেশ গেছে কোন দয়া-মায়া নয়। বেআইনী জনতার মোকাবিলা করতে পুলিশের যে কোন অ্যাক্শনই সমর্থন করতে গভর্নমেণ্ট প্রস্তুত। তার মানে সরকার বাহাদুর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে একখানি ব্ল্যাঙ্ক চেক।

সরকারের বরাত ভাল। শহরে সেদিন তেমন কোন অঘটন ঘটল না। বিপ্লবীরা কখনও গরম মাথায় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে না। তাদের হাতে অ্যাক্শনের রি-অ্যাক্শন তৈরি হয় অনেক ভেবে-চিন্তে। সেই রি-অ্যাক্শনের স্বাদ ব্রিটিশ প্রভুরা পেয়েছিল দীনেশের ফাঁসির মাত্র কুড়িটি দিন পরে। প্রকাশ্য দিবালোকে আলিপুর কোর্টের জজের এজলাসে ঢুকে কুখ্যাত সেই দায়রা জজ মিস্টার গার্লিককে চরম দণ্ড দিয়েছিল আর একটি দামাল ছেলে—কানাই ভট্টাচার্য। তারপর হাসতে হাসতে নিজের পিস্তল দিয়েই নিজেকে নিঃশেষ করে ফাঁকি দিয়েছিল শাসকগোষ্ঠীকে।

সারাটা দিন ডিউটি করতে হয়েছে সার্জেণ্ট ম্যাল্কমকে। টেররিস্ট দীনেশ

গুপ্তের ফাঁসির ব্যাপার নিয়ে শহরের পরিস্থিতি তেমন কিছু খারাপ হয়ে ওঠেনি সেদিন। ম্যাল্‌কমের ডিউটি ছিল মুচিপাড়া থানা এলাকায়। মাসিক 'বেণু' পত্রিকার নিষিদ্ধ 'দীনেশ সংখ্যা' রাখবার অপরাধে থানার অফিসার-ইন্‌-চার্জ একজন পত্রিকাওয়ালাকে এ্যারেস্ট করেছিল। সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমও ছিল ও.সি-র সঙ্গে। ডিউটি শেষে সন্ধ্যায় ম্যাল্‌কম ফিরে এল লালবাজারে। এবার একটু বিশ্রামের একান্তই প্রয়োজন।

সার্জেণ্ট মেসে ঢুকতেই কমনরুমের টেবিলের ওপর একটা খবরের কাগজ দেখে থমকে দাঁড়ায় ম্যাল্‌কম। মেসে প্রতিদিনই খবরের কাগজ রাখা হয়—স্টেটসম্যান। আজ তার বদলে অন্য একটি কাগজ—ডেইলী অ্যাডভান্স।

খবরের কাগজের ওপর কোনকালেই ঝোঁক নেই ম্যাল্‌কমের। কোনদিন হয়তো প্রথম পাতার হেডিংয়ের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, কোনদিন বা কাগজ স্পর্শই করে না। কিন্তু সেদিন কেন যেন ডেইলী অ্যাডভান্স কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরে ম্যাল্‌কম। দীনেশের ফাঁসির খবর প্রথম পাতায়। ইংরেজি 'ডি' অক্ষরটি চারবার ব্যবহার করে সুন্দর ব্যানার তৈরি করেছে—'ডণ্টলেস ডীনেশ ডাইস অ্যাট্‌ ডন'।

খবরের কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে ভাবতে থাকে ম্যাল্‌কম—এরা বাঙালী হলেও ইংরেজি ভাষাটার ওপর বেশ ভাল দখলই আছে এদের, নইলে এমন ইংরেজি লিখতে পারত না। খুব চমৎকার হয়েছে লেখাটা—ডণ্টলেস ডীনেশ ডাইস অ্যাট্‌ ডন। কথাটা মনে মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ম্যাল্‌কমের।

হঠাৎ সার্জেণ্ট এণ্টনী ঘরে ঢুকে একখানা হাত ম্যাল্‌কমের কাঁধের ওপর রেখে বলে ওঠে, এমন মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার নেশা তোর কবে থেকে হল, জনি?

তারপর কাগজটার ওপর চোখ পড়তেই ভুরু কুঁচকে বলে ওঠে, ডেইলী অ্যাডভান্স! এ কাগজটা কে আনল, তুই?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, আমি আনবো কেন? এখানেই তো পড়েছিল।

—তা হলে আজ ইচ্ছে করেই বোধহয় কাগজওয়ালা এই স্বদেশী কাগজটা দিয়ে আমাদের সঙ্গে একটু মস্করা করেছে।

জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, হেড্‌পীস্‌টা কিন্তু চমৎকার হয়েছে, নারে?

হেড্‌পীস্‌টা পড়ে এণ্টনী কেবল একবার ঠোঁট ওল্টায়।

রুমা বাঈজীর কাছে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের খাতির একটু অন্য ধরনের। রুমার গানের আসরে উপস্থিত থাকবার জন্যে ধনীর দুলালদের যেখানে পয়সা খরচ করতে হয় সেখানে বিনে পয়সায় ম্যাল্‌কমের অবারিত দ্বার। প্রথম প্রথম দু' একবার ম্যাল্‌কম নিজেই পয়সার কথা তুলে বলেছিল, সে কি, তুমি সকলের কাছ থেকে টাকা নেবে, আমার কাছ থেকে নেবে না কেন? আমি পুলিশ

সার্জেন্ট বলেই কি আমার এই খাতির ?

একটু মুচকি হেসে বলেছিল রুমা, আমার ইচ্ছা।

—বারে, এটা তো তোমার প্রফেশন, মানে উপজীবিকা।

হাসির বদলে এবার একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছিল রুমা। একটু সময় চুপ করে থেকে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে গাঢ়কণ্ঠে সে জবাব দিয়েছিল, জানো সাহেব, আমি হচ্ছি গিয়ে বাসের কণ্ডাক্টর আর তুমি আমার বিনে পয়সার খদ্দের। যাত্রী বোঝাই বাস নিয়ে আমাকে তো আমার পথে যেতেই হবে। তোমার মত একজন খদ্দেরকে যদি বিনে ভাড়ায় বাসে তুলেই নিই তাতে আমার আর এমন কি লোকসান হবে ?

একটি সুন্দর সুঠাম অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবককে এ পাড়ায় এক বাঈজীর বাড়ি যাতায়াত করতে দেখে প্রথমটায় অনেকেই কৌতূহল বোধ করেছিল এ আবার কেমন ধরনের সাহেব? কিন্তু অল্পদিনেই ব্যাপারটা গা-সহা হয়ে উঠেছিল তাদের। রুমা এবং তার বাড়িওয়ালা সেই ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউই জানত না যে, ম্যাল্‌কম একজন পুলিশ অফিসার। জানলে তাদের কৌতূহল হয়তো কোন এক ধরনের সন্দেহের দিকে মোড় নিত। তাছাড়া, মানিকতলার এই এলাকাটা পশ্চিমা মুসলমানপ্রধান। দেশের রাজনীতি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাত না তারা।

ইচ্ছে থাকলেও সময় অভাবে রুমার বাড়ি খুব একটা যাতায়াত করত না ম্যালকম। তার ওপর তার সব সময় ভয়, পরিচিত কেউ তাকে দেখে ফেলল নাকি! নিজের বন্ধুদের সম্পর্কেই ভয়টা তার সব চাইতে বেশি। একবার ওরা ব্যাপারটা টের পেলে মেরিয়ার কানেও কথাটা উঠতে দেরি হবে না। মেয়েদের মন, তখন সে শত যুক্তি দিয়েও তাকে বোঝাতে পারবে না যে, একমাত্র সঙ্গীতের আকর্ষণেই সে রুমার কাছে যাতায়াত করে। এর চাইতে বেশী কিছু সম্পর্ক নেই তার রুমার সঙ্গে।

নিজের মনেও এই যুক্তিটাই নাড়াচাড়া করে ম্যাল্‌কম। রুমা তার কে? কেউ না। তাকে তার ভাল লাগলেও ভালবাসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রুমা বাঈজীর সঙ্গীত তাকে সত্যিই আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণেই সে মাঝে মধ্যে যায় তার কাছে। এর চাইতে বেশি কিছু সে তার কাছে চায়ও না। মেরিয়া তার প্রণয়িনী। তার অন্তরের অন্তস্তলের আসনটি একমাত্র মেরিয়ার জন্যেই নির্দিষ্ট। সেখানে অন্য কারও স্থান নেই। সময়-সুযোগ মত মেরিয়ার সঙ্গে সে ঘর বাঁধবে। তার মা-বাবাও সেই আশাতেই দিন গুনছে। মেরিয়ার নিজেরও তাই কামনা। কিন্তু মেরিয়া মনে অহেতুক দুঃখ পাবে বলেই ম্যাল্‌কম রুমার কথা তার কাছে প্রকাশ করতে পারে না। নইলে এ কথা তার কাছে বলতে কি দোষ ছিল ?

নিজের যুক্তির বেড়াজালে থেকে মনে মনে খুবই খুশি ছিল ম্যালকম। কিন্তু যুক্তিটা যে মোটেই নিরেট ছিল না, এর মধ্যে যে অনেকটাই ফাঁক ছিল এবং সেই ফাঁকের আড়ালে ম্যালকম নিজেকেই যে ফাঁকি দিচ্ছিল তা সে বুঝতে পারত না।

আগের দিন নাইট ডিউটি ছিল সার্জেন্ট ম্যাল্‌কমের। সারাটা দুপুর বিছানায় কাটিয়ে বিকেলের দিকে পাট-ভাঙ্গা প্যান্ট-সার্ট পরে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয় ম্যাল্‌কম। মেসের বারান্দায় এসে আকাশের দিকে একবার তাকায়। আকাশের মুখ ভার। যে কোন সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে। একমুহূর্ত ইতস্তত করে ম্যাল্‌কম। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়, ছাতা ছাড়াই সে বেরোবে। কলকাতার বাস-ট্রামের ভিড়ে ছাতা নিয়ে চলা-ফেরা করার মত ঝকমারি ব্যাপার আর কিছু নেই।

ম্যাল্‌কমের হাব-ভাব দেখে নর্টন মুখ টিপে একটু হেসে বললে, কি ভাই, চললি তো নির্ঘাৎ প্রিয়া-সন্দর্শনে। গিয়ে হয়তো দেখবি তোর মেরিয়া ওই আকাশের মতই মুখখানা ভার করে বসে আছে। কাজেই এত ভাবনা-চিন্তা না করে যীশুর নাম নিয়ে শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়।

ম্যাল্‌কম মুখে জবাব না দিয়ে নর্টনের দিকে তাকিয়ে কেবল একটু হাসে। নর্টনও চোখ টিপে এমন একটা ইঙ্গিত করে যার একমাত্র অর্থ—শিগ্‌গির চলে যা মেরিয়ার কাছে। এই বর্ষা-বাদলার দিনে জমবে ভাল। বাপ, মা বাড়ি না থাকলে এই সুযোগে একবার—

ইঙ্গিতটা খারাপ হলেও অস্বাভাবিক নয় মোটেই। কোর্টশিপ চলাকালে প্রেমিকার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন অনেকেই করে থাকে। বিশেষ করে তাদের সার্জেন্টস মেসে অনেকেই এই ব্যাপারে অভ্যস্ত। কেউ কেউ তো আবার ফুলে ফুলে মধু পান করে বেড়ায়। আর সার্জেন্ট গ্র্যান্টের মত বেহেড মাতাল তো প্রয়োজনের তাগিদে কুখ্যাত পল্লীতে পর্যন্ত যাতায়াত করে।

কিন্তু মেরিয়া যে একটু অন্য প্রকৃতির মেয়ে একথা ম্যাল্‌কম তার বন্ধুদের কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারে না। মেসের পার্লারে বসে এই প্রসঙ্গে সরস আলোচনা শুরু হলে সবাই একযোগে আক্রমণ করে ম্যাল্‌কমকে। বলে, কিরে জনি, তোর মেরিয়া নাকি ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানে না ?

একটু উদাস ভঙ্গিতে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, তা জানবে না কেন ? তবে রাজি হয় না।

—নিজে থেকে রাজি হয় ক'জন ? রাজি করাতে হয়। তুই ঐ কন্দর্প-কান্তি চেহারাটাই কেবল পেয়েছিস। আসলে একেবারেই একটা গবেট।

আর একজন হয়তো এই সময় বলে ওঠে, আর তাকিয়ে দেখ তো আমাদের গ্র্যান্টের দিকে। ইতিমধ্যেই ও কয়েক ডজনকে পার করে দিয়েছে।

ম্যাল্‌কম চুপ করে থাকে। এন্টনী হয়তো তার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে বলতে থাকে, না রে না, তোর—আমার চাইতে আমাদের জনি মোটেই কম সেয়ানা নয়। তবে একটু চাপা স্বভাবের ছেলে, তাই সব কথা আমাদের খুলে বলে না। তাই না রে, জনি ?

এন্টনীর কথায় আবার একটা হাসির রোল পড়ে যায়। ম্যাল্‌কম বুঝতে পারে এদের বিশ্বাস করানোর প্রচেষ্টা নেহাত পন্ডশ্রম। তাই আর কিছু না বলে সেও ওদের দলে যোগ দিয়ে হাসতে থাকে। আর, সেই মুহূর্তে অন্য সবাই ধরে নেয় যে, এন্টনীর কথাই তাহলে সত্যি।

সত্যি বলতে কি, ম্যাল্‌কম যে দু'একবার চেষ্টা না করেছিল তা নয়। মেরিয়ার মা-বাবার অনুপস্থিতির সুযোগে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সতর্ক মেরিয়া বলে উঠেছিল, না না জনি, এখন নয়। দিন তো ফুরিয়ে যায়নি, বিয়ের আগে এসব আমার একেবারেই ভাল লাগে না। যারা এসব করে তাদের আমার দস্তুর মত ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়। আর তোমার সম্বন্ধে আমার এমন উঁচু ধারণাকে এমনভাবে ভেঙে দিও না তুমি। দোহাই তোমার।

মেরিয়ার কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানে না ম্যাল্‌কম, কিন্তু সে আর এগোতে পারেনি। মেরিয়া কিন্তু সেই মুহূর্তে ম্যাল্‌কমের কাছ থেকে সরে যায়নি। তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে ম্যাল্‌কমের মুখখানা চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠেছিল, আমি জানি, তুমি আর দশটা ছেলের মত নও, জনি। আর এইটুকুই তো আমার গর্ব। এই গর্বটুকু বুকে নিয়েই তো আমি আমার বান্ধবীদের মধ্যে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াই।

ম্যাল্‌কম আরও একদিন মেরিয়াকে রাজি করাতে চেষ্টা করেছিল। মেরিয়া সেদিন শান্তকণ্ঠে ম্যাল্‌কমের চোখে চোখ রেখে বলেছিল, তোমাকে বারে বারে নিরাশ করতে আমার মোটেই ভাল লাগে না, জনি। ইচ্ছে হয় রাজি হই। আমার আচরণে তুমি মনে ব্যথা পাবে এটা আমার একদম ভাল লাগে না। কিন্তু ভাবছি কি জানো, তোমার মনের ব্যথা ঘোচাতে গিয়ে আমি নিজে যে ব্যথা পাব সে তো এ জীবনে তুমি ঘোচাতে পারবে না।

এরপরে আর কোনদিন সেই চেষ্টা করেনি ম্যাল্‌কম। মেরিয়ার সম্বন্ধে একটা গর্বমিশ্রিত আনন্দে বুকখানা ভরে উঠেছিল তার।

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যাল্‌কম বলেছিল মেরিয়াকে, মেরী মাতা কিন্তু যীশুকে কোলে পেয়েছিলেন কুমারী অবস্থায়। তাতে কিন্তু তাঁর গৌরব এতটুকুও ম্লান হয়নি।

যীশু ও মেরী মাতার নামে কপালে ও বুকে ক্রুশ এঁকে মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল মেরিয়া, বাগদত্তা হলেও মেরী মাতার গর্ভে ভগবান যীশু এসেছিলেন নাজারেথের মানুষ যোসেফের দ্বারা নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিবলে। তাই তো মেরী মাতা যীশুর মা হয়েও চিরকুমারী। তিনি আদর্শ নারী।

আর একদিন ম্যাল্‌কম এমনি একটা কাহিনীই শুনেছিল আর একজনের কাছে। তার নাম রুমা বাঈজী। সেদিন রুমা হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারতের কাহিনী শোনাচ্ছিল ম্যাল্‌কমকে। শুনতে বেশ ভালই লাগছিল তার। মহাবীর কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্তের কথা বলতে গিয়ে রুমা বাঈজী বলছিল, তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না সাহেব, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, ভগবানের অলৌকিক শক্তিবলে নারী গর্ভবতী পর্যন্ত হতে পারে। এতে কোন রক্তমাংসে গড়া পুরুষের প্রয়োজন হয় না। একদা পরিচর্যায় তুষ্ট দুর্বাসা মুনি পাণ্ডব-মাতা কুন্তীদেবীকে একটি মন্ত্রদান করেন। সেই মন্ত্র দ্বারা কোন দেবতাকে আহ্বান করলে তাঁর প্রসাদে পুত্রলাভ হয়। কৌতূহলী কুমারী সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে আহ্বান করলেন সূর্যদেবকে এবং তাঁরই প্রসাদে তিনি লাভ করলেন মহাবীর

কর্ণকে। কিন্তু লজ্জায় ভয়ে কুমারী কুন্তীদেবী ত্যাগ করলেন তাঁর সেই সন্তানকে।

এক রকম—অবিকল এক রকম কাহিনী। সেদিন রুমার বাড়ি থেকে ফেরার পথে ভগবান যীশু ও মহাবীর কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্তের কথাই মনে মনে আলোচনা করছিল ম্যাল্‌কম। বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্রতম জীব এই মানুষ। স্থান বিশেষে সময়, বিশেষে মানুষের কত বিচিত্র মনোভাব, কত বিভিন্ন লোকাচার। কুমারী মেরী মাতা সেদিন ভগবান যীশুকে গ্রহণ করেছিলেন বলেই পবিত্র বাইবেলের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। আর কুমারী কুন্তীদেবী মহাবীর কর্ণকে সেদিন বর্জন করেছিলেন বলেই সুবিশাল ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের সূত্রপাত ঘটেছিল। গ্রহণ ও বর্জন, ভোগ ও ত্যাগ, আবাহন ও বিসর্জন—মানুষের জীবনে এর সবগুলোই সত্য, কিছুই মিথ্যে নয়।

নর্টনের ইঙ্গিতের জবাবে আবার একটু হেসে ছাতা না নিয়েই বেরিয়ে এসেছিল ম্যাল্‌কম। লালবাজারের গেট পেরিয়ে এসে একটু সময় চিন্তা করে সে। যাবে কোন্ দিকে, লিণ্টন স্ট্রীট, না মানিকতলা? পূর্ব-দক্ষিণে, না পূর্ব-উত্তরে? অবশেষে উত্তরে যাওয়াই ঠিক করে একখানা চলন্ত ট্রামে উঠে বসে ম্যাল্‌কম।

শিয়ালদহ আসার আগেই কিন্তু শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজেই ট্রাম পাল্টে একটা বাসে করে মানিকতলা নেমে হাঁটতে হাঁটতে ম্যাল্‌কম যখন রুমা বাঈজীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সে পুরোপুরি স্নান করে ফেলেছে। ভিজে জামা-প্যাণ্ট লেপটে রয়েছে তার দেহের সঙ্গে। আমসত্ব হয়ে উঠেছে চামড়ার জুতো।

দরজা খুলে ম্যাল্‌কমকে ঐ অবস্থায় দেখে চমকে বলে ওঠে রুমা, এ কি সাহেব, এমনিভাবে ভিজতে ভিজতে আসার এমন কি দরকার ছিল? দেখ দেখি কি কাণ্ড! এবার যে আমার মত জ্বর বাধিয়ে ফেলবে, সাহেব। শিগ্‌গির এস—ভেতরে এস।

ম্যাল্‌কম ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করে, তোমার জ্বর নাকি, রুমা?

—তা ছাড়া আর কি? কাল রাতে এক মুজরো থেকে ফেরার পথে একটা ভাঙা ঘোড়ার গাড়িতে বসে খুব ভিজেছিলাম। আজ সকালেই কম্প দিয়ে জ্বর এলো। সারাটা দুপুর পড়ে রইলাম বিছানায়। এই তো একটু আগে সবে উঠে বসেছি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে ম্যাল্‌কম বললে, তাহলে আমি বরং আজ যাই। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। আর একদিন আসব। বলেই ম্যাল্‌কম ঘুরে দাঁড়াতেই রুমা খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলে বলে ওঠে, না, এই অবস্থায় তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না, সাহেব! জ্বর হয়েছে বলে আমি তো এখনও মরিনি। এস—ভেতরে এস।

রুমার সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না ম্যাল্‌কম। পেছন পেছন এসে দাঁড়ায় তার শোবার ঘরের সামনে।

ভেতরে এসে রুমা এবার বললে, তাই তো, এবার সত্যি সত্যি আমাকে

বিপদে ফেললে তুমি। তোমাকে এখন কি পরতে দিই বল তো? আমার ঘরে তো আর প্যাণ্ট-সার্ট নেই।

—না-না, ঠিক আছে। ব্যস্ত হতে হবে না তোমাকে। প্যাণ্ট-জামা ছাড়বার দরকার নেই।

—তা তো বটেই! এই ভিজে জ্যামা-প্যাণ্ট পরে থেকে জ্বর হবে, আর তখন এই রুমা পোড়ারমুখীকেই গালাগাল দেবে। ওসব হবে না সাহেব। প্যাণ্ট-সার্ট না থাকলেও ধুতি-পাঞ্জাবি আছে আমার ঘরে। কলতলায় গিয়ে তাই পরে এস। বলেই রুমা তার সেই পরিচারিকা মাসীকে ডাকতে থাকে, ও মাসী, আমাদের সাহেবের জন্যে একজোড়া ধুতি-পাঞ্জাবি নামিয়ে দাও। কথাটা বলেই রুমা খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে।

—ও কি, হাসছো যে? ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করে।

তেমনি হাসতে হাসতে জবাব দেয় রুমা, হাসছি তোমার দুরবস্থা দেখে। ধুতি-পাঞ্জাবি বোধহয় জীবনে পারোনি তুমি। তাই ও জিনিসের নাম শুনেই তোমার মুখের যে অবস্থা হয়েছে তা দেখেই আমার হাসি পাচ্ছে। তা, ধুতি পরতে জান তো সাহেব? না একতলার বাড়িওয়ালাকে ডেকে এনে তোমার সঙ্গে পাঠাতে হবে তোমাকে সাহায্য করতে?

রুমার ঠাট্টার জবাবে একটা কথা মুখে এসেছিল ম্যাল্‌কমের। ইচ্ছে হয়েছিল বলে, আমার আর আপত্তি কিসের? তবে তাতে তোমার নিজের গৌরবের কিছু হানি ঘটবে না তো?

ম্যাল্‌কম কিন্তু কিছুই বললে না সেই মুহূর্তে। তার মনে তখন অন্য এক প্রশ্ন। যুবতী রুমা বাঈজীর ঘরে ধুতি-পাঞ্জাবি কেন?

কলতলা থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ম্যাল্‌কম এসে দাঁড়াতেই আবার খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে রুমা। এবার বাঁধভাঙা বন্যার মত। হাসতে হাসতে তার জ্বর তপ্ত ছলছলে চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে। ম্যাল্‌কম অপ্রস্তুত মুখে কেবল দাঁড়িয়ে থাকে।

হাসি থামিয়ে বলে ওঠে রুমা, এরকম অদ্ভুতভাবে কেউ ধুতি পরে নাকি? নাঃ, এসব তোমার কর্ম নয়। বলেই সে এগিয়ে যায় ম্যাল্‌কমের কাছে।

রুমার নির্দেশে সামনে কোঁচা ঝুলিয়ে বেশ পরিপাটি করেই ধুতিখানা পরে ম্যাল্‌কম। রুমা বলে ওঠে, বাঃ, এই তো বেশ হয়েছে। এবার এই নাও চিরুনী। মাথা আঁচড়াও ভাল করে।

ধুতি-পাঞ্জাবিতে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল ম্যাল্‌কম। তার কেবলই মনে হচ্ছিল কোমর থেকে তার ধুতির গেরো বোধহয় এখনই খুলে যাবে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে খাটের ওপর বসতেই রুমা সামনে এসে শান্ত ভঙ্গিতে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ম্যাল্‌কমের দিকে।

রুমার ঐ দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কম। একসময় মৃদু হেসে সে জিজ্ঞেস করে, কি দেখছো অমন করে?

রুমা সে কথার জবাব না দিয়ে আরও কিছুক্ষণ তেমনিভাবে তাকিয়ে থেকে একসময় প্রায় নিজের মনেই বলে ওঠে, সাহেবরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে তাদের

যে এমন চমৎকার দেখায় তা কিন্তু এতদিন জানতাম না।

খাটের ওপর পড়েছিল একখানা বাংলা পত্রিকা। ম্যাল্‌কম বাংলা পড়তে না পারলেও এই পত্রিকাটা তার অপরিচিত নয়। মাসিক 'বেণু' পত্রিকার 'দীনেশ সংখ্যা' এটা। দীনেশ গুপ্তর ফাঁসির পরের দিন এরকম কয়েকখানা পত্রিকা কাছে রাখার অপরাধেই মুচিপাড়া থানা এলাকায় একজন পত্রিকা-ওয়ালাকে গ্রেপ্তার করেছিল তারা।

ব্যবধান বজায় রেখে রুমা খাটের ওপর বসতেই ম্যাল্‌কম পত্রিকাটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, শুয়ে শুয়ে এটাই পড়ছিলে বুঝি?

পড়ার কথায় একটু লজ্জা পায় রুমা। তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, না না, ঠিক পড়া নয়। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, পড়াশোনা আর শিখলাম কোথায়? তবে ছেলেবেলায় অক্ষর-জ্ঞান একটু হয়েছিল। তাই শুয়ে শুয়ে পত্রিকাটা—

মুচকি হেসে ম্যাল্‌কম আবার বললে, তুমি কি জানো যে, সরকার বাহাদুর তোমাদের এই 'বেণু' পত্রিকার দীনেশ সংখ্যাটা নিষিদ্ধ করেছেন? এখন এটা কাছে রাখাও বে-আইনী?

সহসা আবার হেসে ওঠে রুমা। হাসতে হাসতে বললে, আমি রাতদিন গান-বাজনা আর মুজরো-মাইফেল নিয়ে থাকি, তোমাদের এসব সরকারী আদেশ জানব কেমন করে? কিন্তু হাসি পাচ্ছে তোমাদের সরকার বাহাদুরের অবস্থা দেখে। এত ভয় তোমাদের? অল্পবয়সী একটা ছেলেকে হাতের মুঠোয় পেয়ে সবাই মিলে তাকে ফাঁসি-কাঠে লটকেও তোমাদের মনে শান্তি নেই? তার সম্বন্ধে লেখা কাগজ-পত্র পর্যন্ত তোমরা দেখলে ভয় পাও?

—একথা বলছ কেন, রুমা? দীনেশ গুপ্তকে সবাই মিলে জোর করে ধরে তো আর ফাঁসি দেয়নি। আইনের বিচারেই তার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল।

—ওসব ছেলেভুলান ছেঁদো কথায় কাজ কি সাহেব? তোমাদেরই তৈরি আইন দিয়ে তোমরাই তার বিচার করেছ। সেই বিচার ন্যায় না অন্যায় তা বিচার করবে কে বলতে পার? আসল কথা এদেশের মালিক এখন তোমরা। তোমাদের মর্জির ওপরই আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। সাপ হয়ে দংশন করতে হলেও তোমরা করবে, আর ওঝা হয়ে ঝাড়বার প্রয়োজন মনে করলেও তোমরাই তা করবে। কাজেই তোমাদের কথার ওপর তো আর কিছু নেই। তাই ওসব বিচার-আচারের কথা ছেড়ে দাও সাহেব। সোজা কথায়, তোমরা প্রয়োজন মনে করেছ বলেই ছেলেটাকে ফাঁসি দিয়েছ।

রুমার কথার ধরনে একটু সতর্ক হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কম। নিজেকে যতই কেন না মুখ্যু মেয়েমানুষ বলে প্রচার করুক, আসলে দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে সে যে অনেকের চাইতেই সচেতন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে জানে, বাঈজীর ছদ্ম-বেশে ও নিজেই হয়ত একজন মেয়ে টেররিস্ট!

রুমা যেন থট্ রিডিং জানে। একটু সময় চুপ করে থেকে ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, আমাকে যেন আবার ঐ বিপ্লবী দলের একজন বলে মনে কর না সাহেব। অবশ্য ঐ দলের একজন হয়ে দেশের কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম কোথায়?

—এইসব বিপ্লবীদের তুমি শ্রদ্ধা কর, রুমা ?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় রুমা, নিশ্চয়ই—একশ বার। ওদের শ্রদ্ধা করব না তো করব কাকে ? দেশের জন্যে যারা নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে তারা তো দেবতা। হিন্দু মেয়েছেলে হয়ে দেবতাকে ভক্তি করব না, তা কি হয় ? হতে পারি বাঈজী, কিন্তু তাই বলে তো অকৃতজ্ঞ হতে পারি না।

দেশের সরকারকে বোঝাতে গিয়ে ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে রুমার এই 'তোমরা', 'তোমাদের' প্রভৃতি কথাগুলো তেমন ভাল লাগছিল না ম্যাল্‌কমের। তাই সে প্রতিবাদের সুরে বললে, আমরা সরকারী চাকরি করি বলে আমাদেরকেই তুমি সরকার বলে ভুল করছ কেন রুমা ? আমিও তো এদেশের মানুষ, এই কলকাতা শহরেই আমার জন্ম। গায়ের রঙটা সাদা বলে আমি তো আর রাতা-রাতি বিলেতের মানুষ হয়ে উঠিনি।

একটু সলজ্জ হেসে রুমা জবাব দেয়, তা অবশ্য ঠিক। তবে আমাদের মত সাধারণ মানুষের চোখে সাদারা সবাই প্রায় একই রকম। তোমরা সবাই সাহেব —সেকালে যাদের বলা হত ফিরিঙ্গী।

কথায় কথায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। রুমার মাসী এসে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেয়! বাইরে তখনও সমানে জল ঝরছে। জানালা দিযে বাইরের দিকে তাকিয়ে রুমা আবার বললে, ওসব কথা থাক সাহেব। এবার বল তো, কি খেতে দিই তোমাকে ?

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই রুমা একটু হেসে আবার বলে ওঠে, আচ্ছা সাহেব, দিশি জামা-কাপড় যখন পরেছ তখন না হয় দিশি খাবারই আজ খাও, কেমন ?

— দিশি খাবার আবার কি ?

—খিচুড়ি। চাল-ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি হয়। এই বর্ষা-বাদলের দিনে পাঁপড় ভাজা দিয়ে সেই খিচুড়ি খেতে যা লাগে! বলেই জিভ ও তালুর সাহায্যে একটা শব্দ করে রুমা।

—তাই নাকি ? কখনও খাইনি। তবে তুমি যখন বলছ তখন খেতে আপত্তি নেই। তবে ভাল লাগবে কি না—

—তার মানে ? আমার মাসীর হাতের রান্না খিচুড়ি যে একবার খেয়েছে সে আর জীবনে কোনদিন তা ভুলতে পারবে না। সাহেব, জ্বরের জন্য আজ সারাদিন উপোস করে আছি। বিকেলে হঠাৎ খুব খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে হল। আর আমার মাসী আমার কোন ইচ্ছাই কখনও অপূর্ণ রাখে না। যদি কোনদিন আত্মহত্যা করার জন্যে বিষ খেতে ইচ্ছে হয়, আমার এই মাসী বোধহয় তাও আমার জন্যে যোগাড় করে আনবে। বলেই খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে রুমা। ম্যাল্‌কমও হাসতে থাকে।

খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজা খেতে খেতে ম্যাল্‌কম বললে, জিনিসটা ভালই, তবে একটু ঝাল।

—আরে বাপু, আমাদের এদেশী রান্নার ঐ ঝালটাই তো বিশেষত্ব। তোমরা যেখানে গোলমরিচের গুঁড়ো খেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা কর, আমরা সেখানে

কাঁচা লঙ্কা ও লঙ্কা বাটা খেয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করি!

—না-না, শুধু তোমরা কেন, কাঁচা লঙ্কা আমরাও খাই। আমাদের সার্জেণ্টস মেসে একবেলা রুটির সঙ্গে একবেলা ভাতের বন্দোবস্ত। ভাতের সঙ্গে প্রায়ই ফাউল-কারি থাকে, তাতে কাঁচা লঙ্কা দেয় আমাদের বাট্‌লার। তবে ঝাল একদম হয় না।

—তা হবে কেন? তোমরা এমন লঙ্কা খাও যাতে ঝাল থাকে না। মোটা-সোটা টক্‌টকে লাল আচারের লঙ্কা তোমাদের পছন্দ। তোমরা পছন্দ কর বাইরের চাকচিক্য, আর আমরা ভালবাসি ভেতরের গুণটুকু।

—না রুমা, সব ক্ষেত্রে তা ঠিক নয়। তোমার নিজের বাইরের চাকচিক্যের চাইতে ভেতরের গুণটুকুর জন্যেই তো আমি প্রায়ই আসি তোমার কাছে।

—প্রায় না ছাই! এবার ক'দিন পরে এলে বল তো? অবশ্য তোমার একেবারেই না আসা উচিত। আমার কথা টের পেলে তোমার সেই ভাবী বধূ নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলবে। তাছাড়া সত্যিই তো, যাকে ভালবাস তার বিশ্বাসভঙ্গ করা তো তোমার উচিত নয়।

—না, বিশ্বাসভঙ্গ আমি করছি না। তবে তোমার এখানে গান শুনতে এলে যদি বিশ্বাসভঙ্গ হয় তবে আমি নাচার। আমি গান ভালবাসি রুমা।

একটু সময় চুপ করে থেকে রুমা আবার বললে, শুধু গানের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকলে বিশ্বাসভঙ্গ হয় না ঠিকই, তবে তার বাইরে কিছু পেতে চাইলে—

হাতের চামচে নামিয়ে রেখে ম্যাল্‌কম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একটু সময় তাকিয়ে থাকে রুমার দিকে। পরে বললে, তেমন ব্যবস্থাও তোমার এখানে আছে নাকি?

রুমা আর কোন জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে। ম্যাল্‌কম আবার বললে, ও কি, জবাব দিচ্ছ না যে? আমি কিন্তু এতদিন জানতাম তুমি কেবল বাঈজী। গান শুনিয়ে পয়সা রোজগার করাটাই তোমার পেশা।

এবার মুখ তোলে রুমা। ছলছল চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে ধরা গলায় জবাব দেয়, চাল-ডালের দোকানেও যে দু'একটা মনোহারী জিনিস রাখার প্রয়োজন আছে, একথা একমাত্র দোকানী নিজে ছাড়া আর কে বুঝতে পারে, সাহেব? সবাইকে ফেরাতে পারলেও দু'একজন এমন নাছোড়বান্দা খদ্দের থাকে যাদের কিছুতেই ফেরান যায় না। তাদের জন্যেই ঐ মনোহারী জিনিস দোকানে না রেখে উপায় থাকে না। নইলে খদ্দের যে হাতছাড়া হয়ে যাবে। তোমার গায়ের ঐ জামা-কাপড় যে তাদের জন্যই তোলা থাকে সাহেব।

রুমার নিজের মুখে তার স্বীকারোক্তি শুনেও যেন কথাটা বিশ্বাস করতে মন চায় না ম্যাল্‌কমের। তার নিজের চোখে রুমার সেই সুকণ্ঠী গায়িকা রূপটিই স্পষ্ট। তার বাইরে তার যে আরও একটা রূপ আছে তা মনে করতে মোটেই ভাল লাগে না ম্যাল্‌কমের।

ম্যাল্‌কমকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে আঁচলে চোখ মুছে একটু হাসতে চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে রুমা, ও কি, চুপ করে বসে রইলে কেন? খাচ্ছ না যে? মাসী, সাহেবকে আর একটু খিচুড়ি দাও।

—না, না, আর চাই না আমার।

—সে কি, এইটুকুতেই পেট ভরে গেল? বৃষ্টি মাথায় করে এখানে এলে গান শুনতে। শরীর খারাপ বলে আজ গান শুনিয়ে তো আর মন ভরাতে পারলাম না। তাই, খিচুড়ি খাইয়েই পেট ভরাতে চাইছি, সাহেব।

মুখ-হাত ধুয়ে এসে ম্যাল্‌কম রুমাকে বললে, আমার ভিজে জামা-প্যাণ্ট এনে দাও রুমা। আমাকে এবার বেরোতে হবে।

—এই বৃষ্টি মাথায় করে যাবে তুমি? আমার ঘরে তো একটা ছাতাও নেই।

—উপায় কি বল? যেতে যখন হবেই তখন বৃষ্টিতে ভেজা ছাড়া আর তো কোন পথ নেই।

রুমা এবার ম্যাল্‌কমের আরও একটু কাছে সরে এসে বললে, না গেলেই কি নয় সাহেব। একটা রাত এখানে থেকে যেতে পার না? ভয় নেই তোমার। পাশের আসর-ঘরে তোমার বিছানা করে দেব। কোন অসুবিধে হবে না।

ম্যাল্‌কম হেসে জবাব দেয়, আমি পুরুষ মানুষ, আমার আবার ভয় কিসের? ভয় যদি কিছু থাকে তো তোমার।

ম্লান হেসে রুমা বললে, সর্বস্বান্ত ভিখিরির তো আর চোরের ভয় নেই। তবে ভিখিরির ঘরে চুরি করতে এসে কিছু না পেয়ে চোরের হতাশ হবার ভয় থাকতে পারে। ঠাট্টা নয়। একটা রাত থেকে যাও না এখানে।

—তা হয় না রুমা। লালবাজার সার্জেণ্টস মেসে আমাকে ফিরে যেতেই হবে। রাতে বাইরে থাকবার হুকুম নেই আমাদের।

—বেশ তবে যাও। আবার আসবে তো সাহেব?

—হ্যাঁ, আসব!

ভিজে জামা-প্যাণ্ট পরে প্রস্তুত হয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আসে ম্যাল্‌কম। তাকে এগিয়ে দিতে আসে রুমা বাঈজী।

## ছয়

অবশেষে কপাল গুণেই হোক, কিংবা মিসেস টেগার্টের বিলিতি শাঁখা-সিন্দুরের জোরেই হোক, কলকাতা পুলিশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট এদেশে চাকরির মেয়াদ শেষ করে পাড়ি দিলেন বিলেতে। পেছনে পড়ে রইল দু' নম্বর কিড স্ট্রীটের বাড়িটি আর লালবাজারের পুলিশ হেড কোয়ার্টার। আরও পড়ে রইল শহর কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাতৃভূমির জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ একদল যুবক-যুবতী, সরকারী ভাষ্যে যাদের নাম টেররিস্ট বা সন্ত্রাসবাদী। যাবার আগে চার্লস টেগার্ট এদের ভার দিয়ে গেলেন পরবর্তী পুলিশ কমিশনার কোল্‌সনের ওপর।

উনিশ শ' তেইশ থেকে একত্রিশ। পুরো আটটি বছর কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থেকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে টেগার্ট যে কাজ করেছিলেন, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ কৃতজ্ঞ সরকার তাঁকে 'নাইটহুডে' ভূষিত করতে মোটেই দ্বিধা করেনি। চার্লস টেগার্ট হয়ে উঠেছিলেন স্যার চার্লস টেগার্ট। কেবল এদেশের মুক্তিপাগল ছেলেরা সেদিন বিমর্ষ বোধ করেছিল টেগার্ট সশরীরে বিলেতে ফিরে যেতে পেরেছিল বলে। চেষ্টা করেও ওরা এই লোকটির গায়ে একটি বুলেটের চিহ্নও এঁকে দিতে পারেনি।

টেগার্টের পরে কোলসন। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, বাঁশের কঞ্চির মত সোজা। চাপা নাকের নিচে ছাঁটা গোঁফ। মাথায় পাতলা চুল, সামনের দিকে ছোট্ট একটু টাক। লম্বা ধরনের লালচে মুখখানায় সর্বদাই কেমন যেন একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব।

লোক হিসেবে খারাপ না হলেও টেগার্টের যোগ্য উত্তরাধিকারী কোলসন। টেগার্টের মত তাঁরও ধারণা ছিল এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব টিঁকিয়ে রাখতে কোন অন্যায়ই অন্যায় নয়। একটু সন্দেহপরায়ণ এই ব্যক্তিটি এদেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে তেমন কোন দুর্বলতা মনে পোষণ করতেন না। ওরা যে খাঁটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এ কথাটা সর্বদাই মনে থাকত তাঁর। কলকাতা পুলিশের সার্জেণ্ট পদে তখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একচেটে রাজত্ব। অতীতে এদের নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। কোম্পানীর চাকরিতে ও শিক্ষায় এরা ইউরোপীয়দের সমান সুযোগের অধিকারী কিনা তা নিয়ে বিলেতের মাটিতে অনেক জল ঘোলা হয়েছিল একদিন। সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত এই গোষ্ঠীর ইতিহাসে সেই সময়টাই হয়ে উঠেছিল এদের স্বর্ণযুগ। অত্যাচার ও নিপীড়ন যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সে যুগের ইতিহাসই তার প্রমাণ। সে যুগে এই সমাজের দাবী-দাওয়া আদায় করতে জে ডব্লু রিকেটসের মত স্বাধীনচেতা পণ্ডিত ব্যক্তিকে বিলেতে ছুটতে হয়েছিল দরখাস্ত হাতে নিয়ে, যার নাম 'ইস্ট ইণ্ডিয়া পিটিশন'। হাউস অফ কমন্স ও হাউস অফ লর্ডসের সিলেক্ট কমিটির সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন নিজের বক্তব্য পেশ করতে হয়েছিল জে. ডব্লু. রিকেটসকে। অবশেষে সফল হলেন তিনি। কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হল এই সমাজকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হল সেই স্বর্ণযুগ। চাকরি-সর্বস্ব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ আবার ডুব দিল গভীর অন্ধকারে।

টেলিগ্রাফ বিভাগে চাকুরিরত সেকালের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সহায়তায় ব্রিটিশ সরকার উত্তর ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান দমন করার কাজে সহজেই সাফল্য লাভ করেছিল। তারই ফলে রেল-বিভাগে তাদের চাকরির দরজা খুলে যায় সহজেই। তারপর একে একে শুল্ক বিভাগ, পুলিশ বিভাগেও ঘটতে থাকে তাদের অনুপ্রবেশ। অতীতের অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা ভুলে গিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ তখন ব্রিটিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সরকারের কাছেও তখন তারা হয়ে উঠেছে 'ঘরের ছেলে'। 'পরের ছেলে' আর নয়।

অবশেষে এদেশের মাটিতে যখন জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় ঘটল তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার প্রয়োগ করল তার অতি পুরাতন অথচ চিরনতুন অস্ত্র —ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। ঘরের ছেলেকে একেবারে কোলে টেনে নিল। চাকরি ও সুযোগ-সুবিধার লোভে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ ডুবে গেল চির অন্ধকারের মধ্যে। এককালে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এদেশে এসে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা এদেশের নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালে এদেশের মানুষের সঙ্গে সমান তালে চলতে না পেরে পিছিয়েই পড়ল তারা। সেই পিছিয়ে পড়াটাকে আর কোন দিনই 'মেক-আপ' দিতে পারল না। আজও তাই চলেছে।

দেওয়ানী মামলায় অভিযোগকারীকে বলা হয় 'বাদী', আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে বলে 'বিবাদী'। বিখ্যাত অলিন্দ-যুদ্ধের ঘটনাটা ফৌজদারী মামলার আওতায় পড়লেও মৃত্যুঞ্জয়ী সেই তিন বিপ্লবী বীর তাদের নামের আদ্যাক্ষর দিয়েই বাদী সরকার পক্ষের অভিযোগে বিবাদী হয়ে উঠেছিল। বিনয় - বাদল দীনেশ—'বি-বা-দী'।

সেই বিবাদীর প্রথম নায়ক বিনয় বসুর পিস্তলের গুলির আঘাত হজম করে দিব্বি আরোগ্য লাভ করল ঢাকার সেই পুলিশ সুপার হাডসন। চিকিৎসার জন্যে তাকে নিয়ে আসা হল ঢাকা থেকে কলকাতায়। হাসপাতালে সুস্থ হয়ে উঠতেই ঘটল তার পদোন্নতি। বিনয় বসুর বুলেটের আঘাত যে হজম করতে পেরেছে সেই বীরের পদোন্নতি না ঘটালে কি চলে? অবশ্য একে ঠিক পদোন্নতি বলা চলে না। পুলিশ সুপার থেকে কলকাতার ডেপুটি কমিশনার র‍্যাঙ্ক হিসাবে সমান, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে কিছু ফারাক আছে নিশ্চয়ই। বিশেষ করে সেই ব্রিটিশ আমলে ডি. সি.-র পদকে একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই গণ্য করা হত। শুধু কি সেকাল? একালেও তো জেলার পুলিশ সুপারদের মধ্যে অনেকেরই নজর থাকে ঐ ডি. সি. পদের দিকে। আর কিছু না থাক, চাকুরি জীবনে নিজের নামের শেষে একটি অতিরিক্ত টাইটেল জুড়ে দেওয়ার সুযোগ ঘটে এই পদের কল্যাণে। জে. পি. অর্থাৎ 'জাস্টিক অফ পীস' টাইটেলটি একমাত্র তিনি-ই বরাবর ব্যবহার করতে পারেন, যিনি নাকি একবার এই ডি সি পদের বুড়ি ছুঁতে পেরেছেন।

বিনয় বসুর গুলির আঘাত হজম করতে পারলেও সেই বিপ্লবী বুলেটের শক্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিল হাডসন। শুধু তাই নয়, সে আরও বুঝতে পেরেছিল যে, ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে যে কীর্তি সে স্থাপন করেছিল শহর কলকাতায় তেমন কিছু ঘটাতে চাইলে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। বিপ্লবী-দের গুলি বারে বারে হজম করার শক্তি তার নেই। বিপ্লবীরা যদি আবার তার দিকে নেক-নজর দেয় তাহলে বিলেতে ফিরে যাবার আশা ত্যাগ করতে হবে তাকে। সবাই তো আর চার্লস টেগার্টের মত ভাগ্য নিয়ে আসেনি।

কাজেই ডি. সি. হেডকোয়ার্টার হাডসন এবার একটু সংযত। শুধু তাই নয়, একটু ভীতও বটে। তাই টেররিস্টদের নাম শুনলেই একটু চমকে না উঠে

সে পারে না আজকাল।

এমনিতে কিন্তু বেশ আমুদে প্রকৃতির মানুষ এই হাডসন। বেশ গোলগাল চেহারা। নিচু পদের অফিসার ও কনস্টেবলদের সঙ্গে মেলামেশায় তেমন কোন অস্বস্তিবোধ ছিল না তার। কু-লোকে অবশ্য বলত, অল্পবয়সী রিক্রুট কনস্টেবলদের দিকেই নাকি তার নজর ছিল বেশি। সেই জন্যই নাকি লালবাজারে নিজের কোয়ার্টারে সে একা থাকত, স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিলেতে। পি. টি. এস. অর্থাৎ পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের অল্পবয়সী বাছাই রিক্রুট কনস্টেবলরা নাকি তার বাড়ির কাজকর্ম করে দিত।

সেকালে কলকাতা পুলিশের আর্মড ফোর্সের ব্যারাক ছিল ঐ পি. টি এস ও টালা পার্ক অঞ্চলে। পদাধিকারবলে ডি. সি হেডকোয়ার্টারই ছিল আর্মড ফোর্সের ডি. সি.।

একদিন সন্ধ্যায় হাডসন হঠাৎ এসে হাজির সেই পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে। আর্মড ফোর্সের কনস্টেবলদের এমনিতে কাজ বলতে তেমন কিছু নেই। খাও-দাও আর মল্লযুদ্ধ করে গায়ের শক্তি বাড়াও। কেবল প্রয়োজনে ডাক পড়ে তাদের, অনেকটা শান্তির সময় ফৌজী সেপাইদের মত।

মুহূর্তে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ডি সি—ডি. সি এসেছে! সতর্ক হও সবাই। হাডসন ফোর্সের অফিস-ঘরে আসতে পারে, কাজেই অফিসার ও সেপাইরা মিলে তাড়াতাড়ি টেবিল-চেয়ার গোছগাছ করতে লেগে গেল। হাডসন ব্যারাক ইন্সপেকশন করতে পারে। কাজেই কনস্টেবলরা তাড়াতাড়ি যে-যার খাটিয়া ও জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল। এমনকি ডি. সি. ইচ্ছে করলে কনস্টেবলদের মেসও দেখতে আসতে পারে, সুতরাং মেসের ঠাকুর-চাকরেরা আরম্ভ করল হাঁড়ি-কড়াই গোছাতে।

ডি. সি হাডসন কিন্তু কোনদিকে না গিয়ে সোজা চলে এল সেপাইদের ব্যায়ামাগারে। সেখানে তখন জনাকয়েক মল্লবীর সেপাই সবে মল্লযুদ্ধ শেষ করে বসে বসে বিশ্রাম করছিল। ছোট চুল, মোটা গোঁফ, বিরাট ভুঁড়ি, গায়ে-মাথায় ধুলো মাখা নেংটি পরা সেই মল্লবীরেরা ডি. সি.-কে দেখতে পেয়েই লাফিয়ে উঠে শক্ত কাঠের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হাডসন চলে এল তাদের কাছে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সেপাইদের দেখতে দেখতে আঙুলের ডগা দিয়ে কারুর ঝুলে পড়া মোটা গোঁফ নাড়ল, কারুর বা বিরাট ভুঁড়ি টিপে দেখল। তারপর সহসা একজনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

একটা ঢোক গিলে সেপাইটি নিজের নাম বলল। অনেকক্ষণ মল্লযুদ্ধ করে এমনিতেই তার গলা শুকিয়ে উঠেছিল। তার ওপর হঠাৎ ডি. সি র আগমনে গলাটা একবারে শুকনো খটখটে হয়ে উঠল।

তার অবস্থা দেখে হাডসন তাকে অভয় দেয়, ঘাবড়াও মত্। আচ্ছা, দু'বেলা ডন-বৈঠক তো কর, কিন্তু খাও কি?

—আজ্ঞে হুজুর, ডাল-রোটি।

—ব্যাস্! শুধুই ডাল-রোটি? দুধ খাও না?

— আজ্ঞে হুজুর, তাও একটু একটু খাই।

—ক'টা রোটি খাও ?

— আজ্ঞে, বিশ-পঁচিশখানা।

চোখদুটো কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করে হাডসন বলে ওঠে, বিশ-পঁচিশ খানা রোটি ! এর বেশি খেতে পার না ?

সাহেবের কথার ধরনে মনে আশার সঞ্চার হয় সেপাইটির। তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, হাঁ হুজুর, আরও বেশি খেতে পারি, কিন্তু মেস থেকে দেয় না।

—হুঁ ! একটু সময় চুপ করে থাকে হাডসন। তারপর আবার বলল, এই সামান্য মাইনে থেকে দেশে টাকা পাঠাও, নিজে রোজ রোজ বিশ-পঁচিশ খানা রোটি খাও, আবার সেই সঙ্গে দুধও খাও। এত পয়সা পাও কোথায় ?

সেপাইটি তো অবাক। সাহেবের প্রশ্নের ধরন যে এমনিভাবে ঘুরে যাবে তা সে ধারণাই করতে পারেনি।

সেপাইটিকে চুপ করে থাকতে দেখে হাডসন নিজের দুটো আঙুল নাচিয়ে বলে ওঠে, বেশ মোটামুটি ঘুষের বন্দোবস্ত আছে, তাই না ?

আরও অবাক হয় সেপাইটি। আর্মড ফোর্সের সেপাইদের ঘুষ খাওয়ার পথ কোথায় ? ঘুষের ব্যাপারটা তো আন-আর্মড অর্থাৎ থানা ফাঁড়ির সেপাই জমাদারদের একচেটিয়া। সেই লোভে তো দরখাস্তের পর দরখাস্ত দিয়েও সে নিজে আন-আর্মড ব্রাঞ্চে যেতে পারেনি। কিন্তু সাহের এসব কি বলছে !

সঙ্গে আর্মড ফোর্সের সার্জেণ্ট মেজরের দিকে তাকিয়ে হাডসন বলল, ওকে কাল আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবে। বলেই সে হেলতে দুলতে চলে যায় ব্যারাকের দিকে।

সারাটা রাত সেপাইটির ঘুম হল না। সঙ্গী সাথীরা আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও নয়। এতদিনের চাকরিটি বোধহয় এবার গেল। সাহেব-সুবোদের মর্জির ওপরই তাদের চাকরি। বিনা দোষে এবার তল্পি-তল্পা গুটিয়ে দেশে চলে যেতে হবে। যে হাতে এতদিন রাইফেল ধরেছে সেই হাতেই এবার লাঙ্গল ধরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

পরের দিন যথাসময়ে কনস্টেবলটি লালবাজারে হাডসনের অফিস-ঘরে ঢুকে এ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে স্যালুট করে দাঁড়ায়। বেচারা ভয়ে তখনও থরথর করে কাঁপছিল। কপালে আজ কি আছে ভগবান জানেন।

হাডসন কুতকুতে চোখে একবার তাকায় তার দিকে। ঠোঁটের কোণে তার চাপা হাসি, পরক্ষণেই নিজের আর্দালীকে ডেকে তার হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে কি যেন হুকুম করতেই আর্দালী সেই সেপাইটির দিকে তাকিযে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

একটু পরেই আর্দালীটি আবার ঘরে ঢোকে। হাতে দু'টো রসগোল্লার হাঁড়ি।

হাডসনের হুকুমে আর্দালী একটা হাঁড়ির মুখ খুলে অ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা সেপাইটির সামনে তুলে ধরতেই বেচারা ভাবাচাকা খেয়ে ডি. সি-র মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

হাডসন তাকে হিন্দীতে হুকুম দেয়, খাও।

—আমি—আমি হুজুর? বিস্ময়ের ঘোরে সেপাইটির মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে আসে কথাটা।

ধমকে ওঠে হাডসন, তুমি না তো আমি খাবো? খাও শিগ্‌গির!

তবুও যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটে না তার। এবার হাডসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই সেপাইটি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আজ্ঞে হুজুর খাচ্ছি, এক্ষুণি খাচ্ছি।

—হ্যাঁ খাও! আবার চেয়ারে বসে পড়ে হাডসন।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সাহেবের আর্দালী হাঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেপাইটি অ্যাটেন্‌শন ভঙ্গীতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁড়ি থেকে রসগোল্লা তুলে তুলে খাচ্ছে। খাওয়া হোক কিংবা আর যা কিছুই হোক না কেন, ডি. সি-র সামনে দাঁড়িয়ে তার হুকুম ছাড়া অ্যাটেন্‌শন ভঙ্গী থেকে স্ট্যান্ড এ্যাট ইজ্‌ ভঙ্গীতে দাঁড়াতে পারে না সে। এদিকে হাডসন চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে তার সেই খাওয়া দেখছে।

একটা হাঁড়ি শেষ হতেই আর একটা হাঁড়ি। সেকালের সস্তার বাজারে দশ টাকার রসগোল্লা তো সহজ ব্যাপার নয়!

দ্বিতীয় হাঁড়িটা আসতেই সেপাইটি মৃদু আপত্তি করতে যেতেই হাডসন ধমকে ওঠে তাকে. চুপ, কথা বল না। খেয়ে যাও কেবল। বিশ-পঁচিশখানা রোটিতে যার পেট ভরে না, দেখবো সে কত খেতে পারে!

দু'হাঁড়ি রসগোল্লা শেষ হতেই হাডসন নিজের পকেট থেকে আর একখানা পাঁচ টাকার নোট টেনে তোলে। এবার আর সহ্য হয় না সেপাইটির। পুলিশী নিয়ম-শৃংখলার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলতে থাকে, দোহাই হুজুর, আর পারবো না। হুজুর মা-বাপ। আরও খেলে নির্ঘাৎ পেট ফেটে মরে যাবো।

হাসতে হাসতে নোটখানা পকেটে রেখে হাডসন জিজ্ঞেস করে, পেট ভরেছে এবার? আর খেতে ইচ্ছে করছে?

—জী, না।

—জল খেতে ইচ্ছে করছে?

—জী, হাঁ।

—ঠিক আছে। আর্দালী জল দেবে। জল খেয়ে সোজা চলে যাও ব্যারাকে।

সাহেবকে সেলাম ঠুকে ভারি পেট নিয়ে টলতে টলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সেপাইটি। আর কোনদিন বোধহয় সে অনুযোগ করবে না যে, মেস থেকে তাকে পঁচিশখানার বেশী রোটি দেওয়া হয় না। বিশেষ করে, ডি. সি. হাডসনের কাছে তো নয়ই।

সাহেব পরিবর্তন মানেই নিয়ম-কানুনেরও কিছু কিছু পরিবর্তন। নিজের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রচলিত নিয়ম-কানুনের কিছু না কিছু পরিবর্তন করতেই হবে। কাজেই টেগার্টের পরে কোল্‌সনের আমলে লালবাজারেও এসেছে কিছু পরিবর্তনের জোয়ার। দোতালায় সি. পি-র ঘরের সামনে সতর্ক পুলিশ পাহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আগে রাতের দিকে হালকা

পাহারার ব্যবস্থা ছিল। কোল্‌সন এসে তা নাকচ করে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করছে। লালবাজার গেটের সামনেও হাতে আর. সি. তকমা আঁটা প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। নিজের পছন্দমত কিছু ডি. সি.-কে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে সে। হেডকোয়ার্টার থেকে বাইরে বদলি করে দিয়েছে কিছু অফিসারকে। সেই সূত্রে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমও হেডকোয়ার্টার থেকে বদলি হল বৌবাজার থানায়। ম্যাল্‌কমের হয়ে একজন ডি. সি. কিছু বলতে গিয়েছিল কোল্‌সনকে। বলেছিল, হি ইজ ভেরি কম্পিটেণ্ট সার্জেণ্ট, স্যার।

জবাবে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল কোল্‌সন, হু ইজ ইনকম্পিটেণ্ট ইন দি ফোর্স? এভরিবডি ইজ কম্পিটেণ্ট। সার্জেণ্টের মামুলী কাজ, তার আবার কম্পিটেন্সির প্রশ্ন! হুঁঃ!

সার্জেণ্ট রিক্রুটমেণ্টের ব্যাপারে আলোচনার সময় কোল্‌সন একদিন জিজ্ঞেস করেছিল একজন ডেপুটিকে, আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে, সার্জেণ্ট পদের দরখাস্তের ফরমে একমাত্র প্রার্থীর নিজের নাম-ঠিকানা ছাড়া আর কারুর নাম-ধাম লেখার প্রয়োজন হয় না? এমন কি নিজের পিতৃপরিচয়ও নয়?

জবাবে ডেপুটি বলেছিল, ইয়েস স্যার।

—কেন এই নিয়ম? সাব-ইন্সপেক্টর পদের জন্যে যেখানে বাপ-ঠাকুর্দা তো বটেই, এমনকি চৌদ্দপুরুষের নাড়ী-নক্ষত্রের খবরের প্রয়োজন হয়, সেখানে সার্জেণ্ট পদের জন্যে এই পক্ষপাতিত্ব কেন? ওরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে?

বোধহয় তাই স্যার। সরকার বোধহয় ধরেই নিয়েছে যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা ইউরোপীয়ানদের সমগোত্রীয়।

—তাই বলে নিজের বাপের নামটাও লিখতে হবে না?

এবার আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে ডি. সি।

—এই বিদঘুটে নিয়ম সম্পর্কে কে সঠিক খবর দিতে পারে?

—তা বলতে পারি না, স্যার। সি. আর. ও-কে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

সি আর. ও. অর্থাৎ সেণ্ট্রাল রিজার্ভ অফিসার ভদ্রলোকটি বয়সে প্রৌঢ়। এই বাঙালী অফিসারটির চাকরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জীবনে অনেক বিলিতি পুলিশ কমিশনারকে সে পার করেছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

কোল্‌সনের প্রশ্নে মনে মনে একটু হেসে সে জবাব দেয়, তা তো ঠিক বলতে পারছি না, স্যার। তবে সার্জেণ্টরা সবাই যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তখন—। কথাটা শেষ না করেই সে থেমে যায়।

মনে মনে আবার একটু হেসে মাথা চুলকে ঘুরিয়ে জবাব দেয় সেই সি আর. ও. ভদ্রলোক, সত্যিই ব্যাপারটা একটু বেখাপ্পা, স্যার। এতদিন ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করছি কিন্তু এমন একটা প্রশ্ন এই প্রথম আপনার কাছ থেকেই পেলাম, স্যার। এই দীর্ঘদিন চাকরির অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে—

—কি দেখেছেন?

—না স্যার, তেমন কিছু নয়। তবে সার্জেণ্ট পদপ্রার্থী কোন কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক নিজের পিতৃপরিচয় দিতে গিয়ে সময় সময় একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়। অবশ্য সবাই নয়, কেউ কেউ। তাদের সেই লজ্জার হাত থেকে

অব্যাহতি দেবার জন্যেই বোধহয় সরকার বাহাদুর সেকালে এমন একটা নিয়ম চালু করেছিলেন। একালে অবশ্যি এই নিয়ম চালু রাখার আর কোন মানে হয় না, স্যার! আজকাল ওদের অধিকাংশই ভদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ঘরের সন্তান।

—অল রাইট, ইউ মে গো।

মনে মনে আর একবার হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে ভদ্রলোক। সাপও মরল, আবার লাঠিও ভাঙল না। বোঝার হলে এতেই সাহেব ব্যাপারটা বুঝে নেবে।

একমাত্র সার্জেণ্ট এণ্টনী ছাড়া ম্যাল্‌কমের বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সবাই হেড-কোয়ার্টার থেকে বদলি হয়েছে অন্যত্র। হেডকোয়ার্টারের চাকরি থেকে থানার চাকরিতে খাটুনি অনেক বেশি। তাছাড়া ও. সি.-র বসিং তো আছেই। সকাল থেকে বেশি রাত অবধি ঘুরে বেড়াতে হয় থানার এলাকায়। মাঝখানে লাঞ্চের সময় কয়েক ঘণ্টা ছুটি। লালবাজার সার্জেণ্টস মেসে এসে স্নান-খাওয়া শেষ করে আবার ছুটতে হয় থানায়। থানায় পরিশ্রম বেশি হলেও তা পুষিয়ে নেবার ব্যবস্থাও যথেষ্ট। কোন কোন ওস্তাদ সার্জেণ্ট থানা থেকে অনাত্র বদলি হয়েও সেই বদলি নাকচ করার জন্যে রীতিমত ধর্ণা দেয় সি. আর ও-র অফিসে। সুযোগ বুঝে সি. আর. ও ভদ্রলোকও ঝোপ বুঝে কোপ মেরে চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে কসুর করে না। পাল্লার ভারী ও হাল্কা দিক খতিয়ে দেখে সেই বুঝে সাহেবের কাছে তদ্বির করে।

সার্জেণ্টের চাকরি রাজার চাকরি। দায়-দায়িত্বহীন এমন একটা চাকরির চাকচিক্যই আলাদা। এরা চাকরিতে হাবিলদার, পোশাকে সাব-ইন্সপেক্টর, আর মাইনেতে ইন্সপেক্টর। লেখাপড়ার সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন এমন লাঠিবাজি চাকরি সেকালে ছিল সত্যিই বিরল। ওদের এক্তিয়ারে এন্‌কোয়ারীর মধ্যে চা-দোকানের লাইসেন্সের কিংবা পেটি মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট মামলার এন্‌কোয়ারী। তা ছাড়া কে কোথায় পথ অবরোধ করে বসেছে কিংবা মদ খেয়ে কে মাতলামি করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে অথবা কার গরু কিংবা ধর্মের ষাঁড় রাস্তা জুড়ে বসে পাবলিকের অসুবিধার সৃষ্টি করছে—এই সব বিষয়ের দিকে নজর রাখাই ছিল সার্জেণ্টের কাজ। এ ছাড়া থানার কনস্টেবল ব্যারাকের কর্তৃত্বও তার ওপর ন্যস্ত। এলাকায় যে কোন একটা কিছু ভারি ঘটনা ঘটলে সেখানে আর সার্জেণ্টের কোন দায়িত্ব নেই। তখন সব কিছু বর্তায় থানার সাব-ইন্সপেক্টর কিংবা ও. সি-র ওপর। সোজা কথায় সেকালে হলওয়েল সাহেবের তৈরি টাউন-গার্ডের দায়িত্বটুকুই কেবলমাত্র থেকে গিয়েছিল সার্জেণ্টের ঘাড়ে। আর, একাজে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা বিশেষ পটু বলেই সরকারী হুকুমে একমাত্র তাদেরই নিয়োগ করা হত এই পদে। তাই এই চাকরিতে বিদ্যে-বুদ্ধির চাইতে শক্তি-সাহসের কদরই ছিল বেশি।

পুলিশ কমিশনার কোল্‌সন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। নিজে একজন আই. পি. অফিসার হলেও এটা সে ভাল করেই জানত যে, কর্মনৈপুণ্যে সব আই. পি. অফিসারই এরকম হতে পারে না। নিজের কর্মক্ষমতা দ্বারা চার্লস টেগার্ট সরকারী মহলে যে রেখাপাত করেছিলেন, তার পাশাপাশি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

করা কেবল শক্তই নয়, প্রায় অসম্ভব। এখন শহর কলকাতায় যে কোন সিরিয়াস ক্রাইম বা পলিটিক্যাল ঘটনা ঘটবে তাতে সরকারী মহল তার কর্ম-নৈপুণ্য যাচাই করতে চাইবে চার্লস টেগার্টের মাপকাঠিতে। অবশ্য তাদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব আই. পি. অফিসারই যে চার্লস টেগার্ট নন, একথা তখন আর কেউ ভেবে দেখবে না।

তাই প্রথম থেকেই কোল্‌সন চারিদিকে চোখ-কান খোলা রেখে সরকারী ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট হয়ে উঠল। নিজের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে 'রুথলেস টু দি টেররিস্টস্ অ্যান্ড টেন্ডার টু দি ল এবাইডিং পিপল্‌স'—এই বাক্যটি শিরোধার্য করেই সে ভাসাল তার শাসন-যন্ত্রের নৌকা। শহর কলকতায় বিপ্লবীদের ওপর প্রেসার সেই আগের মত তো বটেই, এমন কি তার চাইতেও কিছু বেশি পড়তে লাগল। সাদা পোশাকের পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল তাদের সেই গুপ্ত ঘাঁটির খোঁজে। আর তারই ফলে 'টেন্ডার টু দি ল এবাইডিং পিপল্‌স' কথাটার আর সম্মান বজায় রাখা গেল না। নিপীড়ন চলতে লাগল নিরীহ জনসাধারণের ওপর।

তার উপর জাতীয় কংগ্রেসের ভাবভঙ্গীও ভল নয়। ইদানীং সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসীদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজী লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক থেকে খালিহাতে ফিরে এসেই আপাতস্থগিত আইন অমান্য আন্দোলনকে আবার তীব্রতর করে তোলেন। শহর কলকাতার রাস্তায়, পার্কে সর্বত্র জনসভা – আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক। শহরের অবস্থা গরম। প্রতিদিনই দলে দলে আইন অমান্য আন্দোলনকারী নর-নারীকে জেলে পাঠাতে হচ্ছে। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের খবরে সেই আন্দোলন আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। চিন্তিত হয়ে উঠল ব্রিটিশ সরকার। দু'বছর আগে লবণ-আইন ভঙ্গের প্রথম দিকে অহিংস সত্যাগ্রহীরা গান্ধীজীর নির্দেশে ধরসানা নামক জায়গায় সরকারী লবনগোলা আক্রমণের মত কোন ঘটনা কলকাতায় না ঘটে। লালবাজার সর্বদাই সরগরম। আজ সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে হাজরা পার্ক থেকে। কাল হয়তো মনুমেন্টের কাছে কিংবা দেশবন্ধু পার্ক থেকে। প্রথমে তাদের এনে তোলা হচ্ছে লালবাজারের সেন্ট্রাল লক-আপে। সেখান থেকে পরের দিন আদালত ছুঁয়ে একেবারে সোজা জেলখানায়।

লর্ড সিন্‌হা রোডের এস. বি ও আই. বি. অফিসও তৎপর। চিন্তিত কোল্‌সনও। দু'টো ফ্রন্টে তাকে লড়াই চালাতে হচ্ছে। একদিকে অহিংস সত্যাগ্রহীরা, অন্যদিকে সহিংস বিপ্লবীরা। দুশ্চিন্তা এই দু'দলকে নিয়েই।

একালের শহর কলকাতা। শহরটা যেন বৃদ্ধ ম্যালকমের নিজের মতই বুড়ো হয়ে পড়েছে। ম্যালকমের তো তবু চলার শক্তি আছে এখনও, কিন্তু হতভাগ্য শহরটার যেন সেটুকু ক্ষমতাও নেই। ম্যালকমের নিজেরও ত্রিসংসারে কেউ নেই, সম্পদ বলতে কেবল পেনশনের সামান্য ক'টা টাকা আর হোম ফর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ওল্ড মেন-এর পুরনো বাড়িটায় মাথা গুঁজবার মত একটু ঠাঁই।

কিন্তু এই শহর কলকাতার অবস্থা তো তেমন নয়। কয়েক লক্ষ সন্তানকে বুকে ধরে রেখেছে এই বুড়ো শহরটা। তাদের মধ্যে অনেকেই তো প্রচুর সম্পদশালী। সেই সম্পদ তারা আহরণ করেছে এই শহরের বুকে বসে ব্যবসা-বাণিজ্য করেই। এত ধন-জন যার সহায় তার অবস্থা এমন কেন? কেন তার পথে-ঘাটে এমন আবর্জনার স্তূপ, কেন তার রাস্তা-ঘাট এমন ভাঙাচোরা? তবে কি এই শহরটার দশা কোন সম্পদশালী ব্যক্তির অবহেলিত বাপের মত? ব্রিটিশের অনেক দোষ ছিল। তারা এদেশকে শোষণ করেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্যজ্ঞান মিশিয়ে গড়ে তুলেছিল শহর কলকাতার মত অনেক শহর। শুধুমাত্র গড়ে তুলেই ক্ষান্ত থাকেনি তারা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও নজর ছিল তাদের। কিন্তু একালে—।

থাক ওসব কথা। পথ-পরিক্রমায় বেরিয়েছে, আপন মনে সেই পথ-পরিক্রমাই করবে বৃদ্ধ ম্যালকম।

বড় ক্লান্ত লাগছে। একটু ধূমপান করতে ইচ্ছে করছে তার। হাতের লাঠিখানার ওপর ভর দিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের খোঁজ করতে থাকে। গেল কোথায় সিগারেটটা? হোম থেকে বেরুবার সময়ও তো সেটা প্যান্টের পকেটে রুমালের নিচেই ছিল। তবে কি সেটা রাস্তায় পড়ে গেছে? সম্ভবত তাই। রুমাল বের করে মুখ মোছার সময় বোধহয় ওটা পড়েই গেছে। আবার পাঁচটা পয়সার ধাক্কা।

বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে পানের দোকান থেকে একটা চারমিনার সিগারেট কিনে ধরায় ম্যাল্কম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানিকক্ষণ ধূমপান করে, তারপর আবার লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে থাকে উত্তরমুখো।

বাঁদিকে সেই মেডিকেল কলেজ। লালবাজারে থাকতে এই মেডিকেল কলেজে কতবার আসতে হয়েছে তাকে মুমূর্ষু বিপ্লবীদের নিয়ে। কেউ মারা গেছে এখানেই, কেউ বা এখান থেকে ভাল হয়ে বেরিয়ে গিয়ে জেলের মধ্যে ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুবরণ করেছে।

মেডিকেল কলেজ ছাড়িয়ে আরও উত্তরে এগিয়ে যায় বৃদ্ধ ম্যাল্কম। ডাইনে কলেজ স্কোয়ার আর বাঁয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পুরনো রূপ আজ আর নেই। বহুকালের বহু স্মৃতি-বিজড়িত সেই সিনেট হাউস আজ অন্তর্হিত। তার জায়গায় বহুতল আধুনিক বাড়ি।

রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাথে নানা ধরনের পোস্টার। সেকালের রাজনীতি-ঘেঁষা ছাত্ররা কাগজের পোস্টারেই সন্তুষ্ট থাকত, কিন্তু একালে আর এত অল্পে এরা সন্তুষ্ট নয়। তাই এখানে-ওখানে রঙ-বেরঙের কালিতে বড় বড় অক্ষরে দেয়াল-লিখনের ঘটা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেয়ালের সিমেন্টের আস্তরণ অসমান করে রেখেও এই নবীন আর্টিস্টদের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। নাঃ, এখানে আর নয়। এবার হ্যারিসন রোড ধরে শিয়ালদা হয়ে হোমে ফিরে যেতে হবে। লাঠিহাতে বৃদ্ধ ম্যাল্কম যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই অতীত ইতিহাসের একখানা পাতা সহসা খুলে যায় তার চোখের সামনে।

কোন্ সাল সেটা? ঊনিশ শ' তেত্রিশ? না না, ঊনিশ শ' বাত্রিশ সালের

ফেব্রুয়ারি মাসের দুই তারিখ। পুলিশের চোখের সামনেই ঘটল সেই ভয়ানক ঘটনা। গোটা লালবাজার সেদিন এখানে উপস্থিত। কিন্তু তবুও তারা সেদিন রুখতে পারল না সেই অনিবার্যকে। কলেজ স্কোয়ারের এই দীঘির জল বোধহয় আজও তার সাক্ষী। একটি সাধারণ বাঙালী তরুণীর ক্ষাত্র তেজের দীপ্তিতে গোটা ভারতবর্ষ সেদিন উদ্ভাসিত। তরুণীটির নাম কুমারী বীণা দাস।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন মিটিং। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ডিগ্রী-ডিপ্লোমা বিতরণ করা হবে। প্রথানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলরের উপস্থিত থাকার কথা এই মিটিংয়ে। তিনিই নতুন গ্রাজুয়েট ও অন্যান্যদের ডিগ্রী-ডিপ্লোমা বিতরণ করবেন। পদাধিকারবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলর হচ্ছেন বাংলার গভর্ণর স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাকসন।

নিয়ম মাফিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গভর্ণরকে আমন্ত্রণ জানালেন মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে। কর্তৃপক্ষের আশংকা ছিল দেশের যে রাজনৈতিক অবস্থা তাতে জ্যাকসন উপস্থিত থাকতে রাজী হবেন কিনা।

কিন্তু না, তাদের আশংকা নিতান্তই অমূলক। দেশের টেররিস্টদের ভয়ে বাংলার গভর্ণর কনভোকেশন মিটিংয়ে উপস্থিত হতে রাজী হলেন না, এমন একটা প্রচার কেবলমাত্র গভর্ণরের নিজের প্রেস্টিজেই নয়, ব্রিটিশ-সিংহের প্রেস্টিজেও আঘাত করবে। কাজেই সেদিন সেখানে উপস্থিত না থেকে উপায় নেই তাঁর।

যথাসময়ে গভর্ণরের সেক্রেটারীর কাছ থেকে খবর এল যে, হিজ এক্সেলেন্সি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন এবং চ্যানসেলরের যা কিছু করণীয় সবই করবেন। সঙ্গে যাবেন তাঁর স্ত্রী লেডী জ্যাকসন।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল চারদিকে। সোজা কথা তো নয়, ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপীঠ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উৎসব। একই সময় প্রতিষ্ঠিত ভারতের তিন প্রান্তে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই যে শ্রেষ্ঠ তা সেকালে চ্যানসেলর নিয়োগের পদ্ধতি দেখেই বোঝা গিয়েছিল। বম্বে, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলর হিসেবে যেখানে নিয়োগ করা হয়েছিল সেখানকার প্রাদেশিক গভর্ণরদের, সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যানসেলর নিযুক্ত হন ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং।

লালবাজারে খবরটা পৌঁছতেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সি. পি. কোলসন। দেশের এই পরিস্থিতিতে হিজ এক্সেলেন্সি নিজে ওখানে উপস্থিত না থাকলেই ভাল করতেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের যা খবর তাতে বিপ্লবীরা বেশ সক্রিয়। তার ওপর আইন-অমান্য আন্দোলনের ঢেউ তো আছেই।

কিন্তু কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে তো আর বাংলার গভর্ণর চলবেন না। তাঁর ইচ্ছেতেই চলতে হবে সি. পি. কে।

অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে সি. পি কোলসন একখানা চিঠি পাঠাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলরের কাছে। তাতে তাঁকে অনুরোধ জানানো হল, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং হিজ এক্সেলেন্সির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কনভোকেশনের দিন তিনি যেন পুলিশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকতে অনুমতি দেন।

শুনেই তো খাপ্পা হয়ে উঠলেন ভাইস-চ্যানসেলর। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের অনুপ্রবেশ! তাও আবার কনভোকেশন উৎসবের মত একটা পবিত্র দিনে! এ হতেই পারে না। এই মর্মেই চিঠির জবাব গেল সি. পি-র কাছে।

ভাইস-চ্যানসেলরের জবাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কোল্‌সন। ভাইস-চ্যানসেলরের এত বড় সাহস যে, পুলিশ কমিশনারের অনুরোধ উপেক্ষা করে! শহর কলকাতার নিরাপত্তার ভার যার হাতে তার কথার কোন মূল্য নেই? ঠিক আছে, এর একটা বিহিত করতেই হবে। ভাইস-চ্যানসেলরের উপরে আছেন খোদ চ্যানসেলর। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে তাঁর কাছ থেকেই অনুমতি নেবে কোল্‌সন।

এখানেই কোল্‌সন ভুল করল। ব্যাপারটা নিয়ে খোদ গভর্ণরের কাছে না গেলেই ভালো করত সে। ব্রিটিশ হলেও স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাকসনের কাণ্ডজ্ঞান কোল্‌সনের চাইতে কিছু বেশিই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের অনুপ্রবেশ নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা যদি উৎসব বয়কট করে তাহলে সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই চীফ সেক্রেটারী মারফত সি. পি. কোল্‌সনের আর্জি শুনে তিনি জবাব দিলেন, টেররিস্টদের ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঢুকবে এ হতেই পারে না। কলকাতার পুলিশ কি এতই অপদার্থ হয়ে উঠেছে যে, গভর্ণরকে রক্ষা করতে হবে বলে তারা কনভোকেশন মিটিংয়ে লাঠি-বন্দুক হাতে গভর্ণরকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকবে? তাই যদি হয় তো স্পেশাল ব্রাঞ্চটা রাখা হয়েছে কেন? কেন তারা আগে থেকে খবর জোগাড় করে সেই মত ব্যবস্থা নিচ্ছে না? কোল্‌সনের বদলে চার্লস টেগার্ট সি পি থাকলে বোধহয় এমন কথা তাঁকে শুনতে হত না।

গভর্ণরের জবাবে দারুণ দমে গেল কোল্‌সন। একজন আই. পি অফিসারের পক্ষে এর চাইতে বেশি অপমান আর কি হতে পারে? কিন্তু উপায় নেই। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এমন অপমান একটু-আধটু সহ্য করতেই হবে।

ডাক পড়ল স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি সি. ও অন্যান্য ডেপুটিদের। শলা-পরামর্শের পর ঠিক হল, এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে শ্যাম ও কুল দু'দিকই রক্ষা হয়।

কনভোকেশনের দিন কলেজ স্ট্রীট লোকে লোকারণ্য। গভর্ণর আসবেন। তাঁকে দেখার জন্যে ফুটপাথে কৌতূহলী জনতার ভিড়। বাধ্য হয়ে পুলিশকে যানবাহন বন্ধ করে দিতে হয়েছে এই রাস্তায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে ফুটপাথে সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাঠিধারী পুলিশ। সিনেট হাউসের গেটের বাইরে পুলিশের দারুণ কড়াকড়ি। জন কয়েক ডেপুটি কমিশনারসহ খোদ সি. পি কোল্‌সন সেখানে হাজির। গেট পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন সার্জেণ্ট। ঠিক গেটের মুখেই ডিউটি পড়েছে সার্জেণ্ট ম্যালকমের। সকলের দেহেই আজ গভর্ণর-ডিউটির জন্যে সেরিমোনিয়াল পোশাক। একটু দূরে মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে কয়েকখানা পুলিশভ্যান সহ বিরাট পুলিশ-বাহিনী। তাদের হাতে রাইফেল। যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যে তারা প্রস্তুত।

শুধু কি তাই? কোল্‌সনের আদেশে লর্ড সিন্‌হা রোডের স্পেশাল ব্রাঞ্চের

অফিসার ও ওয়াচার কনস্টেবলেরাও সেখানে উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর ইউনিফর্ম পরা পুলিশের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তাই বলে সাদা পোশাকে দর্শকদের আসনে গিয়ে বসতে তো তাদের মানা নেই। সিনেট হাউসের দর্শকদের ভিড়ে মিশে রয়েছে তারা। প্রতিটি সন্দেহজনক ব্যক্তির ওপরে দু'তিন জোড়া করে তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টি। যে-কোন মুহূর্তে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা প্রস্তুত।

গেটের মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেণ্ট ম্যালকম। লোকজন যাতায়াত করছে গেট দিয়ে। প্রতিটি লোকের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে সে। পাশে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাদা পোশাকে কয়েকজন এস. বি-র অফিসার। পরিচিত কোন টেররিস্টকে দেখতে পেলেই তারা ধরিয়ে দেবে। যাতায়াতকারী লোকজনদের মধ্যে কারুর ওপর সন্দেহ হলেই ম্যাল্কম তাকে একপাশে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তারপর নিঃসন্দেহ হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে তাকে। কনভোকেশন গাউন ও টুপি পরে নতুন গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীরা হাসিমুখে গল্প করতে করতে যাতায়াত করছে সিনেট হাউসের ভেতরে।

একসময় ফুটপাথের জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে ওঠে—আসছে—লাটসাহেব আসছে!

একটু পরেই রাস্তায় জেগে উঠল মোটর-সাইকেলের শব্দ। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর ও অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা এসে দাঁড়ালেন গেটের সামনে গভর্ণরকে অভ্যর্থনা করতে।

প্রথমে মোটর-সাইকেল পাইলট। তারপরে পুলিশের সিকিউরিটি ভ্যান। তারও পরে লাটসাহেবের নম্বরবিহীন রোল্সরয়েস মোটরগাড়ি। গাড়ির দু'পাশে দু'জন মোটর-সাইকেল সিকিউরিটি। সবশেষে পর পর দু'খানা সিকিউরিটি ভ্যান। বিরাট পুলিশ-বাহিনী গার্ড দেওয়ার নামে লাটসাহেবকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে আসছে সভাস্থলে।

গাড়ি এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে এলেন গভর্ণর স্যার স্ট্যান্লি জ্যাকসন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লেডী জ্যাকসন। সি পি. কোল্সন এগিয়ে গিয়ে কড়া হাতে স্যালুট করে তাঁকে। গোঁফের কোণে একটু হাসির রেখা টেনে অভিবাদন গ্রহণ করেন গভর্ণর জ্যাকসন। তারপর হাত বাড়িয়ে করমর্দন করেন সি. পি-র সঙ্গে। ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছেন ভাইস-চ্যানসেলর ও অন্যান্য কর্মকর্তারা। গভর্ণর জ্যাকসন সকলের সঙ্গে করমর্দন করেন। অবশেষে তাঁদের নিয়ে দলটি এগিয়ে যায় সিনেট হাউসের দিকে।

গেটের মুখে সার্জেণ্ট ম্যাল্কম গভর্ণরকে স্যালুট করতেই গভর্ণর আগের মতই ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে গ্রহণ করেন সেই অভিবাদন।

সিনেট হাউসের বিরাট হলঘর লোকে গিস গিস করছে। গাউন পরা ছাত্র-ছাত্রীরা বসে আছে একপাশে। আর, অন্যপাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অতিথিবৃন্দ। অধ্যাপকদের মধ্যে আছেন সেকালের বিখ্যাত পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার পালিত অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন ও পি. সি.

রায় প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও অন্যান্যরা। প্রেস এনক্লোজারে খবরের কাগজের সংবাদদাতারাও নোটবই, পেন্সিল নিয়ে প্রস্তুত গভর্ণরের কনভোকেশন এ্যাড্রেস লিপিবদ্ধ করবে বলে।

ডায়াসের ওপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝখানে বসে আছেন গভর্ণর জ্যাকসন। পরনে ধূসর রঙের সুট, গলায় বো-টাই, আর শ্রীমতী জ্যাকসন বসেছেন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে। তিনি পরেছেন দামী ছাপা কাপড়ের স্কার্ট, হাতে ছোট্ট একটা এ্যাটাচি কেস।

শুরু হল অনুষ্ঠান। ভাইস-চ্যানসেলরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর একে একে নাম ধরে ডাকা হতে লাগল নতুন গ্রাজুয়েটদের। জমকালো কনভোকেশন গাউন ও টুপি মাথায় গ্রাজুয়েটেরা একে একে গভর্ণরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত থেকে গ্রহণ করতে লাগল ডিগ্রী কিংবা ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট। গভর্ণর জ্যাকসন মুখে স্মিতহাসি ফুটিয়ে তুলে প্রত্যেকের সঙ্গেই করমর্দন করতে লাগলেন। মেয়ে গ্রাজুয়েটেরা অবিশ্যি করমর্দনের বদলে হাতজোড় করে নমস্কার জানাতে লাগল তাঁকে।

এবার ডায়াস থেকে ডাক এলো—কুমারী বীণা দাস।

ভিড়ের মধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল একটি তরুণী। তারপরে ভিড় কাটিয়ে একটু একটু করে গভর্ণরের দিকে এগোতে লাগল সে।

—কুমারী বীণা দাস। আবার ডাক এল ডায়াস থেকে। গভর্ণর জ্যাকসনও সার্টিফিকেটখানা হাতে নিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত।

হঠাৎ কুমারী বীণা দাসের গাউনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একখানা চুড়ি-পরা হাত। হাতের পাঁচটি আঙুল ধরে রয়েছে একটি চকচকে রিভলভার। পরক্ষণেই কেউ কিছু বুঝবার আগেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে পর পর চারবার গুলি ছুঁড়ল কুমারী বীণা দাস।

মুহূর্তে যেন একটা বজ্রপাত ঘটল সিনেট হাউসের মধ্যে। চেয়ারসুদ্ধ একপাশে কাত হয়ে পড়ে নিজেকে বাঁচালেন গভর্ণর জ্যাকসন। হাউ হরিবল! বলে এপাশ থেকে চিৎকার করে উঠলেন লেডী জ্যাকসন। তাঁর হাতের এ্যাটাচিটা ছিটকে পড়ল একদিকে। ডায়াসের ওপর উপবিষ্ট কর্মকর্তারা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দিশেহারা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তরুণী বীণার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলভারসুদ্ধ তার হাতখানাকে চেপে ধরল সাদা পোশাক পরা দুজন অফিসার।

শুরুতেই একটা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। চারিদিকে হৈচে, গোলমাল, চিৎকার। কেউ কেউ ভয়ে ঠেলাঠেলি করে হলের বাইরে আসতে চেষ্টা করছে, কেউ বা গুলির শব্দে আতঙ্কিত হয়ে চেয়ারসুদ্ধ আছাড় খেয়ে পড়েছে মেঝেয়। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের আর গভর্ণরের ভাষণ কভার করার সুযোগ হল না। তার বদলে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মনের পাতায় লিখে নিয়ে পরের কাহিনীটুকু জানবার জন্যে অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

গুলির শব্দ কানে আসতেই কমিশনার কোল্‌সন তার দলবল নিয়ে ছুটল সিনেট হাউসের দিকে। তার আশঙ্কা যেমন সত্য হয়েছে, তেমনি খোদ

গভর্ণরের ওপর এই আক্রমণ প্রকট করে তুলেছে পুলিশী ব্যর্থতা। উঁচু সরকারী-মহলে হয়তো এই ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করা হবে পুলিশী অপদার্থতা বলে। কিন্তু কোল্‌সন নিরুপায়—সম্পূর্ণ নিরুপায়। এত লোকের মধ্যে কার মনে কি আছে তা আগে থেকে কেমন করে টের পাওয়া যাবে? তাই যদি সম্ভব হত তা হলে চার্লস টেগার্টের নিজের ওপর আক্রমণের সেই ঘটনা ঘটত না কিংবা তিনটি তরুণ সেদিন গোটা রাইটার্স বিল্ডিংস্‌টাকে লণ্ডভণ্ড করতে পারত না।

ধরা পড়ে তরুণী বীণা দাস কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে একটুও চেষ্টা করল না। সে জানে, এতগুলো লোকের সঙ্গে সে একা কিছুতেই পারবে না। তাছাড়া, গভর্ণরকে গুলি করে ভিড়ের মধ্য থেকে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা যে খুবই কম সে কথা ভাল করে জেনেই সে এই কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু তার একমাত্র দুঃখ, একটা গুলিরও সে সদ্ব্যবহার করতে পারল না। চারটে গুলিই ব্যর্থ হল। সময় পেলে রিভলভারের বাকি দুটো গুলিও সে কাজে লাগাতে পারত। কিন্তু তাও হল না।

সিনেট হাউসের ভেতরে ঢুকে একটু আশ্বস্ত হল কোল্‌সন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সর্বনাশ চরম পর্যায়ে পৌঁছয়নি। গভর্ণর এবং লেডী জ্যাকজন অক্ষতই আছেন।

ধড়াচুড়ো পরা পুলিশের উপস্থিতিতে সিনেট হাউসের ভেতর আতঙ্ক আরও বেড়ে ওঠে। এবার পুলিশী তাণ্ডবের আতঙ্ক। কোল্‌সন ঝড়ের বেগে বীণা দাসের সামনে এসে কটমট করে একবার তার দিকে তাকিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সার্জেণ্ট ম্যালকমকে হুকুম দেয়, এই ডেঞ্জারাস মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে পুলিশভ্যানে তোল। বি কেয়ারফুল! ও যেন পালাতে না পারে। বলেই কোল্‌সন অফিসারদের নিয়ে ছুটে যায় ডায়াসের দিকে যেখানে দাঁড়িয়ে গভর্ণর জ্যাকসন তখনও চেষ্টা করছিলেন নিজেকে সামলে নিতে এবং আতংকিত লেডী জ্যাকসন দু'চোখ বিস্ফারিত করে তখনও বলে চলেছিলেন একটি কথা, হাউ হরিবল্‌—হাউ হরিবল্‌!

চীফের হুকুমে সার্জেণ্ট ম্যালকম এগিয়ে গিয়ে বীণার হাতখানা চেপে ধরতেই বীণা শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্ট ইংরেজি উচ্চারণে বলে ওঠে, না—না, আমাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে।

তারপর একটু থেমে সংক্ষেপে আবার বলে ওঠে, ফাঁসি হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার একমাত্র দুঃখ সফল হল না আমার প্রচেষ্টা। টার্গেটে একটা গুলিও লাগাতে পারলাম না আমি।

সেই মুহূর্তে নিজের বিপদের কথা না ভেবে টার্গেটে গুলি লাগাতে না পারার দুঃখেই বোধহয় মেয়েটির চোখ জলে ছল্‌-ছল্‌ করে উঠেছিল।

সারাদিন প্রচণ্ড ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। লালবাজারের 'বারে' ঢুকে একটু বেশি পরিমাণেই হুইস্কি গলায় ঢেলে সার্জেণ্ট্‌স মেসে নিজের বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিল ম্যালকম। পাশের ঘরে তখন জোর আলোচনা চলছিল আজকের ঘটনা নিয়ে। আকণ্ঠ মদ খেয়ে সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট তখন জড়িতকণ্ঠে কুরুচিপূর্ণ শব্দপ্রয়োগে একটানা বক্তৃতা দিয়ে চলছিল

কি করে এমন ডেঞ্জারাস মেয়েগুলোকে শায়েস্তা করা চলে। তার সেই খিস্তি-খেউড়ের মাঝখানে শ্রোতার দল মাঝে মাঝেই অট্টহাসিতেই ফেটে পড়ছিল।

হুইস্কির দৌলতে মাথাটা ঝিম-ঝিম করছিল ম্যালকমের। কিন্তু তার মধ্যেও চিন্তার বিরাম ছিল না তার। আজকের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তার চিন্তা। কপালগুণে জোর বেঁচে গেছেন গভর্ণর জ্যাকসন। আজ একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন তাঁকে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে ঐ বীণা দাস! অল্পবয়সী ঐ তরুণীটির কি সাংঘাতিক মনোবল, কথা বলার কি দৃপ্ত ভঙ্গিমা। এতটুকু অনুতাপ নেই মনে, নেই এতটুকু ভয় কিংবা দুশ্চিন্তা। কেবল আক্ষেপ—গভর্ণরের গায়ে গুলি লাগাতে পারেনি বলে—শুধুই আক্ষেপ।

মেয়েটি এমন কঠিন মনোবলের অধিকারিনী হল কেমন করে? শুধুই কি দেশপ্রেম? দেশপ্রেম কি মানুষকে, বিশেষ করে একটি তরুণীকে, এমন মনোবলের অধিকারিণী করে তুলতে পারে? রুমা বাঈজী তো সেদিন এরকম একদল মৃত্যুভয়হীন ছেলে-মেয়েকেই দেবতার পর্যায়ে তুলে তাদের পুজো করার কথা বলেছিল। সত্যিই কি ওরা তাই? বিদেশী বুটের তলা থেকে দেশের মুক্তি-কামনাই কি ওদের পাগল করে তুলেছে?

দেশ—দেশ—দেশ। নিজের দেশের মুক্তিই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের একমাত্র কামনা। আচ্ছা, তার নিজের কামনা কি? তার নিজের দেশ কোন্‌টা?

শক্ত প্রশ্ন, জবাবটাও তেমনি শক্ত। রুমা বাঈজীর কাছে নিজেকে এদেশের লোক বলে জাহির করতে সে যতই কেন না চেষ্টা করুক, মনে মনে নিজেকে সাদার দলেই ফেলতে ভালবাসে ম্যাল্‌কম। শুধু সে কেন, তাদের সমাজের প্রত্যেকেরই বোধহয় এই মনোভাব। এদেশের জন্যে সত্যিকারের মমত্ববোধ তার কোথায়? ধর্মীয় আচরণে এদেশের হিন্দুরা যেমন তাকিয়ে থাকে পূর্বদিকে, আর মুসলমানেরা পশ্চিমে মক্কার দিকে, তেমনি রাজনৈতিক আচরণে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ তাকিয়ে আছে সুদূর ইংলণ্ডের দিকে। সেটাই তো স্বাভাবিক। এদেশের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র কোথায়?

ম্যালকমের মনে পড়ে সেই ছেলেবেলার কথা। এদেশের ছেলে বুড়োরা তাদের বলত ট্যাঁস, গালাগাল দিত 'দো-আঁশলা' বলে। সেগুলো কি শুধুই মুখের কথা? না বোধহয়। ও দিয়েই ওদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যেত। আসলে তাদের সঙ্গে এদেশের যে কোন নাড়ির সম্পর্ক নেই সেই কথাটাই এদেশের মানুষেরা প্রতিনিয়ত তাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিত, আর তারাও সেকথা শিরোধার্য করে তাকিয়ে থাকত বিলেতের দিকে।

কিন্তু সত্যিই কি বিলেত দেশটা তাদের নিজেদের দেশ? সত্যিই কি তারা একজাতীয়? এদেশ থেকে যদি কোনদিন ব্রিটিশকে চলে যেতে হয়, সেদিন খাঁটি ইয়োরোপীয়দের মত তারাও কি ঠাঁই পাবে ওদেশে? কে দিতে পারে এই প্রশ্নের সত্যিকারের জবাব?

হঠাৎ সেদিনকার কথাটা মনে পড়ে ম্যাল্‌কমের। একটা পেটি মোটর এ্যাক্সিডেণ্ট মামলার এন্‌কোয়ারী করতে সে গিয়েছিল একজন ভদ্রলোকের বাড়ি। ভদ্রলোক খাঁটি ইয়োরোপীয়, একটা বিলাতি ফার্মের বড় অফিসার।

ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল না ম্যাল্‌কমের। অগত্যা এনকোয়ারী শেষ করতে তার ইয়োরোপীয় স্ত্রীর সঙ্গেই কথা বলতে হয়েছিল তাকে।

প্রথমটায় মহিলাটি বোধহয় তাকেও একজন খাঁটি ইয়োরোপীয় বলে ভুল করেছিল। কিন্তু যখন জানতে পারল যে, ম্যাল্‌কম অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তখন তার চোখে-মুখে যে অবজ্ঞার ভাবটুকু ফুটে উঠেছিল তা বোধহয় কোনদিনই সে ভুলতে পারবে না। সেই মুহূর্তে ম্যাল্‌কমের ছেলেবেলায় পড়া ঈশপের গল্পের সেই দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের কাহিনীটি মনে পড়েছিল। যাকে নিজের বলে ভাবতে পারি না, তার অত্যাচারে গায়ে ব্যথা লাগলেও মনে তেমন একটা দাগ কাটে না। কিন্তু যাকে নিজের বলে ভাবি, তার সামান্য অবজ্ঞাটুকুও মনের গভীরে রেখাপাত করে। কোন ইরেজার দিয়েই সেই রেখাটাকে মুছে ফেলা যায় না।

পরের দিন সকালে বেশ ঝরঝরে শরীর নিয়েই ঘুম থেকে উঠল ম্যাল্‌কম। বাথরুমে ঢুকে দাঁতে ব্রাশ করতে করতে আগের দিন রাতের সেই সব অসংলগ্ন কথা মনে পড়তে নিজের মনেই হাসি পেল তার। মনে মনে ভাবল—ওসব কেবল অতিরিক্ত হুইস্কির এ্যাক্‌শন। নাঃ, গাঁটের পয়সা খরচ করে আর কোনদিন অসংলগ্ন চিন্তাকে টেনে আনবে না সে। গ্র্যাণ্ট, অ্যাণ্টনী, নর্টন ওদের মনেও কি এ ধরনের অসংলগ্ন চিন্তার উদয় হয়? বোধহয় না। তবে কেন সে শুধু শুধু এসব চিন্তা করে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে তুলতে চায়? কি প্রয়োজন তার? মেরিয়ার কথাই ঠিক। টেররিস্টদের উৎখাত করে এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থ কায়েম করতে সাহায্য করাই তার একমাত্র কর্তব্য। তার নিজের একমাত্র পরিচয়, সে কলকাতা পুলিশের সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। এর বাইরে তার আর কোন পরিচয় সে চায়ও না।

রুমা বাঈজীকে মাঝে-মধ্যে সে যে-কথা শোনায় তা কেবল তার মনরাখা কথা। রুমার গান সে পছন্দ করে, রুমাকে তার ভাল লাগে—ব্যস, এই পর্যন্ত। এর বেশি কিছু নয়। রুমার কাছে যাতায়াত কিংবা তার মুখে এদেশীয় কথা-কাহিনী শোনার মধ্য দিয়ে এটা মোটেই প্রমাণ হয় না যে, সে এদেশীয় কৃষ্টি-সভ্যতার প্রতি হঠাৎ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছে। সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট মত্ত অবস্থায় মাঝে মধ্যে যে সব গণিকা-পল্লীতে যাতায়াত করে, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এদেশীয় স্ত্রীলোক। কিন্তু তাই বলে কি এটা প্রমাণ হয় যে, গ্র্যাণ্টের মত লোক হঠাৎ এদেশের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছে?

তবে কি রুমা বাঈজীও ওদের মতই একজন গণিকা? তা ছাড়া আর কি? সেদিন রুমা তো নিজের মুখেই তা স্বীকার করেছে। কেবল সে চমৎকার গান গাইতে পারে বলে বাঈজীর আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। ওদের সঙ্গে তার এটুকুই যা তফাৎ।

ইদানীং মেরিয়া বিয়ের জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার এত ব্যস্ততার কারণ কি? তবে কি মেরিয়া রুমার ব্যাপারে কিছু টের পেয়েছে? রুমা সম্বন্ধে সে নিজে কি কখনও কিছু বেফাঁস বলে ফেলেছে মেরিয়ার কাছে? কৈ, তেমন কিছু তো মনে পড়ে না। তবে হ্যাঁ, গান-বাজনা নিয়ে আলোচনার সময়

এদেশীয় গানের প্রতি তার মনোভাবের কথা সে কোনদিন লুকোয়নি মেরিয়ার কাছে। শুনে মেরিয়া কৌতুক বোধ করে ঠাট্টার সুরে বলেছে, তুমি কি একালের অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী হতে চাও নাকি ?

জবাবে ম্যাল্‌কম হেসে বলেছে, পুলিশের সার্জেণ্ট না হলে হয়তো একবার চেষ্টা করে দেখা যেত। সেকালের অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী নিশ্চয়ই পুলিশ সার্জেণ্ট ছিল না ?

মাথা দুলিয়ে জবাব দিয়েছে মেরিয়া. না, তা ছিল না। সেযুগে একালের মত পুলিশ কোথায় ছিল ? থাকলে, সার্জেণ্ট না হোক একটা কনস্টেবলের পোস্ট পেতে পারত। গুণ তো তার কম ছিল না !

সরল কণ্ঠে ম্যাল্‌কম বলেছে, লোকটি খুব গুণবান ছিল নাকি ? তার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি, তবে সঠিক কিছুই জানি না।

—আহা, এমন একটি গুণধর ব্যক্তির সম্পর্কে কোন খবর রাখো না তুমি ? নিজের ধর্ম ছেড়ে যে পরের ধর্ম গ্রহণ করে, তার গুণের কি কিছু ঘাটতি আছে ?

—লোকটি বুঝি খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু হয়েছিল ?

না, অনুষ্ঠান করে ধর্মত্যাগ করেনি। তবে আচার-আচরণে প্রায় তাই হয়ে উঠেছিল। জাতিতে ছিল পর্তুগীজ। বিয়ে করেছিল একজন হিন্দু স্ত্রীলোককে। বৌবাজারের ফিরিঙ্গী কালীমন্দির তো ঐ লোকটাই প্রতিষ্ঠা করেছিল। হিন্দু দেব-দেবীর গান নিয়েই লোকটা মেতে থাকত।

মেরিয়ার মুখে এসব কথা কিসের ইঙ্গিত ? তার নিজের বরাবর গানের প্রতি ঝোঁকের কথা মেরিয়ার অজানা নয়। মেরিয়া নিজেও তার মত্ই বিখ্যাত এনরিকো কারুসোর একজন ভক্ত। তাঁকে নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনাও হয় মাঝে মাঝে। ম্যাল্‌কমের আগ্রহ ও উৎসাহেই বাপের কাছ থেকে সম্প্রতি একটা গ্রামোফোন যন্ত্র আদায় করেছে মেরিয়া। তবে কি দিশী সঙ্গীতের প্রতি তার আগ্রহের কথা জানার পর থেকেই মেরিয়া মনে মনে শংকিত হয়ে উঠেছে ? তাই কি সে ঠাট্টার ছলে অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গীর কাহিনী শোনাল তাকে ? নাকি ব্যাপারটা তার চাইতেও কিছু গুরুতর ? আগাগোড়া রুমার ব্যাপারটা জেনেশুনেই কি তবে মেরিয়া সোজাসুজি তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গীর গান ও তার হিন্দু স্ত্রীর কথা পেড়ে তার মনোভাব টের পেতে চাইছে ? আর সেটাই কি তার বিয়ের ব্যাপারে এত ব্যস্ততার কারণ ?

কথাটা খোলাখুলি মেরিয়াকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেয় ম্যাল্‌কম। যাক্ গে, জেনেই যদি থাকে, কিছু করার নেই। তা ছাড়া, শুধু কথা দিয়ে কি মেরিয়ার মনের সন্দেহ সে দূর করতে পারবে ? তার চাইতে ও সব নিয়ে এই মুহূর্তে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো।

ম্যাল্‌কম বললে, দেখ মেরি, বল তো আজ-কালের মধ্যেই দরখাস্ত করতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে সি পি. তা মঞ্জুর করবেন কিনা জানি না। মাস ছয়েক আগে আমাদের সার্জেণ্ট নর্টনও দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু বর্তমান ল এ্যাণ্ড অর্ডার

সিচুয়েশনের জন্যে সি. পি তা নামঞ্জুর করেছেন।

ম্যাল্‌কমের কথার অর্থ ঠিক ধরতে না পেরে মেরিয়া জিজ্ঞেস করে, কিসের দরখাস্তের কথা তুমি বলছ, জনি?

—বারে, কিসের আবার? বিয়ের!

—বিয়ের দরখাস্ত? সে আবার কি? বিস্মিত চোখে মেরিয়া তাকিয়ে থাকে ম্যাল্‌কমের মুখের দিকে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু হেসে ম্যাল্‌কম জবাব দেয়, মাই গুড্‌নেস। পুলিশ সার্জেণ্ট কাউকে বিয়ে করতে চাইলে যে সি. পি.-র অনুমতি নিতে হয়, এটা তুমি জানতে না?

বিস্ময় এবার চরমে ওঠে মেরিয়ার। সে বলে ওঠে, সেকি, একজন পুলিশ সার্জেণ্ট কাকে বিয়ে করবে তাও বিবেচনা করবে তোমাদের কমিশনার? তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে হবে না? এরকম একটা বিদঘুটে নিয়ম সত্যিই বিচিত্র!

মেরিয়াকে থামিয়ে ম্যাল্‌কম আবার একটু হেসে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না—না, ব্যাপারটা তা নয়। সি. পি. বিয়ের পাত্রী বাছাই করে দেবেন না। পাত্রী যে-ই হোক্ না কেন, বিয়ে করতে হলে সি. পি-র অনুমতির প্রয়োজন।

—তাই বল। এতক্ষণে যেন একটু আশ্বস্ত হয় মেরিয়া। তারপর আবার তেমনি সুরেই বলে ওঠে, তা বাপু, এটাও কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। বিয়ে-শাদী মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে আবার সরকারী হস্তক্ষেপ কেন?

জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, তা অবশ্য বলতে পারি না। তবে এই নিয়ম মেনেই সার্জেণ্টদের চলতে হয়। বোধহয় বিয়ে করলেই সার্জেণ্টরা লালবাজারে সরকারী কোয়ার্টার চাইবে কিংবা লালবাজার ছেড়ে প্রাইভেট কোয়ার্টারে চলে যাবে, এই জন্যেই এই নিয়ম চালু হয়েছিল। সে যাই হোক্, আমি দু'এক দিনের মধ্যেই দরখাস্ত করছি, দেখা যাক কি হয়।

একমুহূর্ত থেমে আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে মেরিয়া বলতে থাকে, ব্যাপারটা ভাবলেই হাসি পায় আমার। বিয়ে করার জন্যে অনুমতি! ড্যাডি শুনলে একেবারে তাজ্জব বনে যাবে।

মেরিয়ার কথাবার্তায় সেই মুহূর্তে ম্যাল্‌কম কিন্তু এমন কিছু লক্ষ্য করে না যাতে বোঝা যায় যে. বিয়ের ব্যাপারে তার মনে কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে।

## সাত

পুলিশ কমিশনার কোল্‌সন যা আশঙ্কা করেছিল তেমন কিছুই ঘটল না। বাংলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাক্‌সনের ওপর আক্রমণের জন্যে সরকারের কাছে তেমন কোন কৈফিয়ত দিতে হল না তাকে। বোধহয় আক্রমণকারিণী হাতে-নাতে ধরা পড়েছিল বলে সরকার এ নিয়ে তেমন কিছু হৈ-চৈ করল না। তা ছাড়া, সরকার মহানুভব। বিশেষ করে, ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মহানুভবতার অন্ত নেই। এরাই যে তার রাজ্যপাট

রক্ষার প্রধান হাতিয়ার।

কমিশনারের সরকারী আবাস দুই নম্বর কিড্ স্ট্রীটে মিসেস কোল্সনকে প্রায় দেখাই যায় না। সকালের দিকে বাড়ি থাকলেও বিকেলে তার দেখা পাওয়া সত্যিই কঠিন। ভদ্রমহিলা একটু অতিরিক্ত সোস্যাল প্রকৃতির। আজ এর বাড়ি পার্টি, কাল ওর বাড়ি অন্য কোন অনুষ্ঠান, এসব নিয়েই মহিলাটি রাত-দিন ব্যস্ত। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় নিজের স্বামীকে নিয়ে চিন্তা কিংবা দুশ্চিন্তা কোনটাই তার নেই। বয়স হলেও ভদ্রমহিলা সাজগোজ করতে এখনও বেশ ভালবাসে। থাকেও এমন টিপ্‌টপ হয়ে যে তার আসল বয়স অনুমান করা বাস্তবিকই শক্ত।

সাংসারিক ব্যাপারে কোল্সন সাহেব নিজে আবার একটু অন্য ধাতের। এমনিতে কড়া প্রকৃতির হলেও কোল্সনের মনটা কিন্তু 'কোল্' অর্থাৎ কয়লার মত কৃষ্ণবর্ণ নয়। তাই স্ত্রীর এই আচার-আচরণ তার পছন্দ না হলেও এ নিয়ে তেমন একটা উচ্চবাচ্য করে না সে। আর করলেও তাতে তার শ্রীমতীর কিছু আসে যায় না। একবার একটা কি কথার জবাবে ঠোঁটে রঙ লাগাতে লাগাতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে গ্রীবাভঙ্গি করে সে বলেছিল, ইউ আর বিজি উইথ ইওর ওন্ এ্যাফেয়ার্স এ্যান্ড আই এ্যাম্ বিজি উইথ মাইন। একজনের ব্যাপারে আর একজনের ইণ্টারফেয়ার না করাটাই কি ভাল নয়, ডার্লিং?

হ্যাঁ ভাল, নিশ্চয়ই ভাল। সাংসারিক শৃঙ্খলার কাঠগড়ায় সাংসারিক শান্তিকে বলি দিলে মনে কষ্ট হলেও বাইরে তা প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবন কম। আর পুলিশ কমিশনারের মত একজন সুপিরিয়র অফিসারের বাড়িতো তেমন একটা সাংসারিক আবহাওয়াই তো কাম্য। নইলে সাবর্ডিনেট অফিসারেরা যে ব্যাপারটা টের পেয়ে যাবে। তাতে তো মিসেসের চাইতে মিস্টারের লজ্জাই বেশি। সুপিরিয়র অফিসারদের অন্দরের খবর নিয়েও তো সাবর্ডিনেট মহলের কৌতূহলের কমতি নেই। কবে কোন্ একজন বিলিতি অফিসার তার হাড়-কৃপণ মিসেসের কাছে একটু 'ক্যাবেজ' অর্থাৎ বাঁধাকপি খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল। আর তাতে সেই খাণ্ডারিনী মিসেস রেগে গিয়ে 'এই তবে খাও ক্যাবেজ' বলে একটা আস্ত বাঁধাকপি সাহেবের প্লেটের ওপর ছুঁড়ে মেরে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। সেই কাহিনী আর্দালী-মারফত বাইরে প্রকাশিত হয়ে সাবর্ডিনেট মহলে হাসাহাসির অন্ত ছিল না।

তবে কোল্সনের বরাত ভাল যে, তার মিসেস ঠিক তেমনটি ছিল না। কিছু খেতে ইচ্ছে করে তো খানসামা-বাবুর্চিদের হুকুম কর, তারাই এনে খাওয়াবে। আমাকে আর ওসবের মধ্যে টেনে নিয়ে যেও না। আমি নিজেকে নিয়েই বেশ আছি।

মনে শান্তি নেই কোল্সনের। শান্তি নেই ঘরে বাইরে কোথাও। দেশের সরকার-সমর্থক খবরের কাগজগুলো সরকারী শাসনযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এমন মুখর হয়ে উঠেছে যে, সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ছে পুলিশ কমিশনার কোল্সনের ওপর। এই প্রতিবাদের সাম্প্রতিক কারণ ইয়োরোপীয়ান এ্যাসো-

সিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে হত্যা।

কিছুদিন হল মিস্টার ভিলিয়ার্স বিপ্লবীদের প্রতি সরকারের নরম নীতির প্রতিবাদে গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছিল। সরকারের এই নীতির জন্যেই নাকি এদেশের মাটিতে ব্রিটিশ-রক্ত ঝরছে। এই বিপ্লবীদের নাকি ধরে ধরে দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা উচিত। এদের ঠাণ্ডা করার নাকি এটাই একমাত্র পথ।

মিস্টার ভিলিয়ার্সের এই উপদেশ সরকার-সমর্থক কাগজগুলো, বিশেষ করে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বেশ ফলাও করে ছাপা হচ্ছিল। স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াট্‌সনও পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এই নিয়ে জোরালো ভাষায় লিখছিল। বিপ্লবীদের প্রতি নাকি খুবই নরম নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। কাজেই কঠোর—আরও কঠোর নীতি গ্রহণ করা উচিত। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যে, ব্রিটিশ-সিংহ এখনও দুর্বল হয়ে পড়েনি।

এরই ফলে মিস্টার ভিলিয়ার্স নিহত হল তরুণ বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের হাতে। দেশের মাটিতে আর ফিরতে পারল না সে।

আবার সোরগোল উঠল চারিদিকে। ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নিহত। কাজেই সোরগোলটা এবার একটু বেশিই। সরকার থেকে চাপ অসেতে লাগল কমিশনার কোল্‌সনের ওপরে। যে করেই হোক, শহর কলকাতাকে বিপ্লবীমুক্ত করতেই হবে। সরকারী কর্মচারী বিলিতি সাহেবরা তো বটেই, এমনকি সাধারণ ইয়োরোপীয়ানদের জীবনও যে এই শহরে নিরাপদ নয়, এমন একটা অবস্থা কিছুতেই আর বরদাস্ত করা চলবে না।

ভিলিয়ার্স হত্যার পরেই আরও জোরালো হয়ে উঠল স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক স্যার আল্‌ফ্রেড ওয়াট্‌সনের সম্পাদকীয়। তার মতে, 'ধর আর মার', বিপ্লবীদের প্রতি এই নাকি সরকারী আচরণ হওয়া উচিত। ওদের দেখা মাত্রই গুলি করে শেষ করে দিতে হবে। কোন দয়া-মায়া নেই। যেন ব্রিটিশ সরকার এতদিন বিপ্লবীদের ওপর খুবই দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে আসছিল। যেন তারা 'ধর আর মার' পথে যেতে কোনরকম কার্পণ্য করেছিল এতকাল।

আগস্ট মাস। শহর কলকাতা থেকে বর্ষা তখন যাই-যাই করছে। বেলা প্রায় তিনটে। গভর্ণর হাউসে একটা জরুরী মিটিং শেষ করে কোল্‌সন সবে তার ঘরে এসে ঢুকেছে। হঠাৎ ঝড়ের বেগে এসে হাজির হয় হাডসন।

কোল্‌সন তার দিকে তাকাতেই হাডসন বলে ওঠে, সর্বনাশ স্যার, এইমাত্র খবর পেলাম স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক ওয়াট্‌সনকে নাকি গুলি করা হয়েছে।

—কোথায় ?

—স্টেটস্‌ম্যান অফিসের সামনেই। কালপ্রিটও নাকি ধরা পড়েছে।

—অল্‌রাইট। এক মুহূর্ত চিন্তা করে কোল্‌সন। তারপর আবার বললে, আপনি শিগগির ফোর্স পাঠান ওখানে, আর আপনি নিজেও চলে যান। ডি. সি. ডি ডি আছেন অফিসে ?

— না স্যার, তিনি খিদিরপুরের দিকে গেছেন।

—ঠিক আছে, আপনি একাই চলে যান।

হাডসন বললে, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একজন সার্জেণ্টের সঙ্গে ফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছি। আমিও যাচ্ছি। বলেই হাডসন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

চিন্তিত কোল্‌সন টেলিফোন তুলে নেয় চীফ সেক্রেটারীকে খবরটা দিতে।

হাডসন যখন এসে পৌঁছল তার আগেই সেখানকার নাটক শেষ হয়ে গেছে। বিকেল তিনটে নাগাদ লাঞ্চ সেরে অফিসে ফিরছিল স্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক স্যার আল্‌ফ্রেড ওয়াট্‌সন। অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নামতেই ক্লোজ রেঞ্জ থেকে ফায়ার করল বিপ্লবী অতুল সেন, যে নাকি ডালহৌসীতে টেগার্টের ওপর বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় জড়িত ছিল।

একবার—দুবার। কিন্তু অতুলের দুর্ভাগ্য, দুটো গুলিই মিস্ করল সে। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্টেটস্‌ম্যান অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দারোয়ান এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। রাস্তায় ডিউটিতে থাকা একজন কনস্টেবলও এগিয়ে এল তার সাহায্যে।

বিপদ বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই মনস্থির করে ফেলল অতুল। এদের ফাঁসির দড়ির চাইতে পটাসিয়াম সায়ানাইড অনেক ভাল। কাজেই কোনরকমে নিজের একটা হাত ছাড়িয়ে মুখে পুরে দিল সেই ভয়ঙ্কর বিষের অ্যাম্পুল।

ডি. সি. হেডকোয়ার্টার হাডসন যখন এসে পৌঁছল তখন সেখানে লোকে-লোকারণ্য। সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে আছে অতুলের অচৈতন্য দেহ। কিন্তু আশ্চর্য, পুলিস ফোর্সের কোন দেখা নেই!

গেল কোথায় পুলিশ ফোর্স? সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্টের সঙ্গে সেই কখন তাদের এখানে পাঠিয়েছে সে! লালবাজার থেকে স্টেটস্‌ম্যান অফিস, মাত্র এইটুকু পথ!

পুলিশ-ভ্যান ফোর্স নিয়ে যখন সেখানে হাজির হল ততক্ষণে হাডসন অতুলর অচৈতন্য দেহটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে হাসপাতালে। আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও দেহটাকে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছে—হি ইজ অলরেডি ডেড্।

পুলিশ-ভ্যান থেকে নেমে আসে সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট। কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হাডসন জিজ্ঞেস করে, হোয়াই সো লেট, সার্জেণ্ট?

জবাব দেয় গ্র্যাণ্ট, রাস্তায় খারাপ হয়েছিল গাড়িটা।

—এইটুকু রাস্তা হেঁটে এলেও তো অনেক আগে পৌঁছতে পারতেন।

—আই এ্যাম্ সরি, স্যার।

আর 'সরি'! 'সরি' বলে পার পেল না সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট। কালকের কোন একটা কাগজেই হয়তো ছাপা হবে যে, এমন একটা ব্যাপারে ঘটনাস্থলে পুলিশ ফোর্স এসেছে অনেক পরে—যদিও ডি. সি. নিজে আগেই পৌঁছেছিল।

ঠিক তাই। অনুমান মিথ্যে নয় হাডসনের। খোদ স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদকের ওপর আক্রমণ! ঘটনার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রিপোর্টার পুলিশ ফোর্সের এই অহেতুক দেরির জন্যে মন্তব্য করে বসল। আর তারই ফলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হল সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট।

বিষাদের ছায়া নেমে এল লালবাজারের সার্জেণ্ট-মেসে। বন্ধুরা সবাই অনুযোগ করল গ্র্যাণ্টকে, তুই বাস্তবিকই মাথামোটা। এমন একটা ঘটনা,

আর তুই কিনা পুলিশ-ভ্যানকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এঞ্জিনের কার্বুরেটর ঠিক করতে লেগে গেলি! কেন, ঐটুকু পথ হেঁটে যেতে কি অসুবিধে ছিল তোর?

যার বিরুদ্ধে এই অনুযোগ সে নিজে কিন্তু নির্বিকার। খালি গায়ে আণ্ডারওয়ার পরে সিগারেট টানতে টানতে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সে জবাব দেয়, ভালই হল, কিছুদিন এবার বিশ্রাম করা যাবে।

অসুরের মত চেহারা গ্র্যাণ্টের। বিশাল বুকের ছাতি, মজবুত হাতের পেশী। হাতে তো বটেই, এমনকি বুকে-পিঠে পর্যন্ত তার লাল-নীল রঙের উল্কি। ফর্সা ধবধবে রঙের ওপর জ্বল-জ্বল করছে সেই উল্কির চিত্র। সেই চিত্রের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র ভয়ঙ্করদর্শন ড্রাগন ও প্রায়-নগ্ন নারীমূর্তি যা নাকি তার নিজের বিকৃত রুচিরই পরিচয় দেয়।

উল্কির চিত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে ম্যাল্‌কম বলে ওঠে, বেশ তো বলছিস বিশ্রাম করা যাবে। এদিকে ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিংয়ে যদি পানিশমেণ্ট হয়?

—হয় তো হবে। ইন্সপেক্টর তো দূরের কথা, সার্জেণ্ট মেজরও কোনদিন হতে পারব না। কাজেই পানিশমেণ্টে আর দুঃখ কিসের? তবে, টাকা-পয়সার ক্ষতি হলে বড়ই বিপদে পড়ব। বুঝতেই তো পারছিস। আমার তো আবার অনেক রকম খরচ। বলেই গ্র্যাণ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

—তা তো বটেই। ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে নর্টন, তোকে একদিন না দেখতে পেলে তোর সেই সুন্দরীরা তো চোখে সর্ষেফুল দেখবে, কি বলিস?

গ্র্যাণ্ট কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসে। এসব ব্যাপারে কোন কালেই তার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিছু নেই।

বিপ্লবীদের টার্গেট মানে ঈগলের নজর। একবার যখন নজর পড়েছে তখন আর নিস্তার নেই। সুযোগ পেলেই আবার বসাবে নখের আঁচড়। হলও ঠিক তাই। মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানেই বিপ্লবীরা বাগে পেয়ে গেল আল্‌ফ্রেড ওয়াট্‌সনকে। এবার আর স্টেটস্‌ম্যান অফিসের সামনে নয়। ভদ্রলোক তার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মিসেস্ গ্রোসকে নিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিল ময়দানে হেস্টিংসের কাছে। বিপ্লবীরা গাড়িতে করেই অনুসরণ করেছিল তাকে। সন্ধ্যা হয়েছে তখন। চলন্ত গাড়ি থেকেই বিপ্লীরা পর পর অনেকগুলো গুলি করল তাকে। এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। আহত হল দু'জনেই।

অবশেষে হাসপাতাল। বিপ্লবীদের পেছনে লাগার ফল এবার হাতে হাতেই পেল সেই নাইটহুড পাওয়া ভদ্রলোক। বাদ গেল না তার অ্যাসিস্ট্যাণ্টও। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে! বেঁচে উঠল তারা হাসপাতালে।

একটার পর একটা বিলিতি মানুষের দেহ থেকে রক্ত ঝরার ঘটনা। উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার। উদ্বিগ্ন পুলিশ কমিশনার কোল্‌সন। কলকাতাকে বিপ্লবী-মুক্ত করতে গিয়ে বিপ্লবীতে যেন ছেয়ে গেল শহরটা। এই শহরের যুবকদের মধ্যে কে যে বিপ্লবী নয় তা যাচাই করাই তো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। মরিয়াদের সাথে যুঝতে গেলে মরতে প্রস্তুত থাকা ছাড়া আর তো কোন

উপায় নেই। কাজেই ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশন মারফত শহর কলকাতার ইয়োরোপীয়ান সমাজের কাছে পৌঁছে গেল সেই সাবধান-বাণী—হুঁশিয়ার! সাবধান হয়ে চলা-ফেরা করুন। বিপদ হয়তো আপনার পাশেই ওঁৎ পেতে বসে আছে।

বিপদগ্রস্ত পুলিশ কমিশনার কোল্‌সন। শুধু বিপ্লবীদের নিয়ে বিপদ হলে না হয় একটা কথা ছিল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে না হয় তাদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তার তো উপায় নেই। ঐ গান্ধীপন্থী স্বদেশীগুলোর দিকেও তো নজর দিতে হচ্ছে। আইন-অমান্য আন্দোলন সমানে চলছে। জাতীয় কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। ওদের নিয়েও তো দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বিপ্লবীদের সহিংস বুলেটের অর্থ বুঝতে পারলেও গান্ধীবাদীদের অহিংস সত্যাগ্রহের অর্থ আজও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কমিশনার কোল্‌সন।

নিয়ম-শৃংখলাহীন এই শহরের পথে হাঁটতে ভাল না লাগলেও হাঁটতে হয় বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমকে। না হেঁটে যে তার উপায় নেই। মস্ত নেশা এটা। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাকে এমনি করে হাঁটতেই হবে।

কিন্তু হাঁটবে কেমন করে? ফুটপাথ জুড়ে যে ব্যাপারীর পসরা। গোটা শহরের মাঠ-ঘাঠ, পথ-প্রান্তর যেন একটা বিরাট ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। শহরের লোকগুলোরও যেন কোন হুঁশ নেই। অসুবিধে হজম করার মত শক্তি যেন এদের অসাধারণ। কিন্তু তাই বলে এদের মেজাজ কিন্তু শান্ত নয় মোটেই। বোধহয় দিনের পর দিন অসুবিধা হজম করে করে ওদের মেজাজ এমনি তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। ফুটপাথের অবশিষ্ট অংশটুকু দিয়ে হাঁটবে মুখ বুজে, কিন্তু একজনের গায়ে ধাক্কা লাগলেই মারমুখো হয়ে উঠবে আর একজন। বাদুড়ঝোলা হয়ে বাসে-ট্রামে যেতে মোটেই আপত্তি নেই, কিন্তু একজনের পায়ে আর একজনের পা ছুঁয়ে গেলেই তেড়ে উঠবে।

আশ্চর্য এই শহর। তার চাইতেও আশ্চর্য চরিত্র শহরের অধিবাসীদের। তাই কি এই পরমাশ্চর্য শহর ও তার মানুষগুলোকে দেখতেই প্রতিদিন পথপরিক্রমায় বের হয় বৃদ্ধ ম্যালকম? মানুষের ছকে-বাঁধা জীবনে কলকাতার এই বিরাট বিপরীত চালচলনটাই কি তবে ম্যালকমের মত এক শ্রেণীর মানুষের কাছে আকর্ষণের বস্তু? তাই কি এই পচা, নোংরা শহরটা আজও তাদের কাছে মায়াময়?

লাঠি হাতে ঠুক্ ঠুক্ করে ধর্মতলা স্ট্রীটের বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে মোড় ঘুরে চৌরঙ্গীতে এসে পড়ে ম্যালকম। বাঁ দিকে একটা পত্র-পত্রিকার স্টল। ফুটপাথেই ওদের ব্যবসা। সারি সারি পত্র-পত্রিকা সাজানো।

ম্যালকম এসে দাঁড়ায় সেই স্টলের কাছে। হিন্দুস্থানী দোকানী তাকে একজন খদ্দের মনে করে দু'চারখানা খবরের কাগজ এগিয়ে ধরে তার সামনে। ম্যালকম মাথা নেড়ে বলে ওঠে, নেহি মাংতা।

মুখে কথাটা বললেও কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ ম্যালকম। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এলেও সামনের ওই ইংরেজী কাগজখানার হেডপীস পড়তে কষ্ট

হয় না তার। এমন কি প্রথম পাতার বড় ছবিখানাও সে দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে—কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছে সেকালের সল্ট্ লেক অর্থাৎ একালের বিধান-নগরে। কংগ্রেস মণ্ডপে ডায়াসের ওপর একখানা চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধা শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। আর তাঁর পায়ের কাছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

সেকাল ও একাল! ছবিটা দেখতে ভাল লাগছে তার। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই ঘুরে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ম্যালকম। ফুটপাথের কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে ভুরুর ওপর হাত রেখে তাকায় পশ্চিমদিকে। ঐ তো লেনিনের নতুন মূর্তি। আর তার পাশেই তো ছিল সেই পুরানো টালির আটচালা। সেদিন ওখানে যে ঘটনা ঘটেছিল তাতেই তো চাকরি-জীবনের প্রথম অঘাত পেয়েছিল ম্যাল্কম।

ঊনিশ শ' তেত্রিশ সাল। আইন-অমান্য আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস তখন বে-আইনী। নেতাদের অনেকেই তখন কারাগারের অন্তরালে।

লালবাজারে পুলিশ কমিশনার কোল্সন দারুণ ব্যস্ত। ঘন ঘন টেলিফোন, প্রায় প্রতিদিন অফিসারদের সঙ্গে মিটিং। বে-আইনী কংগ্রেসের অধিবেশন স্থল ঠিক হয়েছে কলকাতা। সরকারের কড়া আদেশ, বে-আইনী কংগ্রেসের অধিবেশন কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। যেমন করে হোক ঐ অধিবেশন বন্ধ করতেই হবে।

সরকার তো হুকুম দিয়েই খালাস। কিন্তু সেই হুকুম তামিল করতে গিয়েই তো বিপদে পড়ল সি. পি. কোল্সন। অধিবেশনের তারিখটি জানা থাকলেও এই বিরাট শহরের কোথায় ও কখন সেই অধিবেশন বসবে তা এখনও অজ্ঞাত। আপ্রাণ চেষ্টা করেও কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কিংবা বাংলা পুলিশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কোন খবর যোগাড় করতে পারেনি। এমন একটা ব্যাপারে লর্ড সিন্হা রোডের ঐ অফিস দুটো যদি কোন খবর দিতে না পারে তো লালবাজার নিরুপায়। হাওয়ার সঙ্গে তো আর যুদ্ধ করা চলে না!

বিপ্লবীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা মাথায় উঠল কোল্সনের। এখন নাকের ডগায় সমূহ বিপদ। সরকারী এ্যাটিচুড এবার বড়ই কড়া। সরকারী আদেশ নস্যাৎ করে দিয়ে যদি কোনরকমে কংগ্রেস অধিবেশন হতে পারে তাহলে তা হবে সরকারের একটা মস্ত পরাজয়। বে-আইনী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কাছে তেমন পরাজয় মেনে নিতে মোটেই প্রস্তুত নয় ব্রিটিশ সরকার।

কংগ্রেস অধিবেশন বসবে কলকাতায় কিন্তু তার জন্যে কোন প্রস্তুতি নেই কোথাও। কোথায় সেই বিরাট অধিবেশন মণ্ডপ, কোথায় সেই ভলাণ্টিয়ার বাহিনী, আর কোথায় বা সর্বভারতীয় ডেলিগেটদের থাকার ব্যবস্থা? কিছুই নেই কোথাও।

তবু কোল্সনের প্রশ্নের জবাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার জবাব দেয়, ইয়েস স্যার, অধিবেশন নির্দিষ্ট দিনেই হবে এবং তা হবে এই কলকাতায়। দে আর ডিটারমিন্ড টু হোল্ড দি কনফারেন্স ইন্ ক্যালকাটা।

—কিন্তু কখন হবে এবং কোন্ জায়গায় হবে সেটাই তো জানতে পারা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমাদের সোর্স ওয়ার্ক একেবারেই হতাশ করেছে।

—না স্যার, সোস ওয়ার্কের কোন দোষ নেই, স্যার। শুধু আমরাই তো নই,

আই. বি.-ও তো এই ইনফর্মেশন যোগাড় করতে পারে নি। আসলে মাত্র কয়েকটি লোক ছাড়া এর খবর আর কেউ জানে না।

—তা হলে কি ধরে নিতে হবে যে, ওরা প্রস্তুত না হয়েই হঠাৎ কোথাও অধিবেশন বসাবে?

—হ্যাঁ স্যার। অনেকটা তাই। তবে একেবারে অপ্রস্তুত নয় ওরা। তলে তলে কিন্তু প্রস্তুতির কাজ চলছে।

এই আসন্ন অধিবেশনের ব্যাপারে নাওয়া-খাওয়া প্রায় ভুলতে হয়েছে কোল্‌সনকে। লালবাজার, রাইটার্স বিল্ডিং ও গভর্ণর হাউস, এই তিনটে বাড়ির ত্রিভুজের মধ্যেই ঘন ঘন দৌড়তে হচ্ছে তাকে। গভর্ণমেণ্টের কাছেও রিপোর্ট গেছে সেই মর্মে—দে আর ডিটারমিন্‌ড টু হোল্ড দি কনফারেন্স ইন ক্যালকাটা অন দি ভেরি ডে, বাট দি ভেনু অর টাইম ইজ নট নোন।

শুধু তাই নয়, এই অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যাঁরা গোপনে কাজ করছিলেন তাঁদেরও কোন সন্ধান যোগাড় করতে পারেনি পুলিশ। বৃথাই পুলিশের পরিশ্রম। কোন সোর্সই কোন খবর দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত।

লুকোচুরির খেলা শুরু হল ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে। সরকার অধিবেশন বসতে দেবে না, আর কংগ্রেস তা বসাবেই। কিন্তু কোথায় বসবে তা কেউ জানে না।

এর পরেই লালবাজারে এল সরকারী সার্কুলার—শহরে ঢোকার প্রত্যেকটি রাস্তার মুখে নজর রাখ, ট্রেনে কিংবা অন্য কোন যানবাহনে কোন কংগ্রেস ডেলিগেট যেন শহরে ঢুকতে না পারে। অধিবেশনের সমর্থক বলে যাকেই সন্দেহ হবে তাকেই গ্রেপ্তার কর। নজর রাখ শহরের পার্ক ও খোলা জায়গার ওপর যাতে কেউ সেখানে ঝটিতি অধিবেশন বসাতে না পারে।

সার্কুলার গেল জেলায় জেলায়—অধিবেশনের তিন-চারদিন আগে থেকে নজর রাখ প্রতিটি রেলস্টেশনে, যাতে কোন ডেলিগেট কলকাতার দিকে না যেতে পারে। নজর রাখ ছেলেছোকরাদের ওপর যাতে তারা ভলাণ্টিয়ারের কাজ করতে কলকাতায় না যেতে পারে। দরকার হলে গ্রেপ্তার কর তাদের।

সার্কুলার জারি হল কলকাতার নাগরিকদের উদ্দেশে—কলকাতায় কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশন বে-আইনী। এই বে-আইনী অধিবেশনে কেউ যোগ দিতে চেষ্টা করবেন না। একে কেউ কোনরকম সমর্থন কিংবা সাহায্যও করবেন না। কেউ নিজের বাড়িতে কংগ্রেসী ডেলিগেটদের আশ্রয় দিলে সেই বাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

গোটা শহর জুড়ে জারি করা হল একশো চুয়াল্লিশ ধারা। কোনরকম সভা, শোভাযাত্রা এমনকি পাঁচজনের অধিক লোকের একত্র সমাবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

কলকাতার পুলিশ-মহল প্রস্তুত। রাত-দিন লালবাজারে দলে দলে পুলিশ ফোর্সের আনাগোনা। কোল্‌সনের আদেশে গোটা শহরের পুলিশ ফোর্স মোবিলাইজ হল লালবাজারে। অধিবেশনের আগের দিন থেকেই ডিউটি চার্ট তৈরী হতে লাগল। শহরের প্রতিটি পার্কের গেটে তালা পড়ল। সেখানে পোস্টিং হল পুলিশ, যাতে কেউ পার্কে ঢুকতে না পারে। গড়ের মাঠের মত খোলা জায়গায়

বসানো হল পুলিশ পিকেট। এ ছাড়া, শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি জায়গায় রাখা হল আর্মড্ ফোর্স।

এবারের অধিবেশনের সভাপতি শ্রীমাধব শ্রীহরি এ্যানে সভাপতিত্ব করবার জন্যে কলকাতা আসার পথে সদলবলে গ্রেপ্তার হলেন খড়্গপুর স্টেশনে। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হল মেদিনীপুর জেলে। সে যুগে জেল-বিভাগে একটা প্রথা চালু ছিল। কোন অপরাধী জেলে ঢোকবার মুখে তাকে বলতে হবে 'সরকার সেলাম'। যেন, সরকার তাকে জেলে পুরে অত্যন্ত মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, কাজেই সরকারকে সেলাম জানাতে সে বাধ্য।

এ্যানে সরকারকে সেলাম জানাতে রাজী হলেন না। কাজেই মেদিনীপুর জেলে উৎপীড়ন চলল তাঁর ওপর। এদিকে কলকাতায় আসার পথে শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হল আসানসোলে।

কিন্তু এত করেও ব্রিটিশ সরকার ঠেকাতে পারল না কলকাতায় ডেলিগেটদের আগমন। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রায় হাজার তিনেক ডেলিগেট ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে গেছেন কলকাতায়। অতি গোপনে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ। এমনকি কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার্স দলও প্রস্তুত। কিন্তু কেউ তখনও জানে না কোথায় বসবে সেই অধিবেশন।

কলকাতার মধ্যাঞ্চল এসপ্লানেড এলাকা। এর আশেপাশে প্রচুর খোলা জায়গা। সভা-সমিতি করার পক্ষে এমন জায়গা আর কোথাও নেই। অতীতে মনুমেন্টের কাছে এবং গড়ের মাঠে কংগ্রেসের অনেক মিটিং হয়েছে। কাজেই এই অঞ্চলে কংগ্রেসীদের সেই হঠাৎ অধিবেশন হতে পারে মনে করে সি. পি. কোল্সন এখানে বসিয়েছে বিশেষ পুলিশ পাহারা। গড়ের মাঠে ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দিচ্ছে মাউণ্টেড্ পুলিশ। এসপ্লানেডের মোড়ে লাঠিধারী একদল পুলিশের নেতৃত্বে সার্জেণ্ট ম্যাল্কম। কাছাকাছি রাস্তার মোড়ে গাড়িতে বসে আছে ক'জন ডি. সি. ও এ. সি। এ ছাড়া কার্জন পার্কের আশেপাশেও ছড়িয়ে আছে সার্জেণ্টদের অধীনে এক-একটি পুলিশ দল।

কংগ্রেসীরাও প্রস্তুত। সভাপতি এ্যানে গ্রেপ্তার হয়েছেন। কাজেই বিকল্প সভাপতি একজন প্রয়োজন। কর্মকর্তারা শরণাপন্ন হলেন শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার। সানন্দে রাজী হলেন তিনি। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশকে তোয়াক্কা করেন না এই খাঁটি ব্রিটিশ-কন্যা। বিয়ের আগে ছিলেন কুমারী নেলী গ্রে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সহধর্মিণী হয়ে হয়েছেন নেলী সেনগুপ্তা। স্বামীর সঙ্গে অনেকবার জেল খেটেছেন দেশসেবার ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে।

পরিকল্পনা প্রস্তুত। এসপ্লানেড অঞ্চলে গাড়ি-ঘোড়ার যথারীতি ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে রয়েছে কংগ্রেসী ভলাণ্টিয়ার ও অধিবেশনের ডেলিগেটরা। সবাই প্রস্তুত। শ্রীমতী সেনগুপ্তাকে বাড়ি থেকে একখানা ট্যাক্সি করে নিয়ে আসা হয়েছে। কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পরনে খদ্দরের মোটা শাড়ি। হাতে সভাপতির অভিভাষণের কাগজ। সবাই প্রতীক্ষা করছে সিগন্যালের। সিগন্যাল, মানে বিউগিলের আওয়াজ। যেখানে

জেগে উঠবে সেই আওয়াজ সেখানেই শুরু হবে কংগ্রেস অধিবেশন।

চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে কনস্টেবলদের মধ্যে কেউ লাঠির ওপরে ভর দিয়ে খৈনি টিপছে, কেউ বা চাড়া দিচ্ছে গোঁফে। কোমরে রিভলবার থাকলেও সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের হাতে একখানা মোটা বেতের লাঠি।

ম্যাল্‌কম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল আজকের এই ডিউটির কথা। দুপুর ছাড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো, এখনও কোনও কংগ্রেসী অধিবেশনের দেখা নেই। আজ বোধহয় আর অধিবেশন হল না, আর হলেও এই অঞ্চলে তো নয়ই। এত পুলিশের মধ্যে ওদের সাহস কি যে অধিবেশন করে!

যাক্, বাঁচা গেল তবে। লাঠি চালাতে আর হল না। কমিশনারের স্পষ্ট নির্দেশ, অধিবেশন যদি একান্তই শুরু হয় তা হলে লাঠি চার্জ করে তা ভেঙে দিতে হবে। এ্যারেস্ট করতে হবে উপস্থিত সবাইকে। সেই অপ্রিয় কাজ আর বোধহয় করতে হল না তাকে।

কিন্তু চৌরঙ্গীর এই অঞ্চলে আজ যেন একটু বেশি ভিড়। অন্য দিন তো এমন ভিড় হয় না।

ওসব কিছু নয়। বোধহয় এমনিই এই ভিড়। বোধহয় এলাকার সর্বত্র এই ছড়িয়ে থাকা পুলিশ দলকে দেখতেই কৌতূহলী জনতা দাঁড়িয়ে পড়েছে ফুটপাথে।

বেলা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিনটে। হঠাৎ একটি দক্ষিণ-ভারতীয় যুবক এসপ্লানেড ট্রাম-গুমটির সেই টালির আটচালার কাছে দাঁড়িয়ে বিউগিল বাজাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজির মত গোটা অঞ্চলের চেহারাই গেল পাল্টে। ফুটপাথ ছেড়ে দলে দলে লোক দৌড়ে এসেই বসে পড়ল সেই আটচালার সামনে। ওপাশ থেকে কর্মকর্তারা নিয়ে এলেন অধিবেশনের সভাপতি শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তাকে।

সভাপতি এসে আটচালার মধ্যে দাঁড়াতেই সমবেত জনতা হাততালি দিয়ে সংবর্ধনা জানাল তাঁকে। দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রীমতী সেনগুপ্তা এগিয়ে গিয়ে হাতের কাগজ খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন সভাপতির ভাষণ। শুরু হয়ে গেল কংগ্রেস অধিবেশন।

গাড়ি-ঘোড়া নেই, মিছিল নেই, বুকে তক্‌মা-আঁটা ভলাণ্টিয়ার নেই, এমনকি একটা সভামণ্ডপ পর্যন্ত নেই। চৌরঙ্গী এলোকায় নীল আকাশের নিচে আরম্ভ হল জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। ট্রাম-গুমটির আটচালায় দাঁড়িয়ে শুরু হল কংগ্রেসের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ, অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ও সভাপতির ভাষণ।

এত অল্প সময়ে ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটতে লাগল যে, সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম প্রথমটাই কিছুই বুঝতে পারেনি। কংগ্রেস অধিবেশন বলতে সেই পার্ক সার্কাস ময়দানের চিত্রটাই তার চোখের সামনে স্পষ্ট। এরকম একটা অবস্থায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হতে পারে তা ছিল তার ধারণারই বাইরে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ম্যালকম ফোর্স নিয়ে এগিয়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার পাশে এসে দাঁড়ায় একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার। ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, হোয়াই আর ইউ ওয়েটিং?—কুইক—ফলো মী।

বলতে বলতে সেই বাঙালী এ. সি. ভদ্রলোক সামনের দিকে দৌড়ে যেতেই ম্যাল্‌কমও তার ফোর্স নিয়ে অনুসরণ করে তাকে।

ইতিমধ্যে কার্জন পার্কের মধ্য থেকেও পুলিশ ফোর্স ছুটে আসছে লাঠি উঁচিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য শান্ত জনতা। একজনও ছুটে পালাল না ভয় পেয়ে। পুলিশের দিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই কারুর। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা তখন পড়ে চলেছেন নিয়মমাফিক অধিবেশনের প্রস্তাব। জনতাও একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

ততক্ষণে সেই বিরাট পুলিশ ফোর্স ঘিরে ফেলেছে জনতাকে। একজন ডেপুটি কমিশনার গুমটির কাছে এগিয়ে গিয়ে শ্রীমতী সেনগুপ্তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, স্টপ—আই সে স্টপ ম্যাডাম্‌। আই ডিক্লেয়ার ইট এ্যান্‌ আন-ল'ফুল অ্যাসেম্বলী। প্লীজ ডিস্‌পার্স।

শ্রীমতী গুপ্তার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। আপনমনে তিনি পাঠ করে চলেছেন সেই প্রস্তাব। ডি. সি.'-র কথা যেন কানেই যায় নি তাঁর। জনতাকে বে-আইনী ঘোষণা ও তাদের সরে যেতে বলার পুলিশী হুমকির দিকে নজর না দিয়ে তিনি তখন সেই প্রস্তাব-পাঠ শেষ করতেই ব্যস্ত।

হঠাৎ ডি. সি. আবার চীৎকার করে ওঠে—চার্জ!

আরম্ভ হল পুলিশী তাণ্ডব। ভোজপুরী কনস্টেবল ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টরা মিলে লাঠি চালাতে শুরু করল জনতার ওপর।

এবার আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে না জনতা। প্রাণের ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে আরম্ভ করেছে। তাদের পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে পুলিশ। জনতার ভেতর মেয়ে-ভয়াণ্টিয়াররা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠছে। কিন্তু তারাও রেহাই পাচ্ছে না।

লাঠি চালাচ্ছে ম্যাল্‌কম নিজেও। না, এই মুহূর্তে এদের প্রতি এতটুকু দরদ নেই তার। পারিপার্শ্বিকতা এবং ঘটনাপ্রবাহ মানুষকে মুহূর্তের মধ্যেই অমানুষ করে তুলতে পারে। এই মুহূর্তে ম্যাল্‌কম নিজেও হয়ে উঠেছে অমানুষ। মানবিক বোধ এবং প্রবৃত্তি সেই মুহূর্তে নিঃশেষে মুছে গেছে তার মন থেকে। এখন তার একমাত্র পরিচয় লালবাজারের পুলিশ সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। এ ছাড়া আর অন্য কোন পরিচয় নেই তার।

সঙ্গীত-রসিক ম্যাল্‌কমের মুখের লালিত্যটুকু আর চোখে পড়ে না এখন। তার বদলে একখানা কঠোর কঠিন বিবেকবর্জিত মুখ। সেই মুখে ফুটে উঠেছে একটা জিঘাংসার চিহ্ন। জনতা শত্রু। শত্রুকে ঘায়েল করে গ্রেপ্তার করতে হবে। তারপর ওদের টেনে তুলতে হবে পুলিশ-ভ্যানে।

চৌরঙ্গী এলাকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি-ঘোড়া। প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে জনতা।

হঠাৎ বিবেকবর্জিত ম্যাল্‌কম একটি মেয়ের দিকে লাঠি তুলতেই মেয়েটি সেই ভিড়ের মধ্যে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, না—না—না!

স্তব্ধ হয় দানব। মেয়েটি শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে থর থর কাঁপতে কাঁপতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবার বলে ওঠে, মারবেন না আমাকে, আমি—আমি

আপনাদের গাড়িতে উঠছি।

হাতের লাঠি নামিয়ে ম্যালকম তাকায় সেই আটচালার দিকে। আশ্চর্য অদ্ভুত! ধবধবে ফর্সা সেই সভানেত্রী মহিলা স্থির অচঞ্চল ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চোখে তার ভৎর্সনার দৃষ্টি।

সাদা খোলের খদ্দরের শাড়ি পরা সেই মহিলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সার্জেন্ট ম্যালকম। হাতের লাঠি আর ওঠে না তার। মহিলাটি জাদু জানে নাকি? এ কি সেই জাদু, যা নাকি বছর পাঁচেক আগে এমনি আর এক অধিবেশনে সে দেখতে পেয়েছিল জি. ও. সি. সুভাষ বোসের চোখে?

সহসা একজন ডি. সি. তার পাশে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠে, এমনিভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাই কি আপনার কাজ?

সম্বিৎ ফিরে আসে ম্যালকমের। সে কিছু একটা জবাব দেবার আগেই ডি. সি. এগিয়ে গিয়ে কর্কশকণ্ঠে বলে ওঠে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তাকে, ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট। চলুন আমার সঙ্গে।

—ইয়েস, আই এ্যাম রেডি। স্পষ্ট বিলিতি উচ্চারণে কথাটা বলেই ঘুরে দাঁড়ান তিনি।

পুলিশ-ভ্যান মানে 'ব্ল্যাক মিরর'। সে-যুগের কংগ্রেসীদের মধ্যে অনেকেই পুলিশ-ভ্যানের ঐ নাম দিয়েছিল। সেই ব্ল্যাক মিররে করে বন্দীদের নিয়ে আসা হল লালবাজারে। অনেক মেয়ে-বন্দীও ছিল তাদের মধ্যে। ছিলেন দেশবন্ধুর বোন ঊর্মিলা দেবী।

বন্দীদের নিয়ে লালবাজারে ফিরে আসার পথে ম্যালকম একজনের মুখে শুনেছিল ঐ মহিলার পরিচয়। কুমারী নেলী গ্রে—শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা—খাঁটি ব্রিটিশকন্যা। কথাটা শোনার পর থেকে নিজের কাছেই নিজেকে কেমন যেন ছোট লাগছিল ম্যালকমের। স্বাধীনতা-সংগ্রামী নেলী গ্রে একজন ব্রিটিশ-কন্যা!

লালবাজার থেকে শ্রীমতী সেনগুপ্তাকে পাঠানো হয়েছে জেল হাসপাতালে, আর অন্য বন্দীদের জেলে।

## আট

লুকোচুরি খেলায় সেদিন হেরে গেল ব্রিটিশ সরকার! জেদ বজায় রইল কংগ্রেসীদের। হোক অসম্পূর্ণ, তবুও সেদিন পুলিশকে বোকা বানিযে প্রকাশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন করে তাঁরা ছাড়লেন।

ব্যাপারটা যতই ভাবে ততই যেন আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না ম্যালকমের। এ কেমন করে সম্ভব? কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশ-দুহিতা নেলী গ্রে আত্মনিয়োগ করেছেন ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে? তা কি কেবলমাত্র তার স্বামী একজন ভারতীয় বলে?

সার্জেন্ট ম্যালকম লেখাপড়া তেমন কিছু করে নি। তাছাড়া দেশের রাজনীতির কোন খোঁজখবরই সে রাখে নি কোনদিন। রাখলে হয়তো জানতে পারত যে, নেলী গ্রে-র মত আরো দু'একজন ওদেশের মানুষ এদেশের মুক্তি-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অ্যানি বেসান্ত অন্যতম। শুধু

কি তাই ? যে জাতীয় কংগ্রেসের নামে দেশের কোটি কোটি মানুষ গর্ববোধ করে সেই প্রতিষ্ঠানের আদি প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম কেবল একজন ব্রিটিশ নাগরিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এদেশের একজন ঝানু আই. সি. এস. অফিসার। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের ক্ষোভ যাতে চরমপন্থী বিপ্লবের পথে না বিস্ফোরিত হয় সেই জন্যই নাকি তিনি জাতীয় কংগ্রেস নামক 'সেফটি ভাল্‌বের' সৃষ্টি করেছিলেন।

দিন কয়েক পরে একদিন সার্জেণ্ট ম্যালকমের ডাক পড়ল সি. পি.-র ঘরে। ব্যাপার কি ? হঠাৎ সি. পি. ডাকলেন কেন তাকে ?

নর্টন সবজান্তার ভঙ্গীতে বললে, আমার মনে হয় তোর সেই বিয়ের দরখাস্তর ব্যাপারেই ডাক পড়েছে। হয়তো সি. পি. তোকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন।

ম্যালকমের নিজেরও তেমনি ধারণাই হল। সি. পি. হয়তো জানতে চাইবেন, কবে নাগাদ সে বিয়ে করতে চায়, বিয়ের পরে লালবাজারে সার্জেণ্ট কোয়ার্টার খালি না হলে সে কোথায় থাকবে ইত্যাদি।

পরের দিন সি. পি.-র ঘরে ঢোকার আগে নিজের সেই বিয়ের দরখাস্ত সম্বন্ধে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার জবাব মোটামুটি ঠিক করে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল ম্যালকম।

ঘরে ঢুকে ম্যালকম স্যালুট করে দাঁড়াতেই কোল্‌সন টেবিলের কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, সেদিন এস্‌প্লানেডে লাঠি চার্জের সময় কোথায় ছিলে তুমি ?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রথমটায় একটু বিব্রত বোধ করে ম্যালকম। তবে কি তার নামে কেউ মিথ্যে রিপোর্ট করেছে সি. পি র কাছে ?

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে সপ্রতিভ কণ্ঠে জবাব দেয়, আমি তো ফোর্সের সঙ্গেই ছিলাম, স্যার ;

—ফোর্সের সঙ্গেই ছিলে ? পুলিশ এ্যাক্‌শনের সময় তুমিও লাঠি-চার্জ করেছিলে ? প্রশ্নটা করেই কোল্‌সন তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থাকে ম্যালকমের দিকে।

—ইয়েস স্যার। জবাব দেয় ম্যালকম।

—কিন্তু আমি রিপোর্ট পেয়েছি যে, ঐ সময় তুমি নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে। ইজ ইট ট্রু ?

হঠাৎ ঘটনাটা মনে পড়ে ম্যালকমের। পুলিশ এ্যাক্‌শনের সময় সেই ডেপুটি কমিশনারের মন্তব্য যে এতদূর গড়াবে, তা তখন ভাবতেই পারে নি সে।

ম্যালকমকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সি. পি. কোল্‌সন আবার জিজ্ঞেস করে, তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কি সত্য ?

এবার জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, ইয়েস স্যার। লাঠি চালাতে চালাতে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমি সত্যিই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, স্যার।

—হোয়াই ?

এবার কি জবাব দেবে ম্যালকম ? কেমন করে সে বলবে যে, সেই মুহূর্তে সেই ব্রিটিশ মহিলাটির দিকে তাকিয়েই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ? আর,

সি. পি. এমন কথাটা কোন্ লাইটেই বা নেবেন ?

ম্যালকমকে চুপ করে থাকতে দেখে কোল্‌সন বলে ওঠে, অল্‌রাইট, তোমার সার্ভিস রেকর্ড আমি দেখেছি। রেকর্ড ভালই। রিওয়ার্ড পেয়েছ অনেক, কিন্তু পানিশমেণ্ট একটিও নেই। তাই ডিউটিতে এই নেগলিজেন্সির জন্যে প্রসিডিং করলাম না। একটা মাইনর পানিশমেণ্ট 'সেন্সর' দিয়েই এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি। বি কেয়ারফুল ইন ফিউচার। ইউ মে গো।

সি. পি-কে স্যাল্যুট করে ফিরে আসে ম্যাল্‌কম। রাগে দুঃখে তার ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। সার্ভিস রেকর্ডে একটা মাইনর পানিশমেণ্টের যে কোন গুরুত্ব নেই তা সে ভালই জানে। কিন্তু এই পানিশমেণ্টের পশ্চাৎপটই তো খারাপ। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে নেগলিজেন্স অফ ডিউটি অর্থাৎ কর্তব্যে অবহেলা করা একটা বিশ্রী ধরনের অপরাধ। তার এই চাকরি-জীবনে এই প্রথম এমন একটা অপরাধে অপরাধী হতে হল তাকে। কিন্তু লর্ড যেসাস্ জানেন, সেদিন কর্তব্যে কোন অবহেলাই সে করে নি। ডি. সি.-র হুকুম মত সে নিজেও লাঠিচার্জ করেছিল। দৌড়ে গিয়ে কয়েকজনকে এ্যারেস্টও করেছিল সে। ডি. সি. সেটুকু দেখে নি। কেবল দেখেছিল তার সাময়িক অন্যমনস্কতাটুকু। আর, তারই কোন অপব্যাখ্যা করেই বোধহয় রিপোর্ট দিয়েছে সি. পি-র কাছে। ডিপার্টমেণ্টে কর্তব্যনিষ্ঠার এই তো পুরস্কার !

কারুর সঙ্গে কোন কথা না বলে গট্ গট্ করে নিচে নেমে আসে ম্যাল্‌কম। কৌতূহলী সার্জেণ্ট অ্যাণ্টনী পেছন থেকে ডাকে, হ্যাল্লো জনি—

ম্যাল্‌কম কিন্তু শুনতে পায় না তার কথা। হোক মাইনর, তবুও পানিশমেণ্ট তো বটে ! কিন্তু এই পানিশমেণ্ট শুধু শুধুই দেওয়া হল তাকে। তার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিরও এ ধরনের সাময়িক অন্যমনস্কতা ঘটতে পারে। তাই বলে তাকে কর্তব্যে অবহেলা বলে না। অন্যায়—সম্পূর্ণ অন্যায় এটা।

সার্জেণ্টেস্ মেসে ফিরে এসে পোশাক ছাড়তে থাকে ম্যাল্‌কম। নর্টন এসে জিজ্ঞেস করে, কিরে, পোশাক ছাড়ছিস যে ? ডিউটিতে যাবি না ? সি. পি. ডেকেছিলেন কেন ?

কোমরের বেল্ট খুলতে খুলতে একটু ম্লান হেসে ম্যাল্‌কম বললে, সি. পি-র কাছ থেকে ঘাড়ে করে পানিশমেণ্ট বয়ে নিয়ে এসে বড়ই ক্লান্ত বোধ করছি ব্রাদার। তাই আর ডিউটিতে যাব না।

—সেকি রে ! লালবাজারের সবচাইতে কর্তব্যপরায়ণ সার্জেণ্টের পানিশ-মেণ্ট ! তোর অপরাধ ? কথাটা বলেই নর্টন মুখ টিপে হাসে। ম্যাল্‌কমের পরিষ্কার সার্ভিস রেকর্ড অনেকের মত তারও ঠিক পছন্দ ছিল না। এতদিনে তাতে কালির আঁচড় পড়াতে মনে মনে তেমন একটা অখুশি হয় না সে।

ম্যাল্‌কম তেমনি ম্লান সুরে জবাব দেয়, কর্তব্যপরায়ণতায় ত্রুটি।

—সত্যি বলছিস ?

—মিথ্যে বলে লাভ কি বল ? এইমাত্র সি. পি. একটা সেন্সর দিয়ে বলে দিলেন—বি কেয়ারফুল ইন্ ফিউচার।

—কেয়ারলেসনেসের কি কাজ করেছিস তুই ?

মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে যায় ম্যালকমের। মুখখানা আবার লাল হয়ে ওঠে। গায়ের জামা খুলে তিক্তসুরে বলে ওঠে, নেগলিজেন্স অফ ডিউটি। বলেই জামাটা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বিচিত্র মানব-চরিত্র, তাই এই পৃথিবীটা এমন বৈচিত্র্যময়। কেউ হয়তো কুৎসিততম গালাগালেও ভ্রূক্ষেপও করে না, আবার একটা সাধারণ গালাগালেও কারুর মনোরাজ্যে ঝড় ওঠে। সার্জেণ্ট ম্যালকম এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। সি. পি. কোল্‌সনের দেওয়া একটা মাইনর পানিশমেণ্ট তার স্বাভাবিক জীবনের গতিপথে যে বাধার সৃষ্টি করে, সেই বাধাটাকে যেন কিছুতেই সে দূর করতে পারে না। সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট যেখানে প্রসিডিং ঘাড়ে করে নির্বিকার, ম্যাল্‌কম সেখানে সামান্য 'সেন্সর' নিয়েই বিচলিত। চাকরি-জীবনের এই সামান্য আঘাতটুকু জীবনের প্রথম আঘাত বলেই হয়তো ভুলতে এত কষ্ট হচ্ছিল তার।

প্রায় মাসখানেক পরে রুমা বাঈজীর বাড়িতে এল ম্যাল্‌কম। গান তখনও সুরু হয় নি। সঙ্গতকারীরা ঠিক করে নিচ্ছিল তাদের বাদ্যযন্ত্র। চার-পাঁচজন ধনী শ্রোতা মখমলের তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে বসে পান চিবোতে চিবোতে নিজেদের মধ্যে হাস্য-পরিহাসে ব্যস্ত ছিল। অদূরে নিজের আসনে বসে রুমা তানপুরাটা কাঁধের ওপর ঠেকিয়ে তাতে তুলছিল মৃদু সুরের ঝঙ্কার. আর কান খাড়া করে বাবুদের হাসি-ঠাট্টা শুনতে শুনতে মৃদু মৃদু হাসছিল। ঠিক এমনি সময় ম্যাল্‌কম এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে।

বন্ধ হয় বাবুদের হাস্য-পরিহাস। শত হলেও পুলিশের ফিরিঙ্গী সার্জেণ্ট, তার ওপর আবার বাংলা বোঝে। কি বলতে কি বলে ফেলবে, আর তা নিয়ে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তার ঠিক কি? তার চাইতে চুপ করে থাকাই ভাল।

ম্যালকমের মাঝে-মধ্যে এখানে আগমন বাবুদের অনেকেরই পছন্দ নয়। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলতে পারে না তারা। ঐ ফিরিঙ্গীটিও তাদের মতই একজন শ্রোতা। তারা যেমন পয়সা খরচ করে এখানে আসে ঐ লোকটিকেও তেমনি পয়সা খরচ করতে হয়, অন্ততঃ তারা তাই জানে। কাজেই পছন্দ না হলেও ওকে ঠেকাবার কোন উপায় নেই। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, লোকটি নিয়মিত আসে না, আসে মাঝে-মধ্যে। তবে যেদিন আসে সেদিন রুমা বাঈজীর নজর যে তার ওপরই থাকে এটা তাদের নজর এড়ায় নি।

কোন কোন বাবু আবার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ম্যালকমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। লালবাজারের পুলিশ সার্জেণ্ট। বিপদে-আপদে কখন কাজে আসবে ঠিক কি ?

ম্যালকম নিজে কিন্তু তেমন একটা মিশতে চায় না ওদের সঙ্গে। তার কথা-বার্তায় যেমন কোনরকম কমপ্লেক্সের চিহ্ন ফুটে ওঠে না, তেমনি ওদের সঙ্গে গলাগলি করার চেষ্টাও নেই। যেদিন আসে সেদিন চুপটি করে ফরাসের এক কোণে বসে তন্ময় হয়ে শোনে রুমার সঙ্গীত। তারপর একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আজ চলি। হাতের তানপুরাটা নামিয়ে রুমা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় তাকে।

মৃদুকণ্ঠে কেবল বলে, আবার এসো।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে যায় ম্যাল্‌কম।

সেদিন ম্যাল্‌কম এসে দাঁড়াতেই দু' তিনজন বাবু একযোগে বলে ওঠে, এই যে সাহেব, আসুন—আসুন!

ম্যাল্‌কম একটু স্মিত হেসে হাঁটুর কাছে প্যাণ্টটাকে সামান্য তুলে আসনপিঁড়ি করে ফরাসের ওপর বসতেই একজন বাবু মন্তব্য করে, যাক, আজ তাহলে রুমা বাঈজীর মেজাজী গান শোনা যাবে।

ম্যাল্‌কম ঘাড় ফিরিয়ে বক্তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, অন্যদিন বাঈজী আপনাদের ভাল গান শোনায় না বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে ওঠে, না—না, রুমা বাঈজী বরাবরই ভাল গায়, নইলে পয়সা খরচ করে এখানে আসি কেন? তবে, সত্যি কথা বলতে কি, আপনি যেদিন আসেন সেদিন বাঈজীর মেজাজই অন্য রকম, কি বল হে? বলেই লোকটি আর একজনের দিকে সমর্থনের আশায় তাকায়।

ম্যাল্‌কম আর কিছু না বলে একটু গুছিয়ে বসতে বসতে লক্ষ্য করে বাবুটির কথায় রুমার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। ম্যাল্‌কম যেদিন উপস্থিত থাকে সেদিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কাছ ঘেঁষে না রুমা। ম্যাল্‌কমের ভাল লাগবে না ভেবেই সেদিন সে কেবল বাংলা কিংবা হিন্দী ভজন ও নিধুবাবুর টপ্পা দিয়েই শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে চেষ্টা করে। শ্রোতাদের অনুরোধে দু'একটা ঠুংরিও গায়। তার ধারণা, খেয়াল কিংবা ধ্রুপদ গান এই সাহেব সঙ্গীত রসিকটির কেবল বিরক্তিই উৎপাদন করবে, এবং এ দেশীয় সঙ্গীতের প্রতি তার এই নতুন আগ্রহে ভাঁটা পড়বে। সেই রসিক লোকটি কিন্তু সাহেব ম্যাল্‌কমের উপস্থিতিতে রুমা বাঈজীর মেজাজ প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রকারান্তরে তাকে একটু খোঁচা দিয়ে জানিয়ে দিল যে, ব্যাপারটা তাদের নজর এড়ায় নি।

লোকটির সেই খোঁচায় কিন্তু আজ কাজ হল। টপ্পা কিংবা ঠুংরি দিয়ে আজ শুরু করল না রুমা। এমন কি ম্যাল্‌কমের বিশেষ প্রিয় সেই 'বলে দে সখী বলে দে, কোথায় গেলে শুনতে পাব (সেই) পাগল করা বাঁশির সুর' ভজনখানিও নয়। এমন এক আনন্দমধুর সন্ধ্যায় মৃত্যুকে টেনে আনল রুমা বাঈজী। মৃত্যুশোকের সংযত প্রকাশ সেই বিলাসখানি টোড়ী দিয়েই শুরু করল আজকের আসর।

হোক মৃত্যুশোকের প্রকাশ, তবুও এই বিলাসখানি টোড়ী নিঃসন্দেহে কেবল সৌন্দর্যমণ্ডিতই নয়, মর্যাদামণ্ডিতও বটে। ঝাড়া একটি ঘণ্টার আলাপে রুমা বাঈজী সুরের ব্যঞ্জনা ও বিস্তারে যে মায়ালোকের সৃষ্টি করল তা সেই সঙ্গীত-রসিকেরা আগে কখনও শোনে নি তার কাছে। সৌন্দর্যের অনুভূতির প্রেরণা ছাড়া সঙ্গীতের এমন রহস্যালোকের সৃষ্টি সম্ভব নয়। তবে কি ঐ ফিরিঙ্গী ম্যাল্‌কমই রুমার সেই প্রেরণা?

শ্রোতারা সবাই অবাক। ম্যাল্‌কমের মনোজগতে সেই মুহূর্তে কি ঘটছিল তা কেউ জানে না। তবে সে শান্ত ধীর স্থির। চোখের পলক ফেলতেও যেন

ভুলে গিয়েছিল সে।

আলাপের পরে বসন্ত মুখারী রাগে আরম্ভ হল সঙ্গীত। অপূর্ব সেই সঙ্গীতের মায়াজাল, অনুপম তার মাধুর্য। ততক্ষণে শ্রোতারা কেবল বিস্মিতই নয়, বিমোহিত। গান শুনতে শুনতে কেউ কেউ পানের বাটি থেকে রাংতা-মোড়া সুগন্ধি পান হাতে নিয়ে খেতেই ভুলে গেছে। হাতের পান হাতেই থেকে গেছে তাদের।

অবশেষে একসময় শেস হল সেই সঙ্গীত। শ্রোতারা পরিতৃপ্ত, সঙ্গতকারীরা ক্লান্ত, রুমা তখনও ভাববিভোর। আর ম্যাল্‌কম? না, আপাতদৃষ্টিতে তার মুখ-চোখের কোন পরিবর্তন নেই। সে তখনও তেমনি শান্ত, স্থির। বিস্ময়ের চরম সীমায় পৌঁছালে মানুষের বুঝি এমন অবস্থাই হয়।

অনেকক্ষণ পরে। শ্রোতা এবং সঙ্গতকারীরা সবাই চলে গেছে। যায় নি কেবল ম্যাল্‌কম। রুমা বাঈজী এগিয়ে আসে তার কাছে। তারপর জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগল?

একটু চমকে ম্যাল্‌কম তাকায় রুমার মুখের দিকে। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, ভাল কি খারাপ কিছুই বুঝতে পারি নি।

আশাহত সুরে রুমা আবার বললে, আমি জানতাম যে, তোমার এ গান ভাল লাগবে না, সাহেব। তবুও গাইলাম কেবল—

রুমার কথা শেষ হবার আগেই ম্যাল্‌কম বলে ওঠে, বললাম তো ভাল কি খারাপ কিছুই বুঝতে পারি নি। তবে তোমার গান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল আমি যেন কোথায় কতদূরে চলে গেছি যেখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সারি সারি কেবল মানুষের কবর, তার মাঝে আমি কেবল একা দাঁড়িয়ে—

বলতে বলতে থেমে যায় ম্যাল্‌কম। রুমার মুখে ফুটে ওঠে একটু বিচিত্র হাসি। ম্যাল্‌কমের একটা হাত স্পর্শ করে সে বললে, বেশ তো, গান শেষ হল। ফিরবে না এবার? রাত যে অনেক হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, ফিরতে হবে। বলেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় ম্যাল্‌কম।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে রুমা আবার বললে, দেরি যখন হয়েই গেছে তখন আর পাঁচ মিনিটে কি হবে? এক কাপ চা খেয়ে যাও।

ম্যাল্‌কম কোন প্রতিবাদ না করে রুমার পিছে পিছে এসে ঢোকে তার নিজের ঘরে।

চায়ের কাপটা ম্যাল্‌কমের দিকে এগিয়ে দিয়ে হঠাৎ রুমা জিজ্ঞেস করে, আজ যখন তুমি এখানে এলে তখন তোমার মুখখানা যেন কেমন শুকনো দেখাচ্ছিল।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, ব্যাপার কি? তোমার মেরিয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি, সাহেব?

মৃদু হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, না—না, সে সব কিছু নয়। তবে মনটা তেমন ভাল নেই।

—কেন, কি হয়েছে?

ম্যাল্‌কম চুপ করে থাকে।

—বল না সাহেব, চুপ করে রইলে কেন? কিসের জন্যে মন ভাল নেই?

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চা পান করতে থাকে ম্যাল্‌কম। তারপর একসময় কাপটা সরিয়ে রেখে জবাব দেয়, চাকরির ব্যাপার। তুমি ঠিক বুঝবে না।

জবাবে রুমা বললে, মেয়েমানুষ, তোমাদের চাকরির ব্যাপার না বোঝাই সম্ভব। তবে খুব একটা বোকা যখন নই তখন চেষ্টা করলে তোমার মন খারাপের কারণটা হয়তো বুঝতে পারব।

ম্যাল্‌কম এবার হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বললে, তোমাকে যে বোকা বলে সে নিজে একটি প্রকাণ্ড বোকা।

—তাই নাকি? রুমা হেসে জবাব দেয়, আমি তাহলে বোকা নই? যাক্‌, আমাকে বুদ্ধিমতী বলার মত একটা লোক অন্তত খুঁজে পাওয়া গেল। তা সাহেব, আমার মধ্যে এমন কি দেখলে যা দিয়ে আমাকে তুমি বুদ্ধিমতী ভাবতে পারছ?

বিপদে পড়ে ম্যাল্‌কম। রুমা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতী। তবে তার প্রমাণ দিতে বললে সে নিরুপায়। পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই আছে যা কেবল অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই পড়তে হয় মুশকিলে।

রুমার প্রশ্নের জবাবে ম্যাল্‌কম বললে, অতশত জানি না। তোমার সম্পর্কে যা মনে হয় বললাম।

নাছোড়বান্দা রুমা আবার বললে, শুধুই কি বুদ্ধিমতী? আর কিছু মনে হয় না আমাকে?

—আর? আর কি?

—এই ধরো, ভয়ানক চালাক—ভীষণ ধূর্ত—সাংঘাতিক ধড়িবাজ?

—ধড়িবাজ মনে হবে কেন তোমাকে?

—যেহেতু তোমার মত একজন জাঁদরেল ফিরিঙ্গী পুলিশকে আমি কেমন কায়দা করে মাঝে মাঝেই এখানে টেনে আনি।

বলেই খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে রুমা। ম্যাল্‌কমও হাসে।

রুমা আবার আবদারের সুরে বললে, বল না গো সাহেব, মনটা আজ তোমার খারাপ কেন?

একটু গম্ভীর সুরে ম্যাল্‌কম বললে, চাকরি-জীবনে এই প্রথম বিনা-দোষে ওপরওয়ালা আমাকে পানিশমেণ্ট দিয়েছে।

—কি দিয়েছে বললে?

— পানিশমেণ্ট—শাস্তি।

রুমা একটু সময় কি যেন ভাবে। পরমুহূর্তেই হঠাৎ হেসে উঠে বলতে থাকে, সেকি গো সাহেব, পাঠশালার ছেলেদের মত ওপরওয়ালার কাছে তোমাদেরও কি বেত খেত হয়? নাকি কান ধরে ওঠ-বোস করতে হয়?

রুমার প্রশ্নের ধরনে গাম্ভীর্যের মধ্যেও হেসে ফেলে ম্যাল্‌কম। তারপর বললে, না রুমা, সে সব কিছু নয়। কাগজে-কলমে শাস্তি।

ও, তাই বুঝি? তা বিনা-দোষে কেউ কখনও শাস্তি পায় নাকি? তুমি নিশ্চয়ই কোন দোষ করেছিলে!

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, না, কোন দোষই আমি করি নি। তবুও আমায় শাস্তি পেতে হয়েছে।

—বেশ তো, কি করেছিলে তুমি বল দেখি ?

একটু সময় ইতস্তত করে ম্যাল্‌কম। ঘটনাটা ওর কাছে বলা ঠিক হবে কিনা তাই বোধহয় ভাবে। তারপর সেদিনের ব্যাপারটা বলেই ফেলে।

ম্যাল্‌কম ভেবেছিল সেদিনের সেই কাহিনী শুনতে শুনতে রুমা হয়তো গম্ভীর হয়ে উঠবে। সেদিন ম্যাল্‌কম নিজেও যে লাঠি চালিয়েছিল এটা রুমা বোধহয় বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু তার বদলে রুমার কথায় একটু বিস্মিত হয় সে।

রুমা বললে, তোমাদের ওপরওয়ালা তো ঠিক কাজই করেছেন। কাজের সময় কি অন্যমনস্কতা ভাল ?

—তাহলে কি তুমি আমার সেই লাঠি-চার্জকে সমর্থন করছ ? সেই মেয়েটাকে ধরে পেটালেই বুঝি ভাল হত ?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় রুমা, নিশ্চয়ই। একশোবার। যে কাজ তোমাকে করতে হবে সে কাজ ঠিকমত করাই তো উচিত। চাকরি করব অথচ চাকরির নিয়ম মানব না, তা তো ঠিক নয়। মেয়েদের পেটানো যদি তোমার কাজ হয়ে থাকে, তবে তা ভালমত করাই উচিত। আমাদের দেশের একজন মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছ, সাহেব ? জানো তিনি কি উপদেশ দিয়েছিলেন ?

—কি ?

– তিনি বলেছিলেন—একান্তই যদি পাজি হতে হয়, তো বড়-রকমের পাজি হয়ো। তার মানে, খারাপই বল আর ভালই বল, সব কাজেই নিষ্ঠা চাই। নিষ্ঠা না থাকলে বড় হওয়া যায় না। তাই তো, বড় বাঈজী হতে গিয়ে ঐ নিষ্ঠার অভাবেই আমি প্রায় গণিকা হয়ে গেছি। বড়দরের বাঈজী আর কোনকালেই হতে পারলাম না।

বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে রুমা। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে একটু ম্লান হেসে বলে ওঠে, যাক্‌ ওসব কথা। এই সামান্য ব্যাপারে মন খারাপ করার কোন অর্থই হয় না সাহেব। আমি আর কি-ই বা বুঝি। কিন্তু তোমরা সাহেব মানুষ, কত পড়েছ, কত কি জানো, তোমাদের এসবে মন খারাপ হলে চলবে কেন ?

—তবে কি করতে হবে ? ওপরওয়ালার কাছ থেকে শাস্তি পেয়ে আনন্দে হাত তুলে নাচতে হবে ? ম্যাল্‌কম একটু ঝাঁজালো সুরেই বললে কথাটা।

জবাবে হেসে রুমা বললে, তোমাকে উপদেশ দিতে পারি তেমন বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নেই। তবে আমি হলে অন্য কিছু করতাম।

—কি করতে তুমি ?

—শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশে যেতাম।

—তার মানে ? কৌতুকচোখে ম্যাল্‌কম তাকায় রুমার দিকে।

রুমা সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বললে, কাজ করব পুলিশে, থাকব লালবাজারে, মিশব ওখানকার লোকের সঙ্গে, আর মনে মনে অন্যরকম হতে চেষ্টা করব—তা কি হয় সাহেব ? সবাই যে-রকম চলে তোমাকেও তেমনি চলতে হবে। কাজে-কর্মে, আচারে-ব্যবহারে তাদের মতই হতে হবে। তখন দেখবে এমন

দু'দশ গণ্ডা শাস্তি তুমি অম্লানবদনে হজম করে ফেলবে। মনে এতটুকু বিকার হবে না, বুঝলে?

মুখে কিছু না বললেও রুমার কথায় মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারে না ম্যাল্‌কম। এই বয়সের মধ্যে রুমা এমন অভিজ্ঞতা লাভ করল কেমন করে? না কি সবই তার তোতাপাখীর মত শেখা বুলি? কিন্তু তাই বা সে শিখল কার কাছ থেকে? ব্যবহারিক জীবনে ওর এই কথাগুলো যে সত্যি তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে যদি সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্টের মত চরিত্রের মানুষ হতে পারত তাহলে তো এই সামান্য ব্যাপারে মনে এমন কষ্ট হত না তার।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা খোলা আলমারির দিকে নজর পড়তেই ম্যাল্‌কম ভুরু কুঁচকে বলে ওঠে, ও কি, তুমি মদও খাও নাকি?

একটু চাপা হাসি হেসে রুমা জবাব দেয়, এই যাঃ, দেখে ফেলেছ তাহলে? তা সাহেব, খেতে পারলে তো ভালই হত। অনেক কিছু ভুলে থাকতে পারতাম। কিন্তু কি যে আমার স্বভাব, কিছুতেই আমি ঐ ছাইপাঁশগুলোর গন্ধ সহ্য করতে পারি না।

— তবে আলমারিতে ওগুলো সাজিয়ে রেখেছ কেন?

ম্লান হেসে রুমা জবাব দেয়, নিজের জন্যে নয়। তোমাকে তো বলেছি সাহেব, আমার এখানে সবাই তো আর কেবল নিরিমিষ গান শুনতে আসে না। তা, তোমরা তো সাহেবসুবো মানুষ। এসব জিনিসে তো তোমাদেরও অভ্যেস আছে। যদি আপত্তি না থাকে তো একটু চেখে দেখতে পার।

ম্যালকমকে চুপ করে থাকতে দেখে রুমা আবার বললে, ও কি, চুপ করে রইলে কেন? বল তো বোতলটা নামিয়ে আনতে পারি।

জবাবে ম্যাল্‌কম হেসে বললে, অভ্যেস যখন আছে তখন আর আপত্তি কিসের?

রুমা উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা হুইস্কির বোতল ও গ্লাস নিয়ে আসে।

গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে রুমা হঠাৎ বলে ওঠে, এই যাঃ, সোডা তো নেই, খাবে কেমন করে?

—নাই বা থাকল সোডা। আমাদের ওসবের দরকার হয় না। এমনিই খেতে পারব।

এমন কড়া বস্তু যে সোডা ছাড়া খাওয়া সম্ভব তা এর আগে জানত না রুমা। তাই সে বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে, সে কি, সোডা ছাড়া খেলে গলা পুড়ে যাবে না? বাবুরা তো তাই বলে।

—না। হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, সোডা ছাড়া পুরো একটা বোতল মেরে দেবার লোকেরও অভাব নেই আমাদের দেশে। আমি অবশ্যি অতটা নই। তবে সোডা ছাড়া খাওয়ার অভ্যেস আমার আছে।

গ্লাসটা মুখের কাছে ধরে একটু একটু করে সেই তরল আগুন খেতে থাকে ম্যাল্‌কম। আর চিন্তিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে রুমা। মদ খাওয়ার কথা সাহেবকে না বললেই বোধহয় ভাল হত। সোডা ছাড়া এই বস্তু খেয়ে লোকটি যদি কোনরকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে আর দুঃখের শেষ থাকবে না তার।

মদ খেতে খেতে ম্যাল্‌কম কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা। রুমা হঠাৎ তাকে মদ খাওয়াচ্ছে কেন? কৈ, এত দিনের মধ্যে তো এই অনুরোধ কোনদিন করে নি তাকে! এমনকি এখানে যে মদের ব্যবস্থা আছে তাই তো সে এতদিন জানত না।

ম্যাল্‌কমকে চুপ করে থেকে গ্লাসে চুমুক দিতে দেখে রুমা আবার বলল, কি ভাবছ সাহেব?

জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, ভাবছি তোমার কথা।

—আমার কথা? আমাকে নিয়ে আবার ভাববার কি আছে?

হাতের গ্লাসটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ম্যাল্‌কম নিজেই এবার বোতল থেকে আরও খানিকটা মদ গ্লাসে ঢালতে ঢালতে হেসে বললে, আছে—আছে। ভাবছি এর পরে যদি এখান থেকে যেতে না চাই?

হাল্কা সুরে জবাব দেয় রুমা, না যেতে চাও তো ভালই হবে। তোমাকে তো আর এখানে ধরে রাখার সাধ্যি আমার নেই। এমনিভাবে যদি রাখতে পারি তো ক্ষতি কি?

—ক্ষতি নেই কিছু? ম্যাল্‌কমের মুখের ওপর থেকে হাসিটুকু আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে থাকে।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তেমনি হাল্কা সুরে রুমা বললে, ক্ষতি কিসের? পাশের ঘরে বিছানা করে দেব, শুয়ে থাকবে। কাল ভোরে লালবাজারে ফিরে গিয়ে বাইরে রাত কাটাবার জন্যে শাস্তি পাবে।

—যদি পাশের ঘরে না গিয়ে এখানে এই ঘরে রাত কাটাতে চাই?

খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে রুমা। হাসতে হাসতে বললে, ভাবছ বুঝি আমি ভয় পাব? মোটেই তা নয়। ইচ্ছে হয়, তাও করতে পার। আমার আপত্তি নেই।

—আপত্তি নেই?

মুখে হাসির রেখা টেনে ম্যাল্‌কম কথাটা বললেও সেই হাসির মধ্যে যেন এবার একটু অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করে রুমা। তবুও সে হাসিমুখে জবাব দেয়, না, নেই।

ম্যাল্‌কমের তখন চোখে রঙ ধরতে শুরু করেছে। ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে মাথাটা। রুমা বাঈজী যুবতী। সেই যুবতী বসে আছে তার সামনে। নিজের হাতে সে তাকে পরিবেশন করেছে হুইস্কি। ঘরের মধ্যে আবছা আলো। সেই আলোয় তারা মুখোমুখি দু'জন। রুমা কেবল বাঈজীই নয়, সে গণিকা। পুরুষকে দেহদান করতে সে অভ্যস্ত। মেরিয়ার কাছে চেয়ে যে বস্তু সে এতদিন পায় নি, সেই বস্তু তো সে আজ অনায়াসেই পেতে পারে রুমার কাছে। ভদ্র ঘরের যুবতী মেরিয়ার পক্ষে সেদিন তাকে যা দেওয়া সম্ভব হয় নি, গণিকা রুমার পক্ষে তো তা দেওয়া মোটেই শক্ত নয়।

কথাগুলো মনে হতেই দেহ-মনে এক প্রচণ্ড উত্তেজনা অনুভব করে ম্যাল্‌কম। আরও এক ঝলক রক্ত যেন ছড়িয়ে পড়ে তার সারা মুখে। স্ফীত হয়ে ওঠে তার গ্রীসীয় ধাঁচের নাকের বাঁশি, আরক্ত হয়ে ওঠে তার টানা চোখ দুটো। রুমা বাধা দেওয়ার আগেই সে খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরে চাপা কণ্ঠে বলে ওঠে, তবে তাই হোক, রুমা—মাই ডার্লিং রুমা। আজ রাতটা আমি—আমি

তোমার কাছেই থাকব। বল ডার্লিং, বল, আমাকে ফেরাবে না তো ?

সহসা রুমা এক ঝটকায় নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, এ কি কথা বলছ তুমি ? ঠাট্টাও বোঝ না ?

—ঠাট্টা ? ঠাট্টা কেন রুমা ?

—হ্যাঁ ঠাট্টা। আর দু'পাঁচজন বাবু আমার কাছে যা চায় তুমিও যে শেষে তাই চাইবে তা আমি ধারণাই করতে পারি না সাহেব।

—কেন পার না, আমি কি পুরুষ নই ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি পুরুষ। তবে কাপুরুষ নও।

—পুরুষ হই আর কাপুরুষই হই, এতে তোমার এত আপত্তি কেন ? তুমি তো কেবল বাঈজী নও, তুমি—

—গণিকা, তাই তো ? হ্যাঁ, আমি গণিকা, পয়সার বিনিময়ে আমাকে এ কাজও করতে হয়। তবে—

রুমার কথা শেষ হবার আগেই ম্যাল্‌কম বলে ওঠে, বেশ তো, পয়সাই পাবে তুমি। বল, কত টাকা চাও ?

ম্যাল্‌কমের কথায় রুমার মুখে আর কথা ফোটে না। স্তব্ধ হয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ম্যাল্‌কমের দিকে। পরমুহূর্তেই তার চোখদুটো ছল ছল করে ওঠে। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, এই প্রস্তাব তুমি তোমার সেই মেরিয়ার কাছে করতে পারতে সাহেব ? আর মেরিয়া তাতে রাজী হত ?

গম্ভীর সুরে ম্যাল্‌কম বললে, মেরিয়া আর তুমি এক নও, রুমা।

এবার আর চোখের জল বাঁধ মানে না রুমার। কাজলকালো চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে নিজের বুকের ওপর। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে বলতে থাকে, জানি—জানি, তার সঙ্গে যে আমার অনেক তফাৎ তা আমার চাইতে আর বেশি কে জানে, সাহেব ? কিন্তু আমি নিচে নেমেছি বলে তোমাকে আমি কিছুতেই নিচে টেনে নামাতে পারব না। না—না, কিছুতেই না। তোমাকে আমি কিছুতেই এত ছোট ভাবতে পারি না, কিছুতেই দেহ-সর্বস্ব লোভী ভাবতে পারি না। তোমার ওপর এটুকু আস্থা অন্তত রাখতে দাও আমাকে।

সেই মুহূর্তে রুমার কথাগুলো তেমন ভাল লাগছিল না ম্যাল্‌কমের। বিশেষ করে, মেয়েদের এই যখন-তখন কান্নার ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগে না তার। মেয়েদের চোখে জল দেখলেই তার মনে পড়ে যায় নিজের মায়ের কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে মনটা তার খারাপ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, খিদের মুখে খাদ্যবস্তু নাগালের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হতেই তার মনটা তিক্ত হয়ে ওঠে রুমার ওপয়।

রুমা থামতেই ম্যাল্‌কম বললে, তুমি না হয় আমাকে নিচে টেনে না নামালে, কিন্তু তেমন মেয়ের তো অভাব নেই এই শহরে। আমি যদি তাদের কাছে যাই তো তুমি আমাকে কি দিয়ে ঠেকাবে ?

তেমনি সুরে জবাব দেয় রুমা, তোমাকে ঠেকাবার অধিকার কিংবা ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই সাহেব। তবে মিনতি করছি, ঐ পথে তুমি যেও না।

ওতে হাতে হাতে কিছু আনন্দ পাওয়া যায় মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। যে বাবুরা এখানে রাত কাটায় তাদের আচার-আচরণ দেখেই আমি তা বুঝতে পারি। আমার কথায় নয়, অন্তত তোমার মেরিয়ার কথা চিন্তা করেও এ পথে পা বাড়িও না তুমি। তোমাকে সে ভালবাসে সাহেব। তাকে একদিন তুমি বিয়ে করবে। তার সেই ভালবাসার মর্যাদা দিও। আমি বলছি, তাতে তুমি সুখী হবে।

রুমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে একখানা ট্রামে চেপে বসে ম্যাল্‌কম। বেশি রাতের ফাঁকা ট্রাম। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ ভাল লাগে তার। ট্রামের সীটে ঠেস্ দিয়ে রুমা বাঈজীর কথাই ভাবতে থাকে ম্যাল্‌কম। সেই সঙ্গে মেরিয়ার কথাও মনে পড়ে তার। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতী মেরিয়া আর বাঙালী বাঈজী রুমা। ওদের মধ্যে গরমিল অনেক। তবুও কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। কিসের মিল সেটা—নারীত্বের?

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম, রুমা বাঈজীর কথামত মেরিয়ার ভালবাসার মর্যাদা তো সে দিয়েছিল, কিন্তু কই, সুখী হতে পেরেছিল কি সে? আজ কোথায় সে নিজে, আর কোথায় বা মেরিয়া! রুমা বাঈজীই বা কোথায় আজ!

বর্তমান বিধান সরণীর ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। সেকালের সঙ্গে একালের কলকাতার কত তফাৎ! শহরটা মোটামুটি তেমনই আছে, কিন্তু তার চরিত্র আমূল বদলে গেছে। শহরের চরিত্র মানে শহরের মানুষের চরিত্র—মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চরিত্র।

একালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান এই শহর কলকাতা। আজ এই দেশে কোন রাজা নেই, নীতিও বোধহয় নেই। কিন্তু রাজনীতি আছে পুরোপুরি। নীতিহীন রাজনীতির কবলে পড়ে গোটা দেশ আজ ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু সেদিন যারা দেশের নামে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল, তারা কি আজকের এমন একটা অবস্থা কখনও কল্পনায় আনতে পেরেছিল?

ঐ তো এখনও অটুট রয়েছে ১৩৬।৪-এ নম্বরের বাড়িটা। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এই বাড়িতেই তো উনিশশো তেত্রিশ সালের বাইশে মে ভোর পাঁচটায় হাসিমুখে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিল তিনটি যুবক। এই বাড়ির কিংবা এ পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে ক'জনে আজ সে খবর রাখে?

কিন্তু বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম আজও চেনে এই বাড়িটাকে। তাই যেতে যেতে এক-মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় সে। ঘোলাটে চোখ মেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাড়িটার দিকে। তারপর আবার লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে থাকে ফুটপাথ ধরে।

মে মাস, কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি নেই। প্রচণ্ড গরমে শহরের নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত। দুপুরে পীচের রাস্তায় বিরল হয়ে ওঠে লোকজনের চলাচল। ডালহৌসীর সদাব্যস্ত অফিসপাড়াও হয়ে পড়ে প্রায় কর্মচাঞ্চল্যহীন।

আবার বিকেলে রোদের তেজ একটু কমতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে ডালহৌসী। এবার বাড়ি ফেরার পালা। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পরে বাড়ি ফেরার মিষ্টি হাতছানি।

এমনি এক গরমের বিকেলে লালবাজারে নিজের ঘরে বসে কাজ করছিল

পুলিশ কমিশনার কোল্সন। পাশের ঘরে হেডকোয়ার্টার ও ডি. ডি.-র ডেপুটি কমিশনাররা কাজে ব্যস্ত। পাঁচটা বেজে গেছে। একতলার কেরানীবাবুরা দপ্তর বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে। ঘরগুলো প্রায় সবই ফাঁকা। কেবল দু'চার জন পুলিশ অফিসার তখনও নিচের ঘরে কাজে ব্যস্ত। কেরানীরা পুলিশ আইনের আওতায় না পড়লেও অফিসাররা পড়ে। তাই তাদের আর দশটা-পাঁচটা নেই। যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ অফিস। কাজ মিটলে অফিসও শেষ। কারুর আবার কাজের ধরনই এমন যে, কাজ মিটলেও অফিস শেষ হয় না। সি. পি. ও ডি. সি.-রা যতক্ষণ অফিসে থাকবে ততক্ষণ তাদেরও অফিস ছেড়ে নড়বার উপায় থাকে না। একতলার পূব-পশ্চিম দুটো দরজার দুই প্রান্তে রাইফেলধারী দু'জন কনস্টেবল। দোতলার সিঁড়ির মুখেও একজন।

এমনি সময় লালবাজারের চত্বরে এসে দাঁড়ায় একখানা প্রাইভেট গাড়ি। গাড়ি-খানা পুলিশের হলেও দেখতে সাধারণ প্রাইভেট গাড়ির মত। স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারদের পরিচয় গোপন রাখতেই এই ব্যবস্থা।

গাড়ি থেকে নেমে আসে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার, সঙ্গে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার। পরনে তাদের সাধারণ সাহেবী পোশাক।

বিশেষ কোন কারণ না থাকলে লর্ড সিন্হা রোডের অফিস থেকে ডেপুটি কমিশনার ছুটে আসে না লালবাজারে। সি পি.-র সঙ্গে তার প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা সচরাচর টেলিফোনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

গাড়ি থেকে নেমে ডি. সি. কোনোদিকে না তাকিয়ে সহকারীকে নিয়ে সোজা চলে যায় ওপরে।

এমন অসময়ে লালবাজারে ডি. সি-কে দেখে সি পি কোল্সন তাকায় তার মুখের দিকে। তারপর তাকে বসতে নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিছু ইম্পর্টেণ্ট্ খবর আছে নাকি?

—ইয়েস স্যার, ভেরি ইম্পর্টেণ্ট্ নিউজ। তাই টেলিফোন না করে নিজেই চলে এলাম। চন্দননগরে ফরাসী পুলিশের তাড়া খেয়ে সেই দীনেশ মজুমদার দু'জন সঙ্গী নিয়ে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। আই. বি.-র খবরও তাই।

ডি. সি-র কথায় দাঁতে দাঁত চেপে বিরক্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠে কোল্সন, দীনেশ—দীনেশ—দীনেশ! এদেশে দীনেশ নামে যত মানুষ আছে সবাই কি টেররিস্ট? এক দীনেশের তো ফাঁসি হল, আর এক দীনেশ এদিকে জেল থেকে পালিয়ে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে!

চুপ করে থাকে ডি. সি.। সি পি. মিথ্যে বলে নি, দীনেশ নামটার সঙ্গেই যেন জড়িয়ে রয়েছে টেররিস্ট গন্ধ।

কোল্সন আবার জিজ্ঞেস করে, ওদের আস্তানা লোকেট করতে পেরেছেন?

—না স্যার, এখনও পারি নি, তবে চারিদিকে লোক লাগিয়েছি। আশা করছি খুব শিগগিরই ওদের ঘাঁটি খুঁজে বের করতে পারব।

—দ্যাটস রাইট। তাড়াতাড়ি ওদের ট্রেস করতে চেষ্টা করুন। তারপর চারিদিকে আঁটঘাট বেঁধে রেইড করতে হবে। যে রকম ডেঞ্জারাস চ্যাপ, তাতে যে-কোনো সময় আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়তে পারে। নইলে

চন্দননগরের পুলিশ দু'দু'বার ওকে হাতের কাছে পেয়েও ধরতে পারল না !

সি. পি. কোল্সন অত্যুক্তি করে নি। ডেঞ্জারাস চ্যাপই বটে দীনেশ মজুমদার। ডালহৌসী স্কোয়ারে টাইগার টেগার্টের ওপর আক্রমণকারী লায়ন দীনেশ মজুমদার।

টেগার্টের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে পালাতে চেষ্টা করেও সেদিন সফল হয় নি দীনেশ। ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে। তারপর বিচারের নামে সেই পুরাতন প্রহসন। তা না হলে বাইশ বছরের একটি যুবকের তেষট্টি বছর জেল হয়? তার অর্থ, দীনেশকে আজীবন পচতে হবে সুদূর আন্দামানের সেই ভয়ঙ্কর সেলুলার জেলে।

কিন্তু তেষট্টি বছর জেল খাটার ছেলে দীনেশ মজুমদার নয়। আন্দামানে চালান করার আগে তাকে রাখা হল মেদিনীপুর জেলে। সেখান থেকেই আর দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে জেলের দেয়াল টপকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল একদিন।

হৈ-চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। তুলকালাম কাণ্ড পুলিশ ও জেল-মহলে। মেদিনীপুর জেলের জেলর সাহেবের চাকরি যায় আর কি। সর্বনাশ, দ্বীপান্তরের কয়েদি এমনিভাবে সবাইকে বোকা বানিয়ে সরে পড়ল! এ লজ্জা ব্রিটিশ সরকার ঢাকবে কি দিয়ে? সারা দেশ তোলপাড় করে বেড়াল পুলিশ, কিন্তু পাওয়া গেল না দীনেশ ও তার সেই সঙ্গীদের। দীনেশ তখন তার সঙ্গীদের নিয়ে লুকিয়ে বসে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ফরাসীদের চন্দননগরে।

সেকালের যুগান্তর বিপ্লবী পার্টির নেতারা দীনেশকে চন্দননগরে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দিয়ে ভেবেছিলেন যে, চন্দননগরের ফরাসী পুলিশ হয়তো তাকে নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাবে না। দীনেশ মজুমদার যে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে একথা যদি তারা জানতেও পারে এবং সে-খবর পেয়ে ব্রিটিশ সরকার যদি ফরাসী সরকারকে অনুরোধও করে, তা হলেও বোধহয় ফরাসী সরকার সেই অনুরোধ রাখবে না। কারণ ব্রিটিশের সঙ্গে ফরাসীদের শত্রুতা চিরকালের। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল হিসেবে ভুল।

খবর পেয়ে ব্রিটিশ সরকার যথারীতি অনুরোধ করল ফরাসী সরকারকে। আর ফরাসী সরকারও তৎপর হয়ে উঠল দীনেশ মজুমদারকে ধরবার জন্যে।

তাদের এই তৎপরতার নায়ক ফরাসী চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে কুঁই। তার দাপটে ফরাসী চন্দননগর তখন থর থর করে কাঁপে। চার্লস টেগার্ট যদি হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি স্তম্ভ, তাহলে মঁসিয়ে কুঁই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের একটি মনুমেন্ট। ফরাসী চন্দননগরের ঢালাও মদের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এই অফিসারটি তখন প্রবল বিক্রমে রাজত্ব চালাচ্ছে সেখানে। নিজের দেশের চরমপন্থী বিপ্লবী 'জ্যাকোবিন'-দের হাতে রাজা ষোড়শ লুই-এর হত্যার কাহিনী বোধহয় ভুলে গিয়েছিল এই অফিসারটি।

কিন্তু বেশি দিন ভুলে থাকতে হল না তাকে। একদিন দলবল নিয়ে অতর্কিতে বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে হানা দিতেই মঁসিয়ে কুঁই বুঝতে পারল যে, পৃথিবীর সব দেশের বিপ্লবীদের চরিত্রই একরকম। মাত্র দুটো বুলেটের বিনিময়েই ধরাধাম থেকে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মঁসিয়ে কুঁই।

কলকাতার ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট দীনেশ মজুমদারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন বলে চন্দননগরের ফরাসী পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে কুঁই কিন্তু রেহাই পেল না। খবরটা শেলের মত বাজল ব্রিটিশ সরকারের বুকে। হোক চিরশত্রু ফরাসী, তবুও সাদা চামড়ার ইয়োরোপের মানুষ তো বটে!

এরপর দীনেশ কিন্তু আর বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারল না চন্দননগরে। ফরাসী পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট চন্দননগরের মত একটি জায়গায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আর কতদিন পালিয়ে থাকা যায়? কাজেই এবার তাকে পালিয়ে আসতে হল জনবহুল কলকাতা মহানগরীতে।

দীনেশের শরীর তখন খুব খারাপ। কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু কলকাতার এস. বি, আই. বি. অফিসারদের চোখের আড়ালে কোথায় রাখা যায় তাকে? অবশেষে ১৩৬।৪-এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এই বাড়িটার একখানা ঘরে আশ্রয় পেল দীনেশ মজুমদার। সঙ্গে অন্য দুই বিপ্লবী, নলিনী দাস ও জগদানন্দ রায়।

এস. বি-র ডেপুটি কমিশনার বেরিয়ে যাওয়ার পরেও টেবিলের ওপর খোলা ফাইলের দিকে মন দিতে পারে না কোল্‌সন। শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। লালবাজারকে লড়াই চালাতে হচ্ছে দুটো ফ্রণ্টে। এক ফ্রণ্টে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস, আর অন্য ফ্রণ্টে বিপ্লবীরা। তাছাড়া তৃতীয় ফ্রণ্ট, শহরের সাধারণ চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি ক্রাইম তো আছেই। এই সব-গুলো ফ্রণ্টের ওপর সুষ্ঠু নজর রাখতে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে কোল্‌সনকে। এর ওপর আবার রয়েছে হোম ফ্রণ্ট। সারাদিন পরিশ্রমের পরে বাড়িতে ফিরে মিসেসের সঙ্গে দুটো কথা বলে যে মনে একটু শান্তি পাবে তারও উপায় নেই! মিসেস হয়তো তখন কোথাকার কোন্ পার্টি নিয়ে মশগুল। মাঝে মাঝে অবশ্যি ক্লাবে যায় কোল্‌সন—ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে। কিন্তু সেখানেও বেশিক্ষণ থাকার উপায় নেই। চীফ সেক্রেটারী কিংবা গভর্ণরের এডিকং কখন টেলিফোন তুলে কথা বলতে চাইবে তার ঠিক কি?

ঘরে ঢোকে আর্দালী। কোল্‌সনের হাতে একখানা স্লিপ দিতেই তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোল্‌সন বললে, বোলাও।

ঘরে ঢুকে জুতোর গোড়ালীতে শব্দ তুলে সি. পি-কে স্যালুট করে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

—ইয়েস, বলেই ম্যাল্‌কমের দিকে চোখ তুলে তাকায় কোল্‌সন।

এ্যাটেনশন্ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে ম্যাল্‌কম বললে, আমি একটা দরখাস্ত করেছিলাম স্যার—

—কিসের দরখাস্ত? ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে সি. পি.-র।

সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, বিয়ের পারমিশনের জন্যে দরখাস্ত।

—ও, আই সী! তা আমার কাছে কেন? ডি. সি. হেডকোয়ার্টারের কাছে যাও। তিনিই তো ওসব ডিল করেন।

—তিনি পারমিশন দেন নি। কয়েকমাস ওয়েট করতে বলেছেন।

—ঠিকই বলেছেন তিনি। দেশের যা ল-এ্যাণ্ড-অর্ডার সিচুয়েশন তাতে এখন

কিছুদিন এ সব বিয়ে-সাদী বন্ধ রাখাই ভাল। তা ছাড়া সার্জেণ্টস কোয়ার্টারও খালি নেই। তাই বোধহয় তিনি পারমিশন দেন নি।

—কিন্তু স্যার—কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় ম্যাল্‌কম।

—কি বলতে চাইছ তুমি? মুখ টিপে একটু হেসে জিজ্ঞেস করে কোল্‌সন, এমন কোন ঘটনা ঘটিয়েছ নাকি যে এখনই বিয়ে না করলে চলবে না?

সি. পি.-র কথার আসল অর্থটুকু বুঝতে পেরে মনে মনে ভীষণ বিরক্ত বোধ করে ম্যাল্‌কম। কিন্তু খোদ সি. পি.-র কাছে মনের বিরক্তি প্রকাশ করা চলে না। তাই মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, নো স্যার, ওসব আমি ঘৃণা করি। তবে মেয়ের মা-বাবার ইচ্ছে—

— দ্যাটস লাইক এ গুড বয়। তবে ইচ্ছেটা কি কেবল মেয়ের মা-বাবার? যারা বিয়ে করবে তাদের বুঝি তেমন ইচ্ছে নেই? কথাটা বলেই কোল্‌সন আবার মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ম্যাল্‌কম। নিজের অসুখী বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করেই বোধহয় অন্যের বিয়ের ব্যাপারে সি. পি. কোল্‌সনের কৌতূহল একটু বেশি। বিশেষ করে, নিজের বিবাহ-পূর্বের রোমন্সের কথা বোধহয় মনে পড়ে যায় সেই মুহূর্তে। তাই সে বললে, কবে বিয়ে করতে চাইছ তুমি?

—তারিখ এখনও স্থির হয় নি। তবে পারমিশন পেলে এই মাসের মধ্যেই—

একটু সময় চিন্তা করে কোল্‌সন। তারপর ম্যাল্‌কমের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে ওঠে, লুক মাই বয়, আমি তোমাকে পারমিশন দেব। তবে একটি কথা, কোয়ার্টার চাইতে পারবে না। বাইরে কোন রেণ্টেড হাউসে থাকতে হবে তোমাকে। বল, রাজী তো?

এতক্ষণে একটু হাসি ফোটে ম্যাল্‌কমের মুখে। তাড়াতাড়ি সে জবাব দেয়, মোস্ট গ্ল্যাডলি, স্যার।

— অল রাইট। আমি ডি. সি.-কে বলে দেব।

সি. পি.-কে স্যালুট করে খুশিমনে বেরিয়ে আসে ম্যাল্‌কম। এত সহজে যে কার্যসিদ্ধি হবে তা সে ধারণা করতে পারে নি। আর দেরি না করে এখনই বিয়ে করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার। মেরিয়ার আগ্রহ তো আছেই, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা তার নিজের দিক থেকেও এটার প্রয়োজন। ঐ রুমা বাঈজীকে এড়াতে হলে মেরিয়াকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। রুমার সামনে নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারে না ম্যাল্‌কম। মেয়েটার ঐ অনাসক্তিই তার নিজের আসক্তিকে যেন প্রতিমুহূর্তে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলতে চাইছে। এর হাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ মেরিয়া।

এতদিনে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই বাড়িটার ওপর নজর পড়ল পুলিশের। হাসি ফুটে উঠল ডি. সি, এস. বি.-র মুখে। যাক্, সফল হয়েছে তারা। দীনেশ মজুমদারের ঘাঁটির খোঁজ পাওয়া গেছে। এখন সুযোগমত একদিন জাল ফেলে টেনে তুলতে হবে সব ক'টাকে। কিন্তু খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। এতটুকু সন্দেহ হলেই ওদের উড়ে পালাবার সম্ভাবনা।

বাউন্ড-দি-ক্লক্ ওয়াচ বসল সেই বাড়িটার ওপর। ওদের একমুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করা চলবে না। আর তলে তলে অতি সঙ্গোপনে রেইডের প্রস্তুতি চলল।

অবশেষে এল সেই দিন—বাইশে মে। তখনও ফর্সা হয় নি চারিদিক। আবছা অন্ধকারে বিরাট সরীসৃপের মত পড়ে আছে শহরের রাস্তাগুলো। ভোর সাড়ে চারটে। লালবাজারের গেট দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল দু'খানা পুলিশ-ভ্যান। দু'খানা ভ্যানই পুলিশে বোঝাই। প্রথম ভ্যানের ড্রাইভারের পাশে সাদা পোশাকে দুজন এস. বি.-র ইন্সপেক্টর, আর দ্বিতীয়টায় দু'জন সার্জেণ্ট - ম্যাল্‌কম ও নর্টন। কনস্টেবলদের হাতে রাইফেল আর সার্জেণ্টদের রিভলবার। এমন কি, এস. বি-র ইন্সেপেক্টরদের জামার নিচেও রিভলভার গোঁজা রয়েছে।

পুলিশ-ভ্যান দুটো লালবাজার স্ট্রীটের ওপর পড়েই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল পূর্বদিকে। গন্তব্যস্থল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।

গাড়ির ভেতর বসে নর্টন জিজ্ঞেস করে ম্যাল্‌কমকে, যাচ্ছি তো টেররিস্টদের ঘাঁটি রেইড করতে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি, জানিস?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, কিছুই জানি না। এমনকি কাল রাতেও জানতে পারি নি, কি ডিউটিতে যেতে হবে। এইমাত্র একজন ইন্সপেক্টর বললে রেইডের কথা। কিন্তু কোথায় যেতে হবে তা বললে না।

নর্টন মুখে বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলে ওঠে, এই এস বি. অফিসারদের ধরন-ধারণই আলাদা। হাঁচি-কাশিটি পর্যন্ত এরা এমনভাবে দেয় যেন অন্য কেউ টের না পায়। আরে বাপু, যাই কর না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের না হলে যখন চলবেই না, তখন এত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়ের প্রয়োজন কি? খোলাখুলি বললেই তো পার।

জবাবে কথা না বলে কেবল একটু হাসে ম্যালকম। সে তখন ভাবছিল অন্য কথা। তারা চলেছে টেররিস্টদের ঘাঁটি রেইড করতে। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে দু'জন অফিসার যারা নাকি খাঁটি বাঙালী। আচ্ছা, ঐ টেররিস্টদের ব্যাপারে এই অফিসারদের মনে কি কোনই দুর্বলতা নেই? তারা নিজেরা না হয় আংলো-ইণ্ডিয়ান, কিন্তু ওরা তো খাঁটি এদেশীয়। কিসের জন্য ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতি ওদের এত দরদ? কেবল কি চাকরির খাতিরে? কেবল কি মোটা রিওয়ার্ড, ঝক্‌ঝকে কনফিডেনশিয়াল ক্যারেক্টার রোল আর চাকরিতে উন্নতি —এই জন্যেই এত তৎপর ওরা?

ভোর পাঁচটা। দূরে পুলিশ-ভ্যান দাঁড় করিয়ে শিকারী বেড়ালের মত নিঃশব্দে নেমে আসে পুলিশ-বাহিনী। তারপর অতি সন্তপর্ণে ঘিরে ফেলে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই বাড়িটিকে।

এতক্ষণে বাড়ির ভেতরে জেগে ওঠে সামান্য চাঞ্চল্য। পুলিশের আগমন টের পেয়েছে বাড়ির বাসিন্দারা। তারা বুঝতে পেরেছে পুলিশ গোটা বাড়িটাকে ঘিরে ধরে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতিটি পুলিশ কনস্টেবলের হাতে উদ্যত রাইফেল, অফিসারদের হাতে খোলা রিভলভার।

বাড়িটার পেছন দিকে পুলিশ ফোর্সের সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

সার্জেণ্ট নর্টন। সামনে গেটের কাছে এস. বি. ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

আরম্ভ হল আর একটা অলিন্দ যুদ্ধ। ঐতিহাসিক সেই অলিন্দ-যুদ্ধের প্রায় আড়াই বছর পরে কলকাতাবাসীরা প্রত্যক্ষ করল আর একটা অলিন্দ-যুদ্ধ। সেবারের স্থান ডালহৌসী, আর এবার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। সেবারের সৈনিক বিনয় – বাদল—দীনেশ, আর এবারে দীনেশ—নলিনী—জগদানন্দ। সেবারে 'ডণ্টলেস' দীনেশ গুপ্তের অমর আত্মা যেন এসে ভর করল সৈনিক দীনেশ মজুমদারের ওপর। বাস্তবিকই তাই। নইলে রোগজর্জর দেহে দীনেশ মজুমদার হঠাৎ এমন সিংহের বল ও তেজ পেল কেমন করে?

গোটা এলাকা তখন লালপাগড়ীতে ছেয়ে গেছে। রাস্তার ওপর পুলিশের রি-ইন্‌ফোর্সমেণ্ট। অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে খবর পেয়ে লালবাজার থেকে এসে হাজির হয়েছে আরও পুলিশ ফোর্স। বিপ্লবীদের পিস্তল ও পুলিশের রাইফেল-রিভলভারের গুলির শব্দে সমস্ত এলাকাটা কেঁপে উঠছে থর্‌ থর্‌ করে। বন্ধ হয়ে গেছে প্রভাতী ট্রাম-বাসের আনাগোনা। ফাঁকা রাস্তায় কেবল পুলিশ আর পুলিশ।

আশপাশের কৌতূহলী বাসিন্দারা জানালার পাল্লা ঈষৎ ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকিয়েই আবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিচ্ছে। বলা তো যায় না, ঐ গরম বুলেটের টুকরো ছিটকে এসে পড়তে কতক্ষণ!

দোতলার বারান্দায় পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে তিন বিপ্লবী, আর গেটের সামনে পুলিশ ফোর্স নিয়ে এস. বি.-র দুজন অফিসার ও সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

ম্যাল্‌কমের শান্ত মুখখানা তখন কঠিন হয়ে উঠেছে। মানসিক উত্তেজনার প্রতিচ্ছবি সাবা মুখে। মনের স্বাভাবিক কোমল প্রবৃত্তিগুলি অন্তর্হিত হয়ে সেই মুহূর্তে তার মনখানি জুড়ে জেগে উঠেছে এক ভয়ানক প্রতিহিংসা। মারো ওদের, গুলির মুখে উড়িয়ে দাও ঐ টেররিস্টদের—দানবশক্তি দিয়ে চূর্ণ করে দাও ওদের দর্প!

শিক্ষিত পুলিশ দেয়াল ঘেঁষে পজিশন নিয়েছে। ম্যাল্‌কম নিজেও গুলি ছুঁড়ছে একটা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে। বাড়ির ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিপ্লবীদের গুলি কিছুতেই স্পর্শ করতে পারছে না তাদের।

বাড়ির ভেতর তিনটি মৃত্যুঞ্জয়ী যুবক মরিয়া হয়ে উঠেছে। এস. বি. অফিসারদের আত্মসমর্পণের ডাক অগ্রাহ্য করে সমানে গুলি চালাচ্ছে তারা। সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া ইংরেজের কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ নয়। তার চাইতে মৃত্যুও শ্রেয়।

কিন্তু ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে বিপ্লবীরা। এখান থেকে গুলি চালিয়ে একটি পুলিশের গায়েও আঁচড় কাটতে পারছে না তারা। এমনিভাবে চললে বেশিক্ষণ ওদের সাথে কিছুতেই তারা যুঝতে পারবে না। তবে এখন উপায়?

হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা উপায় মাথায় এসেছে দীনেশের। গুলি চালাতে চালাতে ছাদে উঠে গেল নলিনী, তারপর একে একে দীনেশ ও জগদা। ঠিক আছে, এতক্ষণে ঠিকমত পজিশন নিতে পেরেছে তারা। নিচে পুলিশ, ছাদের ওপর

তিন বিপ্লবী।

এবার বিপদ ঘনিয়ে আসে পুলিশ-বাহিনীর। ছাদের আলসের আড়ালে আত্মগোপন করে বিপ্লবীরা গুলি চালাচ্ছে, নিচে পুলিশ-বাহিনী অসহায়।

ঠিক এমনি সময় ম্যালকমের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কনস্টেবলের হাতে গুলি লাগতেই ছিটকে পড়ে যায় তার হাতের রাইফেল। রাইফেলটি তুলে নিতে নিতে ভাবতে থাকে ম্যালকম, নাঃ, এমনিভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করার কোন অর্থ হয় না। বের করতেই হবে অন্য উপায়।

পুলিশের কোণঠাসা অবস্থাটা বুঝতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বিপ্লবীরা। পুলিশ-বাহিনীকে তাক্ করে নতুন উদ্যমে গুলি চালাতে থাকে তারা। পুলিশ-বাহিনীকে আরও কব্জা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ছাদ থেকে অন্য এক ছাদে লাফিয়ে চলে যায় নলিনী। শুরু হয় সর্বাত্মক লড়াই। পুলিশ-বাহিনী পিছু হটছে। তাদের গুলি চালাবার তেজও যেন কমে এসেছে অনেকটা।

সহসা এ কি! পাশের বাড়ির ছাদের ওপরে উঠে এসেছে পুলিশ-বাহিনী। তাদের অধিনায়ক সার্জেণ্ট ম্যালকম।

মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল বিপ্লবীরা। তাদের পিস্তলের মুখ এবার পাশের বাড়ির ছাদের দিকে।

কিন্তু ও কি! পেছনের ছাদের ওপর কাদের পায়ের শব্দ? এখানেও যে আর একদল পুলিশ!

দেখতে দেখতে আশপাশের ছাদগুলো ভরে ওঠে পুলিশে। আর কোন উপায় নেই। দীনেশের কাঁধ বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। কিন্তু সেদিকে নজর নেই তার। হয় এপার, নয় ওপার।

অবশেষে এল সেই চিরপুরাতন সমস্যা। বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সার্জেণ্ট ম্যালকম দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর।

নলিনী ছিল অন্য এক ছাদে। অনন্যোপায় হয়ে পেছনের জলের পাইপ বেয়ে পালাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু নিচে দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সার্জেণ্ট নর্টন। ধরা পড়ল সে তাদের হাতে।

যুদ্ধ শেষ। এবার পরাজিত শত্রুদের নিয়ে ঘরে ফেরার পালা। পুলিশ-ভ্যানে বিজয়ী পুলিশ-বাহিনী ফিরে চলেছে লালবাজারের দিকে। ভ্যানের মধ্যে কনস্টেবল পরিবেষ্টিত দীনেশ, নলিনী ও জগদা চোখ বুজে বসে আছে স্থির হয়ে। এতক্ষণে তাদের সারা দেহ-মনের ওপর নেমে এসেছে কেমন যেন এক অবসাদ। মৃত্যুকে ভয় করে না তারা। কিন্তু এত গুলি চালিয়েও যে একজন পুলিশকেও তারা হত্যা করতে পারল না তাতেই তাদের দুঃখ।

পুলিশ-ভ্যানের ড্রাইভারের পাশে নর্টন ও ম্যালকম। আনন্দে উচ্ছ্বসিত নর্টন একাই কথা বলে চলেছে। আজকের এই পুলিশ এ্যাকশনের আসল কৃতিত্ব জনির হলেও তার নিজের কৃতিত্বও যে কম নয় সেই কথাটাই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছিল তাকে। তাদের দু'জনের বরাতেই যে মোটা রিওয়ার্ড ঝুলছে সে কথাও সে বলছিল বারে বারে।

ম্যালকম কিন্তু কথা বলছিল না। গাড়ির মধ্যে ঠেস্ দিয়ে বসে উইণ্ডস্ক্রীনের

ফাঁকে একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিজয়-আনন্দের বদলে সেই মুহূর্তে কেমন যেন এক নির্লিপ্ত উদাসীনতা ঘিরে ধরেছিল তাকে। বহু পুরনো সেই প্রশ্নটি বারে বারে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল তার মনের কোণে—সত্যিই কি তারা নিজেরা এদেশের ব্রিটিশ স্বার্থের এক সরিক ?

নর্টনের হঠাৎ খেয়াল হল ম্যাল্‌কম তার কথা ঠিক শুনছে না। তাই সে জিজ্ঞেস করে, কিরে জনি, ভাবছিস কি বসে বসে ! খুব টায়ার্ড লাগছে নাকি ?

নর্টনের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, ইয়েস ফ্রেণ্ড, বোথ ফিজিক্যালি এ্যাণ্ড মেণ্টালি।

## নয়

এতদিনে বিয়ের ফুল ফুটল সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের। দীর্ঘ কোর্টশিপের পর বিয়ে। বিলিতি মতে বিয়ের আগে কোন আইবুড়ো-ভাতের ব্যবস্থা না থাকলেও লালবাজার সার্জেণ্টস্‌ মেসের বন্ধু-বান্ধবেরা নিচের বারে বসে একদিন সন্ধ্যায় হুইস্কি-শেরি-স্যাম্পেন দিয়ে ম্যাল্‌কমকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াল। খাওয়াল বললে ভুল হবে, খেল তারা নিজেরাই বেশি। ম্যাল্‌কম কেবল উপলক্ষ।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একখানা বই হাতে নিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করছিল রুমা। কলকাতার এক বনেদী বাড়িতে আজ রাতে মুজরো আছে তার। ধনীর একমাত্র নাতির মুখে-ভাত উপলক্ষে একটা ছোটখাটো ঘরোয়া মাইফেলের ব্যবস্থা। মাইফেল মানেই রাত জাগতে হবে। কাজেই দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেবার ইচ্ছে ছিল তার।

কিন্তু ঘুম হল না। অসময়ে এসে হাজির হল ম্যাল্‌কম। ম্যাল্‌কমের মুখের দিকে তাকিয়ে রুমা জিজ্ঞেস করে, এমন অসময়ে কি মনে করে, সাহেব ? খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসতে বসতে মৃদু হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, ইচ্ছে হল, তাই এলাম। ইচ্ছের তো আর সময় অসময় বলে কিছু নেই।

—তা না থাকতে পারে, কিন্তু এই সময় কেন ইচ্ছে হল তাই তো জিজ্ঞেস করছি। একটি দিন এখানে আসতে হলে যার দিন-ক্ষণ দেখতে হয়, সাহেব-সুবোদের অনুমতি নিতে হয়, সে হঠাৎ এমনি সময় কেন এসে হাজির হল তাই তো জানতে চাইছি। মাথার চুলের গোছা হাতে জড়িয়ে খোঁপা বানাতে বানাতে রুমা বলে ওঠে।

পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটা ধরায় ম্যাল্‌কম।

তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, তোমার এখানে আসতে হলে যে আমাকে সাহেব-সুবোদের অনুমতি নিতে হয়, সেই খবরটা তোমাকে কে দিলে, রুমা ?

—কে আবার দেবে ? আমার নিজের মনে হল, তাই বললাম। অনুমতি নেওয়ার ঝক্কি-ঝামেলা আছে বলেই হয়তো ন'মাসে ছ'মাসে তোমার দেখা পাওয়া যায়।

ম্যাল্‌কম একটু সময় চুপ করে বসে বসে কেবল সিগারেট টানে। তারপর একসময় বললে, তোমাকে একটা সুখবর দিতে এসেছি, রুমা।

—সুখবর! ম্যাল্‌কমের দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তার মনের কথা আন্দাজ করতে চেষ্টা করে রুমা বললে, কিরকম সুখবর সাহেব, চাকরিতে উন্নতি হয়েছে নাকি?

মাথা দোলাতে দোলাতে ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, না, হল না। ধরতে পারলে না তুমি।

—তাহলে বোধহয় এবারে মেরিয়ার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে, কেমন?

রুমার চোখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে ওঠে ম্যাল্‌কম, আশ্চর্য! তুমি বুঝলে কেমন করে?

—ও আমরা মেয়েরা তোমাদের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি। তা, সত্যি বলছ? বিয়ে ঠিক হয়েছে? হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করে রুমা।

—হ্যাঁ, কাল আমাদের বিয়ে।

সহসা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রুমা। যে রুমা ম্যাল্‌কমের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখেই বরাবর চলতে অভ্যস্ত, সে হঠাৎ আজ আনন্দের আতিশয্যে সেই দূরত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে একটু অতিরিক্ত প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে ম্যাল্‌কমের প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, আশ্চর্য মানুষ তো তুমি! এমন একটা খবর এতক্ষণ চেপে রেখেছ? তা গোধূলি লগ্নে বিয়ে তো?

কথাটা বলে ফেলে যেন নিজের বোকামিতে নিজেই লজ্জিত হয় রুমা। খিল খিল করে হাসতে হাসতে আবার বলে ওঠে, কী বোকা আমি! তোমাদের যে খ্রীষ্টান মতে গির্জায় বিয়ে হবে তা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তা সাহেব, তোমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করবে না আমাকে?

রুমা হাসলেও ম্যাল্‌কম কিন্তু সেই মুহূর্তে একটুও হাসছিল না। রুমার হঠাৎ প্রগল্‌ভতার কারণ খুঁজতে খুঁজতে ম্যাল্‌কম জবাব দেয়, নেমন্তন্ন করলে কি তুমি যাবে, রুমা?

সহসা যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে রুমা। মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলে ওঠে, এই যাঃ, এ কথা তো একবারও মনে হয় নি। আমি গেলে তুমি যে বিপদে পড়বে। তাহলে থাক্‌। কাজ নেই গিয়ে। কিন্তু আমার যে অনেক দিনের ইচ্ছে পাশাপাশি তোমাদের দু'জনকে দেখব!

—বেশ তো, বিয়ের পরে একদিন না হয় কোনরকমে—

—না-না, লুকোচুরি করে দেখতে চাই না আমি। তার চাইতে একটা কাজ কর সাহেব। বিয়ের পরে তোমাদের দু'জনের একখানা ছবি এনে আমাকে দেখিও। তাতেই খুশি হব আমি। আর—

ম্যাল্‌কম মুখে কিছু না বলে কেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রুমার দিকে। রুমা আবার বলতে থাকে, আর একটা কাজ যদি করতে পার তো আমি ভারি খুশি হব, সাহেব।

—কি কাজ, বল?

রুমা কোন জবাব না দিয়ে 'আসছি' বলে পাশের ঘরে চলে যায়। আর, এ ঘরে একা বসে সিগারেট টানতে থাকে ম্যাল্‌কম।

কিছুক্ষণ পরে রুমা আবার এসে দাঁড়ায় ম্যাল্‌কমের সামনে, হাতে তার একখানা লাল রঙের দামী বেনারসী শাড়ি।

সোনার কাজ করা সেই দামী শাড়িটার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করে, এটা দিয়ে কি হবে?

—তোমার বৌকে এটা দিলাম, সাহেব। মেমসাহেবদের তো আর লাল বেনারসী পরে বিয়ে হয় না। হলে এটা পরেই বিয়ে হওয়ার কথা বলতাম। তা যখন সম্ভব নয়, তখন তোমার বৌকে অন্তত একটি দিন এই শাড়িখানা পরতে অনুরোধ করো। হয়তো তোমার মেরিয়া শাড়ি পরতে জানে না। কিন্তু তাতে কিছু যাবে আসবে না। যেমন তেমন করে একটিবার মাত্র শাড়িটা পরলেই আমি খুশি হব। তাকে বলবে যে, আমার এ-দেশীয় যে বন্ধুটি এই শাড়িখানা দিয়েছে সে অন্তত একটি বার তোমাকে এটা পরতে বলেছে। তুমি অনুরোধ করলে তোমার মেরিয়া তা উপেক্ষা করতে পারবে না কিছুতেই। বল, আমার কথা রাখবে তো?

রুমার হাত থেকে শাড়িখানা হাতে নিয়ে ম্যাল্‌কম বললে, আমার কথা যে মেরিয়া উপেক্ষা করবে না তা আমি জানি। কিন্তু এই শাড়িটা তুমি যোগাড় করলে কোত্থেকে?

হেসে জবাব দেয় রুমা, ভয় পেও না, সাহেব। এটা কোন চোরাই মাল নয়। সাড়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে দোকান থেকে কিনেছি এটা।

— তুমি কিনেছ?

– হ্যাঁ, আমিই কিনেছি।

—কবে কিনেছ?

সহসা মুখে জবাব জোগায় না রুমার। একটু আমতা আমতা করে বললে এই তো এই তো কয়েক দিন আগে।

—কার জন্যে কিনেছিলে?

কার জন্যে আবার? তোমার বউয়ের জন্যে।

—উপহার দেবার মত দোকানে এত জিনিস থাকতে আমার গাউন-পরা বউয়ের জন্যে এত দাম দিয়ে এই শাড়িটা কিনলে কেন? আর, দেখে তো মনে হয়, নতুন হলেও এটা অনেকদিন বাক্স-প্যাটরার তলায় ছিল। সত্যি করে বল তো রুমা, কার জন্যে এটা কিনেছিলে?

ম্যাল্‌কমে প্রশ্নের ধরনে চোখে-মুখে কেমন যেন একটু বিব্রত ভাব ফুটে ওঠে রুমার। সেই বিব্রত ভাবটুকু ঢাকতে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, তা অবশ্যি তুমি ঠিকই ধরেছ, সাহেব। সত্যি বলতে কি—

কথার মাঝখানেই থেমে যায় রুমা। তারপর মাথা নিচু করে বিছানার ওপর পড়ে থাকা খোলা বইটি নিয়ে নিঃশব্দে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

ম্যাল্‌কম এবার মৃদুকণ্ঠে বললে, আমার তো মনে হয় তুমি নিজের জন্যেই শাড়িটা কিনেছিলে, রুমা।

—না—না, চকিতে কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে রুমা, নিজের জন্যে নয়। তবে—তবে একটি মেয়ের জন্যে কিনেছিলাম।

বলতে বলতে সহসা থেমে যায় রুমা। ম্যাল্‌কমের দিকে না তাকিয়ে এবার সে জানালা দিয়ে বাইরের একটা উঁচু বাড়ির চিলেকোঠার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই চিলেকোঠার কার্নিশে বসে তখন একজোড়া পায়রা পরস্পরের কাছে প্রেম নিবেদন করতে ব্যস্ত। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেকটা অন্যমনস্ক-ভাবে বলতে থাকে রুমা, প্রতীক্ষা করে করে মেয়েটা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন একদিন তার মনের মানুষের খোঁজ পেল সেই হতভাগী। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল মেয়েটা। বিয়ের দিন-ক্ষণ ঠিক। নিজের বিয়ের কেনাকাটা নিজেকেই করতে হল সেই হতভাগীকে। অবশেষে বিয়ের আগের দিনই তার সেই মনের মানুষটা নিরুদ্দেশ হয় গেল। অনেক খোঁজাখুজি করল, কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। পাবে কেমন করে? বিয়ের আগেই যে সবকিছু লুটেপুটে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকে, তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়? সেই থেকে শাড়িটা রয়ে গেল বাক্সের তলায়। এতদিনে এই শাড়িটা পরার মত লোকের সন্ধান পাওয়া গেল।

কথা শেষ করে বাইরের দিকেই নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে রুমা। তার সুন্দর হাত দু খানা অবসন্ন ভঙ্গীতে পড়ে থাকে তার কোলের ওপর।

ম্যাল্‌কমও চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, শেষে নিজের শাড়িটা তুমি মেরিয়াকে দিলে, রুমা?

—হ্যাঁ, দিলাম। না—না, আমার নয়—আমার শাড়ি নয়, সাহেব। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রুমা। তারপর দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলতে থাকে, সেই হতভাগী আর নেই, মরে বেঁচেছে। তোমার কাছে অনুরোধ সাহেব, শাড়িটা তুমি তোমার মেরিয়াকে দিও। অন্তত একটিবার যেন তোমার মেরিয়া শাড়িটা পরে সেই হতভাগীকে খুশি করে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় রুমা। আর সেই দামী বেনারসী শাড়িটা কোলের ওপর নিয়ে তার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে লালবাজারের পুলিশ সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল উঠে গিয়ে রুমাকে বলে তোমার শাড়ি তোমার কাছেই থাক রুমা। তোমার সেই মনের মানুষটাকে যেখান থেকে পারি আমি ধরে নিয়ে আসব!

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কেবল চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে কিংবা বলতে পারল না ম্যাল্‌কম।

কতদিন আগের কাহিনী, কিন্তু আজও প্রতিটি কথা স্পষ্ট মনে আছে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের। মনে হয়, যেন এই তো সেদিন মাত্র ঘটনাগুলো ঘটেছে। রুমার সেদিনের প্রতিটি কথা, এমনকি তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে ম্যাল্‌কমের। কিছুই ভোলে নি সে। ভুলতে পারলে অবশ্য ভালই হত, কিন্তু ভুলতে পারছে কোথায়? শুধু কি রুমা? মেরিয়াকেও কি ভুলতে পেরেছে সে? চেষ্টা করেও ভুলতে পারে নি তাকে। যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন এই দুটি নারীর একজনকেও ভুলতে পারবে না ম্যাল্‌কম। আজও পথে-ঘাটে রুমার মত দেখতে কোন আধুনিকা শ্যামাঙ্গীর দিকে চোখ পড়লে সে চমকে ওঠে। আজও সাহেবপাড়ায় মেরিয়ার বয়সের কোন শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে

পড়ে ম্যাল্‌কম।

রুমার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখে নি ম্যাল্‌কম। একদিন নয়, একাধিক দিন তার পীড়াপীড়িতে তাদের পার্ক স্ট্রীটের ছোট্ট ফ্ল্যাটে মেরিয়াকে কেবল সেই বেনারসী শাড়িটা পরতেই হয় নি, ঐ শাড়ি পরে তাকে লক্ষ্মী মেয়ের মত ম্যাল্‌কমের বক্স ক্যামেরার সামনে বসতেও হয়েছিল। বেনারসী পরা মেম-সাহেবের ছবির দিকে তাকিয়ে খুশির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে কেঁদে ফেলেছিল রুমা। তারপর ম্যাল্‌কমের একটা হাত ধরে ধরা গলায় বলেছিল, বল তুমি সাহেব, কথা দাও আর কখনও তুমি ওকে ফেলে রেখে আমার এখানে আসবে না?

—তার মানে? চমকে উঠেছিল ম্যাল্‌কম, তোমার এখানে আসা ছেড়ে দিলেই কি আমার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করা হবে? তোমার এখানে এলে বুঝি মেরিয়ার প্রতি কর্তব্য করা যাবে না?

—যাবে না বলছি না, তবে একটু শক্ত। স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ হতে হলে অন্য নারীর দিকে নজর দেওয়া চলবে না।

—তা হয়তো ঠিক, কিন্তু তাই বলে তোমার এখানে গান শুনতে আসা বন্ধ করে দিলেই যে মেরিয়ার প্রতি স্বামীর কর্তব্য করা হবে, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া, এমনিভাবে নিজেকেই যদি নিজে অবিশ্বাস করি তাহলে কেমন করে আশা করব যে, আমার স্ত্রী আমাকে বিশ্বাস করবে?

—তুমি নিজেকে নিজে বিশ্বাস কর সাহেব?

—হ্যাঁ, করি।

ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ, ঠিক বলছি।

—কোন দুর্বল মুহূর্তে ভুল করে বসবে না তো?

একটু ম্লান হাসি হেসে জবাব দিয়েছিল ম্যাল্‌কম, ভুল মানুষ মাত্রেই করতে পারে। আমিও মানুষ। তবে সেই ভুল শুধরে দেবার জন্যে তুমি তো রইলে, রুমা।

ম্যাল্‌কমের কথায় সেই মুহূর্তে রুমার চোখ দুটি কেমন যেন আবেগময় হয়ে উঠেছিল। চাওয়া-পাওয়ার যুক্তি-তর্কের বাইরে কেবলমাত্র একান্ত বিশ্বাসের মধ্যেই যে একটা কল্যাণকর শক্তি লুকিয়ে থাকে তা এতদিন সে জানত না। কিন্তু ম্যাল্‌কমের কথায় সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, তার প্রতি ম্যাল্‌কমের এই বিশ্বাসটুকুই তো তার জীবনের একটা মস্ত সম্পদ। সারা জীবন একসাথে ঘর করেও তো অনেক নারীর ভাগ্যেই এই সম্পদ জোটে না। সত্যিই সে ভাগ্যবতী!

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের জীবনে মেরিয়া হচ্ছে প্রয়োজন, আর রুমা বাঈজী বিলাস। না, ঠিক বিলাস নয়। বিলাসের হাল্কা মেজাজটুকু ছাড়িয়ে প্রয়োজনের গণ্ডীও অতিক্রম করে এক অপার্থিব আনন্দঘন জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ। প্রয়োজনের গণ্ডীতে তা গণ্ডীবদ্ধ নয়, আবার অপ্রয়োজনের হাল্কা সুরেও তা বাঁধা নয়। স্ত্রী মেরিয়া তার সংসারের কর্ত্রীই শুধু নয়, ম্যাল্‌কমের জীবনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে এই মেয়েটি। সাংসারিক জীবনে তার প্রতি মেরিয়ার

ভালবাসা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করতে পারে ম্যাল্‌কম। কিন্তু রুমা বাঈজী অপ্রয়োজনীয় হলেও ম্যাল্‌কমের জীবনে অপরিহার্য। তাকে অস্বীকার করার শক্তি ম্যাল্‌কমের নেই। তাদের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবনে কোনরকম ছায়াপাত না ঘটিয়েও ম্যাল্‌কমের জীবনে রুমা বাঈজী আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। তাকে স্থানচ্যুত করার ক্ষমতা নেই ম্যাল্‌কমের।

পার্ক স্ট্রীটের একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে নিজের সংসার গুছিয়ে বসেছে মেরিয়া। নিজের হাতেই সংসার গোছায়, নিজের হাতেই বাজার হাট করে। বিয়ের আগে ততটা বুঝতে না পারলেও বিয়ের পরে মেরিয়া বুঝতে পারে পুলিশের সংসার সত্যিই 'ওয়ান উওম্যানস শো'। কর্তাটি তো রাত-দিন নিজের ডিউটি নিয়েই ব্যস্ত, সংসারের দিকে ফিরে চাইবার অবসর কোথায়? কখনও জেনারেল কিংবা রিজার্ভ ডিউটি, কখনও বা ডিউটি করতে হয় ট্রাফিকে, কখনও বা ফোর্স নিয়ে ছুটতে হয় স্বদেশীদের মিটিং ভাঙতে কিংবা বিপ্লবী ছোকরাদের ঠ্যাঙাতে। মাঝে মাঝে কোয়ার্টারে এসে লাঞ্চ খাওয়ার পর্যন্ত সময় পায় না। কেবল ডিউটি আর ডিউটি। কিন্তু তবুও ম্যাল্‌কমের কাছে কোন অভিযোগ নেই মেরিয়ার। প্রেমময় স্বামী আর নিজের ছোট্ট সংসার নিয়ে মেরিয়া বাস্তবিকই পরিতৃপ্ত। এর বেশি আর কিছু সে চায় না।

ইদানীং দেশের হাল-চাল কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। স্বদেশীওয়ালাদের প্রতিপত্তি যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সরকারও যেন ওই স্বদেশীওয়ালাদের সম্পর্কে একটু নরম নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেছে। মেরিয়ার মতে সরকার ভুল করছে। তোয়াজ করে কাউকে কখনও বশে রাখা যায় না। তার জন্যে চাই শক্ত হাতের শাসন। ওদের প্রকৃত দাওয়াই চার্লস টেগার্টের মত শক্ত হাতের পুলিশ কমিশনার, লালবাজারের বর্তমান সি. পি. ফেয়ারওয়েদারের মত নরম মানুষ নয়।

টেগার্টের পরে কোল্‌সন। তারপরে ফেয়ারওয়েদার। ধব্‌ধবে ফর্সা, ঈষৎ বেঁটে ধরনের এই মানুষটির নিজের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চেহারাটা বাস্তবিকই রাজসিক। সুন্দর ছাঁটা গোঁফ, মাথার মাঝখানে একটি লম্বা সিঁথি, দুপাশে ঢেউ-খেলানো চুলের বাহার। ইউনিফর্ম ছাড়া এই মানুষটিকে সাধারণ পোশাকে এদেশীয় সাহেব-জমিদারদের একজন বলেই মনে হয়।

পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদারের মেজাজটিও ছিল বেশ ফেয়ার। চট্ করে কাউকে কড়া কথা বলতে পারত না। এদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম তথা স্বদেশী-ওয়ালাদের তেমন একটা ভাল চোখে না দেখলেও তাদের সম্বন্ধে মনে কোন বিদ্বেষ পোষণ করত না সে। চাকরিকে সে কেবল চাকরি বলেই গ্রহণ করেছিল। এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম থাকবে কি থাকবে না তা নিয়ে ফেয়ারওয়েদারের তেমন একটা মাথাব্যথা না থাকলেও চল্লিশ সালের এই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ব্রিটিশ সরকারকে বিপাকে ফেলে স্বদেশীওয়ালাদের দাবী আদায়ের প্রচেষ্টাকে সে তেমন সুনজরে দেখত না। তার মাঝে মাঝে মনে হত এটা একধরনের ব্ল্যাকমেলিং।

একটু নরম মেজাজের মানুষ হলেও সি. পি. ফেয়ারওয়েদার একজন আই.

পি. অফিসার। খাঁটি বিলিতি সাহেব। সরকারের হোমরা-চোমরাদের মধ্যে অনেকেই পছন্দ করত তাকে। সেকালের বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ও নাজিমুদ্দিন সাহেব তাকে খুবই পছন্দ করতেন তার চরিত্র- মাধুর্যের জন্যে।

তিয়াত্তরের শহর কলকাতা যেন বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের নিজের মতই দিনে দিনে বুড়ো হয়ে পড়েছে। তার নিজের মুখের শিথিল কুঞ্চিত চামড়ার মত এই শহরটার সর্বাঙ্গেও যেন কেমন এক জীর্ণ শিথিলতা। তার নিজের মত এই শহরটার দিকেও যেন নজর দেওয়ার কেউ নেই। এখানে-ওখানে রাস্তা খোঁড়া-খুঁড়ি, পলেস্তারা-ওঠা ফুটপাথে ব্যবসায়ীর ভিড়, জরাজীর্ণ ট্রাম-বাস, লোড-শেডিংয়ের নামে এলাকার পর এলাকায় ব্ল্যাক-আউট, আর সেই সঙ্গে তাল বেখে নগর-জীবনের চরম উচ্ছৃংখলতা—সব মিলিয়ে এক অসহনীয় অবস্থা। এমন একটা অবস্থার কথা বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম কোনদিন কল্পনায়ও আনতে পারে নি। মেরিয়া ঠিকই বলত। বলত, এদেশের মানুষ যেদিন নিজেদের হাতে শাসন-ক্ষমতা পাবে, সেদিন তারা দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করে ছাড়বে। সত্যিই তাই ঘটল শেষ পর্যন্ত। মেরিয়া কাছে থাকতে ম্যাল্‌কম কোনদিন তার এ ধরনের কথায় সায় দিতে পারে নি। কিন্তু সে আজ কাছে নেই, আজ কিন্তু তার সেই কথায় সায় দিতে ইচ্ছে করে বৃদ্ধ ম্যালকমের।

মাসের প্রথম সপ্তাহ। এ. জি বি. অফিস থেকে মাসিক পেনসনের টাকা ক'টা নিয়ে ডালহৌসি এলাকার ফুটপাথ ধরে ধীরপায়ে হাঁটতে থাকে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। গায়ের ছেঁড়া গরম কোটে শীত মানছিল না তার। তাই বাইরের রোদে হাঁটতে বেশ ভালই লাগছিল।

সহসা পাশ দিয়ে একখানা বড় পুলিশ-ভ্যান চলে গেল। সেকালের সেই ব্ল্যাক মিররের মত অবিকল একরকম পুলিশ-ভ্যান। ভ্যানের মধ্যে চিৎকার হচ্ছিল -যুগ-যুগ জিও জিও, যুগ-যুগ জিও জিও। একদল আধুনিক বিপ্লবীকে নিয়ে বোধহয় ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে বেরিয়েছে ভ্যানটি। সম্ভবত চলেছে লালবাজার কিংবা আলিপুর অথবা দমদম সেণ্ট্রাল জেলের দিকে।

সেকালেও পুলিশ-ভ্যানের মধ্যে এমনি শ্লোগান হত। তবে তার ভাষা ছিল অন্যরকম। অহিংস কংগ্রেসী কিংবা সহিংস বিপ্লবী সকলের মুখেই সেকালে ছিল একটি মাত্র শ্লোগান—বন্দেমাতরম্‌। তারও পরে আমদানি হল সার্ব-জনীন শ্লোগান ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। অবশেষে সর্বাধুনিক—যুগ-যুগ জিও।

শ্লোগানের ভাষা কানে যেতেই মনে মনে একটু হাসে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। সময়ের স্রোত চিরকালই অতীতের অবসান ঘটিয়ে নতুনকে আবাহন করে। অতীতের রাজনীতি, সমাজনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ রাজনৈতিক চেতনা কিংবা চরিত্র, এমনকি রাজনৈতিক শ্লোগানের পর্যন্ত অবসান ঘটেছে আজ। কেবল অবসান ঘটে নি সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার। এদেশে তা কেবল বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন।

বড় রাস্তা পার হয়ে লালদীঘির পাশে এসে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। সেকালের সুন্দর লালদীঘির কি চেহারাই হয়েছে! ঘাটের গেট খোলা। পথের ভিখিরিরা

আসর জাঁকিয়ে বসেছে ঘাটের ওপর। কেউ ছিপ নিয়ে মাছ ধরছে, কেউ কাপড় কাচছে, কেউ বা অন্যভাবে নোংরা করছে দীঘির জল। কেউ দেখবার নেই, কেউ বলবার নেই। লালদীঘির অবস্থান খোদ রাইটার্স বিল্ডিংয়ের নাকের ডগায় হলেও দেশের কর্ণধারেরা বোধহয় দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভুলেও একবার এদিকে চোখ মেলে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কিংবা প্রয়োজন বোধ করলেও বোধহয় মনে মনে হিসেব করেন, রাস্তার ভিখিরিদের মধ্যেও তো দু'চার জন ভোটার থাকতে পারে। কাজেই ওদের ইচ্ছেয় বাধা না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

দেশের কর্ণধারেরা যতটা বুদ্ধিমান, সরকারী আমলাদের বুদ্ধি বোধহয় তার চাইতেও বেশি। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কর্তা যেখানে নীরব, সেখানে সরব হতে গিয়ে বিপাকে পড়তে যাবে কোন্ কর্মচারী? তার চাইতে চোখ বুজে থাকাই শ্রেয়। হৈ চৈ করার মধ্যে তো আছে কেবল দু'চারটে খবরের কাগজ। ওদের কথায় কান না দিলেই হল।

অবশ্যি পুলিশ রয়েছে কাছেই। লালবাজার থেকে লালদীঘির দূরত্ব আর কতটুকু! কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নজর দেবার সময় কোথায় তাদের? শহর কলকাতার শ্রীবৃদ্ধির চাইতে নিজের চাকরি ও সংসারের শ্রীবৃদ্ধির দিকেই যে তাদের নজর বেশি প্রখর। কি হবে ওসব শুকনো ঝঞ্ঝাটে গিয়ে? তার চেয়ে যেমন চলছে তেমনি চলুক।

বৃদ্ধ ম্যাল্কমের রাগ হয় গোটা লালবাজারের ওপর। এককালে নিজে ঐ লালবাজারের একজন কর্মচারী ছিল বলেই হয়তো ওদের এই উদাসীনতা সে বরদাস্ত করতে পারে না। তার নিজের আমলে এমনটি হতে পারত কি? লালদীঘির টলটলে জলে সামান্য একটুকরো ইট ছোঁড়বার সাহস ছিল কারুর?

কিন্তু একালে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হচ্ছে। গড্ডালিকার প্রবাহে ভেসে চলেছে গোটা সমাজ। পুলিশও গা ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের সঙ্গে।

মনের বিরক্তি মনেই চেপে রেখে দীঘির কালো জলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় বৃদ্ধ ম্যাল্কম। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া দীর্ঘ দেহটাকে টেনে নিয়ে এসে দাঁড়ায় ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে।

ভিড়—শুধুই ভিড়। বাস, ট্রাম, গাড়ি-ঘোড়া আর মানুষের ভিড়ে সারা ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকা জমজমাট। সবাই ব্যস্ত, সবাই ছুটে চলেছে নিজের কাজে। কেবল নিষ্কর্মা বৃদ্ধ ম্যাল্কম নিজে। কোন কাজ নেই তার। হাতের লাঠিখানার ওপর ভর দিয়ে একালের অতিব্যস্ত মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে, একালের ঐ ব্যস্ত মানুষগুলোর মধ্যে অনেকেই হয়তো জানে না, এককালে ডালহৌসী স্কোয়ারের এই উত্তর-পূর্ব কোণেই ছিল সেই মনুমেণ্ট, যাকে নিয়ে একদা চিন্তিত হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকার। একদিকে সুভাষ বোষের হুমকি, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের জেদ। মাঝখানে পড়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী বেচারী ফজলুল হক সাহেবের সসেমিরা অবস্থা।

হলওয়েল মনুমেণ্ট। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা যাই বলুন না কেন, ইতিহাস সাক্ষী, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা সত্যিই আঠারো ফুট লম্বা ও

প্রায় পনেরো ফুট চওড়া একটা ক্ষুদ্র কক্ষে একশো ছেচল্লিশ জন ইংরেজ অধিবাসীকে সারারাত বন্দী করে রেখেছিলেন কিনা। আর তারই ফলে তাদের মধ্যে একশো তেইশ জন বন্দী সত্যিই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল কিনা। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা একেই নাম দিয়েছিলেন—অন্ধকূপ হত্যা। সেই সব নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতিরক্ষার জন্যেই পরবর্তী কালে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ডালহৌসী স্কোয়ারের এই কোণে নির্মিত হয়েছিল হলওয়েল মনুমেণ্ট।

সতেরো শো ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দের বিশে জুন। ব্রিটিশ বেনিয়াদের ঔদ্ধত্য আর সহ্য করতে না পেরে নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলেন। পিল পিল করে কলকাতায় ঢুকতে লাগল নবাবী সৈন্য। প্রমাদ গনল বেনিয়ার মুখোশধারী ব্রিটীশ রাজপুরুষেরা। এতদিনের সাধের আস্তানা বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু চুপ করে বসে থাকার মানুষ তারা নয়। যথাসাধ্য বাধা দিতে লাগল তারা সিরাজকে। কিন্তু সিরাজ তখন দুর্মদ। অনেক সহ্য করেছেন তিনি. কিন্তু আর নয়। এবার ঐ ফিরিঙ্গীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, দেশটা ওদের নয়। ওদের যথেচ্ছাচার আর কিছুতেই তিনি সহ্য করবেন না।

পিছু হঠতে হঠতে ফিরিঙ্গী সৈন্যরা এসে আশ্রয় নিল তাদের শেষ আশ্রয়স্থল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে। সেকালের পুরানো রোপ ওয়াক-এর এক কোণে অবস্থিত নাট্যশালাটি অধিকার করে নিলেন সিরাজ। মিলিটারী স্ট্র্যাটেজী হিসেবে এই নাট্যশালাটির অবস্থান খুবই চমৎকার। এরই পশ্চিমে বর্তমান লালদীঘি. আর তারই অদূরে সেকালের সেই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। এখান থেকে সহজেই ঐ দুর্গের ওপর তোপ দাগা চলবে।

শুরু হল তুমুল লড়াই। দীঘির অপর পার থেকে ফিরিঙ্গী সৈন্যদের কামানের গোলার জবাবে এ পার থেকে ছুটতে লাগল নবাবী সৈন্যের তোপের আগুন। দু'পক্ষের মুখোমুখি লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে থর থর করে কাঁপছে সেকালের কলকাতা। আক্রমণের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে নবাবী সৈন্য, আর সেই আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছে ফোর্ট উইলিয়ামের ফিরিঙ্গী সৈন্যরা।

কিন্তু ইংরেজরা আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না নবাবী সৈন্যের সেই আক্রমণ। দুর্গ-রক্ষাকারী সৈন্যরা নবাবী কামানের মুখে একের পর এক ঢলে পড়তেই সৈন্যাধক্ষের লাল মুখখানা দুর্ভাবনায় নীল হয়ে উঠল। আর কোন উপায় নেই। এমনিভাবে আরও কিছুক্ষণ চললে সিরাজের ক্রোধের আগুন থেকে একজন ইংরেজ নারী-পুরুষও বাঁচবে না। অতএব সন্ধির প্রস্তাব পাঠানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

সহসা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ইংরেজের কামানের শব্দ থেমে গেল। দুর্গ-শীর্ষে ইউনিয়ন জ্যাকের পাশে জেগে উঠল সাদা রঙের পতাকা। শান্তি — শান্তির আবেদন জানাচ্ছে ইংরেজরা। আত্মসমর্পণে তারা প্রস্তুত।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল নবাবী সৈন্য। ইংরেজের বিষদাঁত তারা গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে ভেসে আসা একদল সাম্রাজ্যবাদী মানুষের সাম্রাজ্য-বিস্তারের বাসনায় তারা বাদ সাধতে পেরেছে। ওদের দর্প খর্ব করতে পেরেছে তারা।

ইংরেজদের শান্তির আবেদনে সাড়া দিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। তাঁর ঠোঁটের কোণে ছড়িয়ে পড়ল সামান্য একটু হাসি। বেয়াদপির উচিত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। এবার ওদের এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, ওরা পাততাড়ি গোটায় নি। বরঞ্চ এদেশের মাটিতে আরও শক্ত হয়ে গেড়ে বসেছিল তারা পরবর্তীকালে। কলকাতার মাটিতে পরাজয়ের প্রতিশোধ তারা নিয়েছিল পলাশীর প্রান্তরে কূটবুদ্ধির খেলায়। যুদ্ধে জয়ী হয়েও পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল সিরাজকে।

বিজয়ী নবাবী সৈন্য ফোর্ট উইলিয়ামের উন্মুক্ত দ্বারপথে বীরদর্পে প্রবেশ করল। বন্দী করল ইংরেজ সেনানীদের।

তবে কি পরবর্তীকালে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা নিজেদের কৃতকর্ম ও পরাজয়ের লজ্জা ঢাকতে চেয়েছিল সিরাজের কাঁধে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে? তাই কি কুখ্যাত 'ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি' অথবা 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক কাহিনীর সৃষ্টি? বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার গায়ে কালি লেপে দিতেই কি তারা সেকালের লালদীঘির উত্তর পূর্ব কোণে নির্মাণ করেছিল সেই স্মৃতিস্তম্ভ —হলওয়েল মনুমেণ্ট? পরবর্তীকালে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র। আর তারও পরে ঐ একই প্রশ্ন বজ্রনির্ঘোষে জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন সুভাষ বোস।

উনিশশো চল্লিশ সালের পঁচিশে মে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে সুভাষ তখন ঢাকা শহরে। সেদিন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালীর মনে দারুণ উত্তেজনা। ইংরেজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করতেই হবে। সম্মেলনের সাফল্য জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাই ফুটিয়ে তুলেছিল সেদিন।

এমনি দিনে একদল মুসলমান তরুণ এসে ভিড় করে দাঁড়াল সুভাষের কাছে। মুখে তাদের সোচ্চার দাবী বাঙালী-জীবনের সবচাইতে বড় কলঙ্ক ইংরেজের তৈরি ঐ হলওয়েল মনুমেণ্ট নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। বাংলার শেষ নবাব সিরাজের অপমান গোটা বাঙালী সমাজের অপমান। এই অপমানের অবসান চাই।

অনেক আলোচনা হল। অনেক বিচার-বিবেচনার পরে উনত্রিশে জুন ঢাকার এ্যালবার্ট হলে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে সুভাষ ঘোষণা করলেন ইংরেজের দেওয়া বাঙালী-জীবনের এই কলঙ্ক ঘোচাতেই হবে। আগামী তেসরা জুলাই নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি-দিবসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি কলকাতার ডালহৌসী এলাকা থেকে ঐ মনুমেণ্ট সরিয়ে নিয়ে না যায় তাহলে সেদিন থেকেই শুরু হবে অভিযান। প্রথম দিনের অভিযানের নেতৃত্বে থাকবেন সুভাষ নিজে।

খবর চলে এল কলকাতায়। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ব্রিটিশ সরকার। সুভাষকে তারা ভালমতই চেনে। তাঁর আহ্বানে গোটা বাংলার তরুণ-সমাজ যে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াবে একথাও তাদের অজানা নয়। ইয়োরোপে তখন যুদ্ধ চলছে। জার্মানীর হাতে মার খেয়ে ব্রিটিশ বাহিনী তখন পর্যুদস্ত। এর মধ্যে এদেশে আবার শুরু হল অশান্তি। ইংরেজের এই দুঃসময়ে এদেশের মানুষের সহযোগিতা

যখন বেশি প্রয়োজন, ঠিক সেই মুহূর্তে কিনা সুভাষ ব্রিটিশ সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে প্রস্তুত।

কিন্তু তাই বলে কি সুভাষের দাবী মেনে নিতে হবে? কক্ষণো নয়। ইয়োরোপে যুদ্ধে ব্রিটিশ-সিংহ যে এখনও হীনবল হয়ে পড়েনি সেকথাটা এদেশের নেতাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

সবচাইতে অসুবিধায় পড়লেন ফজলুল হক সাহেব। বাংলার প্রধানমন্ত্রী তিনি। সরাসরি ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারেন না। আবার সুভাষের এই দাবীর বিরোধিতা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এদিকে কলকাতার সরকারী মহলে জোর তৎপরতা। ঘন ঘন বৈঠক। মাঝে আর মাত্র দুটো দিন। যেমন করেই হোক সুভাষকে ঠেকাতেই হবে।

পয়লা জুলাই বিকেলে লালবাজারে এসে ঢুকল স্পেশাল ব্রাঞ্চের একখানা গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে এল ডেপুটি কমিশনার জনভ্রিন ও ডেপুটি কমিশনার সামসুদ্দাহার। পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদার ডেকে পাঠিয়েছে তাদের।

অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ চলল তাদের। একসময় ফেয়ারওয়েদার তার ডেপুটিদের দিকে তাকিয়ে বললে, সুভাষ বোসকে নিরস্ত করতেই হবে। গভর্ণমেণ্ট ডিটারমিন্‌ড্‌। প্রয়োজন হলে তাঁকে এ্যারেস্ট করাও চলতে পারে।

—কিন্তু তাতে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠবে না, স্যার? খবর পেয়েছি, সুভাষ বোসের ডাকে সাড়া দিতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কলকাতার প্রতিটি কলেজের ছাত্ররা নাকি প্রস্তুত। সামসুদ্দাহার বললে।

জবাব দেয় জনভ্রিন, কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি? ব্যাপক পুলিশ এ্যারেঞ্জমেণ্ট করেও যদি সুভাষ বোসকে ঠেকানো না যায় তাহলে শেষপর্যন্ত তাঁকে এ্যারেস্ট করা ছাড়া আর কোন উপায় আছে কি?

জনভ্রিন থামতেই ফেয়ারওয়েদার তার পরিপাটি মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, আমার মনে হয় ওদের সেই অভিযানের সময় সুভাষ বোসকে এ্যারেস্ট করলে অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে। তার চাইতে আগে-ভাগেই এ্যারেস্ট করা ভাল। আপনারা কি বলেন? বলেই ফেয়ারওয়েদার পর্যায়ক্রমে ডি সি-দের মুখের দিকে তাকায়।

—দ্যাট্‌স রাইট, স্যার। বলে ওঠে জনভ্রিন। সামসুদ্দাহারও সমর্থন করে তাকে।

অবশেষে ঠিক হল পরের দিনই জনভ্রিন নিজেই এ্যারেস্ট করবে সুভাষ বোসকে। ব্যবস্থা পাকা। লালবাজারে পুলিশ ফোর্স প্রস্তুত। এস. বি. অফিস থেকে খবর এলেই ফোর্স বেরিয়ে পড়বে এলগিন রোডে সুভাষের বাড়ির দিকে।

সুভাষের গতিবিধির ওপর পুলিশের তীক্ষ্ন নজর। এলগিন রোডের বাড়ির চারদিকে ওয়াচায় কনস্টেবল ও অফিসারদের সতর্ক দৃষ্টি। হঠাৎ এস, বি অফিসে খবর এল সুভাষ বোস নাকি কোথায় বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। কিন্তু সঠিক কোথায় তিনি যাচ্ছেন তা নাকি জানা যাচ্ছে না।

চিন্তিত হয়ে ওঠে এস. বি. অফিসের অফিসারেরা। আগামীকাল বেলা

দশটায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের অভিযান পরিচালনা করবেন সুভাষ বোস। তবে কি এ ব্যাপারে অন্য কারুর সঙ্গে আলোচনা বা পরামর্শ করতে চলেছেন তিনি? কিন্তু কার সঙ্গে?

সামসুদ্দাহার জনভ্রিনকে পরামর্শ দেয়, আমাদের পক্ষে কোন রিস্ক্ না নিয়ে এখনই সুভাষ বোসকে এ্যারেস্ট করা উচিত।

জবাবে একটু সময় চিন্তা করে জনভ্রিন বললে, এতে আর রিস্কের কি আছে? আমাদের চোখের সামনে থেকে তো তিনি উধাও হয়ে যেতে পারবেন না। দেখা যাক না তিনি কোথায় যান!

স্পেশাল ব্রাঞ্চের একনম্বর ডেপুটি কমিশনার জনভ্রিন। সামসুদ্দাহার দু'নম্বর। কাজেই একনম্বরের কথামত ওয়াচ সেক্সানের অফিসারদের কাছে নির্দেশ গেল—ফলো সুভাষ এ্যাণ্ড ইনফর্ম—সুভাষকে অনুসরণ করো এবং তাঁর খবর দাও।

কয়েকজন অনুচর নিয়ে সুভাষ দক্ষিণ কলকাতা থেকে চলেছেন উত্তরের দিকে। তাঁর গাড়িকে অনুসরণ করে চলেছে এস. বি. অফিসের দু'খানা পুলিশ গাড়ি। দেখতে হবে কি উদ্দেশ্যে সুভাষ কোথায় যান।

চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে বেণ্টিংক স্ট্রীট ধরে চিৎপুরের ট্রামলাইন বরাবর চলতে থাকে সুভাষের গাড়ি। তাঁকে অনুসরণ করতে করতে ভাবতে থাকে এস বি-র অফিসারেরা, এদিকে কোথায় চলেছেন সুভাষ? এ তল্লাটে তো তেমন কোন বড় পলিটিক্যাল সাস্পেক্ট থাকে বলে তাদের জানা নেই। তবে কার সঙ্গে পরামর্শ করতে চলেছেন তিনি?

না, কোন রাজনৈতিক নেতা নন, এমন কি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীও নয়। একজন অসাধারণ প্রতিভাধরের বড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় সুভাষের গাড়ি। অনুচরদের গাড়ির মধ্যে বসিয়ে রেখে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করেন সুভাষ। শান্তিনিকেতন থেকে এসেছেন গুরুদেব। সুভাষ তাঁরই দর্শনপ্রার্থী।

এস. বি. অফিসে খবর আসে ওয়াচ সেক্সানের অফিসারদের কাছ থেকে—রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে এসেছেন সুভাষ। সেই সঙ্গে আগামী দিনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার আগে সম্ভবত গুরুদেবের আশীর্বাদ নিতেও এসেছেন।

বাস্তবিকই তাই। ব্রিটিশ-সিংহের সাথে সংগ্রামের শুরুতে সুভাষ গুরুদেবের আশীর্বাদপ্রার্থী হয়েই এসেছেন। ব্রিটিশের দেওয়া কলঙ্কের বোঝা বাঙালী-জীবনের ওপর থেকে সরিয়ে নেবার সংগ্রামে সুভাষের প্রয়োজন এমন একজন মানুষের আশীর্বাদ যিনি নাকি কেবল মনে-প্রাণেই বাঙালী নন, বাঙালী তথা বিশ্বমানবের কল্যাণের কথাই যাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তেমন একজন মানুষ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে হতে পারেন?

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে সুভাষ চলে এলেন তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে। গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলে, তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে মনটা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর। কানের কাছে যেন অহরহ বেজে চলেছে

গুরুদেবের উচ্চারিত সেই অভয়মন্ত্র - ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।

যথারীতি খবর চলে গেল এস. বি অফিসে সুভাষ রিটার্ণড ব্যাক্ টু হিজ রেসিডেন্স।

ফোর্স এসে গেছে লালবাজার থেকে। তেমন কোন বিরাট বাহিনী নয়। সামান্য কয়েকজন লাঠিধারী কনস্টেবল। তাদের নেতৃত্বে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। এই ফোর্স নিয়েই এস. বি.-র ডি. সি. জনব্রিন সুভাষকে এ্যারেস্ট করতে রওনা হল তাঁর এলগিন রোডের বাড়ির দিকে।

আজ আর অন্ধকারের মধ্যে নেই সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম। আজ সে জানে ফোর্স নিয়ে সে কোথায় চলেছে। সুভাষ বোস—বাঙালী জনমানসে এই নামটির শক্তি ম্যাল্‌কমের মত ফিরিঙ্গী সার্জেণ্টেরও আজ আর অজানা নেই।

সেই ঊনিশনো আঠাশ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে ম্যাল্‌কম একবার দেখেছিল সুভাষকে। মিলিটারী পোশাক পরা সেই 'গক' সুভাষ বোস। তাঁর সেই তেজোদ্দীপ্ত চেহারার ভঙ্গিমাটি আজও যেন ম্যাল্‌কমের চোখের সামনে স্পষ্ট। তারপর দীর্ঘ একটি যুগ কেটে গেছে। এই বারোটি বছরে কতই না রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে এ দেশে। সুভাষ আজ আর কেবল বাঙালী সুভাষ নয়, সারা ভারতের সুভাষ। বজ্রের মত কঠোর অথচ কুসুমের মত কোমল স্বভাবের আপসহীন সংগ্রামী সুভাষের নাম আজ প্রতিটি ভারতবাসীর মুখে।

সেই সুভাষকে আজ এ্যারেস্ট করতে চলেছে ডি. সি জনব্রিন স্বয়ং। সঙ্গে ফোর্স নিয়ে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। পুলিশ-ভ্যানের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে বসে আছে ম্যাল্‌কম। দীর্ঘ বারো বছর পরে আজ আবার চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পাবে সেই সুভাষকে।

সুভাষের বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসে দাঁড়াল পুলিশ-ভ্যান। জনব্রিনের গাড়িটাও এসে দাঁড়াল সেখানে। সাধারণ পোশাক পরা ডি. সি. জনব্রিন এস. বি -র কয়েকজন অফিসারসহ পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। সঙ্গে একমাত্র পুলিশের পোশাক পরা অফিসার—সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি চাকর শ্রেণীর লোক বেরিয়ে আসতেই এস. বি.-র একজন ইন্সপেক্টর দু-পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, মিঃ বোস বাড়িতে আছেন ?

আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে ভুরুজোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে চাকরটির। নিরুৎসাহ কণ্ঠে সে পাল্টা প্রশ্ন করে, কোন্ বাবুর কথা বলছেন ?

- সুভাষবাবু, সুভাষ বোস বাড়িতে আছেন ?

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে চাকরটি মাথা নেড়ে সায় দেয়।

— তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করতে এসেছি।

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম ও বিলিতি জনব্রিনের দিকে একবার সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে চাকরটি জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন ?

ইন্সপেক্টর একবার জনব্রিনের দিকে তাকায়। তার চোখের তারায় মৌন সম্মতির লক্ষ্মণ দেখে সে জবাব দেয়, তাঁকে গিয়ে বলো যে, লালবাজার থেকে পুলিশ এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

অখুশি কণ্ঠে চাকরটি এবার বলে ওঠে, ও—বুঝেছি। দাদাবাবুকে বুঝি ধরে নিয়ে যেতে এসেছেন আপনারা? তা, ভেতরে এসে বসুন। আমি দাদাবাবুকে ডেকে দিচ্ছি।

—না-না, বসব না আমরা। এখানেই অপেক্ষা করছি। তুমি তাঁকে গিয়ে আমাদের কথা বলো।

—তা না হয় বলছি। কিন্তু আপনারা যে দাঁড়িয়ে থাকবেন তা হবে না। ভেতরে এসে বসুন। কেউ এসে দাঁড়িয়ে থাকলে বাবুরা বকবেন।

—না, বকবেন না। আমরা এখানেই আছি। তুমি একবার তাঁকে ডাকো।

ডাকতে হল না। হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন সুভাষ। জনব্রিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও বেচারার দোষ নেই। এ বাড়ির এই হুকুম। পুলিশ এলেও তাদের বসতে হবে। এমনকি এ্যারেস্ট করতে এলেও।

সুভাষের কথার ধরনে একটু থতমত খায় জনব্রিন। সামান্য অপ্রতিভ হেসে বললে, আপনি কি জানতেন যে আপনাকে আমরা এ্যারেস্ট করব?

তেমনি স্মিত হেসে জবাব দেন সুভাষ, হ্যাঁ, তেমন অনুমানই করেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, আপনারা আমাকে বাইরে রাখবেন না।

—একজ্যাক্টলি সো। বলেই জনব্রিন একটু এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানা বের করে সুভাষের চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট, মিঃ বোস।

ভাবলেশহীন মুখে সুভাষ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন জনব্রিনের দিকে। তারপর একটু ম্লান হেসে বললেন, একটু ওয়েট করুন, আমার মাকে প্রণাম করে আসি।

বীর পুত্রের বীর মাতা। প্রভাবতী দেবী একফোঁটা চোখের জল ফেললেন না। প্রিয়পুত্রের চিবুক স্পর্শ করে সামান্য একটু হেসে কেবল বললেন, এসো বাবা। মনে মনে হয়তো আরও বললেন তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক্।

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সুভাষকে। দীর্ঘ বারো বছর আগের সুভাষের সঙ্গে এই সুভাষের যেন কত তফাত। সেদিন মিলিটারী ইউনিফর্মের আড়ালে ছিল এক ক্ষাত্রতেজোদ্দীপ্ত মূর্তি, আর আজ কেমন যেন শান্ত সৌম্য—আপনাতে আপনি সমাহিত অন্য এক সুভাষ। ক্ষাত্রতেজের বদলে বৈরাগ্যদীপ্ত।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম বঙ্কিমের আনন্দমঠ পড়ে নি। পড়লে হয়তো বুঝতে পারত বঙ্কিম এমনি একটি মূর্তি কল্পনা করেই সম্ভবত সত্যানন্দকে সৃষ্টি করেছিলেন। তেজ ও বৈরাগ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়।

সুভাষকে নিয়ে ডি. সি. জনব্রিন গাড়ির কাছে আসতেই ম্যাল্‌কম দৌড়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে এ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। সুভাষকে আগে গাড়িতে তুলে দিয়ে জনব্রিন তার পাশে এসে বসে। গাড়ির পাশে এ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে একটু মাথা দোলায় জনব্রিন। সে ভেবেছিল ম্যালকম ঐভাবে দাঁড়িয়ে বোধহয় তাকেই সম্মান দেখাচ্ছে। কিন্তু

সেই মুহূর্তে একমাত্র ম্যাল্কমের অন্তর্যামীই জানতেন কার উদ্দেশ্যে তার ঐ এ্যাটেনশন ভঙ্গি।

গাড়ি এলো লালবাজারে। সেখান থেকে আদালতের এলাকা ঘুরে সোজা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল।

শহর কলকাতায় আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল সুভাষের গ্রেপ্তারের খবর। পরের দিন খবরটা ফলাও করে প্রকাশ করল দেশীয় সংবাদপত্রগুলো হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ অভিযানের প্রধান নেতা সুভাষকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে চায় ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু বাংলার যুবশক্তি কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করবে না ব্রিটিশ সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতা। এর উপযুক্ত জবাব দিতে তারা প্রস্তুত। আগুন জ্বলবে সারা দেশে।

নিশ্বাস ফেলার অবসর নেই পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদারের। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মেজাজ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এর ধাক্কা সহ্য করতে হবে তাকেই। সুভাষ বোসকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলনের গতিরোধ করতে পুলিশ সমর্থ হলেও আন্দোলনকে একেবারে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি। শহরের এখানে-ওখানে, পার্কে-ময়দানে শুরু হল মিটিং—ব্রিটিশ দমন-নীতির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

পুলিশ-কর্তাদের ঘন ঘন বৈঠক শুরু হল লালবাজারে। ফেয়ারওয়েদার কখনও ছুটছে চীফ কিংবা হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে, কখনও বা খোদ রাজভবনে গভর্ণরের কাছে।

অবশেষে ঠিক হল গোটা শহর জুড়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হবে। হলও তাই। সি. পি. ফেয়ারওয়েদারের আদেশে শহর জুড়ে জারি হল একশো চুয়াল্লিশ ধারা। পাঁচজনের বেশি লোক শহরের কোথাও একত্রে জমায়েত হতে পারবে না।

লালবাজারে সি. পি. র কক্ষে ফাইলপত্রের মধ্যে ডুবে আছে ফেয়ারওয়েদার। হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন।

হাতের কলম নামিয়ে রিসিভার তুলে ফেয়ারওয়েদার বললে—হ্যালো!

ওপাশ থেকে ভেসে ওঠে কণ্ঠস্বর, আমি সামসুদ্দাহার বলছি, স্যার। এইমাত্র খবর এল ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা আজ মিটিং করবে।

—ছাত্রদের মুড্ কি রকম? ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠতে পারে?

—ছাত্রদের ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না, স্যার। ওরা জোর করে মিটিং করবে। বাধা পেলে ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠতে পারে।

—দ্যাটস্ রাইট। বলেই ফেয়ারওয়েদার রিসিভার নামিয়ে রেখে পাশের ঘর থেকে ডেকে পাঠায় ডি. সি., ডি. ডি. ও ডি. সি., হেড কোয়ার্টারকে।

তারা ঘরে ঢুকতেই ফেয়ারওয়েদার বললে, ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা কলেজ-প্রাঙ্গণে জোর করে মিটিং করতে চায়। উই মাস্ট স্টপ্ ইট। যে করেই হোক, মিটিং বন্ধ করতেই হবে। ফোর্স পাঠান। আপনারাও সঙ্গে থাকুন।

—ইয়েস স্যার।

—আর হ্যাঁ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফোর্স যেন এ্যাপ্লাই করা না হয়। স্টুডেণ্ট আন্‌রেস্ট যে-কোন মুহূর্তে খারাপ দিকে টার্ন নিতে পারে।

সাজ-সাজ রব পড়ে যায় লালবাজারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফোর্স বেরিয়ে যায় ইসলামিয়া কলেজের উদ্দেশে।

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমও ছিল ঐ দলে। কলেজ গেটের কাছে এসে দাঁড়ায় পুলিশ ভ্যান। লাঠি ও বন্দুকধারী সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী পুলিশ-ভ্যান থেকে নেমে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। কৌতূহলী জনতা ভিড় করে আশেপাশে।

কলেজ-প্রাঙ্গণে ছাত্রদের ভিড়। মিটিং করবেই তারা। একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে সুভাষের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাবে। বাঙালীর কলঙ্ক হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তারা নিরস্ত হবে না।

সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে নিজের ঘরে বিরস মুখে বসেছিলেন একজন ব্যক্তি। তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব। প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনিও কত অসহায় তা বোধহয় তিনি সেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছিলেন। শহরের পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। ছাত্রসমাজ ক্ষেপে ওঠার মুখে। তারা চায় হলওয়েল মনুমেণ্টের অপসারণ, আর সেই সঙ্গে সুভাষের মুক্তি। তাদের সেই দাবীকে একদিকে যেমন তিনি অযৌক্তিক বলতে পারেন না, তেমনি আবার সেই দাবী মেনে নেবার শক্তিও তাঁর নেই। ব্রিটিশ সরকারের পলিসির বাইরে যেতে পারেন না তিনি।

পুলিশের উপস্থিতি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সামান্য চাঞ্চল্য জাগায় মাত্র। তারা জানত, পুলিশ আসবে। শুধু আসবেই না, তাদের মিটিং ভেঙে দিতে চেষ্টার ত্রুটিও করবে না তারা।

ছাত্রনেতাদের পরিচালনায় ছাত্ররা তখনও শান্ত। পুলিশের উপস্থিতি উপেক্ষা করেই তারা দলে দলে জমায়েত হতে লাগল সভাস্থলে।

হেড কোয়ার্টারের ডেপুটি কমিশনার ইয়োরোপীয়ান আই. পি. অফিসার সদলে সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে, স্টপ্‌ দিস্‌ মিটিং —আই সে. স্টপ্‌ ইট্‌!

ডি সি.-র কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না কেউ। একজন ছাত্রনেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দেয়।

ডি. সি. আবার চিৎকার করে বলে ওঠে. আই সে, ইট ইজ এ্যান্‌ আন-ল'ফুল এসেম্‌ব্লি। প্লীজ ডিস্‌পার্স—আমি এই সমাবেশকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করছি। আপনারা চলে যান।

কে শোনে কার কথা? ডি. সি.-র কণ্ঠস্বরের সাথে সমতা রেখে বক্তৃতারত ছাত্রনেতার কণ্ঠস্বরও উঁচুতে উঠতে থাকে।

রাগে অপমানে ডি. সি-র লাল মুখখানা আরও লাল হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ফোর্সকে হুকুম দেয় চার্জ!

আরম্ভ হয় পুলিশী তাণ্ডব। বেতের মোটা লাঠি হাতে পুলিশ ফোর্স ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর। আক্রান্ত হয়ে ছাত্ররা ছুটোছুটি করতে থাকে এদিক-ওদিক। কারুর আঘাত লাগে মাথায়, কেউ বা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়

মাটিতে, তারই ওপর প্রচণ্ড জিঘাংসায় লাঠি চালাতে থাকে পাঞ্জাবী কনস্টেবল ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টরা।

সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমও পিছিয়ে নেই। লাঠি হাতে সে-ও তাড়িয়ে চলেছে ছাত্রদের। তার লাঠির আঘাতে একজন ছাত্রনেতা পড়ে যেতেই সে তাকে জামার কলার ধরে টেনে তুলে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে আসে পুলিশ-ভ্যানের দিকে। আর কোন ভুল নয়, কোনরকম অন্যমনস্কতাও নয়। এমনি এক ব্যাপারে একবার পানিশমেণ্ট পেতে হয়েছে তাকে। তেমন ভুল আর কখনও করবে না ম্যাল্‌কম। এমনকি তার সেদিনের সেই অন্যমনস্কতাকে রুমা বাঈজীও সমর্থন করে নি।

পুলিশী আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে রুখে দাঁড়ায় ছাত্ররা। পরমুহূর্তেই তারা প্রয়োগ করতে শুরু করে নিরস্ত্র জনতার চিরাচরিত অস্ত্র — থান ইট।

একদিকে পুলিশের লাঠি, অন্যদিকে ছাত্রদের থান ইট। হঠাৎ একখানা বড় থান ইটের টুকরো এসে পড়ে ম্যাল্‌কমের মাথায়। মাথার টুপি ভেদ করে সেই ইট ম্যাল্‌কমের মাথায় সৃষ্টি করে গভীর ক্ষত। মাথা বেয়ে নেমে আসে রক্তের ধারা। তার গায়ের সাদা ইউনিফর্ম লাল হয়ে ওঠে। মাথায় হাত চেপে সেখানেই বসে পড়ে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

শেষ হয় পুলিশী তাণ্ডব। লণ্ডভণ্ড সভাস্থল। চারিদিকে কেবল ছেঁড়া জুতো ও ইটের টুকরোর ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে চাপ চাপ রক্ত। নিরস্ত্র ছাত্র ও সশস্ত্র পুলিশের রক্ত একাকার হয়ে মিশে গেছে কলেজ-প্রাঙ্গণের মাটিতে। বিরাট একদল ছাত্রকে এ্যারেস্ট করে সভাস্থল ত্যাগ করে পুলিশবাহিনী। আহত ছাত্র ও পুলিশদের পাঠানো হয় হাসপাতালে।

গর্জে উঠল বাংলার ছাত্রসমাজ। সুভাষকে অন্যায়ভাবে আটক করেছে ব্রিটিশ সরকার। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে পুলিশ। এর প্রতিবিধান করতেই হবে।

ছাত্রসমাজের সমালোচনার লক্ষ্য হল এবার বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী। কেন তাঁরা পদত্যাগ করে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন না? কিসের মোহে এই জাতীয়-অপমান তাঁরা মুখে বুজে সহ্য করেছেন? দেশের সংবাদপত্রেও এই নিয়ে আরম্ভ হল তিক্ত সমালোচনা।

এবার প্রকাশ্য বিবৃতি নিয়ে হাজির হলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক। তিনি বললেন, আমরা সুভাষকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। আমরা সবাই তাঁর প্রতি অনুরক্ত।

কিন্তু এত সহজে শান্ত হতে পারে না বাংলার ছাত্র-সমাজ। তাদের দাবী, ঐ কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেণ্টের অপসারণ চাই। সেই সঙ্গে মুক্তি দিতে হবে সবাইকে। এর অন্যথা হলে সারা দেশে আগুন জ্বালবে তারা।

দায়ে পড়ে বোধহয় সুবুদ্ধি হল ব্রিটিশ সরকারের। ইয়োরোপের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বোধহয় আর দেশের মধ্যে জল বেশি করে ঘোলা করতে চাইল না। আবার বিবৃতি দিলেন হকসাহেব—হলওয়েল মনুমেণ্ট সরানো হবে। ধৃত

ছাত্রদেরও মুক্তি দেওয়া হবে।

আর সুভাষ ?

না, তাঁকে এখন ছাড়া হবে না। জেলেই থাকতে হবে তাঁকে।

কিন্তু কেন ? কি তাঁর অপরাধ ?

দুর্জনের ছলের অভাব নেই। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবী কোন অপরাধ নয়। কাজেই অন্য এক অপরাধে তাঁর বিচার হবে। সুভাষ 'হিসাব-নিকাশের দিন' নামে যে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেই অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিচার করবে।

অপসারিত হল বাঙালি জাতির কলঙ্ক হলওয়েল মনুমেণ্ট। মুক্তি পেল ছাত্ররা। আর, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডের একখানি শয্যায় আশ্রয় নিল গুরুতর আহত সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম।

ডালহৌসী স্কোয়ারের এক কোণে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম অন্যমনস্কভাবে নিজের মাথায় হাত দেয়। সেই ক্ষতচিহ্নটি আজও আছে মাথায়, কিন্তু সেদিনকার কাহিনীগুলো ক্রমে যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। চেষ্টা করেও সব কথা এখন আর মনে করতে পারে না। তবে হাসপাতালের শয্যায় একটি মাস বন্দী-জীবনের প্রতিটি কথাই তার মনে আছে এখনও।

মাথার ক্ষতস্থানে সেপটিক্ হয়েছিল তার। তা নিয়ে পুরো একটি মাস দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল তাকে।

ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের শয্যায় শুয়েও কিন্তু মনের সন্দেহ দূর হয় না ম্যাল্‌কমের। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা কি সত্যিই ইয়োরোপীয়ানদের সমপর্যায়ের মানুষ ? ভারতীয়দের চাইতে ঐ ইয়োরোপীয়ানরাই কি তাদের নিকট-আত্মীয় ? এদেশের মাটির সঙ্গে কি কোনই যোগ নেই তাদের—

অখণ্ড অবসর হাসপাতালে। চমৎকার চিকিৎসার ব্যবস্থা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে লাগামহীন চিন্তায় ডুবে থাকে ম্যাল্‌কম। বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে লালবাজার থেকে দু' একজন বন্ধু-বান্ধব দেখতে আসে তাকে। আর প্রতিদিন বাস্কেট-ভর্তি ফল ও খাবার নিয়ে এসে হাজির হয় মেরিয়া। অনুযোগ করে ম্যাল্‌কম, এত ফলের দরকার কি, মেরি ? হাসপাতাল থেকে যে খাবার দেয় তাই তো শেষ করতে পারি না।

মেরিয়া কোন জবাব না দিয়ে স্বামীর গায়ে-মাথায় কেবল হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ম্যাল্‌কম আবার বলে, কাল থেকে তুমি আর কিছু এনো না, মেরী। শুধু শুধু পয়সা খরচ করে কি লাভ ? সরকারী পয়সাতেই যখন এত কিছু পাওয়া যাচ্ছে তখন আর পয়সা খরচ করা কেন ?

মেরিয়া ম্যাল্‌কমের আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে স্বামীর মুখের দিকে ছল্‌ছল্ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, আমার নিয়ে আসা খাবার কি ভাল নয়, জনি ?

ম্যাল্‌কম তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না—না মেরি। তোমার খাবারের সঙ্গে হাসপাতালের খাবারের তুলনাই হয় না, তা সে যত দামীই হোক না কেন। তোমার খাবারের স্বাদই আলাদা। কিন্তু আমি বলছিলাম, শুধু শুধু—

ম্যাল্‌কমকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে মেরিয়া, বল তো এর কারণ কি?

জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকে ম্যাল্‌কম। মেরিয়া তেমনি মৃদুকণ্ঠে আবার বলতে থাকে, হাসপাতালের দামী খাবারের সঙ্গে মিশে থাকে কর্তব্যের বোঝা। মনের উত্তাপ তো এতে থাকে না, জনি।

একদিন ম্যাল্‌কম মেরিয়াকে বললে, জানো মেরি, আমি মাঝে মাঝে ভাবি, যে ছাত্রটি সেদিন আমাকে ইট মেরে ঘায়েল করেছিল তার সত্যি সত্যি কোন অন্যায় হয়েছিল কিনা।

—এসব বাজে কথা কেন ভাবতে যাও তুমি? শাসনের সুরে বলে ওঠে মেরিয়া, তোমাকে আহত করে সে নির্ঘাৎ অন্যায় করেছে।

—আমিও তো তাদের লাঠি-চার্জ করে আহত করেছি।

— তুমি কেবল তোমার কর্তব্য করেছ।

মৃদু হেসে ম্যাল্‌কম বললে, আত্মরক্ষা করাও তো মানুষের কর্তব্য।

—কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সরকারী কর্মচারীর গায়ে হাত তোলা কেবল অন্যায়ই নয়, সম্পূর্ণ বে-আইনী কাজ। এ কাজের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। তোমাদের সি. পি. লোকটি নেহাত ভালমানুষ। আমি যদি সি. পি. হতাম তাহলে সেদিন গোটা কলেজে আগুন জ্বালিয়ে দিতাম।

কথাটা বলেই মনের উষ্মা চেপে রাখতে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে মেরিয়া।

ম্লান হেসে ম্যাল্‌কম ঠাট্টার সুরে বললে, ভাগ্যিস তুমি সি. পি. হও নি! তাহলে কি যে হত—

মেরিয়া আর কোন জবাব দেয় না। স্বামীর এমন গুরুতর আহত হওয়ার ব্যাপারটাকে কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারে না সে। এদেশের মানুষের ওপর কোনকালেই সে সদয় নয়। স্বদেশী আন্দোলন, বিশেষ করে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড চিরকালই তার কাছে তিক্ত। তার কেবলই মনে হত এদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে তাড়াবার ক্ষমতা তাদের কোনদিনই হবে না। সে অধিকারও তাদের নেই। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে সাদা মানুষেরা এসেই এদেশের কালো মানুষগুলোকে শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে সভ্য করে তুলেছে। কাজেই সাদা মানুষের ওপর তাদের বরঞ্চ কৃতজ্ঞ থাকাই উচিৎ।

আসলে মেরিয়ার এই কট্টর ব্রিটিশ-পন্থী মনোভাবের পেছনে কাজ করছিল ইযোরোপীয়ানদের সঙ্গে তার নিজের একাত্মবোধ। ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে যে এদেশের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের কোন সম্পর্ক নেই, একথাটা ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে। কাজেই এদেশে বাস করেও তাদের সমাজের অনেকের মতই মেরিয়ার মনটাও পড়ে থাকত বিলেত নামে দেশটার দিকে, যে দেশের মাটির চেহারা সে কোনদিন না দেখলেও তার সম্পর্কে জানতে কিছু বাকি

ছিল না তার।

মেরিয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাল্‌কম তেমনি হাল্কা সুরে বললে, এদেশের মানুষকে কোনকালেই নিজের লোক বলে ভাবতে পারলে না তুমি—

—কেন ভাবব? সহসা মুখ ঘুরিয়ে বলে ওঠে মেরিয়া, যা সত্যি নয় তা বিশ্বাস করতে যাব কোন্ দুঃখে?

—আচ্ছা মেরি, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করে যে, বিলেতের মানুষের সঙ্গেই আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক?

— শুধু বিশ্বাস নয়, এটাই খাঁটি কথা।

—ওরাও কি আমাদের আপন ভাবে বলে তোমার ধারণা?

- নিশ্চয়ই। একশোবার। নইলে হাসপাতালের এই ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে তোমার জায়গা হল কেমন করে? এখানে তো ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ।

অকাট্য যুক্তি। এই যুক্তির ওপর আর কোন কথা বলা চলে না। তা ছাড়া কিছু বলে আর লাভও নেই। মেরিয়ার মনোভাব পাল্টাবার ক্ষমতা ম্যাল্‌কমের নেই। তা ছাড়া সে নিজেও তো আজও সন্দেহের দোলায় দুলছে।

তবে কি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মনীষী হেনরি ডিরোজিওর মতাদর্শ ভুল? তবে কি এই দেশকে স্বদেশ জ্ঞান করে তাঁর বিখ্যাত 'ফকির অফ জাংঘিরা' খণ্ড-কাব্যের প্রথমে মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষের বন্দনা-গীতি একেবারে মূল্যহীন? তবে কি কবি ডিরোজিওকে সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার পদ থেকে বিতাড়িত হয়ে? এমনিভাবেই কি তিনি এদেশটাকে ভালবাসার পুরস্কার পেয়েছিলেন?

কিন্তু ইতিহাস সে কথা বলে না। সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর জনক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সেদিন তাঁর ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যুক্তির অস্ত্র, যা দিয়ে তাঁরা হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্মের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মূলে আঘাত করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাতেই ক্ষেপে উঠেছিলেন পুরাতনপন্থীরা। তাই সেদিন তাঁরা প্রত্যাঘাত করেছিলেন এই তরুণ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনীষীকে। কিন্তু তবুও নিজের বিশ্বাস থেকে কোনদিন একচুলও সরে আসেন নি তিনি। কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে যাঁর জন্ম, মৃত্যুর পরে সেই ডিরোজিও শেষ শয্যাও গ্রহণ করেছিলেন তাঁর স্বদেশ এই কলকাতার-ই মাটিতে।

মনীষী ডিরোজিওর জীবনেতিহাসের কিছু কিছু কথা জানা ছিল সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের। ছেলেবেলায় নিজের মার কাছে সে শুনেছিল তাঁর জীবন-কথা। তাই মাঝে মাঝে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম সেই মনীষীর আদর্শের পাথরে ধার দিয়ে নিতে চেষ্টা করত নিজের যুক্তিকে। কিন্তু তবুও কেন যেন মনের সন্দেহের কাঁটাটিকে কিছুতেই একেবারে দূর করতে পারত না।

হাসপাতালের বিছানায় অখণ্ড অবসরের মধ্যে এমনি ধরনের নানা চিন্তায় মাঝে-মধ্যে ডুবে থাকত ম্যাল্‌কম। আর সেই চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই উঁকিঝুঁকি দিত একখানা মুখ—রুমা - রুমা বাঈজী। তবে কি তার এমনি

মনোভাবকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ঐ মেয়েটিই দায়ী?

কিন্তু রুমা তো কোনদিন এ নিয়ে তেমন কোন আলোচনা করত না ম্যাল্‌কমের সঙ্গে। সে তো নিজেকে বরাবরই শামুকের মত গুটিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত। তবে কি বাঙ্গালী রুমার অখণ্ড ভারতীয় সত্তাকে ভালবেসেছিল বলেই ম্যাল্‌কমের জীবনের এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা? কে এর জবাব দেবে?

হাসপাতালে অনেকেই দেখতে আসে ম্যাল্‌কমকে। আসে না কেবল একজন—রুমা। ম্যাল্‌কম মনে মনে ভাবে, তার এখানে না আসাই ভাল। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্সে মেরিয়ার উপস্থিতিতে রুমার এখানে আগমন একমাত্র তাকেই বিপাকে ফেলবে। দি ক্যাট্‌ উইল বি আউট্‌ অফ দি ব্যাগ। তার চাইতে এই ভাল। দূরের রুমা দূরেই থাকুক। মিথ্যার আবরণ দিয়ে সত্যকে ঢাকতে চেষ্টা করার মত বিড়ম্বনা সংসারের বোধহয় আর কিছু নেই।

## দশ

শহর কলকাতার রাজনৈতিক অশান্তি একেবারেই ভাল লাগে না মেরিয়ার। এদেশের মানুষের এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ঔদ্ধত্য বলেই মনে হয় তার। সে যেন এখনও সেই পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার সেই কলকাতায় থাকতে চায়, যে কালে এদেশের মানুষেরা সাদা চামড়ার মানুষমাত্রকেই শ্রদ্ধাভক্তি করত, সমীহ করে চলত। নিজের চোখে না দেখলেও সে সব দিনের কাহিনী মেরিয়া বইতে পড়েছে। পড়তে পড়তে সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। মনে মনে বলেছে, না, সেদিন আর ফিরে আসবার নয়! একালের মানুষগুলোর ভয়-ডর বলে যেন কিছু নেই, নইলে শক্তিমান ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে চায়? আর গভর্ণমেণ্টও হয়েছে তেমনি। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের আশকারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে ফেলেছে। সব কাজেই কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব সরকারের। এমনিভাবে চললে কি রাজ্যপাট বজায় রাখা যায়?

সেদিন হাসপাতালে এসে মেরিয়া হাসিমুখে ম্যাল্‌কমকে বললে, জানো, মার্গারেটের চিঠি পেয়েছি আজ। চিঠিটা প্রায় দেড়মাস আগে লেখা।

—তাই নাকি? লণ্ডন থেকে কলকাতায় আসতে চিঠিটার দেড়মাস লাগল? ম্যাল্‌কম বললে।

—বারে, তা আর লাগবে না? চিঠিটা যে এসেছে এই তো কত ভাগ্যি। এর আগে দু-দুটো চিঠির তো কোন খোঁজই নেই!

—তা বটে। ইয়োরোপে যে লড়াই চলছে তাতে সাধারণ চিঠিপত্রের যাতায়াত তো প্রায় বন্ধই হতে বসেছে। তা, চিঠিতে মার্গারেট লিখেছে কি?

মার্গারেট মেরিয়ার বান্ধবী। আগে ওরা কলকাতাতেই থাকত। যুদ্ধের প্রথমদিকে স্বামীর সঙ্গে সে লণ্ডনে যায়। সেই থেকে লণ্ডনেরই বাসিন্দা ওরা। একটা ভাল ফার্মে চাকরি করে ওর স্বামী। মার্গারেট নিজেও নাকি একটা ডিপার্টমেণ্টাল শপে চাকরি করে। স্বামী-স্ত্রীর আয়ে লণ্ডনে ওরা বেশ

ভালই আছে।

ম্যাল্কমের কথার জবাবে মেরিয়া বললে, ছোট্ট চিঠি। বেশি কিছু লিখতে পারে নি মার্গারেট। এমনি, যুদ্ধের টুকিটাকি কথা লিখেছে। আর লিখেছে যুদ্ধের দরুণ নাকি সেখানে অনেক জিনিসপত্রই পাওয়া যায় না। গোটা দেশ নাকি যুদ্ধের রসদ জোগাতে ব্যস্ত। জার্মান বোমার ভয় থাকলেও ওরা নাকি বেশ ভালই আছে।

একটু থেমে মেরিয়া আবার বলতে থাকে, মার্গারেট আরও লিখেছে যে, ওদেশের অধিকাংশ লোকই যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে বলে দেশের মধ্যে কাজ কর্ম চালাবার মত মানুষের নাকি দারুণ অভাব। তাই এখন ওদেশে প্রচুর চাকরি পাওয়া যায়। মার্গারেট লিখেছে যে, এই সময় যদি তুমি ও আমি ওদেশে যেতে পারতাম তাহলে নাকি আমাদের আর চাকরির চিন্তা করতে হত না।

হাসপাতালের বেডে স্থির হয়ে শুয়ে মেরিয়ার কথা শুনছিল ম্যাল্কম। কোন জবাব দিচ্ছিল না।

মেরিয়া আবার বললে, ও কি, কিছু বলছ না যে?

—কি আর বলব? মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় ম্যাল্কম।

—মার্গারেটের কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না না, এতে অবিশ্বাসের কি আছে? হয়তো সত্যিই এখন বিলেতে চাকরির ছড়াছড়ি। যুদ্ধ বলে কথা। এমন একটা বিশ্বযুদ্ধেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষকে তার সামিল হতে হয়েছে। কাজেই দেশের মধ্যে কাজকর্ম চালু রাখতে লোকের অভাব তো হতেই পারে।

ম্যাল্কম থামে। মেরিয়াও চুপ করে থাকে। কিন্তু মেরিয়ার মনের কথা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না ম্যাল্কমের। এর আগেও দু-একবার মার্গারেটের চিঠি নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। মার্গারেটের একান্ত ইচ্ছে মেরিয়া ও ম্যাল্কম এদেশের পাততাড়ি গুটিয়ে তাদের মত লণ্ডন চলে যায়। সেখানে নাকি তাদের চাকরির কোন অভাবই হবে না। উৎসাহিত মেরিয়া স্বামীকে রাজী করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু রাজী হয় নি ম্যাল্কম। বলেছে, দেশের এই পরিস্থিতিতে পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিলে ভেবেছ নাকি গভর্ণমেণ্ট আমাদের বিলেত যাবার পাসপোর্ট মঞ্জুর করবে? মোটেই তা নয়। কাজেই ওসব কথা এখন নয়। যুদ্ধ থামুক। সব শান্ত হোক। তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে।

মেরিয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাল্কম বললে, ওসব কথা ভেবে এখন কি লাভ, মেরি?

—আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো জনি, তোমার এদেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না, তাই না?

একটু আমতা আমতা করে জবাব দেয় ম্যাল্কম, না, ঠিক তা নয়। তবে—

—জানি, জানি। তোমার মনের কথা জানতে কি এখনও বাকি আছে আমার? কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য, এ পোড়াদেশে এমন কি আছে যে, এদেশ ছেড়ে লণ্ডনের মত জায়গায় তোমার যেতে ইচ্ছে করছে না? এদেশে আবার মানুষ

থাকে নাকি ? নেহাত উপায় নেই, তাই আছি। নইলে কবে চলে যেতাম। এদেশে থাকার মধ্যে তো কেবল ঐ কংগ্রেসীদের চিৎকার-চেঁচামেচি আর মিটিং-প্রসেশন। মাঝে মাঝে আবার সন্ত্রাসবাদী ছোকরাগুলোর কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ-কর্ম। এ ছাড়া আর আছে কি বলো তো ? তবে যদি—

মেরিয়াকে বাধা দিয়ে ম্যাল্‌কম বলে ওঠে, না মেরিয়া। এদেশে থাকার মধ্যে সত্যিই তেমন কোন আকর্ষণ নেই আমার। এই শহর কলকাতার চাইতে লণ্ডন শত-সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধ না থামলে তো যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া—

—তাছাড়া কি ?

—না, তেমন কিছু নয়। তবে এখানকার এই পাকা সরকারী চাকরি ছেড়ে—

—দেখ, মার্গারেট আমার ছেলেবেলার বান্ধবী। আমাদের অসুবিধে হোক তা সে কখনও চাইতে পারে না। সে যখন বারে বারে ওদেশে যেতে লিখেছে তখন মনে কোর না সে আমাদের বিপদে ফেলতে চাইছে। আমার স্থির বিশ্বাস এখানে পুলিশে চাকরি করে যে সুখে তুমি আছ তার চাইতে অনেক বেশি সুখে থাকবে লণ্ডনে। তবে এই সময় এই যুদ্ধের মধ্যে তোমাকে যেতে বলছি না। যুদ্ধ থামলে কিন্তু একটি দিনও আর দেরি করতে আমি রাজী হব না -- এই তোমাকে বলে রাখলাম।

—বেশ তো, যুদ্ধ আগে থামুক। জার্মানরা আগে কাবু হোক, তারপর না হয় চিন্তা করা যাবে।

—কিন্তু তখন যদি ভাল চাকরি না জোটে ? চিন্তিত সুরে মেরিয়া বললে।

মৃদু হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, তা হতেই পারে না। যুদ্ধের পর ওদেশে চাকরির সুযোগ আরও বেড়ে যাবে। এত বড় বিশ্বযুদ্ধে কি কম লোক-ক্ষয় হবে ভেবেছ ?

—তেমনি আবার যুদ্ধ থেকে যারা ফিরে আসবে তাদেরও তো চাকরি দিতে হবে।

—হ্যাঁ, তা হবে। তবে তোমার বান্ধবী যখন সেখানে আছে তখন আমার চাকরি পেতে বোধহয় তেমন অসুবিধে হবে না।

একটু সময় চুপ করে থাকে মেরিয়া। একজন ইয়োরোপীয় নার্স এসে এই সময় ম্যাল্‌কমকে ওষুধ খাইয়ে যায়। নার্সটি চলে যেতেই মেরিয়া আবার বলে ওঠে, বিশ্বাস করো জনি চোখে না দেখলেও বিলেতের কথা মনে পড়লেই লণ্ডন শহরটার ছবি স্পষ্ট আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হাউ ওয়াণ্ডারফুল—হাউ লাভলি ওই লণ্ডন ! মার্গারেট বলে, পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ শহরের বাসিন্দা হওয়া নাকি যে-কোন মানুষের পক্ষেই একটা গর্বের বস্তু। আমারও তাই মনে হয়। লণ্ডনের কথা মনে পড়লে এই নোংরা শহর কলকাতায় আর এক মুহূর্তও আমার থাকতে ইচ্ছে করে না।

হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্স বিকেল চারটে থেকে ছ'টা। হাসপাতালের ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ড। ঘড়ি ধরে এখানকার কাজকর্ম চলে। মেরিয়া প্রায়

রোজই ঠিক ঐ চারটেয় আসে, আর ফিরে যায় ছ'টায়। এই দ্বটি ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা তারা কেউই ব্ঝতে পারে না। আরও কিছ্ক্ষণ স্বামীর কাছে থাকতে ইচ্ছে করে মেরিয়ার, কিন্তু উপায় নেই। ছ'টার পর আর এক মিনিটও এখানে থাকার হ্কুম নেই।

সেদিন ঘড়িতে পাঁচটা বাজতেই মেরিয়া বললে, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। ডি'সিলভা পরিবারের সবাই আজ ছ'টা নাগাদ একটা পার্টিতে যাবে।

—ও, তাই নাকি? ম্যাল্কম বললে, তাহলে আর দেরি করো না। তুমি বাইরে গেলে ওরাই তোমার ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখে। আজ যখন ওরা বাইরে যাচ্ছে, তখন তোমার একটু তাড়াতাড়িই ফেরা উচিত।

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। আচ্ছা জনি, তোমাকে কি আমি ফলের রস করে দিয়ে যাব?

—কোন দরকার নেই। এত তাড়াতাড়ি আমি ফলের রস খাব না। এখানকার এ্যাটেণ্ডেণ্টই তা সময়মত করে দিতে পারবে।

—তা হলে আমি এবার উঠি, ডার্লিং?

ম্যাল্কম কোন জবাব না দিয়ে এমনভাবে একটু দ্বষ্টুমির হাসি হাসে যার অর্থ একমাত্র মেরিয়া ছাড়া আর কেউ ব্ঝতে পারে না।

ম্যাল্কমের ম্খের দিকে তাকিয়ে মেরিয়া কৃত্রিম রাগের স্বরে বলে ওঠে, ইউ নটি বয়, রোজ রোজ এমন বে-আইনী কাজ? নার্স যদি এসে পড়ে?

—প্লীজ মেরি, প্লীজ! অন্নয়ের স্বরে বলে ওঠে ম্যাল্কম।

মেরিয়া একবার ঘাড় ফিরিয়ে কেবিনের দরজার দিকে তাকায়। পরম্হূর্তে মাথা নিচু করে ম্যাল্কমের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে একটা চুম্ব খেয়েই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদ্ব হেসে বললে, রোগীকে চুম্ব খেতে দেখলে আমার এখানে আসাই বন্ধ করে দেবে, ব্ঝলে?

পরিতৃপ্ত ম্যাল্কমও হাসিম্খে জবাব দেয়, হ্ঁঃ, বন্ধ করে দিলেই হল!

মেরিয়া চলে যায়। বিছানায় শ্বয়ে ম্যাল্কম মেরিয়ার কথাগ্বলোই মনে মনে পর্যালোচনা করতে থাকে। মেরিয়াকে দোষ দেওয়া যায় না। ছেলেবেলা থেকেই ওর মনটা যেমনভাবে তৈরী হয়েছে ওর বর্তমান আচরণও ঠিক তেমনি। বিলেতের নামে ও পাগল হয়ে ওঠে। ওর মতে বিলেত দেশটা নাকি একটা সোনার দেশ। তবে সেই সোনা কোন্ দেশ থেকে আমদানি করা হয় তা সে জানতে চায় না।

কিন্তু সত্যিই কি ঐ দেশটা সোনার দেশ? হতে পারে সত্যি। কিন্তু কথাটা ভাবতে তেমন কোন উৎসাহ বোধ করে না ম্যাল্কম। মেরিয়াকে ম্খে যাই বল্বক না কেন, কলকাতা ছেড়ে লণ্ডন চলে যাবার কল্পনায় তেমন একটা মনের সায় পায় না সে। যতই নোংরা হোক, যতই খারাপ হোক, এই শহরটা কেমন যেন মায়াময়। শত অস্ববিধে সত্ত্বেও কলকাতার সঙ্গে একটা আশ্চর্য সম্পর্ক অন্বভব করে ম্যাল্কম। এক দ্বর্নিবার আকর্ষণ যেন তাকে টেনে রাখতে চায় এই শহরটার ব্বকে। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ? তবে কি সে এই শহরে

জন্মেছে বলেই এই আকর্ষণ অনুভব করে? তবে কি তার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের এতগুলো বছর এখানে কাটিয়েছে বলেই এই আকর্ষণ? হয়তো তাই। হয়তো বা অন্য কিছু।

সহসা ঘরের মধ্যে যে মানুষটি এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে চমকে না উঠে পারে না ম্যাল্‌কম। রুমা—রুমা বাঈজী এখানে এল কেমন করে?

রুমা কিন্তু কপালের ঘোমটা ঈষৎ পেছনে ঠেলে দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ম্যাল্‌কমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই মুহূর্তে তার আয়ত চোখ দুটির ভাষাই যেন ম্যাল্‌কমের কাছে ব্যক্ত করেছিল তার মনের কথা।

—এসো। ইশারায় রুমাকে কাছে ডাকে ম্যাল্‌কম। এখানকার পরিবেশে অনভিপ্রেত রুমাকে দেখে মনটা উল্লসিত হয়ে উঠলেও মনে মনে সে ভাবতে থাকে, ভাগ্যিস মেরিয়া আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে গেছে। নইলে তার কাছে জবাবদিহির অন্ত থাকত না তার।

ধীরপায়ে এগিয়ে যায় রুমা। ম্যাল্‌কমের খাটের পাশে একখানা টুলে বসতে বসতে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন আছ, সাহেব?

—ভালই আছি। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ছাড়া পাব। তা তুমি এখানকার খবর পেলে কেমন করে?

—ইচ্ছে থাকলে খবর পেতে অসুবিধে কি?

—ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে ঢুকতে কোন অসুবিধে হয় নি?

—অসুবিধে হবে কেন? সোজা মিছে কথা বললাম। বললাম যে, লালবাজারের সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম আমার পরিচিত। তার কাছ থেকে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। তাই তার এই বিপদে তাকে একবার একটু দেখতে চাই। এই, কৃতজ্ঞতা স্বীকার আর কি! ব্যস, হয়ে গেল। গেটের দারোয়ান আমার কথা বিশ্বাস করে আমাকে পাঠিয়ে দিলে এখানে।

—বেশ মিছে কথা বলতে শিখেছ দেখছি আজকাল। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলে ওঠে ম্যাল্‌কম।

তেমনি মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় রুমা, আজকাল নয়, বরাবর। নিজের কাজ গোছাতে মিথ্যেই তো আমাদের ভরসা। আচার-আচরণই বল, আর ছলাকলাই বল, আমাদের ব্যবসায়ে মিথ্যেই তো অবলম্বন। নিজে যা নই তাই তো প্রতিপন্ন করে নিজের দর চড়িয়ে রাখতে হয়। যাক্ ওসব কথা। আমার হঠাৎ এখানে আসাটা নিশ্চয়ই তুমি পছন্দ কর নি সাহেব, কেমন?

স্পষ্টকণ্ঠে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, মিথ্যে বল নি রুমা। আমার কেবল ভয় ছিল তুমি এখানে এলেই মেরিয়া তা জানতে পারবে। তুমি তো জান, আমি চাই না সে তা জানুক। তবে যখন এসেই পড়েছ, তখন খুব খুশি হয়েছি। আর সত্যি সত্যিই কতটা খুশি হয়েছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, রুমা। এখন মনে হচ্ছে তুমি না এলে যেন একটা দারুণ লোকসান হত আমার।

—মন যুগিয়ে কথা বলায় তোমরা অর্থাৎ পুরুষেরা, সবাই একরকম, সাহেব।

—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, রুমা। আমি জানতাম, যে করেই হোক

তুমি এক । দিন অন্তত এখানে আসবেই।

—কেমন করে জানতে পারলে? তোমার মেরিয়া যদি তাড়াতাড়ি চলে না যেত তা হলে কি আসতে পারতাম?

—তুমি কি আজ মেরিয়াকে এখান থেকে যেতে দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি। শুধু আজ কেন, গত দশ-এগারো দিন ধরে রোজই দেখছি।

—তার মানে? বিস্মিত কণ্ঠস্বর ম্যাল্‌কমের।

একটু সময় চুপ করে রুমা জবাব দেয়, হ্যাঁ, দশ-এগারো দিন তো হবেই। রোজই গেটের কাছে সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু সুযোগ আর পাই না। তোমার মেরিয়া ঠিক চারটেয় আসে, আর ছ'টায় যায়। সে থাকলে তো আর আসতে পারি না এখানে। অবশ্যি সে আমাকে না চিনলেও আমি তাকে চিনি। ছবি দেখেছি তার। রোজই সে আমার চোখের সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একটু আগে তোমার মেরিয়া বাস্কেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল, আর সেই সুযোগে দারোয়ানকে মিথ্যে বলে ঢুকে পড়লাম।

রুমা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ম্যাল্‌কমের মাথার ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, মাথার ঘা কি এখনও শুকোয় নি?

—প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

একটু সময় ইতস্তত করে রুমা ম্যাল্‌কমের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, তুমি খ্রীষ্টান আর আমি হিন্দু। আমাদের দেব-দেবতার ওপর তোমার বিশ্বাস না থাকারই কথা। তবুও এই জিনিসটুকু সেই প্রথম দিন থেকে সঙ্গে করে আনছি তোমার মাথায় ছোঁয়াব বলে। কথাটা বলেই রুমা শাড়ির আঁচল খুলে এক টুকরো শুকনো ফুল ও বেলপাতা বের করে।

—এগুলো কি? ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করে।

সলজ্জকণ্ঠে জবাব দেয় রুমা, তোমার নামে কালীঘাটে পুজো দিয়েছিলাম সাহেব। মায়ের আশীর্বাদ।

কৌতুককণ্ঠে বলে ওঠে ম্যাল্‌কম, এগুলো মাথায় ছোঁয়ালে কি হয়, রুমা?

জবাবে রুমা বললে, বিশ্বাস থাকলে অনেক কিছু হয়, না থাকলে কিছুই হয় না।

—আমার তো এতে বিশ্বাস নেই।

—তোমার না থাক, আমার আছে। একজনের বিশ্বাস থাকলেই চলবে।

বলতে বলতে রুমা হাত বাড়িয়ে ফুল ও বেলপাতা ম্যাল্‌কমের মাথায় ছোঁয়াতে ম্যাল্‌কম হেসে ঠাট্টার ছলে বলে ওঠে, আমার আর জাত-ধর্ম কিছুই রাখতে দিলে না, রুমা। শেষ পর্যন্ত দেখছি তোমার পাল্লায় পড়ে খ্রীষ্টকে ছেড়ে কৃষ্টকে ডাকতে হবে।

—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। শাসনের সুরে বলতে থাকে রুমা, কোন্ দুঃখে নিজের ধর্ম ছাড়বে? যে নিজের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে পরের ধর্ম গ্রহণ করে আসলে তার কোন ধর্মের ওপরই বিশ্বাস নেই। সে নাস্তিক।

দেবতার ফুল-বেলপাতার মাহাত্ম্য যাই থাক না কেন, ঐ ফুল-বেলপাতার সঙ্গে

রুমার ঠাণ্ডা হাতখানা নিজের কপালে ঠেকতেই সমস্ত দেহ-মন যেন শীতল হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কমের। হাত বাড়িয়ে রুমার হাতখানা আরও কিছুক্ষণ নিজের কপালের ওপর চেপে ধরে চোখ বুজে স্থির হয়ে থাকে। আর রুমাও অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে ম্যাল্‌কমের মুখের দিকে।

ঠিক সেইমুহূর্তে বজ্রপাত ঘটে ঘরের মধ্যে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে মেরিয়া, এক্সকিউজ মি, জনি। তোমাদের ডিসটার্ব করলাম। আমার পার্সটা খুঁজে না পেয়ে রাস্তা থেকে ফিরে এলাম। ভাবলাম এখানে হয়তো ফেলে যেতে পারি।

ম্যাল্‌কমের মুখে কোন কথা নেই। কি করবে কি বলবে বুঝতে না পেরে রুমা তাড়াতাড়ি নিজের হাতখানা টেনে এনে মাথা নিচু করে থাকে।

যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে ঘরে ঢোকে মেরিয়া। তারপর এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে অনেকটা নিজের মনেই যেন বলতে থাকে, পার্সটা যে কোথায় ফেললাম! বোধহয় রাস্তাতেই পড়ে গেছে। তা যাক্‌ গে। তেমন কিছুই ছিল না ওতে। গোটা পাঁচেক টাকা ছিল মাত্র।

নিজের মনেই কথাগুলো বলতে বলতে ম্যাল্‌কমের দিকে তাকায় মেরিয়া। রুমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই সে আবার নির্লিপ্ত সুরে বলে ওঠে, আমি এবার চলি।

আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। রুমার যে-কোন একটা পরিচয় না দিলেই নয়। তাই একটা ঢোঁক গিলে শুকনো হাসি হাসতে চেষ্টা করে ম্যাল্‌কম মেরিয়াকে বললে, এই মহিলাটির সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, মেরি। এককালে ওর কিছু উপকার করেছিলাম। সেই কথা মনে রেখেই ও আমাকে আজ দেখতে এসেছে। এই, মামুলি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের চেষ্টা আর কি!

রুমা এতক্ষণে মেরিয়ার দিকে মুখ তুলে তাকায়। মেরিয়াও সামান্য হেসে বলে ওঠে, সো কাইণ্ড্‌ অফ ইউ। আপনি আমার অসুস্থ স্বামীকে দেখতে এসেছেন। আমরা বাস্তবিকই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

কথাটা বলেই মেরিয়া রুমার হাতের সেই শুকনো ফুল-বেলপাতার দিকে তাকিয়ে ম্যাল্‌কমকে বললে, এটা তোমার ঘোর অন্যায়, জনি। মামুলি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্যে উনি আসবেন কেন এখানে? দেখছ না, ওঁর হাতে রয়েছে গড্‌স ব্লেসিংস্‌—ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তোমার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করতেই কোন টেম্পল থেকে তোমার জন্যে এই আশীর্বাদ বয়ে এনেছেন উনি।

ম্যালকমের মুখে আর কথা জোগায় না। রুমাও বলে না কিছু। এমন একটা পরিস্থিতিতে তার পক্ষে কি বলা শোভন হবে তাই সম্ভবত সে বুঝতে পারে না। এমনকি ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইংরেজীতে যে কথোপকথন হচ্ছিল তার একটি বর্ণও বুঝতে পারে না সে। তবে স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে এইটুকুমাত্র বুঝতে পারে যে, ওদের আলোচনাটা হচ্ছিল তাকে কেন্দ্র করেই। আর, এমন একটা পরিস্থিতিতে সেটাই স্বাভাবিক।

—আচ্ছা, তবে চলি। গুড নাইট। কথাটা বলেই কিন্তু আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না মেরিয়া। যেমন অতর্কিতে এসেছিল, তেমনিভাবেই আবার

বেরিয়ে যায় কেবিন ছেড়ে। বুকের ওপর হাত দু'খানা আড়াআড়ি ভাবে রেখে শূন্যচোখে দরজার দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকে ম্যাল্‌কম।

চোর হাতে-নাতে ধরা পড়লে তার মুখের যেমন অবস্থা হয় ম্যাল্‌কমের মুখ-খানাও ঠিক তেমনি হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পেরেছে রুমা সম্পর্কে তার কৈফিয়তের একবর্ণও বিশ্বাস করে নি মেরিয়া। কিন্তু সেইমুহূর্তে তাড়াতাড়ি ওরকম একটা কৈফিয়ত ছাড়া দেবার মত আর কি-ই বা ছিল তার?

মেরিয়া চলে যায়। ম্যাল্‌কম নিঃশব্দে শুয়ে থাকে হাসপাতালের বেডে। আর রুমা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ম্যাল্‌কমের মাথার কাছে দাঁড় করানো কাঠের মিট্‌সেফের ওপর রাখা একটা খালি কাঁচের গ্লাসের দিকে। এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডেও মাঝে-মধ্যে এক-আধটা মাছি ঢুকে পড়ে। তেমন একটা মাছি এসে আটকে পড়েছে ঐ গ্লাসটার মধ্যে। রুমার মনে হয় ঐ মাছিটা যেন তার নিজের মতই বোকা। মাথার ওপর ফাঁকা গ্লাসের মুখটা নজরে পড়ে না তার। তাই নিজেকে মুক্ত করতে গ্লাসের কাঁচের দেওয়ালে বারে বারে মাথা ঠুকে মরছে ঐ বোকা মাছিটা।

শীতের সকাল। বেলা প্রায় আটটা। এই সাত-সকালেই দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে ফুটপাথে। প্রসেশন আসছে। বিরাট প্রসেশন। সবার নজর ঐ প্রসেশনের দিকে। একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। ইচ্ছে করেই সে ফুটপাথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে যাতে তার লম্বা দেহটা অন্যের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ না করে। ম্যাল্‌কমের দেহে তার সেই চিরাচরিত পোশাক। কেবল আজ মাথায় চাপিয়েছে একটা সোলার হ্যাট। তেলচিটে সেই টুপিটি জরাজীর্ণ। খাঁকি কাপড় ছিঁড়ে গিয়ে ভেতরের সাদা সোলা বেরিয়ে পড়েছে। তবুও ইচ্ছে করেই সে আজ এই টুপিটা পরেছে। শুধু আজ নয়, প্রতি বছর তেইশে জানুয়ারীর এই বিশেষ দিনটিতে এই হ্যাটটি মাথায় দেয় সে। তেইশে জানুয়ারী—নেতাজীর জন্মদিন। সেই দেশনেতার জন্মদিন উপলক্ষ্যেই এই বিরাট শোভাযাত্রা। বিউগল, ব্যাণ্ড, জীপগাড়ি, জাতীয় পতাকা—কোন কিছুরই অভাব নেই এই শোভাযাত্রায়। একটা লরীতে নেতাজীর একখানা বিরাট প্রতিকৃতি। চারিদিকে ধূপ-ধুনো ও ফুলের মালা। মিলিটারী পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

প্রসেশনটি কাছে আসতেই ফুটপাথের জনতা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানায় তাদের প্রিয় নেতাকে। ম্যাল্‌কম কিন্তু হাততালি দেয় না, দেবার প্রয়োজনও বোধ করে না। কেবল একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে সেই তেলচিটে টুপিটা খুলে নিয়ে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে সেই প্রতিমূর্তির দিকে। এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পায় না তাঁর মুখখানা। তবুও তাকিয়েই থাকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় প্রসেশন। হঠাৎ একটা প্রশ্ন মনে হতেই হাসি পায় বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের। অধিকারের প্রশ্ন এটা। নেতাদের মধ্যে যাঁরা এই প্রসেশনের উদ্যোক্তা, তাঁদের এমন ঘটা করে নেতাজীর এই জন্ম-জয়ন্তী পালন করার অধিকার আছে কি? মহাপুরুষদের নিজেদের জীবনের চাইতে তাদের আদর্শই

হচ্ছে বড়। সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী পালন করাটা কেবল হাস্যকরই নয়, ম্যাল্‌কমের মতে ঘোরতর অন্যায়। সুভাষের আদর্শের সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে নিজের জন্মভূমিকে ভালবাসা। এই সত্তরের দশকে দেশের মধ্যে এমন ক'টা মানুষকে খুঁজে বের করা যাবে যাঁরা নিজেদের বুকে টোকা মেরে জোর গলায় বলতে পারেন যে, তাঁরা দেশকে সত্যিই ভালবাসেন? দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত? তাই যদি হয় তাহলে কি দেশের এমনি হাল হয়? নেতাজী কি এমনি একটা দেশের কল্পনা করেছিলেন? এমনি একটা সমাজ-ব্যবস্থাই কি কাম্য ছিল তাঁর?

কিন্তু এই দেশের জন্যে একদিন জীবনের কি বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন নেতাজী! চূড়ান্ত অভিনয় করেছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে। সেই অভিনয়ে অসাধারণ সাফল্য লাভও করেছিলেন তিনি। সেদিন ব্রিটিশ সরকারের মুখে মাখিয়ে দিয়েছিলেন চুন-কালি। দু' নম্বর কিড স্ট্রীটের বাড়িতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসে ছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদার। এমন একটা ভয়ানক ব্যাপার—এমন একটা সাংঘাতিক অভিনয়ের কথা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি।

ঊনিশশো চল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাস। জোর লড়াই চলছে তখন ইয়োরোপে। সুভাষ তখনও জেলে। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলনে ধৃত সুভাষকে কিছুতেই মুক্তি দেয় নি ব্রিটিশ সরকার। তাদের তখন ঘরে-বাইরে বিপদ। এই ঘোর দুর্দিনে সুভাষের মত একজন ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে জেলের বাইরে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়।

রাত প্রায় আটটা। লালবাজারে সি. পি-র টেবিলের ওপর কাগজপত্রের স্তূপ। সি. পি ফেয়ারওয়েদার এই মাত্র নিজের কাজকর্ম শেষ করে পাশের একখানা ইজিচেয়ারে দেহভার এলিয়ে দিয়ে কীট্‌সের একখানা কাব্যগ্রন্থ খুলে বসেছে। পুলিশের কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে যখন কাব্যরসের স্বাদ নিতে তার মনটা অস্থির হয়ে ওঠে তখন কীট্‌সের কাব্যের মধ্যে ডুবে যেতে তার ভাল লাগে। বাড়িতে মিসেসের উপস্থিতিতে এসব কাব্য-টাব্য পড়ার উপায় নেই। মিসেস ফেয়ারওয়েদার যদিও স্ত্রী হিসেবে খারাপ নয়, কিন্তু একটু বেশি কথা বলে। তার ধারণা, তার স্বামীর এই উন্নতির মূলে সে নিজে। সে না থাকলে তার স্বামী আই. পি. অফিসার হয়েও কলকাতার মত শহরের পুলিশ কমিশনার হতে পারত না।

শুধু নিজের মনেই নয়, সুযোগ পেলে এসব কথা স্বামীকে শোনাতেও মহিলাটি ভুলত না। বলত, সত্যি আমি আশ্চর্য হই তোমার বুদ্ধি দেখে। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি যে কি করে পুলিশ কমিশনার হলে তাই ভাবি।

মিসেসের কথায় শান্তকণ্ঠে ফেয়ারওয়েদার বলে, তোমার কাছে বোকা হতে পারি, কিন্তু তাই বলে সরকারী কাজে নিশ্চয়ই বোকা নই। তাই যদি হতাম তাহলে কি আর এত সহজে সি. পি. হতে পারতাম, না প্রাইম মিনিস্টার হকসাহেব আমাকে এমন পছন্দ করতেন?

স্বামীর দিকে একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে মিসেস আবার বলে, তোমার বুদ্ধি

ধারণা, একমাত্র নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার বলেই তুমি আজ জীবনে এতটা উন্নতি করতে পেরেছ ?

প্রশ্নটা অতি পুরাতন। এ ধরনের প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয়েছে ফেয়ারওয়েদারকে। কাজেই এর জবাবটাও তার জানা।

মিসেসের প্রশ্নে ফেয়ারওয়েদার মৃদু হেসে জবাব দেয়, না ডার্লিং, তা আর বলি কেমন করে ? তুমি যদি আমার জীবনে না আসতে তো—

—না—না, নিজেকে এতটা বড় ভাবি না। বলতে থাকে মিসেস ফেয়ারওয়েদার, তবে তোমার এই উন্নতির মূলে যে আমারও কিছুটা দান রয়েছে তা বোধহয় তুমিও অস্বীকার করতে পারবে না।

—ডেফিনিটলি নট্। ইউ আর মাই ইন্স্পিরেশন, ডার্লিং। বলতে বলতে ফেয়ারওয়েদার স্ত্রীকে খুশি করতে এগিয়ে যায় তার দিকে।

বাড়িতে সর্বদাই মিসেসের মুখ চলছে। রাতদিন কথার ফুলঝুরি ছুটছে তার মুখে। সেই ফুলঝুরির রোশনাইয়ে কাব্যের রসাস্বাদন সম্ভব নয়। কাজেই হাতে সময় থাকলেও বাড়ি না ফিরে লালবাজারে বসেই কীট্সের কাব্যগ্রন্থ পড়তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ফেয়ারওয়েদার।

লালবাজারের একতলাটা ফাঁকা। দোতলায় সি. পি ও তার পাশে একজন ডেপুটির ঘরে আলো জ্বলছে। লম্বা টানা বারন্দা। সি পি.-র ঘরের বাইরে একজন চাপরাশি বসে আছে বিরস মুখে। সাহেব না গেলে সে যেতে পারে না। একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট বারান্দায় পায়চারী করে ডিউটি করছে। নিচের উত্তর দিকের চত্বরে পুলিশ-ভ্যানের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই।

ইজিচেয়ারে ঠেস্ দিয়ে কাব্যের মধ্যে ডুবে ছিল সি. পি. ফেয়ারওয়েদার। হঠাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে টেলিফোন। একবার—দুবার।

ধ্যানভঙ্গ হয় ফেয়ারওয়েদারের। কে আবার ডাকছে ? চীফ সেক্রেটারী, অথবা খোদ প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী ? না কি গভর্ণরের এডিকং ?

বইখানি বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় ফেয়ারওয়েদার। তারপর টেলিফোনে মুখ লাগিয়ে বলে ওঠে, হ্যালো, সি. পি. স্পিকিং !

ওপাশ থেকে ভেসে আসে মিসেস ফেয়ারওয়েদারের নারীকণ্ঠ, হ্যালো ডার্লিং, কখন বাড়ি ফিরছ তুমি ?

ব্যস্ততার ভান করে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে ফেয়ারওয়েদার, ডোণ্ট মাইণ্ড ডার্লিং, অফিসের কাজে ভয়ানক ব্যস্ত আমি। ফিরতে একটু দেরি হবে।

—অল রাইট্। তবে বেশি দেরি করো না কিন্তু।

- নো—নো, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরতে চেষ্টা করব।

স্ত্রীর সঙ্গে এমনি ধরনের ছলনা মাঝে-মধ্যেই করতে হয় ফেয়ারওয়েদারকে। তাই মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে ফিরে এসে ইজিচেয়ারে বসার উপক্রম করতেই আবার বেজে ওঠে টেলিফোন।

এবার স্পষ্ট বিরক্ত বোধ করে ফেয়ারওয়েদার। নাঃ, বইখানা কিছুতেই আজ শেষ করতে পারবে না সে।

উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরতেই ওপার থেকে স্টেটস্ম্যান পত্রিকার একজন

পরিচিত রিপোর্টারের কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে, হ্যাল্লো স্যার, কিছু পলিটিক্যাল ইনফরমেশন আছে নাকি?

— না না, তেমন আর কি আছে? জবাব দেয় সি পি।

— আমরা যে শুনতে পেলাম সুভাষ বোস নাকি জেলে অনশন শুরু করবেন? এটা কি ঠিক?

জবাবে হেসে ফেয়ারওয়েদার বললে, আমি জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল হলে না হয় আপনার কথার জবাব দিতে পারতাম। তা যখন নই, তখন—

— তাহলে স্যার, আপনারা এমন ধরনের কোন খবর পান নি?

— না, এখনও পাই নি।

— একবার আই. জি প্রিজন্‌স্‌কে কণ্ট্যাক্ট করব?

—করুন না, তিনি হয়তো সঠিক খবর দিতে পারবেন।

ওপাশ থেকে কেটে যায় টেলিফোনের লাইন। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ফেয়ারওয়েদার আবার এসে বসে তার ইজিচেয়ারে।

পরের দিন বাড়িতে নিজের ড্রইংরুমে বসে খবরের কাগজখানার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে সি. পি. ফেয়ারওয়েদার। সত্যিই, পরের দিন অর্থাৎ উনত্রিশ তারিখ থেকে জেলে অনশন শুরু করবেন সুভাষ বোস। গভর্ণমেন্ট তাঁকে অন্যায়ভাবে জেলে আটক রেখেছে বলেই তাঁর এই অনশন।

চিন্তিত হয়ে ওঠে ফেয়ারওয়েদার। জেলে সুভাষ বোসের অনশন মানেই দেশব্যাপী একটা ঝড় উঠবে, আর সেই ঝড়ের মোকাবিলা করতে হবে তাকেই। গভর্ণমেণ্টের পলিসির সাথে একমত হতে পারে না ফেয়ারওয়েদার। ইয়োরোপের যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার এখন ব্যতিব্যস্ত। এই সময় দেশের মধ্যে এমন একটা ঝঞ্ঝাট ডেকে আনা কেন? এখন গভর্ণমেণ্টের উচিত দেশনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিশ্বযুদ্ধে ভারতের গণ-সমর্থন আদায় করা। কিন্তু তা নয়, আবার শুরু হবে একটা ভয়ানক গোলমাল। এতে যে সরকারের কি লাভ হবে তা ঠিক বুঝতে পারে না সে। এখন বরঞ্চ তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়াই উচিত।

পরের দিন সুভাষ সত্যি সত্যি জেলের মধ্যে অনশন শুরু করলেন। আমরণ অনশন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে না দিলে অনশন করে মৃত্যুবরণ করবেন তিনি।

ভারতবর্ষের অবিসম্বাদী নেতা মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু পড়েছে পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদার। দু-একবার তাঁকে দেখবার সুযোগও হয়েছে তার। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে সে যতই ভাবে ততই যেন বিস্মিত হয়। পৃথিবীর কোন দেশে কোনকালে কোন রাজনৈতিক নেতা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির এমন অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন বলে তার জানা নেই। বাস্তবিক অবিশ্বাস্য ক্ষমতা এই নগ্ন ফকিরটির। তবে ফেয়ারওয়েদারের মনে হয় সারা জীবনে মহাত্মা গান্ধী যদি রাজনীতি একেবারেই আর না করতেন তবুও তিনি পৃথিবীর রাজনৈতিক মহলে চিরকাল অমর হয়ে থাকতেন কেবল তাঁর

একটি মাত্র আবিষ্কারের জন্যে। সেই আবিষ্কারটি হলো এই অনশন পদ্ধতি, যার আর এক নাম আত্মপীড়ন। নিজেকে পীড়ন করে যে অন্যকে বিচলিত করে তোলা যায়, নিজে উপোস করে থেকে যে অন্যের বিবেক জাগ্রত করা সম্ভব, এ পথ সারা বিশ্বে এই ব্যক্তিটিই প্রথম দেখিয়েছিলেন। দেশের নেতারা আজ এই পথ অনুসরণ করেই ব্রিটিশ শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে।

সুভাষের অনশন। শহর কলকাতায় তো বটেই, এমনকি সারা বাংলায় এসে লাগল এই অনশনের ঢেউ। চঞ্চল হয়ে উঠল লালবাজার। চঞ্চল হয়ে উঠল লর্ড সিনহা রোডের এস. বি. অফিস। আজ এখানে মিটিং—কাল ওখানে প্রসেশন। জনসভায় প্রতিটি বক্তার মুখেই ব্রিটিশ সরকারের কঠোর সমালোচনা —ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্যেই সুভাষের এই অনশন। সরকারকে বাধ্য করতে হবে সুভাষকে ছেড়ে দিতে। তাঁর এতটুকু কোন ক্ষতি হলে সারা দেশে আগুন জ্বলবে। বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জল ঢেলেও বাংলার সেই আগুন নেভাতে পারবে না ব্রিটিশ সরকার।

লালবাজারে দারুণ ব্যস্ত সি. পি. ফেয়ারওয়েদার। মাথায় উঠেছে তার কীট্‌সের কাব্য। ব্যস্ত ডেপুটি কমিশনার জনব্রিনও। আর ব্যস্ততার সঙ্গে চিন্তাগ্রস্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব। দু'দিক সামলাতে গিয়েই বিপন্ন বোধ করছেন এই নার্ভাস প্রকৃতির ভদ্রলোক।

জনমতের চাপ আর বেশিদিন সহ্য করতে পারল না ব্রিটিশ সরকার। চৌঠা নভেম্বরের সংবাদপত্রে জানা গেল সরকারী সিদ্ধান্ত—সুভাষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে পরের দিন ব্রিটিশ সরকার সুভাষকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে।

এই বিষয়টি নিয়েই সেদিন ফেয়ারওয়েদার টেলিফোনে আলোচনা করছিল ডি. সি., এস. বি জনব্রিনের সঙ্গে।

ফেয়ারওয়েদার বললে, যাক, ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়াল না। আমাদের, অর্থাৎ পুলিশের ওপর থেকে প্রেসার কিছুটা কমবে এবার।

জবাবে জনব্রিন বললে, তা হয়তো কমবে স্যার, তবে ওঁর ওপর আমাদের ওয়াচ ডিউটি তো চালিয়ে যেতেই হবে।

—তা হবে। তবে তাও তো আর বেশিদিনের জন্যে নয়। বড়জোর দু'মাস। একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে কথাটা বললে ফেয়ারওয়েদার।

কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে জনব্রিন বললে, ঠিক বুঝলাম না স্যার!

বলতে থাকে ফেয়ারওয়েদার, আপনি কি ভেবেছেন সরকার সুভাষ বোসকে শুধু শুধু ছেড়ে দিচ্ছে? মোটেই তা নয়। আগামী সাতাশে জানুয়ারী তো সুভাষ বোসের বিচার শুরু হচ্ছে, আর সেই বিচারে তার নির্ঘাৎ জেল হবে। কাজেই মাস দুয়েক যদি এই ব্যক্তি বাইরে থাকে তাতে আর এমন কি ক্ষতি হবে? এতে সাপও মরবে, আর লাঠিও ভাঙবে না। দেশের মানুষও শান্ত হবে, আবার সুভাষ বোসকেও জেলে ঢুকতে হবে। বিচারের পর জেল। কাজেই দেশের মানুষ বিনা বিচারে আটকের ধুয়ো তুলতে আর পারবে না।

জবাবে জনব্রিন হেসে বললে, পলিসিটা মন্দ নয়, স্যার। তবে এই

ব্যক্তিটিকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। দেশের ছাত্র ও যুবসমাজ ওঁর অনুগত। জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার নতুন কি কাণ্ড ঘটান তার ঠিক কি?

—তাই তো ওঁর ওপর কনস্ট্যাণ্ট ওযাচ রাখতে হবে। একমুহূর্তও ওঁকে চোখের আড়ালে রাখা চলবে না। গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ।

—হ্যাঁ স্যার, লোকটি নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। ওঁর সম্বন্ধে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।

পরের দিনই জেল থেকে মুক্তি পেলেন সুভাষ। জেল-গেটে সেদিন অনেকেই সংবর্ধনা জানাতে গেল তাঁকে। তারা আশা করেছিল মুক্তি পেয়ে সুভাষ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে সংগ্রাম শুরু করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন। সংগ্রামের নতুন কোন পথ দেখাবেন দেশের মানুষকে। এই তো সুযোগ। ইয়োরোপেব যুদ্ধে ব্রিটিশ ভয়ানক বিব্রত। জার্মান বাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে ব্রিটিশ বাহিনী প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-সম্ভার ফেলে রেখে ডানকার্ক থেকে পালিয়ে এসেছে। পতন ঘটেছে ফ্রান্সের। ব্রিটেনের ওপর প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চালাচ্ছে জার্মানী। এই সুযোগে এদেশে ব্রিটিশের ওপর চরম আঘাত হানতে হবে। এই মুহূর্তে এ আঘাত হানার ক্ষমতা গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে কারুরই নেই। একমাত্র আছে সুভাষ বোসের। জনসাধারণের এই আশা তিনি নিশ্চয়ই পূরণ করবেন।

কিন্তু হা-হতোস্মি! সেই সুযোগ কেমন করে পাবেন সুভাষ বোস? জেল-গেটে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে। জেল থেকে ছাড়া পেলেও তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত নন। গৃহবন্দী হয়ে থাকার আদেশ হয়েছে তাঁর ওপর।

পুলিশের গাড়ি সুভাষকে নিয়ে এল তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে। বাড়ির চাবিদিকে বসল পুলিশের সতর্ক পাহাবা। গৃহবন্দী সুভাষের সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা-সাক্ষাৎ নিষেধ। দেশের মানুষের তবুও আশা ছিল, চুপচাপ ঘরে বসে থাকার মানুষ সুভাষ নন। গৃহবন্দী অবস্থায়ও তিনি পরিকল্পনা ঠিকই প্রস্তুত করবেন। যথাসময়ে সেই পরিকল্পনার খবর জানতে পারবে তারা। সেই সঙ্গে জানতে পারবে তাঁর নির্দেশ।

কিন্তু সুভাষ সম্পর্কে একটি খবরে জনসাধারণের সেই আশাটুকুও আর রইল না। সুভাষ নাকি সন্ন্যাসী হতে চলেছেন। বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করেছে ব্রিটিশ সরকার, আর বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এমনকি কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করেছেন তিনি নিজে। সর্বদা ঘরের মধ্যে বসে ধ্যান-ধারণা করেন, পাঠ করেন গীতা। বাড়ির কারুর প্রবেশাধিকার নেই ওই ঘরে। দরজার বাইরে থেকে বাড়িব চাকর খাবার পরিবেশন করে তাঁকে। সুভাষ দাড়ি-গোঁফ কামানো পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। এখন কেবল গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধারণ করাটাই বাকি।

খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল শহরে। শহর কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল গোটা দেশে। সন্ন্যাসী হতে চলেছেন সুভাষ বোস। শ্রীঅরবিন্দের মত রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে আত্মোপলব্ধির পথে চলেছেন তিনি। রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইছেন না। ভূমৈব সুখম্

নাল্পে সুখমস্তি। অল্পতে আর তুষ্ট থাকতে রাজী নন সুভাষ বোস। তাই 'ভূমার' সন্ধানে তিনি জপ-তপ শুরু করেছেন একান্ত সঙ্গোপনে।

সারা শহরে দারুণ উত্তেজনা। জার্মানদের হাতে ব্রিটিশের বেদম মার খাওয়ার খবরের চাইতেও উত্তেজনাপূর্ণ খবর সুভাষ সম্পর্কে। রাজনীতির জগৎ থেকে চিরবিদায় নিতে চলেছেন সুভাষ। সমর্থকরা বলে, দুর্ভাগ্য। সুভাষ বসুর মত মহান নেতার প্রয়োজন যখন দেশে সবচাইতে বেশি, তখনই তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন। বিরুদ্ধবাদীরা মুখ টিপে হেসে আড়ালে বলে, রাজনীতির হালে পানি না পেয়েই সুভাষ বোসের এই অকাল-বৈরাগ্য।

বাইরে যে যাই বলুক, সুভাষ কিন্তু তাঁর এলগিন রোডের একখানি ঘরে নিজেকে নিয়েই তন্ময়। তাঁর এই রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে সারা শহরে নানারকম গুজব। এমনকি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হয়ে তিনি যে তপস্যা করতে হিমালয়ের গভীর অরণ্যে চলে যাবেন সেই পাকা খবরও নাকি ইতিমধ্যে কেউ কেউ জেনে ফেলেছে।

খোদ লালবাজারেও সুভাষকে নিয়ে কানাকানি। এদেশীয় অফিসারেরা তো বটেই, এমনকি বিলিতি সাহেব-সুবোদের মধ্যেও আলোচনা হয় তাঁকে নিয়ে কিন্তু আলোচনা যাই হোক না কেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজনদের তীক্ষ্ন নজর। তাঁর ওপর। রাউন্ড দি ক্লক তাঁর এলগিন রোডের বাড়ির ওপর তাদের দৃষ্টি।

লালবাজারের সার্জেন্ট ম্যাল্‌কম ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। কাজেও জয়েন করেছে। সুভাষের ব্যাপারে কৌতূহল তারও কম নয়। তাছাড়া সবজান্তা সার্জেন্ট অ্যান্টনী, মাতাল সার্জেন্ট গ্র্যান্ট ও অন্যান্য এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্টদের মধ্যেও সুভাষ বোসের ব্যাপারে কিছুটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সেদিন লালবাজারের বারে বসে সেই আলোচনাই হচ্ছিল তাদের মধ্যে।

নিজের বুলডগের মত মুখখানার ওপর একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে গ্র্যান্ট বললে, আরে বাবা, ওসব ছল-চাতুরি কি আর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে চলে? আসলে ওই সুভাষ বোস এমনিভাবে গভর্ণমেন্টকে একটু ভড়কে দিতে চায়।

—তাতে তার লাভ? ম্যাল্‌কম প্রশ্ন করে।

গ্র্যান্টের বদলে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয় অ্যান্টনী, লাভ হচ্ছে এই যে, তার এই চাল-চলন দেখে গভর্ণমেন্ট যদি তার গৃহবন্দী হয়ে থাকার আদেশ তুলে নেয়। আসলে এই লোকটি সাংঘাতিক বুদ্ধিমান। তা ছাড়া এর পেছনে অন্য কোন পলিটিক্যাল কারণও থাকতে পারে।

—কি রকম পলিটিক্যাল কারণ? জিজ্ঞেস করে সার্জেন্ট নর্টন।

সারা মুখে একটা সবজান্তার ভাব ফুটিয়ে তুলে মদের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে অ্যান্টনী বললে, আরে বাপু, পলিটিক্স কি এতই সহজ বস্তু? হয়তো তার এই সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা একটা হুমকি ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়তো এই অস্ত্র দিয়ে সে তার প্রতিপক্ষকে কোনরকমে ঘায়েল করতে চায়।

গ্র্যান্ট আবার বলে ওঠে, ওই সব দেশপ্রেম-ট্রেম একেবারে বাজে কথা। সবাই চায় নিজে বড় হতে, নিজে ক্ষমতায় থাকতে। ঐ সুভাষ বোসও কোন ব্যতিক্রম

নয়। দেখছিস না ঐ কংগ্রেস দলের মধ্যে কতরকম ঝগড়া, কত রেষারেষি!

সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্টের মত একটি একনম্বর মাতাল ও চরিত্রহীনের মুখে এ-ধরনের পলিটিক্যাল আলোচনায় মনে মনে একটু বিস্মিত হয় ম্যাল্‌কম। লোকটা তো দেশের রাজনীতির বেশ খবর রাখে আজকাল! কেবল সে নিজেই কোন খোঁজ-খবর রাখে না। তাই এ-ধরনের আলোচনায় তার নিজের পক্ষে কেবল শ্রোতা হয়ে মুখ বন্ধ করে বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

ম্যাল্‌কম এক সময় বললে, শুনছি নাকি সুভাষ বোস কারুর সঙ্গে কথাবার্তাও বলে না। সর্বদা নাকি মেডিটেশনে থাকে। তাহলে কি তোরা বলতে চাইছিস এগুলোও সব বাজে?

মুখের সিগারেটে একটা টান দিয়ে নর্টন বললে, সত্যি, হিন্দু সন্ন্যাসীদের এই মেডিটেশনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। এতে হয় কি? সত্যিই কি এতে ওই সন্ন্যাসীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে?

নর্টনের প্রশ্নে পাল্টে যায় আলোচনার ধারা। সুভাষ বোস ও দেশের রাজনীতি থেকে তারা সরে আসে সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক কার্যকলাপের আলোচনায়। তারা কে কোথায় সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত কার্যকলাপের কোন্ কাহিনী শুনেছে তাই নিয়ে জমাটি গল্প শুরু হয়ে যায় তাদের মধ্যে।

সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট এতক্ষণ এ নিয়ে কিছু বলে নি। হঠাৎ সে বলে ওঠে, বুজরুকি—সবই বুজরুকি। আসলে এসবই হচ্ছে ট্রিক্‌স। দেশের বোকা মানুষদের ঠকিয়ে দু-পয়সা রোজগারের চেষ্টা। এ-যুগে ওসব অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করার কোন মানে হয়?

—তাই যদি হবে তবে তো ভগবান যীশুর রেসারেক্‌শানও বিশ্বাস করা চলে না। সহসা কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় ম্যাল্‌কমের।

ম্যাল্‌কমের এমনি ধারা কথায় হঠাৎ কেউ কোন মন্তব্য করে না। পরক্ষণেই আর একজন বয়স্ক সার্জেণ্ট বলে ওঠে, আজকাল আমাদের জুনির কথাবার্তাই এমনি। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! কোথায় লর্ড যেসাস্, আর কোথায় এদেশের নেকেড সন্ন্যাসীরা!

সার্জেণ্ট অ্যাণ্টনী তাড়াতাড়ি এইসময় বললে, না—না, সবকিছুই যে বাজে একথা বলা চলে না। এদেশের সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঠগ্ থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে সবাই যে ঠগ্ একথা বলা যায় না।

—হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি। দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলতে থাকে ম্যাল্‌কম, সুভাষ বোসের এই মেডিটেশন সত্যিকারেরও হতে পারে। হয়তো সে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বাকি জীবনটা সত্যিই রিলিজিয়ান নিয়ে থাকতে চায়।

—তুই যে দেখছি সুভাষ বোসের একজন মস্ত ভক্ত হয়ে উঠেছিস! বাঁকা সুরে বলে ওঠে নর্টন।

সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যাণ্ট টেবিলের ওপর একটা চাপড় মেরে বলে ওঠে, হ্যাং ইওর সুভাষ বোস! রেখে দে ওসব আলোচনা।

তারপর অ্যাণ্টনীর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে থাকে গ্র্যাণ্ট, ডিপার্ট-মেণ্টের কিছু খবর রাখিস? শুনলাম পুলিশ মেডালের জন্যে নাকি আমাদের

জনির নাম গেছে।

—তাই নাকি? একযোগে সবাই তাকায় গ্র্যাণ্টের দিকে।

মিটি মিটি হেসে গ্র্যাণ্ট বললে, আমাকে কেন, ঐ জনিকেই জিজ্ঞেস কর না। সেদিন ইসলামিয়া কলেজে ছাত্রদের হাতে মার খেয়েই তো জনি হিরো হয়ে উঠেছে। তার সেই হিরোয়িক্ এ্যাকটিভিটির জন্যেই নাকি সি. পি. পুলিশ মেডালের জন্যে ওর নাম পাঠিয়েছে।

কথাটা ম্যাল্‌কমের নিজের কানেও এসেছিল। কিন্তু এলেও সে তা বিশ্বাস করে নি। তা ছাড়া পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে বাগড়া দেওয়ার লোকের তো অভাব নেই। কাজেই কথাটা কানে এলেও সঠিক খবরটা না জানা পর্যন্ত এ নিয়ে কাউকে কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল না।

কিন্তু গ্র্যাণ্টের কথায় আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। তাই মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, এরকম একটা কথা শুনেছি বটে, কিন্তু কথাটা কতদূর সত্যি তা এখনও জানতে পারি নি। তা ছাড়া নাম পাঠালেই যে গভর্ণমেণ্ট আমাকে মেডাল দেবে তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই।

—ওসব ছেঁদো কথা শুনতে চাই না, বলতে থাকে অ্যাণ্টনী, খোশ-খবরের ঝুটাও ভাল। এইটুকু খবরের জন্যেই জনির উচিত এক বোতল হুইস্কির অর্ডার দেওয়া। কি বল তোমরা?

উপস্থিত সবাই সমর্থন করে অ্যাণ্টনীকে। এই অবস্থায় ম্যাল্‌কমেরও হুইস্কির অর্ডার না দিয়ে উপায় থাকে না।

লালবাজারের বার থেকে বেরিয়ে আসে সবাই। এবার যে-যার ডিউটিতে চলে যাবে। সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্টের ট্র্যাফিক ডিউটি। লাল রঙের মোটরসাইকেলের স্টার্টারে পা লাগিয়ে সে স্টার্ট দিতে যাবে, হঠাৎ হুস্ করে একখানা মিলিটারী জীপ এসে দাঁড়ায় লালবাজারের চত্বরে।

জীপ থেকে নেমে আসে একজন বিলিতি মিলিটারী ক্যাপ্টেন। সঙ্গে আধুনিক সাজপোশাক পরা একটি সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটিকে নিয়ে সেই বিলিতি ক্যাপ্টেন এগিয়ে যায় ব্যাফল্ ওয়ালের দিকে। যুদ্ধের দরুন লালবাজারের বাড়িগুলোর প্রতিটির দরজায় ব্যাফল্ ওয়াল তৈরি করা হয়েছে। কাঁচের দরজা-জানালায় লাগানো হয়েছে কাপড়ের টুকরো।

মেয়েটি বাস্তবিকই সুন্দরী। মোটর-সাইকেলে স্টার্ট দিতে ভুলে গিয়ে সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট লোভীর মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর তারা অদৃশ্য হয়ে যেতেই গ্র্যাণ্ট বন্ধুদের দিকে ফিরে একটা চোখ বন্ধ করে সামান্য একটু জিভ বের করে বলে ওঠে, খাসা! এক্‌সেলেণ্ট!

—ইয়োরোপীয়ান ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এদেশীয় মেয়ে কেন? নর্টন জিজ্ঞেস করে।

জবাব দেয় অ্যাণ্টনী। বলে, বোধহয় ওয়াকাই—উইমেন্স অক্‌জিলিয়ারী কোর অফ ইণ্ডিয়া। নামে ওরাও মিলিটারী। আর কাজে কেবল—। কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় সে।

সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট এই সময় পায়ের চাপে মোটর-সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে

যেতে যেতে বলে ওঠে, ইস্, এই সময় যদি পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে না থেকে মিলিটারীতে ঢুকতে পারতাম!

তার কথার জবাবে পেছন থেকে বলে ওঠে নর্টন, কেন, তোর এদেশীয় সুন্দরীরা কি তোকে ত্যাগ করেছে?

সে-কথার জবাব না দিয়ে লালবাজারের গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট বন্ধুদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে ওঠে—টা—টা!

সুভাষের বাড়ির ওপর রাউণ্ড দি ক্লক ওয়াচ। সাদা পোশাকের ওয়াচার কনস্টেবলেরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নজর রাখে বাড়িটার ওপর। রাস্তার মোড়ের পানের দোকানের লোকটিও হয়তো পুলিশের একজন ইনফর্মার। শীতের সকালে মিঠে রোদে যে ঝাঁকামুটে দুটো রাস্তায় উবু হয়ে বসে গল্প করতে করতে খৈনী টিপছে, ওরাও হয়তো পুলিশের লোক।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাদা পোশাকের ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টররাও মাঝে মাঝেই ওয়াচার কনস্টেবলদের ডিউটি চেক্ করতে আসে। দিনে আসে, রাতে আসে। সব ঠিক আছে। কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

কেটে গেল একটি মাস। ঊনিশশো একচল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসের পনেরোটা দিনও কেটে গেল। তেমন কোন বিশেষ খবর নেই সুভাষের। তিনি তাঁর জপ-তপ নিয়েই আছেন বাড়ির মধ্যে। বাইবের কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও চেষ্টা করে না। কাজেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ-মহলও নিশ্চিন্ত। ডিউটি করতে হয় করছে। সরকারী হুকুম অমান্য করা চলে না। নইলে এই ডিউটি তো একেবারেই অর্থহীন। যে মানুষটি সন্ন্যাসী হয়ে গেছে তার সম্বন্ধে সরকাবের অমন অহেতুক ভয় কেন? আসলে ডেপুটি কমিশনার ওই জনব্রিন সাহেবটিই একটু অতিরিক্ত সন্দেহপরায়ণ। কাউকে বিশ্বাস করে না সে। তাই রাত-দিন এখানে ওয়াচ ডিউটি। যাক্ গে, আর ক'টা দিনই বা এই ডিউটি করতে হবে! সাতাশে জানুয়ারী তো বিচারের দিন। তারপর থেকে তো তাঁকে আবার জেলেই যেতে হবে।

সতেরোই জানুয়ারী আর সাতাশে জানুয়ারীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র দশ দিনের। সেই সতেরোই জানুয়ারী গভীর রাতেই ঘটল সেই অঘটন যাতে কেঁপে উঠল গোটা ব্রিটিশ ভারতের মাটি। বিলিতি রাজপুরুষদের লাল-মুখগুলো লজ্জায় কালো হয়ে উঠল। ছি—ছি, এ লজ্জা ইংরেজরা ঢাকবে কেমন করে? ভারত-বর্ষের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ শক্তির এই অবস্থা!

জানুয়ারী মাসের শীতের রাত। প্রচন্ড শীত পড়েছে শহরে। রাস্তা-ঘাট একেবাবেই নির্জন। অল্প অল্প কুয়াশায় রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলো যেন ভূতুড়ে চোখ মেলে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে।

কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেদিন ওয়াচার কনস্টেবলদের সংখ্যাও কম। কিছুক্ষণ আগেই ওয়াচ সেকসানের ইন্চার্জ ভদ্রলোক নিজে এসে কনস্টেবলদের ডিউটি চেক্ করে গেছে। বাকি রাতটুকু এখন নিশ্চিন্ত। কেউ আর আসবে না এদিকে।

এই সময় অন্যের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে এল্গিন রোডের ঐ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকার কোনোই মানে হয় না। তার চাইতে কাছাকাছি বেশ ভালমত একটু জায়গা বেছে নিয়ে র্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে কিংবা শুয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। শোনা যায় সুভাষ বোস নাকি মানুষ হিসাবে খুবই ভাল। তিনি যদি জানতে পারতেন যে, তাঁকে পাহারা দিতেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের কয়েকজন গরীব কনস্টেবল শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রতিদিন বাইরে রাত কাটায়, তা হলে হয়তো দয়াপরবশ হয়ে তিনি নিজেই তাদের ডেকে নিয়ে বাড়িতে একটু ঠাঁই দিতেন, আর বলতেন—কাল খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে তোমাদের অফিসারের কাছে রিপোর্ট করবে যে, আমরা সারারাত ডিউটি করেছি। সুভাষ বোস বাড়িতেই আছে।

না, ঠাট্টা নয় ব্যাপারটা। শোনা যায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকদের কারুর জীবনে এমনি ঘটনা নাকি সত্যিই ঘটেছে। হয়তো একজন মস্তবড় পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্টের পেছনে পেছনে ঘুরে ওয়াচ কনস্টেবলরা হাঁপিয়ে উঠেছে। তিনি যেখানেই যান, বেচারী কনস্টেবলদেরও অনুসরণ করতে হয় তাঁকে। দেশনেতা সেই পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট হয়তো বুঝতে পেরেছেন পুলিশের লোক তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। তখন হয়তো তিনি সরাসরি তাকে ডেকে বললেন, শোন হে বাপু, কাল থেকে আর আমার জন্যে তোমাকে এমন পরিশ্রম করতে হবে না। আমি আগামী কাল কখন কোথায় যাব, কার সঙ্গে দেখা করব, তা আগেই তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। তুমি এখানে বসে বসেই সেই মত রিপোর্ট দিও তোমার অফিসারদের কাছে।

গভীর রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। রাতজাগা দু'একটা কুকুরের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না কোথাও। ওয়াচার কনস্টেবলরা যে যার জায়গা বেছে নিয়ে র্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে ঢুলছে।

সহসা এল্গিন রোডের বাড়ি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে একখানা কালো রঙের মোটরগাড়ি। গাড়ির আরোহী একজন পাঠান ভদ্রলোক। গালপাট্টা দাড়ি, পরনে পাঠানের পোশাক। গাড়ি চালাচ্ছিল আর একজন ব্যক্তি।

রাস্তায় পড়ে গাড়িখানি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে উত্তরদিকে। গাড়ির পেছনের সীটে ঠেস দিয়ে সেই পাঠান—সুভাষ বোস। গাড়ি চালাচ্ছিল তাঁরই ভাইপো শিশির বোস। এক অজানা দুর্গম পথে পাড়ি দেওয়ার মুহূর্তে ভাইপো শিশির বোস তার রাঙাকাকুকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিতে চলেছে। সৃষ্টি হতে চলেছে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস, যার পটভূমি শুরু হয়েছে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত ছাড়িয়ে আফগানিস্তানের কাবুল থেকে, আর শেষ হয়েছে পূর্ব সীমান্তের কাছাকাছি ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে। মাঝখানে রয়েছে এক বৃহৎ ভূভাগ—রাশিয়া, জার্মানী ও জাপান।

আবছা অন্ধকারে সেই কালো গাড়িখানা বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত থেকে ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হয়ে গেলেও শহর কলকাতার কাকপক্ষীটি পর্যন্ত টের পায় নি কিছু। প্রতিদিনের মত আর একটি শীতের সকালের মুখ দেখল

শহরের নাগরিকেরা। কর্পোরেশনের মালিরা হাইড্রেন্টের জল দিয়ে ছড়্ ছড়্ শব্দে রাস্তা পরিষ্কার করল, প্রভাতী ট্রাম আলো জ্বালিয়ে ঘড়্ ঘড়্ শব্দে ছুটল রাস্তা দিয়ে, চারিদিকে ধোঁয়া ছড়িয়ে চায়ের দোকানের উনুন জ্বলল ফুটপাথের ওপর। এতটুকু পরিবর্তন নেই কোথাও। প্রতিদিন যেমন চলে আজও ঠিক তেমনি চলেছে শহর কলকাতা। এমনকি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারেরা ডিউটি চেক্ করতে এসে ঠিক জায়গাটিতেই হাজির পেল রাতের কনস্টেবলদের।

অনিদ্রার ক্লান্তিতে অবসন্ন কনস্টেবলরা অফিসারের হাতে নিজেদের নোটবই তুলে দিয়ে হাই তুলে বললে, সব ঠিক আছে, স্যার।

প্রতিদিনের মত প্রশ্ন করল অফিসাররা, অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছ?

—না, স্যার।

—কেউ বাড়িতে ঢুকেছিল?

—না, স্যার।

—বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কেউ?

—না, স্যার।

-- দেওয়ার মত আর কিছু খবর আছে?

—না, স্যার।

কিন্তু এই মুখস্থ জবাব 'না, স্যার'-এর মধ্যেই একজন একটু দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বললে, তবে স্যার, একটু বেশি রাতে একখানা কালো গাড়ি যেন—

--কালো গাড়ি? কিসের কালো গাড়ি? কোথাকার কালো গাড়ি?

খবর গেল ওয়াচ সেক্সানের ইন্-চার্জের কাছে—কালো গাড়ি। সেখান থেকে ডেপুটি কমিশনার জনব্রিন ও সমসুদ্দোহারের কাছে—কালো গাড়ি। সেখান থেকে খোদ কমিশনারের কাছে—কালো গাড়ি।

কিন্তু গাড়ির নম্বর কত? ক'জন আরোহী ছিল তাতে? কে চালাচ্ছিল?

এই প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারদের দেরি হল না। কিন্তু জবাবগুলো পাওয়া যেতেই বোঝা গেল যে, পাখী উড়ে গেছে। সুভাষ বোস পালিয়েছে।

চেপে রাখো—চেপে রাখো এই খবর। এমন লজ্জার কথা যেন কেউ টের না পায়। শহর ছেড়ে বেরোবার প্রতিটি রাস্তার মুখে নজর রাখো। সতর্ক করে দাও জেলার পুলিশ-মহলকে। নজর রাখো রেল-স্টেশনে। সুভাষ বোস পালিয়েছে।

সুভাষ বোস পালিয়েছে! বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকার মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের পুলিশকে ওয়্যারলেসের পুলিশ কোডে জানিয়ে দাও এই খবর—সুভাষ বোস পালিয়েছে। গ্রেপ্তার কর তাকে।

লর্ড সিন্‌হা রোডের স্পেশাল ব্রাঞ্চ চিন্তান্বিত, স্তম্ভিত হেডকোয়ার্টার লাল-বাজার। কিড্ স্ট্রীটের বাড়ির ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্টের খাবার ফেলে রেখে এক জরুরী আহ্বানে গভর্ণর হাউসের দিকে ছুটে চলেছে পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদার। গম্ভীর মুখে গাড়ির পেছনের সীটে ঠেস্ দিয়ে বসে ভাবতে থাকে ফেয়ারওয়েদার—ওয়েদার মোটেই ফেয়ার নয়। বড়ই রাফ এদেশের

ওয়েদার। চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হল পুলিশের অপদার্থতা।

খবর ছোটে হাওয়ার মুখে। চেপে রাখো বললেই চাপা যায় না সেই খবর। বিশেষ করে তা যদি হয় সুভাষের মত ব্যক্তির পালিয়ে যাওয়ার খবর।

হন্যে হয়ে উঠেছে সংবাদপত্রের ঝানু রিপোর্টাররা। লালবাজার ও সুভাষের এলগিন রোডের বাড়িতে মুহুর্মুহু বেজে ওঠে টেলিফোন – সুভাষ কোথায়? সুভাষ কোথায়?

লালবাজার প্রথমে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিলে খবরটা। পরে বলল—জানি না। অবশেষে চাপে পড়ে স্বীকার করল যে, সুভাষ বোস বাস্তবিকই পালিয়েছে। তবে সে ধরা পড়ল বলে।

হ্যাঁ, ধরা পড়বার জন্যই পালিয়েছেন সুভাষ। তিনি তখন রেলের একখানা ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে পেশোয়ারের পথে।

শহর কলকাতা সেদিন উত্তাল। অফিসে, কাছারীতে, পথে-ঘাটে সেদিন কেবল ওই একটি মাত্র উচ্ছ্বসিত আলোচনা – সুভাষ পালিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ বাহিনীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সুভাষ পালিয়েছে। কিন্তু কেন পালিয়েছে? কি উদ্দেশ্যে পালিয়েছে?

এর জবাব তারা পেয়েছিল অনেক পরে, যেদিন ইথার-তরঙ্গে ভেসে উঠেছিল একটি কণ্ঠস্বর – আমি সুভাষ।

পরের দিন সকালের খবরের কাগজেই বেরলো সুভাষের পালিয়ে যাবার খবর। একখানি কাগজও আর অবিক্রীত রইল না সেদিন।

পার্কস্ট্রীটের সাহেবপাড়ার বাসিন্দা সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমের কানে তখনও কিছু পৌঁছয় নি। দুপুরে লালবাজারে ডিউটি করতে এসেই সে শুনতে পেল খবরটা —সুভাষ বোস পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। খবরটা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল ম্যাল্‌কম। লজ্জা ও আনন্দের এক মিশ্র অনুভূতিতে খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে রইল সে। ছি – ছি, কলকাতার পুলিশ এমন অপদার্থ! একটি লোক চোখের ওপর থেকে উধাও হয়ে গেল, কেউ কিছু টের পেল না! তবে হ্যাঁ, এমন দুঃসাহসী কাজ সুভাষ বোসের মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। বাড়িতে একান্তে বসে এই প্ল্যানই তাহলে এতদিন আঁটছিলেন তিনি।

ম্যাল্‌কমকে একান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট, হ্যালো জনি, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে যে? কি ভাবছিস?

ম্যাল্‌কম কোন জবাব না দিয়ে গ্র্যান্টের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট তার বুলডগ মার্কা মুখের ছোট ছোট চোখ দুটো একটু নাচিয়ে অপেক্ষাকৃত নিচু কণ্ঠে আবার বলে ওঠে, পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে অনেক ভেক্যান্সি হবে রে!

—কিসের ভেক্যান্সি? চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে ম্যাল্‌কম।

হেসে জবাব দেয় গ্র্যাণ্ট, অনেক চাকরি খালি হবে। সি. পি. থেকে শুরু করে কনস্টেবল পর্যন্ত অনেকেরই চাকরি যাবে এবার। সুভাষ বোসের মত একটা ডেঞ্জারাস ম্যান পালিয়ে গেল আর পুলিশ কিছু টেরই পেল না, এটা কি গভর্ণমেণ্ট মুখ বুজে সহ্য করবে মনে করেছিস?

মৃদু হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, এতদিন চাকরি করেও কি তুই জানিস না হোমরা-চোমরাদের কোন কালেই কিছু হয় না? যদি একান্তই মরতে হয় তো মরবে নিচু স্তরের কেউ কেউ। এটাই তো ডিপার্টমেন্টের দস্তুর।

—তা বটে। বলতে থাকে গ্র্যান্ট, সেদিন আমি বলি নি, ঐ ডেঞ্জারাস লোকটার পেটে পেটে কেবল প্যাঁচালো বুদ্ধি? ওর ওই মেডিটেশন একটা মস্ত ধাপ্পা? আসলে লোকটা কোন কিছু মতলব এঁটেই এমন ধর্মের ভান করছিল এতদিন। এতদিনে বোঝা গেল ওর উদ্দেশ্য। তবে বাছাধন যাবে কোথায়? ধরা তাকে পড়তেই হবে।

সেই মুহূর্তে এ নিয়ে গ্র্যান্টের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছে করছিল না ম্যাল্‌কমের। সে তখন ভাবছিল অন্য কথা—কোথায় পালালেন সুভাষ বোস? কি উদ্দেশ্যে তিনি পালিয়ে গেলেন?

## এগারো

সহসা একদিন সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম নিজের ডান হাতের মণিবন্ধে চামড়ার ব্যাণ্ড বাঁধার হুকুম পেল। শুধু ব্যাণ্ড নয়, তার সঙ্গে লাগানো ধাতু-নির্মিত একটি ব্রিটিশ ক্রাউন। সার্জেণ্ট থেকে সার্জেণ্ট মেজর পদে উন্নীত হলেই কেবল এই ব্যাণ্ডটি হাতে বাঁধার নিয়ম। একে ঠিক প্রমোশন বলা না চললেও নিঃসন্দেহে এটি একটি অতিরিক্ত সম্মান। ডিউটির ব্যাপারেও কিছু অতিরিক্ত সুবিধার অধিকারী এই সার্জেণ্ট মেজর।

অনেক সিনিয়র সার্জেণ্টকে ডিঙিয়েই ম্যাল্‌কম এই অতিরিক্ত সম্মানের অধিকারী হয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ যাই বলুক না কেন, এ ব্যাপারে ম্যাল্‌কমের নিজের কোন হাতই ছিল না। এমনকি সি আর ও, অর্থাৎ সেন্ট্রাল রিজার্ভ অফিসের সাব-ইন্সপেক্টর পরিতোষ ঘটক যখন কমিশনারের আদেশটি তার হাতে তুলে দিল তখন যেন নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না ম্যালকম।

বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ সামনে খুশির ভাব দেখালেও আড়ালে আবডালে কমিশনারের এই অন্যায় আদেশের সমালোচনায় মুখর। এ কেমন বিচার? এতগুলো সিনিয়রকে ডিঙিয়ে একজন জুনিয়রকে সার্জেণ্ট মেজর করার অর্থ কি? নিশ্চয়ই ম্যাল্‌কম তলে তলে জোর চেষ্টা-তদ্বির করেছিল। তারা ঠাট্টার ছলে প্রকাশ্যেই ম্যাল্‌কমকে বলতে শুরু করল—তোর তো গজকপাল, জানি। আঙুল ফুলে রাতারাতি কলাগাছ হয়ে গেছিস।

বন্ধুদের মনের দুঃখ ও সেই সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড উষ্মার ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয় না ম্যাল্‌কমের। তাই সে চুপ করেই থাকে। মনে মনে ভাবে, এর পরে সে সত্যি সত্যিই যদি পুলিশ মেডাল পায় তো ওরা বোধহয় তার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দেবে।

এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম কিন্তু সার্জেণ্ট গ্র্যান্ট। সে প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়, জনি সার্জেণ্ট মেজর হয়েছে, আমরা হতে পারি নি। এতে আমাদের স্বভাবতই দুঃখিত হবার কথা। আমারও দুঃখ হয়েছে। তবে একথা তো মিথ্যে নয়,

আমাদের অনেকের চাইতেই জনি কম্পিটেণ্ট।

সেদিন বাড়ি ফিরে অর্ডারের কাগজখানা মেরিয়ার হাতে দিতেই সে একবার তার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর কাগজটা ম্যাল্‌কমকে ফিরিয়ে দিতে দিতে ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু ম্লান হাসি হেসে কেবল বললে, ভাল।

ম্যাল্‌কম অবশ্যি মেরিয়ার কাছ থেকে এরকম একটি জবাবই আশা করেছিল। তার এই উন্নতির খবরে মেরিয়া যে আগের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে না তা তার ইদানীংকালের আচার-আচরণেই প্রকাশ পাচ্ছিল। হাসপাতালের সেই ঘটনার পর থেকেই মেরিয়া নিজেকে কেমন যেন একটু একটু করে গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করেছিল। তার সেই আগেকার আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর ছিল না। কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব।

ম্যাল্‌কম জানত হাসপাতালে রুমাকে দেখার পর থেকেই মেরিয়ার এই পরিবর্তন। কিন্তু আশ্চর্য ওর ধৈর্য! হাসপাতালে কিংবা বাড়িতে মেরিয়া কোনদিন রুমার সম্বন্ধে ম্যাল্‌কমকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে নি। প্রথম প্রথম ম্যালকম মেরিয়ার প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকত। সেদিন হাসপাতালে সে রুমার যে পরিচয় দিয়েছিল সেই পরিচয়েরই বিস্তৃত বিবরণ মনে মনে তৈরি করে মেরিয়ার প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকত ম্যালকম। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে মেরিয়া! একবার ভুলেও সে তার কাছে রুমার প্রসঙ্গ তোলে নি। রুমার ব্যাপারে মেরিয়া যে কৌতূহলী তাও তার কথাবার্তায় বুঝতে পারা যেত না।

কিন্তু ম্যাল্‌কমের অপরাধী মন এতে ঠিক স্বস্তি পেত না। সে চাইত মেরিয়া কিছু জিজ্ঞেস করুক, কিছু জানতে চেষ্টা করুক রুমা সম্পর্কে। তাহলে সে ঐ ব্যাপারে নিজের বানানো কথাগুলো বলে দিয়ে একটু স্বস্তি পেতে পারে। দু'একবার আকার-ইঙ্গিতে রুমার প্রসঙ্গ টেনে আনতে চেষ্টাও করেছিল ম্যাল্‌কম। কিন্তু মেরিয়ার ঐ নির্লিপ্ততায় বেশিদূর এগোতে পারে নি সে। এ যেন বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর এক ধৈর্যের পরীক্ষা।

অবশেষে একদিন হার মানল ম্যাল্‌কম নিজেই। উপযাচক হয়ে মেরিয়াকে বললে, আচ্ছা মেরি, হাসপাতালে সেদিন সেই মহিলাটির সম্বন্ধে আর কোন কথাই তো জিজ্ঞেস করলে না?

স্বামীর মুখের দিকে একমুহূর্ত অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় মেরিয়া, কি আর জিজ্ঞেস করবো? তার পরিচয় তো সেদিন আমাকে দিয়েছিলে। তার বাইরেও সেই মহিলার আর কোন পরিচয় আছে নাকি?

একটু শুকনো হাসি হাসতে চেষ্টা করে ম্যাল্‌কম বললে, না, না, তার বাইরে আর কি পরিচয় থাকবে? তবে মহিলাটি সত্যিই একটু গায়ে-পড়া স্বভাবের। একদিন ওর যে উপকারটুকু করেছিলাম তাতে মন্দির থেকে ফুল নিয়ে হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসাটা সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি।

— তুমি বাড়াবাড়ি বললেই তো হবে না। সকলের মনের কাঠামো তো একরকম হয় না। তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞান হয়তো একটু বেশি।

— না মেরি, একে একটু বাড়াবাড়িই বলে। কি এমন উপকার করেছিলাম ওর? গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ওর সঙ্গীরা ওকে একা ফেলে রেখে চলে

যায়। সেদিন ঐ বিপন্ন মহিলাটিকে একখানা গাড়ি ডেকে দিয়েছিলাম কেবল। এই উপকারটুকু এমন কিছু নয় যে, তার জন্যে হাসপাতালে আমাকে দেখতে যেতে হবে।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজ—ঘটনাটা মিথ্যে নয়, তবে এতে সবটুকু বলা হল না। পৌনে যোল আনাই বলতে বাকি থেকে গেল।

জবাব দেয় মেরিয়া, পথে-ঘাটে একজন বিপন্ন মহিলাকে সাহায্য করলে এটা কি কম কথা হল? তোমার সাহায্য না পেলে মহিলাটি হয়তো আরও কোন বিপদে পড়ত।

মেরিয়ার কথার ধরনে সেই মহিলাটির বদলে ম্যালকম নিজেই সেই মুহূর্তে বিপন্ন বোধ করে। এতক্ষণে তার জবাবের মধ্যে এটা মোটেই স্পষ্ট হয়ে উঠল না যে, মেরিয়া তার কথা বাস্তবিকই বিশ্বাস করছে। তার মনে হয় এমন একটা পরিস্থিতিতে মেরিয়ার সেই মহিলাটির পক্ষ সমর্থনের উল্টো অর্থও হতে পারে। কোন কিছুই স্পষ্ট বুঝতে না পেরে আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে ম্যালক্ম। মনের সেই অস্বস্তির কাঁটাটা কিছুতেই তুলে ফেলতে পারে না সে।

এবার প্রশ্ন করতে শুরু করে মেরিয়া, মহিলাটির নাম কি?

ম্যাল্কম সত্যি জবাবই দেয়, রুমা।

—কোথায় থাকে?

—মানিকতলার দিকে।

—বিবাহিতা?

মাথা নেড়ে সায় দেয় ম্যাল্কম।

—কিন্তু সেদিন ওর কপালে সিঁদুর দেখেছি বলে তো মনে হল না!

চট্ করে একটা জুৎসই জবাব দেয় ম্যাল্কম, ওরা খ্রীষ্টান।

মেরিয়া একটু সময় চুপ করে থাকে। ম্যাল্কমের মিথ্যে কথাগুলো স্পষ্টই ধরা পড়ে যায় তার কাছে। খ্রীষ্টান মহিলা মন্দির থেকে ফুল আনবে কেন? কিন্তু ম্যাল্কমকে সেই প্রশ্ন করে বিব্রত না করে সে কেবল জিজ্ঞেস করে, ওদের বাড়িতে কখনও গিয়েছিলে?

এবার একটু ফাঁপড়ে পড়ে ম্যাল্কম। সত্যি কথাটা বের হতে চায় না মুখ দিয়ে, আবার সোজাসুজি মিথ্যে বলতেও আটকায়।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে জবাব দেয়, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। ওর স্বামী একদিন প্রায় জোর করেই নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়ি।

—ওর স্বামী কি কাজ করে?

—একটা মার্চেন্ট ফার্মে চাকরি করে।

স্পষ্ট সুরে প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পেরে মনে মনে একটু খুশি হয়েই ওঠে ম্যাল্কম। কিন্তু তবুও মনের স্বস্তি পুরোপুরি ফিরে পায় না সে। গিল্টি মাইন্ড অলওয়েজ সাস্পিসিয়াস। মেরিয়ার মনে সন্দেহ দূর হয়েছে তো? না হলে তার পক্ষে আর কিছু করণীয় নেই। রুমার ব্যাপারে মেরিয়াকে সে যা বলেছে তার অনেকটা সত্যি। এর বেশি আর কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ম্যাল্কমের জীবনে মেরিয়া তার ঘরের একটি স্নিগ্ধ আলো। তাকে ছাড়া

তার চলে না। প্রয়োজন তো বটেই, এমনকি আলোর ঐ রশ্মিটুকুই তার কর্মক্লান্ত দেহ-মনকে সর্বদা এক স্নিগ্ধতার আবরণে ঘিরে রাখে। আর রুমা হচ্ছে তার আকাশের চাঁদ। মানুষের জীবনে যদি কখনও চাঁদের প্রয়োজন থাকে তবে ম্যাল্‌কমের জীবনেও রুমার সেই প্রয়োজন আছে।

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষ বোসের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে প্রশাসক মহলে ঝড় উঠল। শুধু প্রশাসক মহলেই নয়, সেই ঝড় দেশের রাজনৈতিক মহলেও ছড়িয়ে পড়ল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ইণ্টারপ্রিটেশন —রকমারী জল্পনা-কল্পনা। বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব সম্পূর্ণ নির্বিকার। সুভাষের পালিয়ে যাবার ব্যাপারে তিনি আনন্দিত কিংবা দুঃখিত তার কিছুই বোঝা গেল না তাঁর কথাবার্তায়। মন্ত্রিত্বের মসনদে বসে সেদিন বোধহয় তাঁর পক্ষে মনের কথা খুলে বলা সম্ভব ছিল না। তবে আশ্চর্যের কথা, সি পি. ফেয়ারওয়েদারের সেদিন চাকরি যায় নি। শুধু সি. পি. কেন, সেদিন এলগিন রোডে ডিউটিরত ওযাচার কন্‌স্টেবলদের মধ্যে একজনেরও চাকরির ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু কেন? পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে সাধারণ একটু বিচ্যুতি হলে যেখানে শাস্তির ব্যবস্থা, সেখানে এমন একটা ভয়ানক গাফিলতির জন্যে কারুর শাস্তি হল না কেন? গভর্ণমেণ্ট কি তবে বিষয়টির গুরুত্ব লঘু করে দেখানোর মতলব নিয়েই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে তেমন একটা হৈ চৈ করে নি?

কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। সেদিন কার নির্দেশে এলগিন রোডে ওয়াচার কন্‌স্টেবলের সংখ্যা কমানো হয়েছিল? এই প্রশ্নটির জবাব সেদিন কেন, কোনদিনই কেউ পায় নি। সুভাষের জীবনকে কেন্দ্র করে এমনি অনেক রহস্যেরই সমাধান হয় নি আজ পর্যন্ত।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডেস্টিটিউট হোমে সেদিন অকস্মাৎ মারা গেল অশীতিপর বৃদ্ধ অ্যালেন গর্টন। শেষের দিকে চলা-ফেরাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গর্টনের। বয়সে অনেক বড় হলেও বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের সঙ্গেই গর্টনের ভাব ছিল সবচাইতে বেশি। তাই গর্টনের মৃত্যু বুকে বড়ই বেজেছিল ম্যাল্‌কমের।

সেকালের রেলে চাকরি করত গর্টন, স্ত্রী-বিয়োগের পরে এই হোমে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। একটি উপার্জনক্ষম ছেলে ছিল তার। কিন্তু ছেলে তেমন একটা খোঁজ-খবর রাখত না তার বাপের। কথায় কথায় গর্টন প্রায়ই ম্যাল্‌কমকে বলত—লুক্ ব্রাদার, তোমার ছেলেপুলে নেই, আর আমার ছেলে থেকেও নেই। কাজেই আমাদের দু'জনের অবস্থাই সমান। বলেই গর্টন ফোকলা দাঁতে ম্লান হাসত।

গর্টনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তার ছেলে ও বৌ কেবল নিয়ম রক্ষার জন্যেই বোধহয় এসেছিল। মৃত বাপের দিকে তাকিয়ে গর্টনের ছেলে রুমাল বের করে চোখ মুছতেই ছেলের বৌ বলে উঠেছিল, ডোণ্ট বি সিলি, মাই ডার্লিং। লেট আস্ গো নাউ। বলেই তারা বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে।

গর্টনের মৃতদেহ বেরিয়েল গ্রাউণ্ডে নিয়ে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ তার শূন্য খাটখানার দিকে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে একা বসে রইল ম্যাল্কম। অবশেষে একসময় উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা শুকনো ডালিয়া ফুল বের করে গর্টনের শূন্য খাটের ওপর রেখে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

হোমের পুরানো বাড়িটা ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ম্যাল্কম। পরনে তার সেই চিরাচরিত পোশাক। পায়ের ক্যাম্বিসের জুতোজোড়া একেবারেই ছিঁড়ে গেছে। এক জোড়া নতুন জুতোর প্রয়োজন। কিন্তু কেনার টাকা কোথায়?

ফুটপাথ ধরে টেনে চলতে চলতে হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ ম্যাল্কম। রাস্তায় যানবাহনের ভিড়। সিঙ্গল ডেকার, ডবল ডেকার সব বাসেই বাদুড়-ঝোলা ভিড়, ট্রামের ছাদখানি ছাড়া তার সর্বাঙ্গেই ঝুলন্ত মানুষ, প্রতিটি বাড়ির দেয়ালে রঙ ও তুলির কেরামতি। বাস্তবিকই এই শহরের মানুষ-গুলোর রসবোধ আছে। এই মহানগরীকে নিত্য-নতুন আখ্যায় ভূষিত করতে তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। মিছিলনগরী কলকাতা হঠাৎ হয়ে ওঠে দুঃস্বপ্নের নগরী। পরের দিনই হয়ত সে আখ্যা লাভ করে ভিখারী নগরী বলে। ইদানীং এর নামকরণ হয়েছে পোস্টার নগরী। পথে-প্রান্তরে, রাস্তা-ঘাটে কেবল বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন। সিনেমা, টোটকা ওষুধ আর সাধারণ বিজ্ঞাপনগুলো তবুও মন্দের ভাল, কাগজে ছাপা থাকে বলে এগুলোর আয়ু বেশিদিন নয়। কিন্তু রাজনৈতিক দেয়াল বিজ্ঞাপন একেবারে অক্ষয় অব্যয়। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে না পড়া পর্যন্ত এদের লয়-ক্ষয় নেই।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে ম্যাল্কমের। শোনা যায়, পথের কুকুরও নাকি নিজের ঘুমোবার জায়গাটি কখনও নোংরা করে না। কিন্তু কলকাতার আশ্চর্য বাসিন্দাদের যেন সেই বোধটুকু পর্যন্ত নেই। শহর কলকাতা নোংরা হোক, গোল্লায় যাক ক্ষতি নেই, নিজের স্বার্থসিদ্ধি হলেই হল। কিন্তু একদিন কি না ছিল এই কলকাতায়? আজও সারা ভারতে সবচাইতে প্রাণচঞ্চল নগরী এই কলকাতা।

শহরের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই আজ, তবুও এই মায়াময় শহরটিকে ভাল লাগে ম্যাল্কমের। শহর যদি মা হয় তাহলে সেই মায়ের দুঃখে প্রতিটি সন্তানেরই মন ব্যথায় ভরে ওঠা উচিত। তবে এযুগের সন্তান তো, মায়ের দিকে ফিরে চাইতে কার এমন দায় পড়েছে?

হ্যারিংটন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে একবার গঙ্গার দিকে যেতে ইচ্ছে হয় ম্যাল্কমের। পরক্ষণেই মত পাল্টে সে হাঁটতে থাকে দক্ষিণ দিকে।

অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এই দক্ষিণ কলকাতা। ধীর পায়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে বেশ ভালই লাগছিল ম্যাল্কমের। এখানে ঠিক উত্তরের মতই ফুটপাথে দোকানের ভিড়, তবে পথচারীর ভিড় একটু কম।

মৃত গর্টনের কথা ভাবতে ভাবতেই হেঁটে চলছিল ম্যাল্কম। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ডেকে ওঠে, জনি—হ্যাল্লো জনি!

বহুকাল পরে এই পুরনো নাম ধরে কে ডাকে ম্যালকমকে? ঘাড় ফিরিয়ে

তাকায় ম্যাল্‌কম। একটি ছোট ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডাকছে তাকে।

ঘুরে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে ঘোলাটে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

—হ্যালো জনি, আমাকে চিনতে পারছো না? মৃদু হেসে ভদ্রলোক আবার বললে।

ম্যাল্‌কম কিন্তু তবুও ঠিক চিনতে পারে না তাকে। মুখখানা যদিও একেবারে অপরিচিত নয়, তবুও লোকটিকে যে কোথায় দেখেছে তা কিছুতেই মনে করতে পারে না।

ম্যাল্‌কমের অবস্থা দেখে বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার একটু হেসে বললে, চোখের মাথা যে একেবারেই খেয়ে বসে আছ, সাহেব। এতক্ষণেও চিনতে পারলে না? আমি কিন্তু তোমাকে দেখেই চিনেছি। আমার নাম পরিতোষ—পরিতোষ ঘটক। লালবাজারের সি. আর. ও. অফিসে অনেক কাল কাটিয়েছি, মনে নেই?

এতক্ষণে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের মুখের ভাঁজে হাসি ফোটে। নিজের লম্বা হাত দু'টো পরিতোষের কাঁধের ওপর রেখে বললে, আই অ্যাম সরি, পরিতোষ। এতক্ষণে তোমাকে চিনতে পারা উচিত ছিল আমার। ঠিকই বলেছ তুমি। চোখের মাথা বাস্তবিকই খেয়ে বসে আছি। দু'চোখের ছানিই ম্যাচিওর করেছে। যে কোন সময় অপারেশন করা যেতে পারে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে না। তা ব্রাদার, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো?

পরিতোষ ঘটক এককালে পুলিশের সাব-ইন্‌সপেক্টর ছিল। বরাবর লালবাজারে সি আর. ও. অফিসেই কাটিয়েছে। মাঝে বছর দু'য়েক মাত্র ভবানীপুর থানায় চাকরি করেছিল। পার্টিশানের পরে প্রমোশন পেয়ে হয়েছিল ইন্সপেক্টর। সেই অবস্থায় রিটায়ার করেছে। নির্বিরোধী শান্ত স্বভাবের মানুষ পরিতোষ ঘটক থানা-পুলিশের হৈ-হুজ্জত একেবারেই পছন্দ করত না বলে বরাবর থানার পোস্টিং এড়িয়ে চলেছে। পয়সা-কড়ির দিকেও কোন কালে তেমন নজর ছিল না পরিতোষের। বলতে গেলে মোটামুটি সৎভাবেই চাকুরিজীবনে কাটিয়েছে, যা নাকি সেই ব্রিটিশ-যুগে ছিল একান্তই দুর্লভ।

ম্যাল্‌কমের প্রশ্নের জবাবে পরিতোষ হেসে বললে, এই তো কাছেই আমি থাকি। নাতিকে নিয়ে কয়েকটা জিনিস কিনতে বেরিয়েছি। তা, তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে দেখা, জনি। কেমন আছো? অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সেই হোমেই আছো তো?

—তুমি কেমন করে তা জানলে, পরিতোষ?

—কেমন করে জানলাম তা ঠিক বলতে পরেবো না, ভাই। তবে সাত-আট বছর আগে কার কাছে যেন কথাটা শুনেছিলাম।

একটু ম্লান হেসে মাথা নেড়ে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, হ্যাঁ, সেখানেই আছি। ওখানটা ছাড়া আর যাওয়ার মত জায়গাই বা কোথায়? যে ক'টা দিন আর বাঁচবো ওখানেই কাটাতে হবে।

ম্যাল্‌কমের কথার মধ্যে যে বিষণ্ণ সুরটুকু ফুটে উঠেছিল তা পরিতোষের কানেও ধরা পড়ে। একটু সময় চুপ থেকে সে বললে, বহুকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা। চলো না জনি, একবার আমার বাড়িটা ঘুরে আসবে। এই তো কাছেই আমার বাড়ি।

বহুদিনের মধ্যে কারুর বাড়িতে যায় নি ম্যাল্‌কম। তাই স্বভাবতই পরিতোষের বাড়িতে যেতে একটু বাধো-বাধো ঠেকছিল তার। কিন্তু পরিতোষ যখন তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে তার হাত ধরে একরকম জোর করেই নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো তখন আর তার সঙ্গে না গিয়ে উপায় রইল না ম্যাল্‌কমের।

সুন্দর দোতলা বাড়ি। সামনে একফালি বাগান। পরিতোষ তার পুরানো দিনের সহকর্মীকে নিয়ে এসে বসায় বাইরের ঘরে। ভেতর থেকে চা-বিস্কুট আসে। চা খেতে খেতে দুই বৃদ্ধ বসে বসে রোমন্থন করতে থাকে সেই পুরনো দিনের কাহিনী।

একসময় ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করে, এই গোটা বাড়িটাই কি তুমি ভাড়া নিয়েছ?

জবাবে একটু গর্বের হাসি হেসে পরিতোষ বললে, না ভাই, ভাড়া-টাড়া কিছু নয়, নিজেরই বাড়ি।

মনে মনে একটু বিস্মিতই হয় ম্যাল্‌কম। এককালে পরিতোষের সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতাই ছিল তার। চাকরিতে থাকা অবস্থায় সাংসারিক অবস্থা তেমন কিছু ভাল ছিল না পরিতোষের। চাকরি-জীবনে তেমন কিছু উপরি পয়সাও সে রোজগার করে নি। তাহলে এতবড় একখানা বাড়ি সে করল কেমন করে?

পরিতোষকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে একটু বাধো-বাধো ঠেকছিল ম্যাল্‌কমের। কিন্তু পরিতোষ নিজেই সেই প্রশ্নের জবাব দিলে। বললে, ভাবছো এতবড় বাড়ি আমি করলাম কেমন করে, তাই না? আরে বাপু রিটায়ার করে যে কটা টাকা পেয়েছিলাম তা তো হাতে মাখতে মাখতেই ফুরিয়ে গেল। ভাগ্যিস সেই সময় একজনকে ধরে বড়ছেলেটাকে একটা সরকারী কারখানায় ঢুকিয়ে ছিলাম। এই যা দেখছো তা সবই তার কীর্তি।

—তোমার ছেলেটি বুঝি ইঞ্জিনীয়ার?

—আরে না না, ইঞ্জিনিয়ার-টিয়ার কিছু নয়। কেঁদে-ক'কিয়ে কোন রকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। ঐ সরকারী কারখানার স্টোর ডিপার্টমেণ্টে ঢুকিয়ে ছিলাম। এখন সে ওখানকারই স্টোর-কীপার। বেশ দু'পয়সা আসে। বলেই পরিতোষ মুখ-চোখের এমন ভঙ্গি করে যার অর্থ বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না ম্যাল্‌কমের।

সরকারী কারখানার সামান্য একজন স্টোর-কীপারেরই এই অবস্থা! এত বড় বাড়ি যে করতে পেরেছে তার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও নিশ্চয়ই কম নয়। দেশের কি হাল! যে-যার সুবিধামত লুটেপুটে খাচ্ছে। কেউ দেখবার নেই, কেউ বলবার নেই। এই না হলে স্বাধীনতা! মেরিয়ার আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে

মনে পড়ে ম্যাল্‌কমের। একদিন সে ঠোঁট উল্টে বলেছিল, স্বদেশীওয়ালারা যতই চিৎকার করুক না কেন, ওদের হাতে দেশের যে হাল হবে তা একদিন দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

সত্যিই তাই। মানুষ হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছে। বিদেশী ঠাকুরের চাইতে স্বদেশী কুকুরও ভাল—কথাটা বলতে ভাল, শুনতে আরও ভাল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর উপযোগিতা কতখানি তা সত্যিই বিচার্য বিষয়।

সেই মুহূর্তে ম্যাল্‌কম ঐ পরিতোষের কথাই ভাবছিল। কি পরিবর্তন মানুষের! চাকরি-জীবনে যে পরিতোষ ঘটক উপরি পয়সা রোজগার করে নিজের সংসারের চেহারা ফেরাতে চেষ্টা করে নি, সে-ই আজ নির্বিকার চিত্তে ছেলের উপরি রোজগারের কথা বেশ গর্বের সঙ্গেই বলতে পারছে। এতটুকু বাধছে না তার। দেশের মানুষের মনোবৃত্তি আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে!

একসময় উঠে দাঁড়ায় ম্যাল্‌কম। বললে, আমি এবার ভাই চলি।

—কোথায় যাবে? কোন কাজ-টাজ আছে নাকি এদিকে?

—না না, কাজ-টাজ আবার কিসের? এমনিই একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, এই বয়সে ঘরে বসে না থেকে একটু চলা-ফেরা করা ভাল। আমিও রোজ বিকেলে একটু বেড়াতে বেরোই। চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

ঘুরতে ঘুরতে দুই বৃদ্ধ এসে দাঁড়ায় হাজরা পার্কের কাছে। পরিতোষ বললে, চলো না জনি, ঐ পার্কটার মধ্যে গিয়ে একটু বসি। এদিকে বোধহয় তুমি অনেকদিন আস নি?

—হ্যাঁ, এদিকটাতে বড় একটা আসা হয় না। চলো ভেতরে যাই।

পার্কের ভেতরে বসার মত উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে পরিতোষ ও ম্যাল্‌কম পায়চারি করতে করতে গল্প করতে থাকে। গল্প মানে পুরানো দিনের কাহিনীর পর্যালোচনা। হঠাৎ একসময়ে পরিতোষ বললে, আচ্ছা জনি, আগস্ট মুভমেন্টের সময় এই পার্কের সেই ঘটনাটা তোমার মনে আছে?

মৃদু হেসে ম্যাল্‌কম বললে, তা আর মনে নেই? দেখতে দেখতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল, কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিন মাত্র ঘটেছিল। আচ্ছা পরিতোষ, তুমি তো তখন ভবানীপুর থানায় ছিলে, তাই না?

—হ্যাঁ, ভবানীপুর থানায় ছিলাম বলেই তো সেদিন ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কি নিদারুণ অত্যাচার সেদিন হয়েছিল মেয়েদের ওপরে ভাবলে আজও দুঃখ হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম, তোমার দুঃখ হতে পারে কিন্তু আমার হয় না। দেশের শাসন যাদের হাতেই থাকবে তারাই পরিচালনা করবে পুলিশ বাহিনীকে। পুলিশ সেদিনও ছিল যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র বিশেষ, আজও কি তাই নয়? তবে তফাৎ এই যে, সেদিন লালবাজারকে পরিচালনা করত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, আর আজ সেখানে স্বদেশী কর্তাব্যক্তিরা বসে আছেন। বিদেশী লাঠির আঘাতে যতটা ব্যথা লাগে স্বদেশী লাঠির আঘাত কি তার চাইতে কম? তবে হ্যাঁ, বলতে পারো, ঘরের লোকের হাতে লাঞ্ছনা আর বাইরের মানুষের হাতে

লাঞ্ছনার মধ্যে তফাৎ কিছু আছেই।

কথা বলতে বলতে দুই বন্ধু মনে মনে চলে যায় উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের আগস্ট মাসের সেই রক্তরাঙা দিনগুলোতে।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—ডু অর ডাই—এই ছিল সেদিনকার শ্লোগান। এই শ্লোগান সেদিন সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল ভারতবর্ষের জনগণমন-অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধীর মুখে।

ক্রুদ্ধ ব্রিটিশ শার্দুলের চোখে তখন হিংস্র দৃষ্টি, নিঃশ্বাসে ড্রাগনের বিষ। আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডের যুদ্ধে জার্মানদের হাতে মিত্রশক্তির একটার পর একটা দারুণ বিপর্যয়। মরুশৃগাল বলে পরিচিত তরুণ জার্মান জেনারেল রোমেল ব্রিটিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে তব্রুক দখল করে এগিয়ে চলেছে এল-অ্যালামিনের দিকে। জার্মান বাহিনী সেবাস্তোপোল অধিকার করে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে স্তালিনগ্রাড অভিমুখে। এর কিছুদিন আগেই জাপানীরা পার্লহারবার বন্দরের পরে একে একে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন ছিনিয়ে নেয় ব্রিটিশের হাত থেকে। শধু তাই নয়, এই সিঙ্গাপুরেই তখন সংগঠিত হচ্ছিল ভারতের মুক্তি বাহিনী—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। একটার পর একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ব্রিটিশ তখন উন্মাদ। আর এই সময়ই কিনা কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত হল কুইট ইণ্ডিয়া! এদেশীয় নেতাদের এমন আচরণ কি আর সহ্য করা চলে? কাজেই আটই আগস্ট থেকে শুরু হল ব্যাপক গ্রেপ্তার। কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের জেলে পুরল ব্রিটিশ সরকার। আর তারই পরিণতিতে সারা দেশে আরম্ভ হল স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ। এমনিভাবেই মহাত্মাজীর অহিংস সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা সহিংস আন্দোলনের রূপ নিল।

আগস্ট আন্দোলনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লালবাজারের কর্মচাঞ্চল্য আরও বেড়ে উঠল। অগ্নিগর্ভ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাংঘাতিক সব খবর আসছে।

সরকারী অফিস-ভবনে জোর করে ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে তোলা হচ্ছে তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা। যোগাযোগ-ব্যবস্থা বন্ধ করা হচ্ছে টেলিগ্রাফের তার ও রেললাইন উপড়ে ফেলে। রেলস্টেশন, ডাকঘর, থানা প্রভৃতি সরকারী ভবনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দেশের শাসন-বাবস্থাকে অচল করে দেয়ার চেষ্টা চলেছে সর্বত্র। পুলিশও বসে নেই। ব্রিটিশ সরকার চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। কোথাও লাঠিচার্জ করে বে-আইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে পুলিশ, কোথাও বা চলেছে গুলি। গুলির মুখে বুক পেতে দাঁড়িয়ে আত্মাহুতি দিচ্ছে শত শত দেশপ্রেমিক। মুখে তাদের সেই একই শ্লোগান—ব্রিটিশ, কুইট ইণ্ডিয়া—ভারত ছাড়ো—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—ডু অর ডাই। কোন আপোষ নেই এবার। ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তেই হবে তাতে যত রক্তই ঝরুক। শহরের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচা হাতে লেখা ইংরেজি কবিতা—কুইট্ ইণ্ডিয়া ওহ্ জনবুল, ব্রিটিশ নো মোর শ্যাল ইণ্ডিয়া রুল।

হিংস্র হয়ে উঠেছে প্রতিটি প্রদেশের পুলিশ বাহিনী। জনতা এবার আর

অহিংস নয়। সেই সহিংস জনতার মোকাবিলায় আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে পুলিশ বাহিনী। তাদের সেই হিংস্রতায় ইন্ধন জোগাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশের ওপর নির্যাতন। না, একালের বিপ্লবীদের মত নির্বিচারে পুলিশ হত্যার যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নি সেদিন। একটি পুলিশ পরিবারকেও নির্যাতন সইতে হয় নি আন্দোলনকারীদের হাতে। তবে পুলিশ বাহিনীর লোকেরা, বিশেষ করে পোশাকপরা পুলিশের মধ্যে অনেককেই সেদিন পথে-ঘাটে হেনস্তা করেছে জনতা। বিদ্রূপ করেছে, অপমান করেছে তাদের। কোথাও কোথাও মারধোর পর্যন্ত হয়েছে তাদের ওপর।

চোখে ঘুম নেই পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদারের। দেশের আনফেয়ার ওয়েদার প্রচণ্ড রাফ হয়ে উঠেছে এবার। রাতদিন কেবল বৈঠক, আলোচনা আর নির্দেশ দান। সকালে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে বৈঠক করতে হয় তো বিকেলে ডাক আসে স্বয়ং লাট সাহেবের কাছ থেকে। অগ্নিগর্ভ শহর কলকাতা। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শহরের প্রতিটি সরকারী ভবনে পুলিশ পিকেট বসাতে হয়েছে। তাদের সতর্ক নজর কেবল সরকারী ভবনের নিরাপত্তার দিকেই নয়, নজর তাদের ভবনের মাথায় ঐ ইউনিয়ন জ্যাকের দিকেও। কেউ যেন ওখানে উঠে ঐ পতাকার অসম্মান না করতে পারে।

লালবাজারে পুলিশের সাধারণ ডিউটি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। একমাত্র ট্র্যাফিকের লোকজন ছাড়া বাহিনীর প্রতিটি লোককেই নিয়োগ করা হয়েছে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে। কীট্‌সের কাব্যগ্রন্থ মাথায় উঠেছে ফেয়ারওয়েদারের। এখন তার বদলে মাথার মধ্যে কেবল দুশ্চিন্তার কীটের আনাগোনা।

বাড়িতে মিসেস ফেয়ারওয়েদার স্বামীকে উৎসাহ দেয়, এই তো তোমার সুবর্ণ সুযোগ।

—কিসের সুযোগ? জিজ্ঞেস করে ফেয়ারওয়েদার।

জবাব দেয় মিসেস, কাজ দেখাবার। দেশের এমনি একটা পরিস্থিতিতে কাজ দেখিয়ে যদি গভর্ণমেন্টকে সন্তুষ্ট করতে পারো তো—কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় মিসেস। চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার।

—কি হবে তাহলে? মিসেসের মুখের দিকে তাকায় ফেয়ারওয়েদার।

মিসেস আবার জবাব দেয়, তাহলে তোমার নাইটহুড ঠেকায় কে?

ফেয়ারওয়েদার আর কিছু না বলে কেবল একটু হাসে। মিসেসের অনেক-কালের এই মনোবাসনাটি তার অজানা নয়। পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট যেমন নাইটহুড পেয়ে স্যার চার্লস টেগার্ট রূপে বিলেতের অভিজাত মহলে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন, মিসেস ফেয়ারওয়েদারেরও তাই ইচ্ছে। স্বামীর পদোন্নতির মূলে যে সে নিজে একথা মনে রেখেই মিসেস তার স্বামীর নাইট-হুডের অপেক্ষায় বসে বসে দিন গুনছে।

গোটা বাংলাদেশও সেদিন অগ্নিগর্ভ। দিকে দিকে হিংসাশ্রয়ী জনতা সর-কারকে পঙ্গু করে দিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই হিংসার রূপ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। পুলিশের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়েছে জনতা। কিন্তু সেই রাইফেল হিংসাশ্রয়ী কাজে ব্যবহার না করে ভেঙে টুকরো টুকরো করে

ফেলে দিয়েছে। দলছাড়া পুলিশকে হাতের কাছে পেয়ে নির্যাতন করেছে ঠিকই, কিন্তু তারপরেই সেই নির্যাতিতকে পৌঁছে দিয়েছে হাসপাতালে। সেদিন দেশ-প্রেমের উজ্জ্বলতম নজীর সৃষ্টি করেছিল মেদিনীপুর জেলা। ব্রিটিশ শাসন সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে দিয়ে গোটা তমলুক মহকুমা সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। তেরঙ্গা পতাকা হাতে সেদিন শহীদ হয়েছিলেন বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা।

জেলা শহর থেকে একটি একটি করে এমনি সব খবর আসছে আর শহর কলকাতার পুলিশী-ব্যবস্থাও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। বাংলার প্রাণকেন্দ্র এই কলকাতা। এখানকার শাসন-ব্যবস্থায় এতটুকু বাধা-বিঘ্নের অর্থই হল গোটা প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়া। কাজেই নির্মম হাতে এখানকার আন্দোলনের টুঁটি চেপে ধরতে হবে। জনতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচরণের অনিবার্য ফল মৃত্যু।

সরকারী আদেশে শহর কলকাতায় একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদার। সব রকম সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছে। মেদিনীপুরের ঘটনায় উদ্বিগ্ন গভর্ণমেণ্ট পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে—সুট অ্যাট সাইট। সরকারী-বেসরকারী যে কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করতে দেখলেই নির্বিচারে গুলি করো। ডেপুটি কমিশনারেরা রাতদিন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা তদারকিতে ব্যস্ত। কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও বাংলার ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকজনেরা পলিটিক্যাল খবর জোগাড়ের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। গোটা লালবাজার ঘিরে রাত-দিন যেন একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি। পুলিশ-ভর্তি কালো ভ্যান যাচ্ছে আসছে। লালবাজারে ছুটোছুটি করছে অ্যাংলো সার্জেণ্টদের ভারী মোটর সাইকেল।

এমনি দিনে একদিন উত্তর কলকাতা অঞ্চলে ট্রামের মধ্যে একদল জনতা একজন পশ্চিমা কনস্টেবলের ওপর মারপিট করে বসল। ছিঁড়ে ফেলল তার গায়ের পোশাক। ব্রিটিশ ক্রাউন মার্কা পেতলের তকমাসহ তার মাথার লাল পাগড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে জোর করে নামিয়ে দিলে ট্রাম থেকে।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল লালবাজার। কলকাতার মত শহরের রাস্তা-ঘাটে আর পুলিশের জীবন নিরাপদ নয়। তাই সার্কুলার দিল সি. পি. ফেয়ারওয়েদার—পোশাক পরে কেউ একা রাস্তায় বেরোবে না। অফিসারেরা সর্বদা রিভলবার সঙ্গে রাখবে।

বিপ্লবীদের আমলের পরে এতদিনে আবার পুলিশের পরিবার মহলে আশঙ্কার ছায়া পড়ল। কখন কার জীবনে কি ঘটবে কিছুই ঠিক নেই।

শঙ্কিত হয়ে ওঠে মেরিয়া। ম্যালকমের জন্যে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। একবার ইটের আঘাতে মাথা ফেটে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। আবার কি ঘটবে কে জানে?

ম্যালকমকে একদিন বললে মেরিয়া, এবার থেকে পোশাক ছাড়াই বাড়ি থেকে লালবাজার পর্যন্ত যাতায়াত করো তুমি। লালবাজারে পৌঁছেই না হয় পোশাক পরবে।

মৃদু হেসে ম্যাল্‌কম বললে, ভয় কিসের মেরী? চাকরি যখন করতেই হচ্ছে তখন এত ভয় পেলে চলবে কেন? ওদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত পোশাক ছেড়ে চোরের মত চলাফেরা করতে হবে?

নিজের সুন্দর মুখখানায় একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে মেরিয়া অনেকটা নিজের মনেই বলতে থাকে, এদেশে বাস করাটাই ঝকমারি ব্যাপার। চারিদিকে কেবল অশান্তি আর অশান্তি। মার্গারেটের কথামত আমরা যদি আগেই এদেশ থেকে বিলেতে পাড়ি দিতাম তাহলে আর এত অশান্তি সহ্য করতে হত না। এই বর্বর দেশটায় মানুষ থাকে নাকি? লণ্ডনে গিয়ে ওরা ইতিমধ্যে কেমন সুন্দর গুছিয়ে বসেছে। আর আমরা এখনও এই পোড়া দেশে পড়ে থেকে কেবল জ্বলে-পুড়ে মরছি। কবে যে এই যুদ্ধ শেষ হবে আর কবে যে আমরা বিলেতের মাটিতে পা দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবো তা একমাত্র লর্ড যীশুই জানেন।

মেরিয়াকে একটু খুশি করার চেষ্টায় জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, সত্যি ডার্লিং, যুদ্ধ শেষ হলে যেন বাঁচি! আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তুমি এতকাল ঠিকই বলতে, তেলে-জলে কখনও মেশে না। বাস্তবিকই তাই।

ম্যাল্‌কমের কথায় মেরিয়া কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার আন্তরিকতা নিয়ে বোধহয় মনে মনে বিচার করে। তারপর অপেক্ষাকৃত শান্ত সুরে বললে, এতদিনে তাহলে মোহ কেটেছে তোমার?

কিসের মোহের কথা বলতে চাইছে মেরিয়া? এর মধ্যে রুমা সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত আছে নাকি?

ম্যাল্‌কমকে চুপ করে থাকতে দেখে মৃদু হেসে মেরিয়া আবার বললে, আর দ্বিধা নয়, ইউরোপ একটু শান্ত হলেই যাতে আমরা ওদেশে পাড়ি দিতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাবাও সেদিন এই কথাই বলছিলেন।

ম্যাল্‌কম মনে মনে বললে, আগে যুদ্ধ তো থামুক, তারপর দেখা যাবে।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—এই শ্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়েই সেদিন একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে জনসভার আয়োজন করা হল হাজরা পার্কে। দেখতে দেখতে জনসমুদ্রে পরিণত হল এই ছোট পার্কটি। কাতারে কাতারে মানুষের মধ্যে সেদিন মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশি। সরকারী আদেশ উপেক্ষা করতে সেদিন কলকাতার মেয়েদের অফুরন্ত উৎসাহ।

এস. বি. মারফত জনসভার খবর আগেই পেঁছেছিল লালবাজারে, তাই পুলিশ বাহিনীও প্রস্তুত। আশুতোষ কলেজের সামনে পুলিশ-ভ্যানগুলো দাঁড়িয়ে। সারিবন্ধ লাঠিধারী কন্‌স্টেবলেরা রেসের ঘোড়ার মত কেবল হুকুমের অপেক্ষায়। কোমরে রিভলবার ও হাতে ব্যাটন নিয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টরাও প্রস্তুত। তাদের তদারকিতে রয়েছে সার্জেণ্ট-মেজর ম্যাল্‌কম। সেদিনকার পুলিশী-ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা সাউথ ডিস্ট্রিক্টের ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং!

হাজরা পার্কের মধ্যে মুহুর্মুহু শ্লোগান—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—ব্রিটিশ,

ভারত ছাড়—বন্দেমাতরম্।

প্রথমে পুলিশের তরফ থেকে যথারীতি জনসাধারণের প্রতি সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ। তারপরে পুলিশী অ্যাকশনের ভয় দেখিয়ে শাসানি। অবশেষে শুরু হল আসল পুলিশী অ্যাকশন—চার্জ!

কলকাতার অন্যান্য আন্দোলন থেকে এই আগস্ট আন্দোলনের চরিত্র যে একটু ভিন্ন ধরনের তার পরিচয় পেতে পুলিশকে বেশি দেরি করতে হল না। এবার আর লাঠিচার্জের শুরুতে ছত্রভঙ্গ হয় পালিয়ে গেল না জনতা। তার বদলে রুখে দাঁড়ালো তারা।

শুরু হল লড়াই। লালপাগড়ি দেখলে পায়ের চটি ফেলে পালিয়ে যাবার দিন গত হয়েছে। এবার পাল্টা মারের পালা। পুলিশের হাতে পাকা বেতের লাঠি, আর জনতার হাতে ইট ও সোডার বোতল।

কনস্টেবলদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম-ভারতের বাসিন্দা। উত্তর-ভারতের কিছু গাড়োয়ালীও ছিল তাদের মধ্যে। জনতার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে তারা অমানুষিক অত্যাচার শুরু করল। পুলিশের হাতে মার খেয়ে লুটিয়ে পড়ল কেউ। মাথা ফেটে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে, কিন্তু তার মধ্যেও চিৎকার করে বলতে চেষ্টা করছে—ব্রিটিশ, ভারত ছাড়—বন্দেমাতরম্।

ইট ও সোডার বোতলের আঘাতে পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও কেউ কেউ আহত হয়েছে। কপালে প্রচণ্ড চোট পেয়ে একজন সার্জেণ্ট মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গীরা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল পুলিশ-ভ্যানের দিকে।

এর পরেই পুলিশ বাহিনী দলে দলে চড়াও হল মেয়েদের ওপর। আরম্ভ হল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। একহাতে শাড়ির একপ্রান্ত বুকে জড়িয়ে অন্য হাতে তেরঙ্গা পতাকা উঁচু করে চিৎকার করছে তারা—বন্দেমাতরম্। পৈশাচিক উল্লাসে পুলিশ তাদের শাড়ির অন্যপ্রান্ত ধরে টানাটানি করছে। সকলের সামনে ওদের বে-ইজ্জতি করে ছাড়বে তারা। আতঙ্কে, ভয়ে কেউ কেউ চিৎকার করে উঠছে, কিন্তু তাতে ঐ নরপশুদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ছে না একটুও। সুযোগ-সন্ধানী প্রেস ফটোগ্রাফাররা তারই মধ্যে পুলিশের পৈশাচিক আচরণের ছবি চিরকালের মত সেলুলয়েডের ওপর ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠতেই লাঠি হাতে তাদের দিকেই তেড়ে এলো পুলিশ।

সেদিন হাজরা পার্কে যে বীভৎস নারকীয় কাণ্ড ঘটেছিল ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসে বুঝি তার কোন তুলনা নেই। সেদিন এই জঘন্য কাজে অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ভারতীয় কনস্টেবলদের সঙ্গে কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টও যোগ দিয়েছিল। আর এই সমগ্র ঘটনাটাই ঘটেছিল একজন দায়িত্বশীল অফিসার কলকাতা পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনারের চোখের সামনে। লাঠিচার্জের মধ্যে সেদিন সার্জেণ্ট মেজর ম্যালকম নিজেও ছিল, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে এমন অশালীন ব্যবহার তার মোটেই ভাল লাগে নি। কিন্তু ভাল না লাগলেও সেই মুহূর্তে কিছু বলার কিংবা করার উপায় ছিল না তার। যেখানে খোদ ডি. সি.-র চোখের সামনে গোটা ব্যাপারটা ঘটছে সেখানে তার নিজের ক্ষমতা কতটুকু? তবুও তারই মধ্যে ম্যালকম একজন গাড়োয়ালী

কনস্টেবলকে একটি মেয়ের শাড়ি ধরে টানাটানি করতে দেখে বাঘের মত তার হাতের ওপর একটা থাবা মেরে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠেছিল, স্টপ দিস নুইসেন্স, স্কাউনড্রেল ! ঘরমে আপনা মা-বেটি নেহি হ্যায় ?

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণই বটে ! পরের দিন জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজে এই নারী-নির্যাতন নিয়ে অনেক কথা লেখা হলেও ব্রিটিশ-ঘেঁষা কাগজগুলো ব্যাপারটাকে হাল্কা করে প্রচার করতে চেষ্টার কসুর করে নি। গভর্ণমেন্টও এমন একটা ঘটনার জন্যে ডি. সি. -র কাছে কোনরকম কৈফিয়ত তলব করেছিল বলে শোনা যায় নি। এই ব্রিটিশ জাতটাই আবার সভ্যতার বড়াই করে ! একজন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের জন্য সেকালে ঘটেছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, আর একালে শত শত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনাও ধামাচাপা পড়ে গেল অতি সহজেই।

আগস্ট আন্দোলনের মধ্যে শহর কলকাতা যেন থর থর করে কাঁপছে এক ভয়ঙ্কর আশঙ্কায়। কখন কি ঘটে বলা যায় না। পুলিশে পুলিশে গোটা শহরটাকে মুড়ে দিয়েও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না লালবাজার। কিন্তু এরই মধ্যে একটু ফুরসত পেলেই ম্যাল্‌কম এসে হাজির হয় রুমার বাড়িতে। এক দুর্নিবার আকর্ষণ যেন অহরহই তাকে এই বাড়িটির দিকে টেনে আনতে চায়।

দেশে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রুমার গানের আসরেও ভাঁটা পড়েছে। যুদ্ধের দরুন প্রতিটি অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীই অগ্নিমূল্য। চারিদিকে কেমন যেন একটা নাই-নাই রব। সব জিনিসই কণ্ট্রোল। তারই মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে একটা নতুন বাজারের অস্তিত্ব যার নাম কালো-বাজার। উত্তরকালে এই কালোবাজার শব্দটিই যে একটা ভয়ঙ্কর ময়াল সাপের মত গোটা ভারতবর্ষকে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে তাকে গ্রাস করে ফেলবে তা বোধহয় সেদিন কেউ কল্পনাই করতে পারে নি। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সেই দামামা ভারতবর্ষে একটা যুগের অবসান ঘটিয়ে আর একটা যুগের সূচনার সংকেতধ্বনি বাজিয়ে চলেছে। অতি দ্রুত জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে মানুষ। অতীতকে পেছনে ফেলে নতুনের দিকে বেপরোয়া ছুটে চলার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে মানুষের মধ্যে। এমনকি মানুষের রুচিবোধেরও পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করেছে অতি দ্রুতগতিতে। এমনি অবস্থায় রুমা বাঈজীর গানের আসরে যে ভাটা পড়বে তা তো স্বাভাবিক। বাঈজী ও তার গান নিয়ে মাতামাতি করার দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবে নারীদেহের চাহিদা সেদিনও যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনই আছে। বরঞ্চ কিছুটা বেড়েছে।

এখন আর নিয়মিত গানের আসর বসে না রুমার বাড়িতে। গানের মুজরোও কমে গেছে অনেক। পয়সা খরচ করে এসব পুরানো দিনের আনন্দে এখন আর মানুষের মন ভরে না।

কিন্তু এ নিয়ে দুঃখ করে না রুমা বাঈজী। মাঝে মাঝে দু'চারজন পুরানো খদ্দেরের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে তাদের রাতের অন্ধকারে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিতেই হয়। তা ছাড়া নিজেকে নিয়েই বেশ আছে রুমা। এতদিন ধরে সে যা রোজগার করেছে তাতে বাকি জীবনটা বেশ হেসে খেলেই কেটে যাবে তার।

তবে একটা জিনিস এখনও ছাড়ে নি রুমা। বাড়িতে নিয়মিত সঙ্গীতের আসর বসুক চাই না বসুক, মুজরোর ডাক পড়ুক চাই না পড়ুক, প্রতিদিনের রেওয়াজটি তার ঠিক আছে। মাইনে করা সারেঙ্গীওয়ালা ও তবলচি নিয়মিত হাজিরা দেয় তার রেওয়াজের সময়। এই সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই যেন বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে বেড়ায় রুমা। এটি না থাকলে সে বাঁচবে কি নিয়ে?

সেদিন বিকেলের দিকে ম্যাল্‌কম রুমার বাড়ি এসে হাজির হতেই রুমা বলে ওঠে, এসো—এসো সাহেব। আজকাল তোমাদের মুখ দেখতে পাওয়া তো একটা মস্ত পুণ্যের কাজ।

নিজের হাতেই একখানা টুল টেনে নিয়ে বসতে বসতে হেসে জবাব দেয় ম্যালকম, কেন রুমা?

—বারে, তোমরা যে এক-একটি মহাভারতের জীবন্ত চরিত্র। কেউ দুর্যোধন, কেউ দুঃশাসন, কেউ বা চোখ থাকতেও চোখ বন্ধ করে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হয়ে বসে আছো। তোমাদের দেখা মানেই তো অক্ষয় স্বর্গলাভ।

ম্যাল্‌কম মহাভারত পড়ে নি। কেবল রুমার মুখে মাঝে মাঝে একটু-আধটু কাহিনী শুনেছিল মাত্র। তাই রুমার হেঁয়ালী বুঝতে না পেরে সে তাকিয়ে থাকে রুমার দিকে।

রুমা খিল খিল করে হেসে ওঠে। তারপর হাসতে হাসতেই বলতে থাকে, ও হরি, এত করে যে তোমাকে মহাভারত শুনিয়েছি, এখন যে দেখছি কিছুই তোমার মনে নেই। পাশা খেলায় জিতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল মনে পড়ে, সাহেব?

এতক্ষণে গল্পটা সত্যিই মনে পড়ে ম্যাল্‌কমের, আর সেই সঙ্গে রুমার হেঁয়ালীটুকুও ধরা পড়ে। রুমার কথার কোন জবাব না দিয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে চুপ করে থাকে ম্যাল্‌কম।

মুখের ওপর থেকে হাসিটুকু মুছে নিয়ে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে রুমা এবার বললে, বলিহারি তোমাদের পৌরুষ! অসভ্যতারও একটা সীমা থাকে। তোমাদের দেখছি তাও নেই। মেয়েদের সঙ্গে ওরকম আচরণ করতে তোমাদের বিবেকে একটুও বাধল না? আর তোমাদের যে বড় অফিসারটি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল সেও চোখ বুজে দিব্বি ধৃতরাষ্ট্র সেজে বসে রইল!

এবার ধীরে ধীরে মুখ তোলে ম্যাল্‌কম। শান্ত চোখে রুমার দিকে তাকিয়ে শীতলকণ্ঠে কেবল বললে, ও নিয়ে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না, রুমা। জবাব দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে।

সেদিনকার পুলিশী তাণ্ডবের কথা খবরের কাগজে পড়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল রুমা। ম্যাল্‌কম থামতে চাইলেও রুমা থামতে চায় না। জিজ্ঞেস করে, সেদিন ঐ হাজরা পার্কে বোধহয় তুমিও ছিলে?

—হ্যাঁ, ছিলাম।

—মেয়েদের শাড়ি খোলার কাজে তুমিও বোধহয় হাত লাগিয়েছিলে?

একটু সময় স্থির চোখে রুমার দিকে তাকিয়ে থেকে তেমনি শান্ত স্বরে জবাব

দেয় ম্যাল্‌কম, যদি বলি লাগিয়েছিলাম ?

—তাহলে বলবো তোমার মধ্যের আসল মানুষটা মরে গেছে। মন বলে আর কোন কিছু তোমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

একটু সময় চুপ করে থাকে ম্যাল্‌কম। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বলতে থাকে, ঠিক বলেছ রুমা। মন বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তাই সেই মরা মন নিয়েই কেবল চাকরি করে চলেছি।

এতক্ষণে যেন একটু শান্ত হয় রুমা। সামান্য হাসির মাধ্যমে নিজের গুরুগম্ভীর ভাবটুকু ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করে অনেকটা হাল্কা সুরে বললে, যাক ওসব কথা। তা, তোমার সংসার কেমন চলছে, সাহেব ? আমাকে নিয়ে দাম্পত্য-কলহ শুরু হয় নি তো ?

—না, এখনও হয় নি। ম্যাল্‌কমও হাল্কা সুরে জবাব দেয়।

—তার মনে হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে ?

—তা থাকতে পারে। ভবিষ্যতের কথা তো কেউ বলতে পারে না।

একটু সময় চুপ করে থাকে রুমা। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, বিশ্বাস কর সাহেব , হাসপাতালে সেদিনকার ঘটনার কথা যখন ভাবি তখন নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠি। আমার বোকামীর জন্যেই সেদিন তোমার মেরিয়ার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। মেয়েদের পক্ষে ওটাই স্বাভাবিক। সেদিন যদি আমি ওখানে না যেতাম তাহলে বোধহয় মেরিয়া আমার কথা কোনদিন টেরই পেত না। এখনও যে তুমি মাঝে মাঝে এখানে আসো তাও বোধহয় সে বুঝতে পারে।

—না রুমা, মেরিয়া তা টের পাবে কেমন করে ? আর তাই যদি পেত তাহলে সে তা নিয়ে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই বলত আমাকে।

—না সাহেব। ভুল করছো তুমি। মেয়েদের যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে তার খবর কি তোমরা রাখো ? ঐ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে মেয়েরা অনেক কিছুই টের পায় যা নাকি তোমরা পাও না। আসলে মেরিয়া খুব বুদ্ধিমতী। তাই টের পেয়েও কিছু বলে না। যেদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে বলতে শুরু করবে সেদিন বুঝতে পারবে।

ম্যাল্‌কম কথা না বলে কেবল তাকিয়ে থাকে রুমার দিকে।

—আচ্ছা সাহেব, আমার একটা কথা রাখবে ? অনুনয়ের সুর ফুটে ওঠে রুমার কণ্ঠে।

—বল ! জবাব দেয় ম্যাল্‌কম।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে রুমা বললে, তুমি আর এখানে এসো না সাহেব। আমাকে নিয়ে যদি বাস্তবিকই কখনও তোমার সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে, আর সেই আগুনে যদি তোমাকে সত্যিই পুড়তে হয়, তাহলে যে আমার আর সেদিন দুঃখের শেষ থাকবে না।

—ঠিক সেই কারণেই তোমার এখানে আমি না এসে থাকতে পারব না, রুমা।

ম্যাল্‌কমের কথায় রুমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আবার হঠাৎ

তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি তোমার মেরিয়াকে ভালবাসো না, সাহেব ?

—হ্যাঁ, বাসি। অনেকের চাইতেই নিজের স্ত্রীকে বেশি ভালবাসি আমি।

—সংসারে তুমি শান্তি চাও না ?

—হ্যাঁ, চাই। আর চাই বলেই মাঝে মাঝে তোমার এখানে ছুটে আসি। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে সংসারের শান্তি তো দূরের কথা, চিরশান্তির রাজ্যে গিয়েও কি আমি শান্তিতে থাকতে পারবো বলে মনে কর, রুমা ?

ম্যাল্‌কমের কথায় চোখদু'টো ছল ছল করে ওঠে রুমার। রুমার জীবনের রিক্ততার মধ্যে এ যে কত বড় একটা সম্পদ তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝতে পারবে ?

রুমার বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে রুমা সতর্ক করে দেয় ম্যাল্‌কমকে। বলে, দিনকাল ভাল নয়, পথে-ঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করো সাহেব।

ম্যাল্‌কম সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে কেবল ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায় রুমার দিকে।

'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো' ধ্বনিতে মুখর শহর কলকাতা। স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সরকারী আদেশে। কোর্ট-কাছারীতে কেবল আন্দোলনকারীদের বিচারের প্রহসন। ইংরেজদের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। সেই দলে কলকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজও রয়েছে। সাদা চামড়ার মানুষ মাত্রই দেশের শত্রু, এমনি একটা ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণের মধ্যে। কালো চামড়ার অধিকারী হলেও পুলিশবাহিনীর লোকেরাও শত্রু বলে চিহ্নিত হয়েছে। দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করতে ওদের জুড়ি নেই। তাই লালবাজার সেদিন একটি ঘৃণিত নাম। ওখানকার কর্মচারীরা প্রত্যেকেই সেদিন দেশের শত্রু।

একশ' চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করে প্রতিদিনই শহরের কোথাও না কোথাও মিটিং হচ্ছে, আর কঠোর হাতে মিটিং ভেঙে দিচ্ছে পুলিশ। কোথাও জনতার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ পুলিশের, কোথাও বা পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। দেখতে দেখতে শহরের জেলগুলো ভরে উঠল। আর ঠাঁই নেই। দশজনের জায়গায় বিশজনকে রেখেও আর বন্দীদের স্থান হচ্ছে না জেলে, কাজেই সাধারণ অপরাধীদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাদের ছেড়ে দিয়ে রাজবন্দীদের জন্যে জায়গা করে দিতে হয়েছে। তবুও জেলের মধ্যে স্থান-সংকুলান হচ্ছে না।

সেদিন হঠাৎ লালবাজারের কণ্ট্রোল-রুমের একটা টেলিফোন ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে বেজে উঠল। ডিউটিরত অফিসার টেলিফোন তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, হ্যালো হ্যালো-লালবাজার! উত্তেজিত জনতা কালীঘাট ট্রাম ডিপো অ্যাটাক করেছে। শিগগির ফোর্স পাঠান—কুইক !

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু'গাড়ি পুলিশ বেরিয়ে গেল লালবাজার থেকে। তাদের সঙ্গে কয়েকজন সার্জেণ্ট। গোটা ফোর্সের পরিচালনার ভার সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্‌কমের ওপর।

হাজরা মোড় ছাড়িয়ে যেতেই জনতার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল

পুলিশের। ঝপ ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল দোকানের ঝাঁপ। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। অলিগলির মুখ থেকে পুলিশ-ভ্যানের ওপর পড়তে লাগল ইট-পাটকেল ও সোডার বোতল।

পুলিশ ড্রাইভার অতিকষ্টে ভ্যান দু'টো নিয়ে এগিয়ে যেতেই তাদের চোখে পড়ল একদল বিরাট জনতা মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালীঘাট ট্রাম ডিপো ঘিরে।

পুলিশ-ভ্যান দেখেই একটা সাড়া পড়ে গেল জনতার মধ্যে—পুলিশ, পুলিশ! কিন্তু জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখাল না। তার বদলে উত্তেজিত জনতার মুখে জেগে উঠল শ্লোগান - ব্রিটিশ, ভারত ছাড়ো—বন্দেমাতরম্!

ভ্যান থেকে নেমে এল পুলিশ বাহিনী। হাতে তাদের লাঠি ও রাইফেল। যথারীতি প্রথমে জনতাকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশ, পরক্ষণেই আরম্ভ হল লাঠি-চার্জ। কিন্তু লাঠিহাতে পুলিশ বাহিনী জনতার দিকে বেশি দূর এগোতে পারল না। তার আগেই পুলিশের ওপর মুষলধারে পড়তে আরম্ভ করল ইটের টুকরো।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুলিশ বাহিনী। দ্রুত চিন্তা করতে থাকে সার্জেণ্ট-মেজর ম্যাল্কম। পরক্ষণেই জনতার সেই আক্রমণ উপেক্ষা করে পুলিশ ফোর্স নিয়ে এগিয়ে যায় সে। রাইফেল বাহিনী দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ির কাছে।

সহসা জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য। পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। পরক্ষণেই ট্রাম ডিপোর একাংশ জ্বলে ওঠে দাউ-দাউ করে। জনতা আগুন লাগিয়েছে ট্রাম ডিপোতে।

সুট্ অ্যাট সাইট্—সরকারী-বেসরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করতে দেখলেই নির্বিচারে গুলি কর—পুলিশ কমিশনার ফেয়ারওয়েদারের এই নির্দেশের কথা মনে পড়ে ম্যাল্কমের। আর কোন দ্বিধা নয়। মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে তার। শক্তহাতে নিজের কোমর থেকে টেনে তোলে রিভলবার। পর মুহূর্তেই জনতার দিকে তাক করে টিপে দেয় ট্রিগার। এতদিনের চাকরিতে এই প্রথম ট্রিগার টিপে অশান্ত জনতার মোকাবিলায় দাঁড়াতে হল ম্যাল্কমকে।

গুলির শব্দে একটু ভড়কে যায় জনতা। কিন্তু গুলির আঘাতে একজনকে পড়ে যেতে দেখেই তারা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে।

না, আর রিভলবারে চলবে না। রাইফেল চাই এবার। গর্জে ওঠে কনস্টেবলদের হাতের রাইফেল। একঝাঁক তপ্ত সীসার গুলি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যায় জনতার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিশয্যা নেয় আরও কয়েকজন।

এবার ভয় পেয়ে পালাচ্ছে জনতা। আহত সঙ্গীদের দেহ ধরাধরি করে তুলে নিয়েই পালাচ্ছে তারা। দাউ-দাউ করে জ্বলছে ট্রাম ডিপোর একাংশ। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে। আগুনের লেলিহান শিখায় জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে। প্রতিরোধের ইচ্ছা ত্যাগ করে প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তারা।

মব্ ডিস্পার্সড—জনতা ছত্রভঙ্গ। পুলিশের বলপ্রয়োগের আর কোন প্রয়োজন নেই। হাতের রিভলবার কোমরে গুঁজতে ভুলে গিয়ে স্থির হয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে থাকে সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্কম।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এসে হাজির হয় দমকল। রক্তে ভেজা মাটিতে বুটের চিহ্ন ছড়িয়ে গোটা ট্রাম ডিপো ঘিরে রাখে পুলিশ বাহিনী, আর একটা পুলিশ-ভ্যানের গায়ে ঠেস দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্কম। জীবনে এই প্রথম নরহত্যার অপরাধে সে অপরাধী।

আইনের চোখে হয়ত ম্যাল্কম নির্দোষ। কিন্তু আইনই তো সব নয়। বিবেকের কাছে নিজের অপরাধ সে স্খালন করবে কোন্ আইনের সাহায্যে? পরের দিনের সংবাদপত্রেই ছড়িয়ে পড়বে তার কীর্তির কথা। পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট বলবে—হি হ্যাজ ডান্ হিজ ডিউটি। সরকারী ও দেশের স্বদেশী-বিরোধী মহল হয়ত বলবে—ওয়েল ডান, সার্জেণ্ট। আর কলকাতা তথা সমগ্র বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের অভিশম্পাত এসে পড়বে তার ওপর। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তারা মনে মনে তার উদ্দেশে কেবল দু'টি শব্দই উচ্চারণ করবে—বর্বর নরহত্যাকারী!

হাজরা পার্কের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধ ম্যালকম। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার কোটরগত ঘোলাটে চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই অতীতের ছায়া। সঙ্গী পরিতোষ ঘটকের দিকে তাকিয়ে নিজের শীর্ণ ডান হাতখানা মেলে ধরে চাপা কণ্ঠে সে বললে, জানো পরিতোষ, সেই প্রথম আমি নিজের হাতে একটি মানুষের জীবন-দীপ নিভিয়ে দিয়েছিলাম। সেই প্রথম আমি গুলি করে একটি মানুষ মেরেছিলাম। তার পরেও চাকরি-জীবনে অনেকবার আমাকে গুলি চালাতে হয়েছিল, কিন্তু প্রথমবারের মত আর মন খারাপ কোনদিনই হয় নি। সেদিনের মত বিবেকের দংশনও আর অনুভব করি নি কোনদিন।

পায়চারি থামিয়ে পক্ককেশ বৃদ্ধ পরিতোষ ঘটক কিছু না বলে কেবল তাকিয়ে থাকে সেই ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা বৃদ্ধ ম্যাল্কমের ঝুঁকে-পড়া দেহটার দিকে।

ম্যাল্কম আবার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা পরিতোষ, বলতে পার, একালে যখন স্বাধীন দেশের পুলিশ দেশের মানুষের ওপর গুলি চালায় তখন তাদের মনের অবস্থা কেমন হয়?

মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় পরিতোষ ঘটক, তা তো বলতে পারব না আমি।

## ॥ বারো ॥

দুর্ভাগ্য মিসেস ফেয়ারওয়েদারের। তার সাধও মিটল না, আশাও পুরল না! সরকারী তরফ থেকে স্বামীর নাইট-হুডের কোনরকম প্রতিশ্রুতিই পাওয়া গেল না। অগত্যা স্বামীর রিটায়ারের পরেও যে নাইট-হুড পেতে পারে এমনি একটা আশাতেই বুক বেঁধে বসে রইল মিসেস ফেয়ারওয়েদার। হয়ত মনকে এই

বলে প্রবোধ দিলে, সবুরে মেওয়া ফলে।

ফেয়ারওয়েদারের পরে লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের ঘরে এসে বসল মিস্টার রে। পুরো নাম আই. এ. রে। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। গোফ-দাড়ি পরিষ্কার কামানো। ঈষৎ গালভাঙা চোয়াল উঁচু চেহারার এই ব্যক্তিটির সর্বাঙ্গে কেমন একটা চোয়াড়ে ভাব। সারা চাকরি-জীবনে এই ভদ্রলোকটির মুখের হাসি দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়েছিল তা বোধহয় আঙুল গুনে বলা যেত। ভদ্রলোকের চলনে-বলনে সর্বদাই একটা স্পষ্ট সেকালের ফিরিঙ্গীয়ানা ভাব।

মিস্টার রে সি. পি.-র চেয়ার অলংকৃত করে বসল বলে কোন অতিরিক্ত 'রে' অর্থাৎ আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল না লালবাজারের চারিদিকে। একে তখন ঘরের কাছে চলছে যুদ্ধ, তার ওপর গোটা বাংলাদেশ জুড়ে তখন চলছে এমন এক দুর্ভিক্ষ যা নাকি সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যুদ্ধের রসদ যোগাতে ইস্পাহানী কোম্পানী মুঠো মুঠো কাগজের টাকার বিনিময়ে গ্রাম-বাংলার শস্য ভাণ্ডার শূন্য করে ফেলেছে। একমুঠো অন্নের জন্যে সেদিন গোটা বাংলাদেশ ডাক ছেড়ে কাঁদছে, কিন্তু সরকার নির্বিকার। দেশের মানুষের প্রয়োজনের চাইতে যুদ্ধের প্রয়োজন যে অনেক বড়।

সেদিন কলকাতার পথে পথে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নরনারীর মিছিল, রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালসার মৃতদেহ। যুবতী নারী একমুঠো অন্নের বিনিময়ে বিলিয়ে দিচ্ছে তার সতীত্ব। কালোবাজারের সহোদর কালো টাকায় ফেঁপে-ফুলে উঠছে একদল বুদ্ধিমান, আর বোকারা পথের কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে ডাস্টবিন থেকে পচা খাবার তুলে এনে তাতে চোখের জল মিশিয়ে খাচ্ছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার সংগ্রামে সেদিন গোটা বাঙালী জাতটা পর্যুদস্ত। পরাজিত বাঙালীকে সেদিন যমরাজের কাছে নজরানা দিতে হয়েছিল দশ লক্ষ নরনারীর অমূল্য জীবন। এরই পাশে পাশে আর একটা চোখ-জুড়ানো দৃশ্য। যুদ্ধের দৌলতে কোটি কোটি টাকার নোট উড়ছে কলকাতার বাতাসে। ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈনিকরা দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। রেস্টুরেণ্ট ও মদের দোকানে দেশী-বিদেশী ললনাদের সঙ্গে নিয়ে সৈনিকেরা আদিম উন্মত্ততায় মত্ত। মিলিটারী যান-বাহনে ভরে গেছে শহরের পথ-ঘাট। আরম্ভ হয়েছে জাতির অবক্ষয়ের প্রথম পর্ব।

এমন দিনে এক অপরাহ্ন বেলায় সি পি-র ঘরে ডাক পড়ল সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্‌কমের।

ঘরে ঢুকে ম্যাল্‌কম এ্যাটেনশন ভঙ্গিতে স্যালুট করে দাঁড়াতেই রে তার ভাবলেশহীন মুখখানা তুলে কয়েক মুহূর্ত ম্যাল্‌কমের বলিষ্ঠ চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে, আর ইউ ম্যাল্‌কম?

—ইয়েস স্যার। ঋজু দেহটাকে স্থির রেখে ম্যাল্‌কম জবাব দেয়।

সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রে। তারপর টেবিলের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বিস্মিত ম্যাল্‌কমের সাথে করমর্দন করে বলে ওঠে, কন্‌গ্রাচুলেশন সার্জেণ্ট। আই অ্যাম গ্ল্যাড, তোমার কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে গভর্ণমেণ্ট খুশি হয়ে তোমাকে পুলিশ মেডাল দেবার কথা ঘোষণা করেছে। সেরিমোনিয়্যাল প্যারেডে

মেডাল দেওয়া হবে তোমাকে।

আনন্দে উত্তেজনায় সেই মুহূর্তে মুখে কোন কথা সরছিল না ম্যাল্‌কমের। যদিও তার পুলিশ মেডালের সুপারিশ করছিল সি. পি. ফেয়ারওয়েদার, তবুও ম্যাল্‌কম কেবল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রে'র মুখের দিকে।

ব্রিটিশ জাতটার এই একটা গুণ, আদব-কায়দায় তারা চিরকালই দুরস্ত্‌। শহর কলকাতার পুলিশ কমিশনারও একজন সাধারণ পুলিশ সার্জেণ্টকে কন্‌গ্রাচুলেশন জানাতে গিয়ে নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না।

সি. পি.-র ঘর থেকে নিচে নেমে এসে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ম্যাল্‌কম। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের মস্ত সম্মান পুলিশ মেডাল দিয়ে তার কাজের স্বীকৃতি জানাতে চলেছে গভর্ণমেণ্ট। এমন একটা দিনের জন্যে ডিপার্টমেণ্টের প্রত্যেকেই লালায়িত।

ম্যাল্‌কমের একবার মনে হয় সার্জেণ্ট মেসে ছুটে গিয়ে উপস্থিত সবাইকে খবরটা জানিয়ে আসে। পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ে রুমার কথা। হ্যাঁ, রুমাকেই সে সর্বপ্রথম দেবে খবরটা। এই খবরে রুমার চাইতে বোধহয় বেশি খুশি আর কেউ হবে না। যদিও খবরটা শুনে রুমা তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হয়ত বিদ্রূপ করতে ছাড়বে না তাকে, তবুও সে ভালমতই জানে রুমা মনে মনে সবচাইতে বেশি খুশি হবে।

সেদিনের মত ডিউটি শেষ হয়েছিল সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্‌কমের। হাল্কা ভঙ্গিতে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সে। এবার তাকে মানিকতলার দিকে যেতে হবে।

সহসা মত বদল করে ম্যাল্‌কম। না, রুমা নয়, সর্বপ্রথম এই সুখবরটি পাওয়ার অধিকারী তার বিবাহিতা স্ত্রী মেরিয়া। স্বামীর সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার তার স্ত্রী। কাজেই তাকেই আগে দিতে হবে এই সুখবর।

পার্ক স্ট্রীটে নিজেই বাড়ির সামনে একখানা মিলিটারী জীপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমটায় একটু বিস্ময় বোধ করে ম্যাল্‌কম। এই জীপে করে কে এল তার বাড়িতে? তবে কি তার প্রতিবেশী ডি' সিলভা পরিবারের কেউ এল? বোধহয় তাই।

নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় 'নক' করে ম্যাল্‌কম। কোন সাড়া-শব্দ নেই। আবার 'নক' করে। এবার খুলে যায় দরজা। কিন্তু দরজা খুলে দিয়ে যে লোকটি এসে সামনে দাঁড়ায় তাকে দেখে আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না ম্যাল্‌কমের। এ কে? ম্যাল্‌কম জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে সেই সুপুরুষ মিলিটারী ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাতে যেন নিজের বাড়িতে ম্যাল্‌কমকে অভ্যার্থনা করছে এমনি ভঙ্গিতে ইয়াঙ্ক উচ্চারণে বলে ওঠে সেই লোকটি, আই থিঙ্ক ইউ আর মিস্টার ম্যালকম। প্লীজ কাম ইন। ভেরী গ্ল্যাড টু মিট ইউ। বলেই সেই মিলিটারী ক্যাপ্টেন বিমূঢ় ম্যাল্‌কমের একখানি হাত টেনে নিয়ে অনেকটা জোর করেই যেন করমর্দন করে তার সঙ্গে।

লম্বা-চওড়া আমেরিকান ক্যাপ্টেনটির বয়স বোঝা শক্ত। তবে দেখতে-শুনতে বাস্তবিকই সুপুরুষ। ম্যাল্‌কমের নিজের মতই বোধহয় বয়স, কিংবা দু'এক

বছর কমও হতে পারে।

ম্যাল্‌কমের বিমূঢ় ভাবটা কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। মাথার টুপিটা হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে সে বলতে চেষ্টা করে, আমি ঠিক আপনাকে, মানে…

—ওহ্‌—ইয়েস্‌—ইয়েস, সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে ওঠে সেই মিলিটারী ক্যাপ্টেন, আমাকে আপনি চিনবেন কি করে? আমার নাম ক্যাপ্টেন ইয়ং। যদিও বয়সের দিক থেকে খুব একটা ইয়ং নই আমি। বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে।

আর যাই হোক, কথাবার্তায় লোকটি যে বেশ প্রাণোচ্ছল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না ম্যাল্‌কমের। বেশ স্মার্ট ও সপ্রতিভ। অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে খুবই দক্ষ। কিন্তু ওর এখানে আগমনের কারণ তখনও ঠিক বুঝতে পারে নি ম্যাল্‌কম।

ক্যাপ্টেন ইয়ং আবার হাত-পা নেড়ে বলতে থাকে, এবার বোধহয় আমাকে চিনতে পেরেছেন, মিস্টার ম্যাল্‌কম। আমার কথা এতদিনে বোধহয় আপনার স্ত্রী, মানে মেরিয়ার কাছে শুনছেন। সী ইজ মাই ফ্রেণ্ড। এই তো কিছুদিন মাত্র আমাদের পরিচয়, কিন্তু এরই মধ্যে আমরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। সী ইজ রিয়েলি এ নাইস গার্ল। ইউ আর লাকি মিস্টার ম্যাল্‌কম টু হ্যাভ সাচ এ নাইস ওয়াইফ।

সী ইজ মাই ফ্রেণ্ড - মেরিয়া হচ্ছে এই ইয়াঙ্কি ক্যাপ্টেনের বান্ধবী! শুধু তাই নয়, ক্যাপ্টেনের মুখে মেরিয়া একজন 'লেডী' নয়, কেবলমাত্র 'এ নাইস গার্ল'। এই কথা দু'টোই ম্যাল্‌কমের মনে ঝড় তুলতে যথেষ্ট।

কিছু বলার জন্যে ম্যাল্‌কম মুখ তুলতেই ক্যাপ্টেন ইয়ং আবার বলে ওঠে, জানেন মিস্টার ম্যাল্‌কম, টুয়েণ্টি থ্রি লাইট্‌ ইনফ্যাণ্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত আছি আমি। রাত-দিন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে। সময় একদম পাই না। মেরিয়া আমাকে অনেকবার এখানে আসতে বলেছে, কিন্তু সুযোগ পাই নি। আজ আমাদের একটু ডায়মণ্ডহারবার সাইডে বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম আছে। ঘণ্টা কয়েকের ছুটিও নিয়েছি হেড কোয়ার্টার থেকে। তাই এখান থেকে মেরিয়াকে তুলে নিতে এসেছি।

ম্যাল্‌কম তার সারা দেহে একটা তীব্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অনুভব করে। সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেন তার ধমনীর প্রতিটি রক্তবিন্দুর মধ্যে সৃষ্টি করে তুলেছে এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়। সেই ঝড়ের বেগ যেন আর সইতে পারছে না ম্যাল্‌কম। তার ছ' ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা দীর্ঘ দেহটা যেন ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তে পড়ে টলমল করছে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করে, মেরিয়া কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় ক্যাপ্টেন ইয়ং, মেয়েদের কথা আর বলবেন না। ওদের প্রস্তুত হতেই যতটা সময় লাগে তার ভেতর আমরা শ'খানেক জাপানী ট্যাঙ্ক ঘায়েল করে ফেলতে পারি। বলেই আবার হেসে ওঠে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে এসে দাঁড়ায় মেরিয়া। এমনিতেই মেরিয়া সুন্দরী,

তার ওপর দেখবার মত তার সেদিনকার প্রসাধনের ঘটা। যেন কিছুই হয় নি এমনি ভঙ্গিতে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একখানি ছোট্ট আয়না ও পাউডারের পাফ বের করে নিজের চোখ দুটি আয়নার ওপর নিবদ্ধ রেখে মুখের ওপর আলতো হাতে পাফটা ঘষতে ঘষতে ম্যাল্‌কমকে উদ্দেশ করে মেরিয়া বলতে থাকে, আই থিঙ্ক, তোমাদের মধ্যে এতক্ষণে আলাপ-পরিচয়ের পালা শেষ হয়েছে, জনি। বলব-বলব করেও ওর কথা এতদিন তোমাকে বলা হয় নি। আমেরিকানরা যে এত ভাল তা এতদিন আমার জানা ছিল না। ইয়ং ইজ রিয়েলি এ নাইস বয়। হি নোজ হাউ টু বিহেভ উইথ এ—

মেরিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন ইয়ং বলে ওঠে, উইথ এ গার্ল।

পরক্ষণেই আবার নিজেকে সংশোধন করে, ইয়েস-ইয়েস, লেডী। বলতে বলতে হেসে ওঠে ক্যাপ্টেন ইয়ং। মেরিয়াও খিল খিল করে হেসে ওঠে।

সহসা হাসি থামিয়ে মেরিয়া ম্যাল্‌কমের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি তো ডিউটি থেকে ফিরছো। মিট্‌সেফের মধ্যে তোমার প্যাটিস্‌ আছে, ফ্লাস্কে চা-ও রেখেছি। রাত দশটার মধ্যে আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব। আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, ডার্লিং।

কথাটা বলেই ম্যালকমকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় মেরিয়া। ক্যাপ্টেন ইয়ংও অনুসরণ করে তাকে।

মেরিয়াকে পাশে বসিয়ে জীপে স্টার্ট দিতে দিতে ক্যাপ্টেন ইয়ং ম্যাল্‌কমের দিকে হাত তুলে কেবল বলে ওঠে, টা— টা! পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে যায় মিলিটারী জীপ।

বজ্রাহতের মত সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কম। পুলিশ মেডালের খবরটা দেওয়ার আর সুযোগ হল না মেরিয়াকে।

এতক্ষণ ধরে চোখের সামনে কি দেখল ম্যাল্‌কম? রুপোলী পর্দায় কোন সিনেমার গল্প নাকি? অথবা গোটা ব্যাপারটাই ঘটে গেল স্বপ্নের মধ্যে?

না তো, রুপোলী পর্দাও নয়, স্বপ্নও নয়। ব্যাপারটা বাস্তব সত্য। এর মধ্যে কল্পনার স্থান নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই তবে মেরিয়া ঐ আমেরিকান ক্যাপ্টেনটির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সেকথা ম্যালকমকে জানাতে কোনরকম দ্বিধাও নেই মেরিয়ার।

কিন্তু কেন? হঠাৎ মেরিয়ার চরিত্রের এই নিদারুণ পরিবর্তন কেন? কলকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মেয়ে হয়ে খাঁটি ইউরোপীয়ান বা আমেরিকানদের সঙ্গে মিশবার কোনরকম সুযোগ না পেলেও ওদের সম্বন্ধে মেরিয়ার উচ্চ ধারণা ও কৌতূহলের খবর ম্যালকমের অজানা নয়। তবে কি সেই কৌতূহল ও উচ্চ ধারণার বশবর্তী হয়েই মেরিয়া ক্যাপ্টেন ইয়ংয়ের সাথে এমন ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে? না কি, মেরিয়া মনে করছে এদেশ ছেড়ে চলে গিয়ে বিলেত কিংবা আমেরিকার মাটিতে তাড়াতাড়ি পা দেবার এইটিই প্রশস্ত পথ?

বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র তার মনের গতি। সেই গতি কখন যে কোন্‌ খাতে বইবে তা আগে থেকে অনুমান করাই দুঃসাধ্য। কিন্তু সেই গতি-প্রকৃতির

আভাস অন্যকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হবার সুযোগ করে দেয়। আর তা না হলে আচমকা এক বিস্ময়ের ধাক্কায় সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

মেরিয়ার চরিত্র পরিবর্তনের এই খবরে তেমনি এক বিস্ময়ের ধাক্কায় বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে ম্যাল্কম। এ কি হল? এ কেন হল? মেরিয়া তো এমন ছিল না।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে মেরিয়াকে নিয়েই ভাবতে বসে ম্যাল্কম। এবার সে কি করবে? ঝগড়া করবে ওর সঙ্গে? ডাইভোর্স করবে ওকে? ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করার সার্থকতা কোথায়? যে স্ত্রী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত এবং প্রকাশ্যে তা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত নয় তাকে আর যাই হোক স্ত্রীর সম্মান দেওয়া কিছুতেই চলে না। তবে কি সে মেরিয়াকে ডাইভোর্সই করবে? এ বিষয়ে কে তাকে পরামর্শ দিতে পারে? সাংসারিক জীবনের এমন একটা লজ্জাকর সমস্যা নিয়ে সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে সমাধানের আশায়? তাতে যে আরও লোক-জানাজানি হবে।

অবশেষে চুপ করে থাকতেই মনস্থ করে ম্যাল্কম। দেখা যাক জল কতদূর গড়ায়।

সংসারে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ম্যাল্কম ও মেরিয়ার মধ্যে। কথাবার্তা বন্ধ হয় নি, ঝগড়া-ঝাঁটিও নয়, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যোগসূত্রটা যেন ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও ম্যালকম বলে না মেরিয়ার সঙ্গে। তার এই অসামাজিক আচরণের কৈফিয়ত তো দূরের কথা, এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্যও করে না। মেরিয়াও প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথারও জবাব দেয় না ম্যাল্কমকে। তাকে অগ্রাহ্য করে সে নিয়মিত মেলামেশা করে ক্যাপ্টেন ইয়ংয়ের সঙ্গে।

কিন্তু বারুদের স্তূপে একদিন না একদিন বিস্ফোরণ ঘটবেই। ম্যালকমের জীবনেও তেমনি বিস্ফোরণ ঘটল একদিন। সেদিন সে মেরিয়াকে সরাসরি প্রশ্ন করল, এমনিভাবে আর কতদিন চলবে? ঐ আমেরিকানটাকে বিয়ে করতে চাও তুমি? তাই যদি ইচ্ছে, এস মামলা-মোকদ্দমা না করে ভদ্রভাবে আমরা পরস্পরকে ডাইভোর্স করি।

তির্যক ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে মেরিয়া জবাব দেয়, তোমার নিজেরও কি তাই ইচ্ছে?

—যদি বলি, হ্যাঁ?

—তাহলে শুনে রাখো, আমার তেমন কোন ইচ্ছে নেই। তবে তুমি যদি আমার নামে কোর্টে ডাইভোর্স সুট্ আনতে চাও তো স্বতন্ত্র কথা। তখন কোর্টে গিয়ে যা জবাব দেওয়ার আমি দেব।

অধৈর্য কণ্ঠে বলে ওঠে ম্যাল্কম, তাহালে তুমি কী চাও? আমার স্ত্রী বলে গায়ে লেবেল এঁটে এমনিভাবে ব্যভিচার করে বেড়াবে?

উত্তেজিত না হয়ে শান্তকণ্ঠে মেরিয়া বললে, একে তুমি ব্যভিচার বলে ভাবছ কেন, জান? এটা হচ্ছে নিছক অধিকারের প্রশ্ন। মিলিটারী হলেও ক্যাপ্টেন ইয়ং এক ভদ্রবংশের সন্তান। বেচারী আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দীর্ঘকাল দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার যদি আমাকে একান্তই ভাল লেগে থাকে আর সেই ভাল

লাগায় সাড়া দিয়ে আমি যদি তাকে মাঝে-মধ্যে সঙ্গদান করি সেটা এমন কি অন্যায় কাজ, শুনি ?

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে এবার চিৎকার করে ওঠে ম্যাল্‌কম। বলতে থাকে, এছাড়া আর কাকে ব্যভিচার বলে, মেরিয়া ? তুমি কি বলতে চাইছো এমনি ব্যভিচার করার অধিকার স্ত্রী হিসেবে তোমার আছে ?

—আলবাৎ আছে। মেরিয়াও এবার দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দেয়, স্বামী হিসেবে সে অধিকার যদি তোমার থাকতে পারে তবে স্ত্রী হিসেবে তা আমারও নিশ্চয়ই আছে

একটু সময় চুপ করে থাকে ম্যাল্‌কম। তারপর আবার বলতে থাকে, ও বুঝেছি, সেই রুমা মহিলাটির কথা বলছো তুমি। তোমার বুঝি ধারণা হয়েছে আমি তার সঙ্গে ব্যভিচার করে চলেছি ?

—ধারণা নয়, সেটাই সত্যি।

— তুমি ভুল করেছ, মেরিয়া। আমি—

—না, আমি মোটেই ভুল করি নি। অস্বীকার করতে পার যে, তুমি তার কাছে মাঝে মাঝেই যাতায়াত কর ?

—হ্যাঁ, করি, স্পষ্টকণ্ঠে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, রুমার কাছে মাঝে মাঝেই আমি যাই। কিন্তু কেন যাই জান ? গান শুনতে যাই। তার গান আমার ভাল লাগে।

—তা আমি জানি। ভাল লাগে বলেই বুঝি ওর একটা বাংলা গান তুমি ইংরেজি অক্ষরে কাগজে টুকে এনেছিলে ? সেই কাগজটা আমারও চোখে পড়েছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। রুমার মুখে শোনা ম্যাল্‌কমের সেই প্রিয় গানটি 'সখী বলে দে, কোথায় গেলে শুনতে পাব ( সেই ) পাগল করা বাঁশির সুর' একদিন সে ইংরেজি অক্ষরে রুমার কাছ থেকেই লিখে এনেছিল। সেই কাগজখানা যে আবার মেরিয়ার চোখে পড়বে, আর মেরিয়া যে তার পাঠোদ্ধার করবে তা সে ধারণা করতে পারে নি।

ম্যাল্‌কমকে চুপ করে থাকতে দেখে মেরিয়া আবার বলতে থাকে, তুমি ভেবেছিলে তুমি যা করে বেড়াও তা বুঝি কেউ টের পায় না ? শুধু কি তাই, আরও প্রমাণ চাও তুমি ?

—কি প্রমাণ আছে তোমার কাছে ? জ্বলন্ত চোখে ম্যাল্‌কম তাকিয়ে থাকে মেরিয়ার দিকে।

জবাব দেয় মেরিয়া, তোমার ইউনিফর্ম কাচতে দিতে গিয়ে একটা ডায়মণ্ড সেট-করা দামী হেয়ার-পিন পেয়েছি তোমার পকেটে। ওটা কার বলতে পার ? সেই রুমা মেয়েটার গান ভাল লাগার সঙ্গে এই হেয়ার-পিনটার কোন সম্পর্ক আছে কি ?

এতক্ষণে ব্যাপারটা মনে পড়ে ম্যাল্‌কমের। রুমার একজন ধনী গুণগ্রাহী একবার খুশি হয়ে নাকি ওকে একজোড়া দামী হেয়ার-পিন উপহার দিয়েছিল। 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' ছাপ মারা হেয়ার-পিন জোড়ার একটা নাকি হারিয়ে যায়।

কলকাতার বাজারে অবিকল ঐ রকম আর একটা না পেয়ে রুমা একদিন ম্যাল্‌কমকে বলেছিল। জবাবে ম্যাল্‌কম বলেছিল, দিশি দোকানে না পেলেও বিলিতি দোকানে খোঁজ করতে পার।

—এসব জিনিসের বিলিতি দোকান আবার কলকাতায় আছে নাকি? জিজ্ঞেস করেছিল রুমা।

হেসে জবাব দিয়েছিল ম্যাল্‌কম, সে কি, বিলিতি দোকানের অভাব কি? লালবাজারের কাছে ডালহৌসী এলাকাতেই তো এসব জিনিসের বিলিতি দোকান রয়েছে। ওদের কাছে যদি এরকম আর একটা নাও থাকে তো ওরা বিলেত থেকে আনিয়ে দিতে পারবে। তুমি একবার ওখানে খোঁজ করো।

—ওরে বাবা, আমি ঢুকব সাহেবদের দোকানে? তা হলেই হয়েছে! ওদের কথার একটা অক্ষরও বুঝতে পারব নাকি? হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ করে ওরা কি সব বলবে—

—না-না, ওদের মধ্যে অনেকেই বাংলা জানে।

হেসে বলেছিল রুমা, সাহেবদের মুখের বাংলা তো? ও তো প্রায় ইংরেজিই।

—তা হলে আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ কেমন করে?

—এই দ্যাখো, তোমার সাথে অন্যের তুলনা? সাহেবের আর আছে কি তোমার মধ্যে? চলন-বলন, কথাবার্তা, এমন কি চিন্তা-ভাবনায়ও যে তুমি সেই হিন্দু স্টুয়ার্ট সাহেবের মত হয়ে উঠেছ।

—হিন্দু স্টুয়ার্ট, সে আবার কে? কৌতূহলী ম্যাল্‌কম জিজ্ঞেস করেছিল রুমাকে।

জবাবে রুমা হেসে বলেছিল, কে তা আমি কি করে বলব? আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, অতশত জানব কেমন করে? তবে শুনেছিলাম এই কলকাতায় নাকি ঐ নামে এক সাহেব ছিল। সে নাকি রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করত, পুজোআচ্চা করত ঠিক হিন্দুদের মত।

মিথ্যে বলে নি রুমা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল তখন। মেজর-জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট নামে একজন ফৌজী ইংরেজ এদেশে এলেন কোম্পানীর এক বড় চাকরি নিয়ে। সেকালের শহর কলকাতায় তিনি থাকতেন উড্ স্ট্রীট আর থিয়েটার রোডের মোড়ের একটা বাড়িতে।

একে খাঁটি বিলিতি, তায় আবার ফৌজী চেহারা ও মেজাজ। কাজেই তাঁর এদেশীয় কর্মচারীরা ভয়ে একটু দূরে দূরেই থাকত তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু আশ্চর্য চরিত্র এই সাহেবটির। কড়া মেজাজ হলেও তিনি এদেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ পড়তে তাঁর খুব ভাল লাগত। ধীরে ধীরে তিনি আকৃষ্ট হলেন হিন্দুধর্মের প্রতি। রোজ সকালে তিনি নিজের বাড়ি থেকে হেঁটে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করতেন। বাড়িতে রেখেছিলেন একটি শালগ্রাম শিলা। কিন্তু পুজো করবে কে? তিনি নিজে তো খ্রীস্টান। হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তিনি খ্রীস্টধর্ম পরিত্যাগ করেন নি। অবশেষে একজন ব্রাহ্মণ পুরুত-ঠাকুর ঠিক করলেন। সেই পুরুত-ঠাকুরই প্রতিদিন সাহেবের

বাড়ি গিয়ে তাঁর শালগ্রাম শিলা পুজো করত।

এদিকে স্টুয়ার্টের এই আচরণে ক্ষেপে উঠল কলকাতার খ্রীস্টান সমাজ। তারা প্রায় একঘরে করল তাঁকে। কিন্তু ফৌজী মেজাজের মানুষ চার্লস স্টুয়ার্টের তাতে কিছুই যেত-আসত না। তিনি ভাঙা বাংলায় ওদের গালাগাল দিয়ে বলতেন, আমি আমার মতে চলব, তাতে ওই শালাদের কি? আমি ওদের পরোয়া করি নাকি? ওরা আমাকে ঠাট্টা করে বলে হিন্দু স্টুয়ার্ট। ওদের যা ইচ্ছে বলুক, তাতে আমার বয়েই গেল।

আমৃত্যু নিজের মতে চলেছিলেন সেই স্টুয়ার্ট সাহেব। এমনকি মৃত্যুর পরেও তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে তাঁর কবরের ওপর যে সমাধিটি তৈরি করা হয়েছিল তা দেখতে ছিল অবিকল একটি ছোট্ট হিন্দু মন্দিরের মত।

রুমাকে আর সেই হেয়ার-পিন কিনতে ডালহৌসী পাড়ায় যেতে হয় নি। ম্যাল্কম নিজেই নিয়েছিল সেই দায়িত্ব। অবিকল আর একটি যোগাড় করতে হবে বলে রুমার কাছ থেকে সেই হেয়ার-পিন নিয়ে কাগজে মুড়ে সে রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে। কিন্তু নানা কাজে ভুলেই গিয়েছিল সেটার কথা। কিন্তু সেই হেয়ার-পিনটা যে আবার মেরিয়ার চোখে পড়েছে তা সে জানবে কেমন করে?

মেরিয়ার কথায় কিছুক্ষণের জন্য বাস্তবিকই একটু বিব্রত বোধ করে ম্যাল্কম। পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতের চেটোয় বাঁ হাতের তর্জনীর আঘাত করতে করতে বলতে থাকে, শোন মেরিয়া, আজ তবে স্পষ্ট কথা শোন। রুমা একজন বাঈজী। অনেক দিন আগে, এমনকি আমাদের বিয়েরও আগে থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। ওর গলার গান মুগ্ধ করেছে আমাকে। সেই থেকেই আমি ওর কাছে গান শুনতে যেতাম। হ্যাঁ, আজও যাই ওর কাছে। কিন্তু রুমার সাথে আজ পর্যন্ত কোনদিন কোন দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করি নি আমি। বাঈজী হলেও রুমা অন্য ধাতের মেয়ে। ও কোনদিন আমাকে ওর অঙ্গ স্পর্শ করতে দেয় নি। ওর ব্যাপারে আমাকে অবশ্যি কিছু কিছু মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল তোমার কাছে। কিন্তু আজ সব কথা খোলসা করে বললাম।

কথা শেষ করে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে ম্যাল্কম। চেয়ারের একটা হাতল ধরে নিজের ঝুঁকে-পড়া দীর্ঘ দেহটাকে সামলে নেয় সে।

মেরিয়ার সুন্দর ঠোঁট জোড়ায় এবার ছড়িয়ে পড়ে একটু বাঁকা হাসি। বিদ্রূপের সুরে সে জবাব দেয়, বাঃ, বেশ সুন্দর একখানি নাটক ফেঁদে বসলে তো আমার সামনে! বাঈজী মানে তো গণিকা—প্রস্টিট্যুট। একজন প্রস্টিট্যুটের কাছে তুমি যাতায়াত কর কিন্তু তাকে কোনদিন স্পর্শ পর্যন্ত কর নি। তুমি যে দেখছি একজন খাঁটি সন্ন্যাসী! তা প্লীজ, আমাকেও তেমনি একজন সন্ন্যাসিনী বলে ধরে নাও না, জনি। তাহলে তো তোমার আর রাগের কোন কারণ থাকবে না।

—তার মানে? তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে ম্যালকম তাকিয়ে থাকে মেরিয়ার দিকে।

ম্যাল্কমের সেই দৃষ্টি অগ্রাহ্য করেই বলতে থাকে মেরিয়া, মনে কর আমিও

তোমার মত একজন সন্ন্যাসিনী। আমেরিকান ক্যাপ্টেন ইয়ংয়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা থাকলেও সে কখনও আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। বলেই হেসে ওঠে মেরিয়া।

ক্যাপ্টেন ইয়ং এদেশে একজন আত্মীয়-পরিজনহীন সৈনিক। তাছাড়া সে আমেরিকান। আমেরিকান সৈনিকরা যে একটু অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খল একথা তো সবাই জানে। সেই ক্যাপ্টেন ইয়ং যে মেরিয়ার মত একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও তাকে কোনদিন স্পর্শ করে নি একথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু সেকথা মেরিয়াকে বলতে গেলে সে হয়ত উল্টে ম্যাল্‌কমের ওপর আবার কোন কটাক্ষ করে বসবে। তাই মেরিয়ার এই উপহাসটুকু হজম করে সে চুপ করেই থাকে।

ম্যাল্‌কমের মুখের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের তৃপ্তি বোধ করে মেরিয়া। এমনি এক তৃপ্তিই বোধহয় ক্যাপ্টেন ইয়ংয়ের সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণ। স্বামীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়েই সে এই অস্বাভাবিক পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু এ পথে একবার পা বাড়ালে যে আর ফেরা চলে না সে কথা বোধহয় সে তখন জানত না।

বাস্তবিকই তাই। ফেরার কোন পথ আর খোলা নেই মেরিয়ার। নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ মেরিয়াকে তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবকিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে। কোন ধরনের ভয়েই আর ভীত নয় সে। ম্যাল্‌কম বড় জোর তাকে ডাইভোর্স করতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না মেরিয়া।

মাঝে মাঝে গভীর রাতে মেরিয়াকে জীপে করে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয় ক্যাপ্টেন ইয়ং। সেই মুহূর্তে তার চেহারায় লেগে থাকে উচ্ছৃঙ্খলতার স্পষ্ট চিহ্ন। স্খলিত-পায়ে ঘরে ঢুকে ধপ্‌ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে মেরিয়া। ক্লান্তিতে বুজে আসে তার চোখের পাতা।

এমনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন কি সত্যিই ভাল লাগে মেরিয়ার? স্বামীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা থেকে যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি তা কি সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে তাকে? তাই যদি হবে তাহলে বাড়ি ফিরে মাঝে মাঝে কাঁদে কেন মেরিয়া? নিজের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদে কেন? কিসের দুঃখ তার?

ম্যাল্‌কমের মনে হয় ঐ উচ্ছৃঙ্খল আমেরিকানটার জন্যই মেরিয়ার এই দুঃখ। একদিন তাকে ছেড়ে দিতে হবে তা ভেবেই বোধহয় মেরিয়া মাঝে মাঝে এমনি করে কাঁদে। নইলে যে স্ত্রীলোক রাতভর পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থেকে শেষরাতে বাড়ি ফিরে আসে সে কেন মাঝে মাঝে কাঁদে এমনি করে?

রুমা কিন্তু অন্য কথা বলে। ক্ষিপ্ত ম্যাল্‌কমকে শান্ত করতে চেষ্টা করে সে বলে, মেয়েদের মন এমন সহজ বস্তু নয় যে, পুরুষেরা চট করে তা বুঝতে পারবে। তাই যদি পারত তাহলে সংসারের অনেক রহস্যেরই সহজ সমাধান হয়ে যেত, বুঝলে সাহেব?

তিক্ত সুরে ম্যাল্‌কম জবাব দেয়, তাহলে কি মেরিয়া আমার জন্যে কাঁদে বলে তোমার ধারণা?

—না-না, তোমার জন্যই যে সে এমনি করে লুকিয়ে কাঁদে তা বলছি না। তবে এমনও তো হতে পারে, যে পথে সে পা বাড়িয়েছে সেই পথের ভবিষ্যৎ ভেবেই সে এমনি কাঁদে, আবার ছাড়তেও পারে না।

রেগে ওঠে ম্যাল্‌কম। বলতে থাকে সে, ওসব নাটুকে কথায় আমার বিশ্বাস নেই রুমা। সময় সময় আমার ইচ্ছে হয় ওকে আমি ডাইভোর্স করি। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হলে লোকে উপহাস করবে সেই ভয়েই কিছু করতে পারছি না। তবে এভাবে আর বেশিদিন চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমাকে ঐ পথই ধরতে হবে।

এবার অনুনয়ের সুর ফুটে ওঠে রুমার কণ্ঠে। বলতে থাকে সে, আমার কথা শোন, সাহেব। ওপথে যেও না তুমি। আচ্ছা সাহেব, তোমার কি মনে হয় ওর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেই তুমি শান্তি পাবে?

—শান্তি না পাই অশান্তির হাত থেকে রেহাই পেতে পারব।

—না, তাও পারবে না। তাই যদি পারতে তাহলে এতদিনে ওকে তুমি ত্যাগ করতে। তা তুমি কর নি, কারণ ওকে তুমি সত্যিই ভালবাস—

রুমার কথার মধ্যেই প্রায় চিৎকার করে ওঠে ম্যাল্‌কম, না-না, ওকে আর ভালবাসি না আমি। ওকে একেবারেই সহ্য করতে পারি না।

—রাগছ কেন সাহেব? বেশ তো, সহ্য করতে না পার যেমন চলছে তেমনি চলুক। আমি বলছি একদিন সে নিজের ভুল ঠিকই বুঝতে পারবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে তুমিও বুঝতে পারতে যে, তোমাকে দুঃখ দিতে গিয়ে সে নিজে আরও বেশি দুঃখ পাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওর ঐ কান্নাই তার প্রমাণ।

ম্যাল্‌কম আর কিছু না বলে গুম হয়ে থাকে। রুমা আবার বলতে থাকে, তুমি যে অবস্থায় পড়েছ তাতে অন্য কেউ হলে বোধহয় যে কোন একটা চরম পথ বেছে নিত। কিন্তু তুমি তা এখনও নাও নি। তাই বলছি, যেমন চলছে তেমনি চলুক। তোমার সহ্য-শক্তি বেশি বলেই তোমাকে অনুরোধ করছি। তুমি তো জান না সাহেব, যখন ভাবি তোমার সংসারের এই অবস্থার জন্যে একমাত্র আমি নিজেই দায়ী, তখন বিশ্বাস কর, আমার আর একমুহূর্তও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি বরাবর এই ভয়টাই করেছিলাম। তাই না তোমাকে এখানে আসতে বারণ করতাম।

ম্যাল্‌কম বললে, তোমার এখানে আমি আসি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে মেরিয়ার সঙ্গে যে কোনদিন অবিশ্বাসের কাজ করি নি সেকথা তোমার চাইতে আর বেশি কে জানে, রুমা? মেরিয়া যদি একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এমনি কাজ করে তো তার জন্যে তুমি দায়ী হতে যাবে কেন?

রুমা সে-কথার জবাব না দিয়ে বলতে থাকে, জান সাহেব, আমার এক-একবার মনে হয় আমার নিশ্বাসে বোধহয় বিষ আছে। সেই বিষে আমি নিজেও যেমন দগ্ধ হচ্ছি, যারা আমার কাছাকাছি আসে তাদেরও তেমনি পুড়িয়ে মারছি। নিজেও কোনদিন শান্তি পেলাম না। আর যাদের জীবনের শান্তি কামনা কি উল্টে তাদের শান্তিও কেড়ে নিচ্ছি। বাস্তবিক, আমার আর বেঁচে থাকার কোন

অর্থই হয় না, সাহেব! তাই বলছিলাম মৃত্যুই আমার ভাল। সংসারে এক ভয়ানক অপয়া স্ত্রীলোক আমি।

ম্যাল্‌কম এবার ধমকে ওঠে রুমাকে। বলে, তোমার মুখে এসব কথা শুনতে এখানে আসি নি রুমা। আজকাল এখানে এলেই যদি তুমি এমনি ধরনের সব কথা বল তাহলে সত্যি এখানে আসা আমার বন্ধ করতে হবে।

একটু ম্লান হেসে রুমা জবাব দেয়, এখানে না এসে যাবে কোথায় শুনি? আমার নিশ্বাসের বিষে এমন একটা আকর্ষণীয় শক্তি আছে যা ছেড়ে বেশিদূর যাবার সাধ্য তোমার নেই। তোমার সংসারের শান্তি আমি কেড়ে নিয়েছি। এরপর তোমাকে একেবারে পথে না বসিয়ে কি আমি ছাড়তে পারি? আমি যে এক ভয়ঙ্কর ডাকিনী।

- আবার এসব কথা, রুমা!

রুমার চোখদুটো কথা বলতে বলতে ছলছল করছিল। ম্যাল্‌কমের কথায় নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে একটু ম্লান হেসে সে বললে, বেশ, আর বলব না। সত্যি কথা শুনতে যদি তোমার ভাল না লাগে তো এই চুপ করছি। এবার, কি খাবে বল। চা, না অন্য কিছু?

—না, কিছুই খাব না। অনেকদিন তোমার গান শুনি নি, পার তো গান শোনাও।

—বেশ তো, তাতেই যদি তোমার পেট ভরে তো তাই শোন। বলতে বলতে রুমা হাত বাড়িয়ে তানপুরাটা কাছে টেনে নেয়।

শান্তকণ্ঠে ম্যাল্‌কম বললে, পেট না ভরলেও মন তো ভরবে।

চাঁপাকলির মত আঙুল দিয়ে তানপুরায় মৃদু সুরের ঝঙ্কার তোলে রুমা। সুরের সেই তরঙ্গ মুহূর্তে সেখানকার পরিবেশকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। এ যেন বন্ধ গুমোট ঘরের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক দক্ষিণের ঠাণ্ডা হাওয়ার আবির্ভাব যার স্পর্শে মুহূর্তে শীতল হয়ে ওঠে দেহ-মন।

মৃদুকণ্ঠে রুমা বললে, কোন্ গানটি দিয়ে শুরু করব, সাহেব?

কোন্ গানটি তা কি তুমি জানো না? গম্ভীর দৃষ্টিতে রুমার আনত মুখের দিকে তাকায় ম্যাল্‌কম।

গান শুরু করার আগে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে রুমা, সেই পাগল করা বাঁশির সুর শোনার জন্যে আমিও যে দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করে আছি, সাহেব। বলতে পার, কবে কোথায় সেই সুর আমি শুনতে পাব?

ভরাট কণ্ঠে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, না রুমা, বলতে পারব না। তবে তুমি শুনতে না পেলেও আমি কিন্তু শুনতে পাই।

—কোথায়?

—এখানে— এখানে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে ইথার-তরঙ্গে সেই কণ্ঠস্বর। অপার্থিব বাঁশির সুর নয়, পার্থিব জগতের সেই মনুষ্য-কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। 'দিল্লী চলো' শ্লোগানের স্রষ্টা দিল্লী পৌঁছবার আগেই যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন।

সেদিনকার চল্লিশ কোটি ভারতবাসী বিধাতার পায়ে মাথা খুঁড়েও আর পেল না সেই মহাবিপ্লবীকে। বড় অভিমানী তিনি। রক্তের বদলে স্বাধীনতা গ্রহণ করতে তেমন করে কেউ এগিয়ে এল না বলেই বোধহয় সেই অভিমানী মহাবিপ্লবী নিজেকে সরিয়ে নিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে।

শেষদানে কিস্তিমাত করল মিত্রশক্তি। পিছু হঠতে আরম্ভ করল জাপান। সেই সঙ্গে পিছু হঠতে হল আজাদ হিন্দ্ ফৌজকেও। ভারতের মাটিতে সীমান্ত থেকে দেড়শো মাইল ভেতরে প্রবেশ করেও তাদের কাছে দিল্লী 'দূর অস্ত্'ই রয়ে গেল। অবশেষে এল আত্মসমর্পণের পালা। ইংরেজ-আমেরিকানদের আক্রমণে জাপানী সৈন্যবাহিনী তখন ব্রহ্মদেশের মাটিতে পর্যুদস্ত। রাজধানী রেঙ্গুন তখন তাদের অধিকারে। কাজেই আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর পথ কোথায়?

অবশেষে এলো মানব-সভ্যতার ইতিহাসের দুটি ভয়ঙ্কর দিন। উনিশ'শ পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্ট মাসের ছয় ও নয় তারিখ। মাত্র দু'টি পারমাণবিক বোমার আঘাতে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমা শহর দু'টি পরিণত হল বিরাট ধ্বংসস্তূপে। মারা পড়ল লক্ষ লক্ষ মানুষ, জীবন্মৃত হয়ে রইল আরও কয়েক লক্ষ হতভাগ্য। অবশেষে আত্মসমর্পণ করল জাপান। যবনিকাপাত ঘটল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। উনচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখে জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণ থেকে যে যুদ্ধের শুরু, তার পরিসমাপ্তি ঘটল পঁয়তাল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দুই তারিখে জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সাহেব মহাখুশি। ডান হাতের দুটো আঙুল ফাঁক করে ইংরেজি 'ভি' অক্ষর তৈরি করে 'ভিক্ট্রী' অর্থাৎ যুদ্ধজয়ের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। খুশি ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল সাহেবও। মুখে হাভানা চুরুট গুঁজে তিনিও দু'আঙুলে 'ভি' অক্ষরটি দেখাচ্ছেন সবাইকে। খুশি মার্কিন জেনারেল আইসেনহাওয়ার সাহেবও। তাঁরই দাপটের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে জাপান।

যুদ্ধে জয়লাভ করেও ব্রিটিশ শক্তির তখন কাহিল অবস্থা। কোমর ভেঙে গেছে তার, কিন্তু মুখের দাপট কমছে না কিছুতেই। ভারতবর্ষের ওপর প্রভুত্ব চালাবার বাসনা তখনও তার প্রবল।

জঙ্গী জেনারেল ওয়াভেল তখন ভারতবর্ষের ভাইস্রয়—বড়লাট। সেই বিয়াল্লিশ সাল থেকে ভারতবর্ষের একটার পর একটা সমস্যা নিয়ে বিব্রত তিনি! যুদ্ধক্ষেত্রের পারদর্শিতা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও কুশলতার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান এ তত্ত্বটি না জানাই বোধহয় তাঁর ভারতীয় রাজনীতিতে অসাফল্যের কারণ। এর ওপর ব্রিটিশ সরকার তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দিল আর এক সমস্যা—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সদস্যদের বিচার। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! যে লালকেল্লায় ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা ওড়াতে চেয়েছিলেন নেতাজী সুভাষ, সেখানেই যুদ্ধাপরাধে বিচারের ব্যবস্থা হল তাঁরই হাতে গড়া ফৌজের সদস্যদের!

যুদ্ধাপরাধে অপরাধী ওঁরা। মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ওরা অস্ত্র

ধারণ করেছিলেন। এমন গুরুতর অপরাধের বিচার না হলে কি চলে? শুধু ওঁরা কেন, ওঁদের নেতা সেই সুভাষ বসুও তো ওয়ার ক্রিমিন্যাল। হাতে পেলে তাঁর বিচার করতেও যে তারা প্রস্তুত। অতএব বিচার হবেই। জনমতকে অগ্রাহ্য করেই বিচার হবে।

শহর কলকাতার নাগরিকদের মুখে সেদিন কেবলমাত্র একটিই নাম—নেতাজী—নেতাজী—নেতাজী। মিত্রশক্তির যুদ্ধজয়ের আলোচনাকে পেছনে ফেলে, নাগাসাকি, হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলার আলোচনা ছাপিয়ে জনতার মুখে মুখে ঐ নাম–নেতাজী–আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। সেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সদস্যদের বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে লালকেল্লায়। ভারতের, বিশেষ করে বাংলার যুবশক্তি এই ব্যবস্থা মেনে নেবে কেন? গর্জে ওঠে বাংলার কণ্ঠস্বর—বিচারের এই প্রহসন রুখতেই হবে—এই অন্যায় বিচার আমরা মানি না, মানব না।

বিশ্রাম নেই, অবসর নেই কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার লালবাজারের। একটার পর একটা আন্দোলনের ঢেউ। সেই ঢেউ রুখতে হিম্‌সিম্ খেতে হয় তাদের। মিত্রশক্তির যুদ্ধজয়ের আনন্দ উপভোগ করার আর সুযোগ হয় না। তার আগেই গুলি-বন্দুক নিয়ে আবার প্রস্তুত হতে হয়।

কলকাতার গভর্ণর হাউসে সমাসীন লর্ড কেসি। বাংলার প্রধানমন্ত্রী ঢাকার নবাব পরিবারের মানুষ নাজিমুদ্দিন, আর লালবাজারের পুলিশ কমিশনার রে। সেই ফিরিঙ্গী রে সাহেবের একদিন ডাক পড়ল গভর্ণর হাউসে। স্বয়ং লাট সাহেব কথা বলতে চান তার সঙ্গে।

যথাসময়ে সেরিমনিয়্যাল ইউনিফর্ম পরেই সি. পি. রে সাহেব এসে হাজির হল গভর্ণর সন্দর্শনে। বাইরে শান্ত প্রকৃতির কিন্তু ভেতরে সাংঘাতিক চালাক মানুষ লর্ড কেসি, অনেকক্ষণ ধরে নির্দেশ দিলেন তাকে। অবশেষে রে গভর্ণরকে স্যালুট করে বেরিয়ে এল বাইরে।

লালবাজারে ফিরে আসতে না আসতেই টেলিফোন এল চীফ সেক্রেটারীর কাছ থেকে। নতুন কিছু নয়, গভর্ণরের নির্দেশই সে আবার জানিয়ে দিল সি. পি.-কে। অবশেষে পুলিশ কমিশনার একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করল সারা শহরে। সভা-সমিতি-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ।

ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডে যতগুলো ধারা আছে তার মধ্যে এই একশ' চুয়াল্লিশ ধারাটির সঙ্গেই বোধহয় জনসাধারণের পরিচয় সবচাইতে বেশি। এই ধারাটির ব্যবহার দেশের সাধারণ মানুষকে বারে বারে প্ররোচিত করেছে। এই ধারার প্রয়োগ ও তা অমান্য করার মধ্যেই প্রশাসন ও জনসাধারণের শক্তি-পরীক্ষার ধারাটি আজও চালু রয়েছে আমাদের দেশে। আড়াই শ' বছরের ব্রিটিশ শাসনে বিলেতের টেম্‌স ও ভারতবর্ষের গঙ্গা নদী দিয়ে কত জল বয়ে গেছে, কিন্তু আইনের ঐ ধারাটির মাধ্যমে শক্তি পরীক্ষার ধারাটি কিন্তু আজও অব্যাহত।

ক্ষেপে উঠল শহর কলকাতার জনতা। ব্রিটিশ শক্তির মর্যাদা যখন মধ্য-গগনে তখনই তারা তাকে পরোয়া করে নি। আজ তো তার অবস্থা তেজহীন অস্তগামী সূর্যের মত, আজ তারা তাকে সমীহ করতে যাবে কেন? যুদ্ধে জয়লাভ

করেও ব্রিটিশ শাদর্‌লের আজ সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ। নখদন্তহীন খঁর্‌ড়িয়ে-চলা শাদর্‌লের নির্দেশ মান্য করতে বয়েই গেছে তাদের।

কলকাতার কর্মব্যস্ত রাজপথ ধর্মতলায় সেদিন আর একটি অধর্মীয় ঘটনা ঘটাল ব্রিটিশ সরকার। একদিকে নিরস্ত্র জনতা, অন্যদিকে সশস্ত্র পর্‌লিশ। একদিকে নিরস্ত্র জনতার দর্‌র্বার মনোবল, অন্যদিকে সশস্ত্র পর্‌লিশ বাহিনীর দর্‌র্বল মনোভাব। খালিহাতে ওরা এগিয়ে আসে প্রাণের তাগিদে, অস্ত্রহাতে এরা এগিয়ে যায় চাকরির খাতিরে। ওদের নজর দেশের স্বার্থের দিকে, আর এদের নজর নিজের স্বার্থের দিকে।

বিরাট মিছিল এগিয়ে আসছে ধর্মতলার রাজপথ ধরে। লক্ষ্য তাদের এসপ্লানেড। পর্‌লিশ কমিশনার রে সাহেবের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মিছিল বের করেছে। দেশপ্রেমিক আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সদস্যদের বিচারের প্রহসন তারা কিছর্‌তেই সহ্য করবে না—কিছর্‌তেই না।

কাতারে কাতারে মানর্‌ষ সামিল হয়েছে এই মিছিলে। তাদের অধিকাংশই তরর্‌ণ ও যর্‌বক। রক্তে তাদের আত্মদানের নেশা। কণ্ঠে তাদের বজ্রগম্ভীর আওয়াজ।

না, আর এগোতে পারল না সেই মিছিল। নিউ সিনেমার কাছেই তাদের গতিরোধ করে দাঁড়াল লালবাজারের লালপাগড়ী মাথায় পর্‌লিশ বাহিনী, আর তাদের নেতৃত্বে একদল লালমর্‌খো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট।

সার্জেণ্ট-মেজর ম্যাল্‌কমের মর্‌খখানা গম্ভীর। সেই গম্ভীর মর্‌খের টানা বড় বড় চোখ জোড়ায় কেমন যেন এক আশঙ্কার ছায়া। একটু পরেই যে নাটক অভিনীত হবে তার কথা চিন্তা করেই বোধহয় তার এই আশঙ্কা। মনের মধ্যে হাজারো প্রশ্নের জটলা। এর শেষ কোথায়? এমনি করেই কি গড় গড় শব্দে প্রশাসনের রথের চাকা ঘর্‌রবে? রর্‌মার মর্‌খে শোনা মহাভারতের বীর কর্ণের রথের চাকার মত এর চাকাও কি কোনদিন ভেঙে পড়বে না? সেদিন কি হবে? সেদিন তাদের মত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টদের ক্ষমা করতে এগিয়ে আসবেন কোন্‌ মহাপর্‌রর্‌ষ? সেদিন তাদের ঠাঁই হবে কোন্‌ দেশের মাটিতে?

শর্‌রর্‌ হয়ে গেল সংঘর্ষ। জনতা এগিয়ে যাবেই আর পর্‌লিশ তাদের এগোতে দেবে না। আরম্ভ হল লাঠি-চার্জ। এলোপাথাড়ি লাঠি চালাতে চালাতে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করল পর্‌লিশ বাহিনী। রর্‌খে দাঁড়াল মিছিলের পর্‌রোভাগের তরর্‌ণ ও যর্‌বকের দল! মর্‌খে তাদের আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের গানের কলি—কদম কদম বড়ায়ে যা, খর্‌শিসে গীত গায়ে যা –

মাথা ফেটে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে, লাঠির আঘাতে পিঠে কালশিরার দাগ পড়েছে, পা ভেঙে মর্‌খ থর্‌বড়ে পড়ে গিয়ে গোঙাচ্ছে, তবর্‌ও কিন্তু অটল তাদের প্রতিজ্ঞা—সামনে এগিয়ে যাবেই।

হঠাৎ মিছিলের ভেতর থেকে পর্‌লিশের ওপর পড়তে লাগল ইটের টুকরো। বিব্রত পর্‌লিশ বাহিনী কয়েক মর্‌হর্‌র্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল।

কোথা থেকে এল এত ইট! কাছে-পিঠে কোথাও ইট নেই। তবে কি জনতার মধ্যে কেউ পকেটে ইট নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল? না-কি এটা

পুলিশেরই কীর্তি ! জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে ইট ছুড়ে পুলিশকে উত্তেজিত করবার সেই পুরানো কৌশল !

কৌশল হোক কিংবা না-ই হোক ইটের আঘাতে বিব্রত পুলিশ বাহিনীর গুলি ছুঁড়বার ওজুহাত মিলে গেল। শুরু হল গুলিবর্ষণ। যদিও গুলি চালাবার মুখ্য উদ্দেশ্য জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা, কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে স্পষ্ট লেখা থাকবে—কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল।

ধর্মতলা অঞ্চলের দোকান-পাট বন্ধ। গুলির শব্দ ও বারুদের গন্ধে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে সারা এলাকাটা। কালো পীচের রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কয়েকজন যুবক। রক্তস্নাত রাজপথের কালো পীচ শহীদের লাল রক্তের ছোঁয়ায় আরও বেশি কালো হয়ে উঠেছে যেন। ভারতের ব্রিটিশ রাজশক্তির কিন্তু হুঁশ নেই যে, এ কালোর কালিমা তাদের লাল মুখগুলোতেও এঁকে দিয়েছে কালোর ছাপ, আর লালবাজারের লাল দেয়ালেও এই কালোর চিহ্ন ফুটে উঠেছে স্পষ্ট। দেশপ্রেমিকদের হত্যার উৎসবে মেতে উঠে জনচিত্তে লালবাজারের নাম পাল্টে হয়েছে কালোবাজার।

অ্যাকশন শেষ, এবার রি-অ্যাকশন শুরু। শহীদের রক্ত কখনও বৃথা যায় না। চিন্তিত বিলেতের কন্‌জারভেটিভ পার্টি। মুখের বর্মাচুরুটে আগুন থাকা সত্ত্বেও তা থেকে যেন ইচ্ছেমত ধোঁয়া বের করতে পারেন না স্যার উইনস্‌টন চার্চিল। তাঁদের সকলের সামনেই সেদিন এক বিরাট প্রশ্ন—অতঃ কিম? এর পরে কি?

রি-অ্যাকশন কেবল রাজনৈতিক জগতে নয়, লালবাজারের সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্‌কমের মনেও সেদিন এক অস্বস্তিকর রি-অ্যাকশন। সেদিন ধর্মতলা থেকে ফৌজের সঙ্গে লালবাজার ফিরে আসতেই সার্জেণ্ট এণ্টনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে প্রশ্ন করে, কিরে জনি, হঠাৎ তোর শরীর খারাপ হল নাকি?

ম্লান হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, না।

—তবে মন খারাপ?

—হুঁ্যা।

—কেন রে, তোর বউ পালিয়েছে নাকি? ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করে এণ্টনী।

সহসা মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কমের। না জেনে এণ্টনী বলেছে তা এণ্টনীর কাছে ঠাট্টা হলেও ম্যাল্‌কমের কাছে বাস্তব সত্য। মেরিয়া পালিয়ে না গেলেও যে কোন সময় পালাতে পারে।

ম্যাল্‌কমের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে এণ্টনী আবার হেসে বললে, তুই দিন দিন কেমন যেন বোকা হয়ে উঠছিস। ঠাট্টাও বুঝতে পারিস না!

ম্যাল্‌কম একটু হাসতে বৃথা চেষ্টা করে জবাব দেয়, বোধহয় তাই।

একালের ধর্মতলায় নিউ সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে সেকালের সেই কাহিনীর ছবিই চোখের সামনে ভাসছিল বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের। সহসা তার মনে হল, না, রক্তমাখা সেই দিনগুলোর কথা আর ভাববার কোন অর্থ হয় না। অতীত-

অতীতের মধ্যেই নিহিত থাক। তাকে বর্তমানের মধ্যে টেনে আনার কোন সার্থকতা নেই। এই কালো পীচের রাস্তায় সেকালের সেই রক্তঢালা সার্থক হয়েছিল কিনা তা একালের ইতিহাসের ভাষ্যকাররাই বিচার করুক।

ঘুরে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ম্যালকম। নাঃ, পায়ের ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো জোড়া এমনই ছিঁড়ে গেছে যে এটা আর পায়ে দেওয়া না দেওয়া একই কথা। একমুহূর্ত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চিন্তা করে সে, পরক্ষণেই সেই জরাজীর্ণ জুতো জোড়া রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খালিপায়েই ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে।

এতক্ষণে যেন একটু স্বস্তি বোধ করে ম্যাল্‌কম। এ বোধহয় সেই অতীতকে ঝেড়ে ফেলারই স্বস্তি। কিন্তু ঐ ছেঁড়া জুতো জোড়ার মত অতীতকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলার সামর্থ্য তার কোথায়? পারছে কি সে রুমা বাঈজীর কথা বিস্মৃত হতে? পারছে কি মেরিয়াকে ভুলে থাকতে?

মেরিয়া—তার প্রথম যৌবনের সহচরী মেরিয়া। পরবর্তীকালে তার ঘরের ঘরণী মেরিয়া। অবশেষে এক আমেরিকান সৈনিকের সঙ্গিনী মেরিয়া।

না, যুদ্ধ শেষে ক্যাপ্টেন ইয়ংয়ের সঙ্গে আমেরিকা যায় নি সে ইচ্ছে করেই। সেই সুযোগ গ্রহণ করে নি মেরিয়া। ক্যাপ্টেন ইয়ং অনেক অনুরোধ করেছিল তাকে। বলেছিল, নারী-সঙ্গলিপ্সার আগ্রহ নিয়েই তোমার সঙ্গে মিশেছিলাম মেরিয়া, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তুমি বাস্তবিকই আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করে বসেছ। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। কোন একটা ব্যবস্থা করে এখানকার পাট চুকিয়ে চল তুমি আমার সঙ্গে।

স্পষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল মেরিয়া, কি করে এখানকার পাট চুকিয়ে দিতে বলছ? আমার স্বামীকে ডাইভোর্স করে?

জবাব না দিয়ে চুপ করে ছিল ক্যাপ্টেন ইয়ং। মেরিয়া ম্লান হেসে কেবল বলেছিল, না, তা হয় না।

—কেন হয় না মেরী?

—তা তুমি বুঝবে না।

—কিন্তু দেশে ফিরে গিয়েও যে বার বার কেবল তোমার কথাই মনে পড়বে।

—অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে আমাকে ভুলবার চেষ্টা কর।

—তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেলেই কি তুমি খুশি হবে?

—খুশি না হলেও সেটাই আমার কাম্য। উত্তেজিত মুহূর্তে একটা ভুল করেছিলাম আমি। দিনের পর দিন ভুল দিয়েই সেই ভুল শোধরাতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। সেই ভুলের বোঝা আর টেনে বাড়াতে আমি চাই না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

দেশে ফিরে গেল ক্যাপ্টেন ইয়ং, আর ঘরের কোণে এসে আশ্রয় নিল মেরিয়া। কিন্তু এ কোন্ মেরিয়া? এ যেন মেরিয়ার এক প্রেতাত্মা, যে নাকি জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ, আলো-হাসি সবকিছু ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যেই বোবা হয় বেঁচে আছে। যন্ত্রের মত সে সংসারের কাজ করে যায় মুখ বুজে। ম্যাল্‌কম দশটি কথা জিজ্ঞেস করলে হয়ত মৃদুকণ্ঠে একটির জবাব দেয়।

রাত-দিন বসে বসে কি যেন ভাবে।

তবে কি মেরিয়ার জীবনেও শুরু হয়ে গেছে রি-অ্যাকশন!' পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাকি এটা? ম্যাল্‌কম তাই ভাবে। কিন্তু আশ্চর্য, মনে শান্তি পায় না সে নিজেও। মেরিয়ার কথা শুনে রুমা উপদেশ দেয় ম্যাল্‌কমকে, ওকে চোখে চোখে রেখো।

—কেন?

—বলা তো যায় না। মেয়েদের মন—

একদিন শেষরাতে ঘুম ভেঙে যায় ম্যাল্‌কমের। ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে কে? আড়চোখে তাকিয়ে দেখে মেরিয়ার খাট ফাঁকা।

হ্যাঁ, মেরিয়াই বটে। কি করছে ও? আলমারী খুলছে কেন এমন সন্তর্পণে?

আলমারীর ডালা খুলে অন্ধকারেই ভেতরে হাত বাড়ায় মেরিয়া। প্রতিদিন ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরে এসে ম্যাল্‌কম কোথায় তার গুলিভর্তি রিভলবার রাখে তা তার অজানা নয়।

রিভলবারটা শক্ত হাতে চেপে ধরে মেরিয়া। একবার ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাল্‌কমের খাটের দিকে তাকায়। পরক্ষণেই সেটা হাতে নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। খোলাই পড়ে থাকে আলমারীর ডালা।

মেরিয়া বেরিয়ে যেতেই খাট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসে ম্যাল্‌কম। কোথায় গেল মেরিয়া—ঐ তো বাথরুমের আলো জেলে সবে সে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে।

ম্যাল্‌কম ঝড়ের বেগে বাথরুমে ঢুকেই রিভলবারসুদ্ধ মেরিয়ার হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, স্টপ—স্টপ মেরী! কি করতে চলেছ তুমি?

—নো—নো জনি। লিভ মি। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে। আমাকে আমার কাজ করতে দাও। কেঁদে ওঠে মেরিয়া।

ম্যাল্‌কম একহাতে মেরিয়াকে জড়িয়ে ধরে অন্যহাতে রিভলবারটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে বলতে থাকে, নো—নো, ইউ কান্ট ডাই। মরতে দেব না তোমাকে—কিছুতেই না।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলতে থাকে মেরিয়া, কিন্তু আমার পক্ষে আর বেঁচে থাকে যে অর্থহীন।

## তের

সারা শহর চষে বেড়ালেও শহরের এই তল্লাটে প্রায় আসাই হয় না বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের। ইচ্ছে করেই সে আসে না আর। অতীতকে ভুলতে চায় বলেই এই মাণিকতলা অঞ্চলে আসতে তেমন ভাল লাগে না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই অঞ্চলে আসার কথা মনে হলে আজও সে রোমাঞ্চিত হয়। গোটা শহরে এই জায়গাটুকুর আকর্ষণই তার কাছে সবচাইতে বেশি। তাই বোধহয় অভিমানভরে সহসা এদিকে পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না তার।

কিন্তু অভিমান তার কার ওপর? রুমা বাঈজীর ওপর? মেরিয়ার ওপর? দেশের রাজনীতির ওপর? না—না, একমাত্র নিজের ওপর ছাড়া বিশ্বসংসারে

আর কারুর ওপর কোন অভিমান নেই ম্যাল্‌কমের।

আগস্ট মাসের বর্ষা শেষের শহর কলকাতা। দুপুরের রোদ তখনও মিঠে লাগতে শুরু করে নি। সেই রোদ মাথায় করেই ভরদুপুরে হোম থেকে বেরিয়ে পড়ল বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। শিয়ালদার ট্রাফিক জ্যাম, আবর্জনার স্তূপ, হকারের চিৎকার প্রভৃতি সমাধানহীন দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে বিরক্তভঙ্গিতে আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে উত্তরমুখো চলতে থাকে ম্যাল্‌কম। তার কেবলই মনে হতে থাকে, এ শহরে মানুষ নেই—একজন মানুষও নেই। তাই যদি থাকত তবে এত তাড়াতাড়ি শহরটার এমন দশা হত না। কলকাতা যেন একটা বিরাট রত্নখনি। দূর দূর দেশ থেকে রত্নের খোঁজে লোভী মানুষেরা এসে এর বুকে কোদাল চালায়। রত্নের খোঁজ পেলেই তারা খুশি। মাটির দিকে নজর নেই কারুর। মাটিকে ভালবাসে না কেউ। এমনকি যাদের ভালবাসার কথা, যাদের সঙ্গে রয়েছে এর নাড়ীর সম্পর্ক, তারাও কেউ ভালবাসে না একে। উদাসীন ভঙ্গীতে তারা কেবল ঐ কোদাল চালানো দেখে, আর মাঝে-মধ্যে এই হতশ্রী শহরটার জন্যে লোক-দেখানো চোখের জল ফেলে।

হাঁটতে হাঁটতে ম্যাল্‌কম এসে দাঁড়ায় মাণিকতলার মোড়ে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শুকনো মুখ তোবড়ানো গাল ও ঘোলাটে চোখ মেলে কেবল তাকিয়ে থাকে সে। হ্যাঁ, ঐ সেই রাস্তা। ঐ রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে দুটো মোড় ঘুরলেই সেই বাড়িটা।

রাস্তায় গাড়ির ভিড়, পথচারীর ভিড়। বড় বড় ডবলডেকার রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে। সেকালেও শহর কলকাতায় এমনি ডবলডেকার বাস চলতো। সরকারী নয়, বেসরকারী। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেই বাসের দোতলায় হুড খুলে ফেলা হত যাত্রীদের আরামের জন্যে। তবে সেকালে কেউ এমন বাদুড়ঝোলা হয়ে বাসে ঝুলত না। ম্যাল্‌কম নিজেও অনেকদিন ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরে এসে মেরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে কেবলমাত্র হাওয়া খাওয়ার জন্যেই হুড-খোলা ডবলডেকারে চেপে শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত যাতায়াত করেছে।

আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে কেমন যেন হয়ে উঠেছিল মেরিয়া। স্বামীকে জব্দ করতে গিয়ে সে নিয়েই জব্দ হয়েছিল। পঙ্কিল এক আবর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ তলিয়ে যাবার মুহূর্তে কোনক্রমে ভেসে উঠেছিল। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকের কানেই এই খবর পৌঁছে গেছে এতদিনে। বেশ ডালপালা মেলেই পৌঁছেছে। কাজেই ওদের নিয়েই মেরিয়ার বেশি দুশ্চিন্তা। রাস্তায় বেরোলেই তার কেবল মনে হয় সবাই যেন তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। সবাই যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে তাকে। সেই আমেরিকান ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মেলামেশার দিন কিন্তু এসব কথা তার মনে হয় নি। আজ হচ্ছে। এবং হচ্ছে বলেই বাইরে বেরোনো একদম বন্ধ করে দিলে মেরিয়া। রাতদিন নিজের ফ্ল্যাটের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, আর এই লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজে।

ম্যাল্‌কম মাঝে-মধ্যে অনুযোগ করে, এমনিভাবে নিজেকে এদেশীয় মেয়েদের মত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে লাভ কি, মেরী? এতে যে তোমার শরীর

ভেঙে পড়বে!

শান্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে মেরিয়া জবাব দেয়, এই ভাল আছি জনি, আর যে কটা দিন এদেশে থাকব এমনিভাবেই কাটিয়ে দেব। মরতে যখন আমাকে দিলেই না তখন এমনিভাবেই বেঁচে থাকতে হবে।

ম্যাল্‌কমের তরফ থেকে তেমন কোনো সক্রিয় সাড়া না পেলেও মেরিয়া ভেতরে ভেতরে কিন্তু বিলেত যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। না, আর কিছুতেই সে থাকবে না এদেশে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এখন বোধহয় আর ওদেশের মাটিতে পা দেওয়া তেমন কিছু শক্ত নয়। সামান্য চেষ্টাতেই পাসপোর্ট যোগাড় করা যাবে। মার্গারেট বিলেত থেকে সেই কথাই লিখে জানিয়েছে। বিলেতে গিয়ে বসবাসের ইচ্ছে মেরিয়ার বরাবরের, তার উপর নিজের জীবনের সেই লজ্জাকর ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা যাই হোক না কেন, তা যেন তার সেই ইচ্ছাকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। মেরিয়ার মনে হয় এটাই যেন তার পরিত্রাণের একমাত্র পথ। তার এদেশের জীবন ও সেই সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলোকে পেছনে ফেলে রেখে ম্যাল্‌কমের হাত ধরে ওদেশে গিয়ে সে শুরু করবে নতুন জীবন—আরম্ভ হবে জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়।

কিন্তু ম্যাল্‌কম কি শেষ পর্যন্ত যেতে রাজি হবে? মুখে সে যাই বলুক না কেন, তার চাল-চলন হাব ভাবে কিন্তু অন্যরকম কিছু মনে হয়। বিশেষ করে সেই রুমা মেয়েটাকে ছেড়ে সত্যিই কি সে তাকে নিয়ে বিলেত পাড়ি দেবে? ম্যাল্‌কম যতই কেন না বলুক, রুমা সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারে নি মেরিয়া। মেরিয়া কেন, পৃথিবীর কোন স্ত্রীই বোধহয় এমনি একটা পরিস্থিতিতে নিজের স্বামী সম্পর্কে সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারে না। তবে সেই মেয়েটার ওপর মেরিয়ার তিক্ততার পরিমাণ যে আর আগের মত নেই এটা সে মাঝে-মধ্যেই প্রকাশ করে ম্যাল্‌কমের কাছে। ইচ্ছে করেই প্রকাশ করে। বিরুদ্ধাচরণ করে কোন ফল হবে না বুঝতে পেরেই বোধহয় মেরিয়া এটা করে। তাছাড়া, নিজের সেই একদা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্যে মানসিক দুর্বলতাটুকু তো আছেই। সর্বোপরি সে এতদিন মনে মনে বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে, শত হলেও ম্যাল্‌কম এখনও ভালবাসে তাকে। মেরিয়ার মনের ইচ্ছে বোধহয় এই যে, এমনিভাবে আরও কিছুদিন চলে যদি সে ম্যাল্‌কমকে কোনমতে রাজি করিয়ে বিলেতে পাড়ি দিতে পারে, তখন তো আর রুমা বাঈজীকে নিয়ে কোন সমস্যাই থাকবে না। সেই আশাতেই বসে বসে দিন গোণে মেরিয়া।

ম্যাল্‌কম কিন্তু বলে অন্য কথা। বলে, আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরো, মেরী। দেশের যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এদেশে রাজ্যপাট চালাতে পারবে কিনা তার কিছুই ঠিক নেই। এদেশের মানুষের হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে ব্রিটিশকে যদি এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতেই হয়, তাহলে এদেশের ইওরোপীয়ানদের ব্যাপারে একটা কিছু বিশেষ ব্যবস্থা হবেই। হয়ত তার মধ্যে আমরাও পড়ব। আজ এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে চলে গেলে সেদিন তেমন কোন বিশেষ সুবিধে থেকে আমরা বঞ্চিত হব। তখন আর আফসোসের শেষ থাকবে না।

ভারতবর্ষের এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেদিন অনিশ্চিত। বিলেতে সেদিন রক্ষণশীলদের পরিবর্তে শ্রমিক সরকার। প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী সাহেব ভারতীয়দের হাতে স্বাধীনতা তুলে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উনিশশ' ছেচল্লিশ সালের মার্চ মাসে তিনি বিলেত থেকে লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ও আলেক-জাণ্ডার—এই তিনজনকে নিয়ে গঠিত 'ক্যাবিনেট মিশন' পাঠালেন ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে স্বাধীনতার ব্যাপারে একটা কিছু ফয়সলা করতে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধের ফয়সলা হল না কিছুতেই। অবশেষে আংশিক সফল হয়ে ক্যাবিনেট মিশন জুন মাসের শেষে ফিরে গেল নিজের দেশে। আর এদেশের রাজনীতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের দিকে।

মিস্টার রে-র পরে লালবাজারের সি. পি.-র চেয়ারে এসে বসল হার্ডউইক। লালবাজারের হিন্দু অফিসাররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, হার্ডউইক তো নয়, হার্ড উইকেড। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সেই মোক্ষম অস্ত্র 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল'-এর ওপর এই ভদ্রলোকটির অগাধ বিশ্বাস। লালবাজারে সি. পি.-র চেয়ারে বসেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করতে শুরু করল সে।

লালবাজার। দেশের শাসনব্যবস্থার একটা মস্ত স্তম্ভ এই লালবাজার। সর্ব-ধর্মের মিলনক্ষেত্র এই লালবাজার। ভারতের প্রায় সব ধর্মাবলম্বী মানুষই রয়েছে লালবাজারের এই বাহিনীর মধ্যে। তবে তাদের সিংহভাগই হিন্দু ও মুসলমান। খ্রীষ্টানের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এতকাল তারা ছিল একই গোষ্ঠীভুক্ত—পুলিশ। এই পুলিশ নামটিই ছিল তাদের একমাত্র পরিচয়। দেশের রাজনীতিতে অনেক ওলটপালট হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার দানব মাঝে মাঝেই দেশের এখানে-ওখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কিন্তু লালবাজারের পুলিশ-বাহিনীর গায়ে তার তেমন কোন ছাপ পড়ে নি কোনদিন। কিন্তু এবারেই যেন কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল তার।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী তখন সুরাবর্দী। ভারতের এই প্রান্তে সেদিন মুসলিম লীগের রাজত্ব। স্বভাবতই সেদিন তাদের দাপট কিছু বেশি। ক্যাবিনেট মিশন ফিরে গেল দেশে। দেশ-বিভাগ মেনে নিতে পারল না জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু জিন্নাসাহেবের দৃঢ় পণ, পাকিস্তান আদায় করতেই হবে। আর এই পট-ভূমিতেই মুসলিগ লীগ ষোলই আগস্ট তারিখটিকে পাকিস্তান আদায়ের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন হিসেবে চিহ্নিত করল।

ষোলই আগস্ট উনিশশ' ছেচল্লিশ সাল। এই দিনটিরই আর এক নাম 'দি ডে অফ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'—নরহত্যার এক বীভৎস রূপ দেখা গিয়েছিল সেদিন এই মহানগরীতে।

মোটাসোটা বেশ গোলগাল চেহারার মানুষ পুলিশ কমিশনার হার্ডউইক। ছাঁটা মোটা গোঁফ। ঈষৎ ভোঁতা নাক। মাথার ঘন চুলে বাঙালী কায়দায় একটি সিঁথি। এই লোকটি লালবাজারের হিন্দু অফিসারদের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন তাকে হিন্দু-ঘেঁষা বলেই মনে হয়, আবার মুসলমান অফিসারদের সঙ্গে দেখলে মনে হয় মুসলিম-ঘেঁষা। আর বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে সে হচ্ছে,

'ইওর মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট'।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছে শহর কলকাতায়। প্রতিটি নাগরিকের মনেই সেদিন একটিমাত্র প্রশ্ন—কি হবে ঐ দিনটিতে? কিন্তু কোন প্রশ্ন নেই নগর-কোটাল হার্ডউইকের মনে। সবই যে তার জানা, সবকিছুই যে ছকে আঁকা, তাই তার মনে প্রশ্ন থাকবে কেন সেদিন? বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতের পুতুল, মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট হার্ডউইক সম্পূর্ণ নির্বিকার। মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপারে এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই তার। হাতের কাছে ডেপুটি কমিশনার মিস্টার দোহা যখন রয়েছে তখন আর চিন্তা কিসের? এই দোহা সাহেবই তো প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর সবচাইতে বিশ্বস্ত অফিসার।

ষোলই আগস্টের আশঙ্কায় মহানগরী কলকাতা থমথমে। সেই থমথমে ভাবের ছোঁয়া এবার এসে লেগেছে লালবাজারের গায়েও। হিন্দু-মুসলমান প্রতিটি অফিসারের চোখে-মুখে একটা চাপা আশঙ্কার ছায়া। একজন হিন্দু অফিসারের সঙ্গে একজন মুসলিম অফিসার যেন ঠিক সেই আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। লালবাজারের করিডোর দিয়ে যেতে যেতে দু'জন মুসলিম অফিসারের মধ্যে চোখে চোখে যেন কি কথা হয়। লালবাজারের সেণ্ট্রাল লক্-আপের একপাশে দাঁড়িয়ে দু'জন হিন্দু অফিসার ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একজন মুসলিম অফিসারকে দেখে চুপ করে যায়। মুসলিম অফিসারটিও আড়চোখে তাদের একবার দেখে নিয়ে কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে চলে যায় নিজের কাজে। অন্য সময় হলে হয়ত ওদের মধ্যে একজন সেই মুসলিম অফিসারটিকে ডেকে হেসে বলত—ও কি করিম সাহেব, অমন গম্ভীর মুখ করে চললেন কোথায়? করিম সাহেবও হয়ত সেদিন জবাব দিত, আর বলেন কেন ভাই। সাহেবদের হুকুমের জ্বালায় অস্থির। একমুহূর্ত সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলার জো আছে?

আজ কিন্তু লালবাজারে সেই চেহারা আর নেই। শীতের সন্ধ্যায় ঘন কুয়াশার মত অবিশ্বাসের একটা পুরু বাষ্পের স্তর জমে উঠেছে লালবাজারের চারদিকে। হিন্দু-মুসলমান অফিসাররা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। রাজনীতির ক্লেদাক্ত স্পর্শ এসে লেগেছে লালবাজারের অন্দর-মহলেও।

সি. পি. হার্ডউইকের চালচলনে হিন্দু অফিসার মহল খুশি নয়। সত্যি-কারের পুলিশ কমিশনার যে কে তাই বোঝা দায় হয়ে উঠেছে। নামে হার্ড-উইক কমিশনার হলেও ডি. সি. দোহা সাহেবের দাপটে তাকেই কমিশনার বলে মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবের একান্ত বিশ্বাসভাজন এই দোহা সাহেবই ইদানীং লালবাজারের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। রাইটার্সে প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ থেকে ঘন ঘন ডাক আসে দোহা সাহেবের। সেখানে আলাপ-আলোচনার পরেই হয়ত সেই আলোচনাকে কার্যকর করতে টেলিফোনে নির্দেশ আসে হার্ডউইকের কাছে।

ব্যাপারটা নজর এড়ায় না হার্ডউইকের। কিন্তু এই সময় এ নিয়ে কিছু বলা চলে না কাউকে। বাস্তবিক, ঐ দোহার জন্যেই হার্ডউইক এখনও মন্ত্রী-মণ্ডলীর নেক্‌নজরে আছে। হিন্দু অফিসাররা বলে, হার্ডউইক নাকি সুরাবর্দীর

তথা মুসলিম লীগের হাতের পুতুল হয়ে উঠেছে। হোক হাতের পুতুল, তবুও কাগজে-কলমে সে-ই যে এখনও লালবাজারের পুলিশ কমিশনার তাতে তো কোন ভুল নেই। তা'ছাড়া ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানেরা তথা মুসলিম লীগ হিন্দুদের যদি একটু বেকায়দায় ফেলতে পারে তাতে বরঞ্চ হার্ডউইক খুশিই হবে। মুসলিম লীগ মুখে যাই বলুক না কেন, এদেশের মাটি থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টায় হিন্দুরাই যে প্রধানত অগ্রণী একথা ব্রিটিশ আই. পি. অফিসার হার্ডউইকের অজানা নেই।

লালবাজারের এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টদের ভূমিকাই বিস্ময়কর। দেশের রাজনীতির মধ্যে তারা নেই, তবুও তাদের অধিকাংশেরই মনের পাল্লা ঝুঁকে পড়েছে ঐ মুসলমানদের দিকে। কারণও সেই একটিই। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে হিন্দুরাই বরাবর নিয়েছিল অগ্রণী ভূমিকা। কাজেই ওরা নাস্তানাবুদ হোক এটাই ছিল তাদের কামনা।

সারা কলকাতা জুড়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্যে ভেতরে চলেছে গোপন প্রস্তুতি। গোপনই বা কেন, এই প্রস্তুতির খবর অনেকেরই জানা। জানে ডেপুটি কমিশনার দোহা, জানে কমিশনার হার্ডউইক, এমন কি জানেন প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবও। তাই না তিনি ঐ ষোলই আগস্ট দিনটিকে সরকারী-বেসরকারী ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছিলেন। সরকারী ঘোষণায় অবশ্যি বলা হয়েছিল যে, অগ্নিগর্ভ মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করেই নাকি তিনি তা করেছিলেন। গোলমাল যাতে না ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নাকি তিনি ঐ ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের ধারণা অন্য রকম। তাদের মতে মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট এ্যাকশন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে সফল করে তুলতে গিয়েই নাকি তিনি একাজ করেছিলেন।

মহানগরী কলকাতায় এতবড় একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে কিন্তু পুলিশ তরফে কোথাও কোন প্রস্তুতি নেই। তবে কি ঐ ষোলই আগস্ট দিনটির আগের একটি সপ্তাহ লর্ড সিনহা রোডের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কিংবা গোটা বাংলার ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসে তালা ঝুলছিল? পলিটিক্যাল খবর যোগাড় করতে দক্ষ অফিসারদের কি ঐ ক'দিন ছুটি দিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়েছিল? না কি, খবর সংগ্রহের যন্ত্র ঠিকমতই চালু ছিল, কিন্তু তাদের গোপন রিপোর্ট-গুলো কোনো এক অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে উধাও হয়ে গিয়েছিল মাঝ-পথেই?

বিদুষী মহিলা মিসেস হার্ডউইক। পুলিশ কমিশনার স্বামীর চাকরির ব্যাপারে কোন কৌতূহলই নেই তার। দেশের রাজনীতি নিয়েও মোটেই মাথা ঘামায় না সে। রাতদিন দুই নম্বর কিড্ স্ট্রীটের বাড়িতে নিজের ছোট্ট লাইব্রেরীটি নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে। চৌরঙ্গী ও ডালহৌসী অঞ্চলের বিখ্যাত বইয়ের দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন ফরেন্ পাবলিকেশনের বই কিনে তা দিয়ে নিজের লাইব্রেরী সাজায়, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকে সেই বইয়ের মধ্যে। বিখ্যাত লেখকদের বই ছাড়া আর কোন কিছুতেই কোন কৌতূহল নেই তার।

সেই মিসেস হার্ডউইকই একদিন চায়ের টেবিল স্বামীকে জিজ্ঞেস করে বসল, ওয়েল ববি, ষোলই আগস্ট শহরে সত্যিই কি কিছু ঘটবে বলে তুমি মনে কর ?

এমন একটা প্রশ্নের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না হার্ডউইক। এমনি একটা প্রশ্ন যদি কোন প্রেস রিপোর্টারের কাছ থেকে আসত তাহলে হয়ত সে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বলত, ওয়েল মিস্টার, আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নই, কাজেই আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে সেই মুহূর্তে ইচ্ছে হল না হার্ডউইকের। তাই সে তার স্ত্রীর শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, দেখো, দেশের যা রাজনৈতিক অবস্থা তাতে সত্যিই কিছু ঘটবে কিনা তা জোর করে বলা যায় না। এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক তো মোটেই ভাল নয়। কাজেই—

কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় হার্ডউইক। মিসেস আবার জিজ্ঞেস করে, তোমাদের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কোন খবর নেই ?

একটু আমতা আমতা করে জবাব দেয় হার্ডউইক, না তেমন খবর আর কোথায় ? আজকাল কি কারুর কাজে নিষ্ঠা আছে ? সবাই ফাঁকি দিতে চায়। সিক্রেট খবর যোগাড় করতে হলে যতটুকু চেষ্টার প্রয়োজন সেটুকু করতেও তারা নারাজ। হার্ডউইক অবলীলায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়।

—তাহলে, ষোলই আগস্ট দিনটির ব্যাপারে তোমাদের কোনই প্রস্তুতি নেই ?

—না-না, তা কেন ? হার্ডউইক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, তবে জানো তো, মিনিস্ট্রির নির্দেশ মত আমাদের চলতে হয়। তাদের ডিরেকশন মতই কাজ করতে হয়।

—বাট্ স্টিল্, এ্যাজ পুলিশ চীফ্ অফ দি সিটি, ইউ হ্যাভ সার্টেন রেস্পন্সিবিলিটি—তোমার নিজের কিছু দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে।

—দ্যাট্স রাইট ডার্লিং। কিছু দায়িত্ব নিশ্চয় আছে, তবে দেশের যা হাল-চাল তাতে নিজের ওপর কোন দায়িত্ব না রাখাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় ?

—তার মানে, মিনিস্ট্রির ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছ তুমি ?

একটু বিব্রত সুরে জবাব দেয় হার্ডউইক, অনেকটা তাই বলতে পার।

বুদ্ধিমতী মিসেস হার্ডউইক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন চিন্তা করে। তারপর আবার বললে, কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ দিন শহরে একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে।

বিস্মিত কণ্ঠে হার্ডউইক বলে ওঠে, তুমি তোমার লাইব্রেরীতে বসে এসব কথা কেমন করে জানলে ?

—লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ি বলে কি দেশের কোন খবরই রাখি না মনে করেছ ?

—তোমার খবরের সোর্স তো হচ্ছে খবরের কাগজ। ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা নিজেদের পছন্দমত খবর লেখে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু

হেসে হাল্কা সুরে কথাটা বললে হার্ডউইক।

মিসেস হার্ডউইক কিন্তু হাসে না। গম্ভীরকণ্ঠে সে আবার বললে, খবরের কাগজ তো আছেই, তাছাড়া শহরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেই তা টের পাওয়া যায়।

—তুমি কি আজকাল তাই করছ নাকি?

—না-না, পথের লোককে ডেকে কথা বলতে হবে কেন? বাড়িতে এতগুলো খানসামা-বাবুর্চি রয়েছে। ওদের কথাবার্তাতেই বুঝতে পারি ঐ ষোলই আগস্ট শহরে যে একটা ভয়ানক কিছু ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে ওরা একরকম নিঃসন্দেহ। আমার আরও আশ্চর্য লাগে, ঐ মুসলমান খানসামা-বাবুর্চির দল যেন ঐ দিনটির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

এবার গম্ভীর সুরে জবাব দেয় হার্ডউইক, সেটাই স্বাভাবিক। এদেশের প্রায় প্রতিটি মুসলমানই পাকিস্তান কায়েমের পক্ষে। হিন্দু-সুপীরিয়রিটির হাত থেকে তারা মুক্তি চায়। তাই ওদের ধারণা ঐ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ওরা ওদের পাকিস্তান আদায় করতে পারবে। তাই ওদের এত উৎসাহ।

—কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে শহরে একটা বিপর্যয় নেমে আসুক তা বোধহয় কেউ চায় না। পুলিশ চীফ্ হিসেবে তুমি অন্তত তা চাও না বলেই বোধহয় আমি বিশ্বাস করতে পারি?

নিজের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে হার্ডউইক, আমার চাওয়া না-চাওয়ায় কিছু আসে-যায় না, ডার্লিং। আই এ্যাম ওনলি দি সারভেণ্ট অফ দি কিং।

শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় মিসেস হার্ডউইক, ইউ আর আলসো দি সারভেণ্ট অফ দি পাবলিক।

ষোলই আগস্ট সম্পর্কে শহরময় এমন একটা চাপা উত্তেজনা, কিন্তু সেই তুলনায় পুলিশ মহলের প্রস্তুতি যেন একেবারেই শূন্য। গোটা লালবাজার জুড়ে কেমন যেন এক অলসতা। স্বাধীনতা-আন্দোলনের যে-কোন একটা সাধারণ ঘটনায় যে লালবাজার চন্‌মন্ করে উঠত, সহস্র বুটের শব্দে আর পুলিশ ভ্যানের গর্জনে ভারি হয়ে উঠত যার আকাশ-বাতাস, সেই লালবাজার আজ যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন। কোন উত্তেজনা নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই। অন্তত বাইরে নেই তার কোন প্রকাশ।

ব্যাপারটা একেবারেই ভাল লাগে না সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্‌কমের। তবে কি গভর্নমেণ্টের কাছে খবর এসেছে যে, যত গর্জাচ্ছে তত বর্ষাবে না? তবে কি গোটা ব্যাপারটাই ফাঁকা হুমকির মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের কোন চক্রান্ত? কিন্তু তাই বলে পুলিশ মহলের এমন প্রস্তুতিহীনতার কি কোন মানে হয়? তাছাড়া ব্যাপারটাকে ফাঁকা হুমকি বলেও তো মনে হয় না। এদেশীয় অফিসারদের মধ্যে কানাকানি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট মহলে জোর আলোচনা - মুসলমানরা এবার পাকিস্তান আদায় করেই ছাড়বে। রাজপথে মুসলিম লীগের মিছিলের শ্লোগান—আল্লা হো আকবর! লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান! কংগ্রেসী মিছিলের পাল্টা জবাব—বন্দে মাতরম্! অখণ্ড ভারত

জিন্দাবাদ ! এর পরেও কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে ঐ ষোলই আগস্ট তারিখটি শান্তিপূর্ণভাবেই কাটবে এই শহরে ?

বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব তা বিশ্বাস করতে পারেন, বিশ্বাস করতে পারে পুলিশ কমিশনার হার্ডউইক সাহেবও। কিন্তু লালবাজারের একজন সামান্য সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্‌কম তা বিশ্বাস করতে পারে না। আর পারে না বলেই পুলিশের এই নিরুদ্বিগ্ন আচরণে বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তিও বোধ করে সে। এ যেন একটা চক্রান্ত—এ যেন একটা ষড়যন্ত্র—এ যেন একটা প্রি-প্ল্যান্‌ড ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থার মূলে যে অদৃশ্য হাতখানি কাজ করছে তার মালিক হতে পারে পুলিশ কমিশনার হার্ডউইক, হতে পারে ডেপুটি কমিশনার প্রবল প্রতাপান্বিত মিস্টার দোহা। এমনকি, প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবের পক্ষেও সেই হাতের মালিক হওয়া আশ্চর্য নয়।

এই কথাটাই সেদিন আলোচনা করছিল সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্‌কম। আলোচনা করছিল রুমা বাঈজীর সঙ্গে।

দেশের এই অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রুমা বাঈজীর গানের আসর যেন একটা ভাঙা হাট। আজকাল বিশেষ কেউ আসে না এদিকে। কিন্তু ম্যাল্‌কম না এসে পারে না। সময় পেলেই সে আসে। মেরিয়াকে আজকাল বলে-কয়েই সে আসে। বলে, ডিউটির পরে আজ একবার রুমার ওখান থেকে ঘুরে বাড়ি ফিরব।

শান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মেরিয়া। তারপর মাথা নিচু করে মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, দিন-কাল ভাল নয়, একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

—অচ্ছা। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে যায় ম্যাল্‌কম।

ম্যাল্‌কম বলছিল রুমাকে, ষোলই আগস্ট মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট এ্যাকশনের তারিখ। ওদিন শহরে কি যে ঘটবে কে জানে ?

ম্যাল্‌কমের জন্যে চা তৈরি করছিল রুমা। চুলের কাঁটাহীন মাথার খোপাটা ভেঙে পড়েছিল তার ঘাড়ের ওপর। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল তার কপালে। চামচ দিয়ে কেটলিতে চা নাড়তে গিয়ে তার কানের লম্বা দুলজোড়া অল্প অল্প দুলছিল। ম্যাল্‌কমের কথায় কোন জবাব না দিয়ে সে কেবল মাথা নিচু করে নিজের কাজ করতে থাকে।

ম্যাল্‌কম তার হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে পোড়া অংশটুকু বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর মুখ তুলে রুমার দিকে তাকাতেই রুমা একটু এগিয়ে এসে চায়ের কাপটা ম্যাল্‌কমের হাতে তুলে দিয়ে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, সে কি গো সাহেব, তোমরা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের লোক হয়ে জান না পরশু শহরে কি ঘটতে পারে ?

একটু আমতা আমতা করে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, অনেকেই অনেক কিছু ঘটবার আশঙ্কা করছে। কিন্তু সত্যি সত্যি সেদিন—

ম্যাল্‌কমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রুমা বলে ওঠে, বুঝি না বাপু দেশের নেতাদের চাল-চলন। ওরা যখন পাকিস্তান চায় তখন তা দিয়ে দিলেই তো

ল্যাঠা চুকে যায়। এ নিয়ে এত জল ঘোলা করা কেন?

—তুমি তো মুখের কথা বলে দিলে। কিন্তু যারা দেশটাকে ভাঙতে চায় না তারা এতে রাজি হবে কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রুমা আবার বললে, মুখ্যু মেয়েমানুষ, রাজনীতির কিই বা বুঝি! তবে রোজকার খবরের কাগজ পড়ে আর নেতাদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয় যারা পাকিস্তান চায় তাদের তা দিয়ে দেওয়াই উচিত। কোন একান্নবর্তী পরিবারে জোর করে কোন ভাইকে কি আটকে রাখা চলে? যে বাস্তবিকই পৃথক হয়ে যেতে চায় তাকে তা করতে দেওয়াই উচিত। তাতে আর কিছু না হোক ভবিষ্যতে মনের মিল হবার একটা সম্ভাবনা অন্ততঃ থাকে। কিন্তু এমনিভাবে এক সংসারে থেকে রোজ লাঠালাঠি করার কি কোন মানে হয়?

রাজনীতির প্রসঙ্গে না গিয়ে ম্যাল্‌কম কেবল বললে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান বুঝি না, এই নিয়ে শহরে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা না বাধলেই বাঁচি। দাঙ্গা-হাঙ্গামা মানেই তো আমাদের খাটুনির একশেষ। এখানে যাও, ওখানে দৌড়াও, এখানে লাঠি চালাও, ওখানে গুলি ছোঁড়—এসব আর কত ভাল লাগে?

সহসা রুমার চোখের তারায় একটু শঙ্কার ভাব জেগে ওঠে। ম্যাল্‌কমের মুখের পানে তাকিয়ে সে বললে, একটু সাবধানে চলাফেরা কর, সাহেব। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে একটা কিছু অঘটন ঘটিয়ে বোস না যেন।

রুমার কথায় হেসে ওঠে ম্যাল্‌কম। হাল্‌কা সুরে সে জবাব দেয়, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধলে আমাদের বিপদ কোথায়? আমরা তো খ্রীষ্টান। তাছাড়া, কেউ সহসা পুলিশের গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে না।

একটু থেমে ম্যাল্‌কম আবার বললে, তবে আমার দুশ্চিন্তা তোমাকে নিয়ে।

—আমাকে নিয়ে? বিস্মিত কণ্ঠস্বর রুমার।

—হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে। যে পাড়ায় তুমি আছ তার চারদিকেই তো মুসলমান।

—তাতে কি? এ পাড়ার প্রতিটি মুসলমান আমাকে চেনে। তারা কেউই আমার গায়ে হাত তুলবে না। তাছাড়া, আমি হচ্ছি বাঈজী। বাঈজীদের কি কোন জাত আছে? হিন্দু-মুসলমান সবার জন্যেই তো আমাদের দরজা খোলা। আমার জন্যে শুধু শুধু ভাবতে হবে না তোমাকে।

ম্যাল্‌কমের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। খালি চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বললে, এবার আমি উঠি।

—এত তাড়াতাড়ি? হেসে বলতে থাকে রুমা, বাড়িতে গিন্নী বুঝি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছে?

ম্যাল্‌কমও হেসে জবাব দেয়, কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি তাকে?

সারা মুখে একটা কৃত্রিম বিষণ্ণতা ফুটিয়ে তুলে রুমা বলে ওঠে, হিংসে হলেও উপায় কি, সাহেব? শত হলেও সে হচ্ছে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। আর আমি কে?

—না, তুমি কেউ নও। তবে সেই বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে নিয়ে এখনও যে ঘর করছি তার সমস্ত কৃতিত্বটুকুই যার প্রাপ্য তার নাম

রুমা বাঈজী।

সহসা একটু গম্ভীর হয়ে উঠে রুমা। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, কৃতিত্ব আর এমন কি দেখলে? নিজে মেয়ে, তাই মেয়েদের মন বুঝি। যাক ওসব পুরানো কথা। তা, আর একটু বোস না সাহেব। এমন বেশি রাত তো হয় নি।

—শুধু শুধু বসে থেকে কি করব? কথাটা বলে মিটি মিটি হাসতে থাকে ম্যাল্‌কম।

রুমাও তার পাতলা ঠোঁটের ওপর হাসির রেখা টেনে জিজ্ঞেস করে, কি করতে চাও সাহেব?

—যা করতে চাই তাতে কি তুমি রাজি হবে, রুমা? হাল্‌কা কণ্ঠস্বর ম্যাল্‌কমের।

—মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রুমা বললে, নিশ্চয়ই রাজি হব, কারণ আমি জানি তুমি কোন কিছু অন্যায় করতে চাইবে না।

—ন্যায়-অন্যায় বোধ যদি আমি এই মুহূর্তে বিসর্জন দিই? এবার ঈষৎ গম্ভীর শোনায় ম্যাল্‌কমের কণ্ঠস্বর।

—না, তা তুমি পার না। সেটা তোমার স্বভাববিরুদ্ধ।

—তুমি এতখানি বিশ্বাস কর আমাকে?

—না, ঠিক বিশ্বাস নয়, ভরসা করি তোমার ওপর।

হঠাৎ হেসে ফেলে ম্যাল্‌কম। হাসতে হাসতে বললে, আর কিছু নয়। অনেক দিন গান শুনি নি তোমার। একটা গান শোনাবে?

জবাব দেয় রুমা, গান-বাজনা তো প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। আর সত্যি বলতে কি ওসব কেন যেন আর ভালও লাগে না। তা, শুনতে যখন চেয়েছ তখন শোনাব।

ঘরের কোণ থেকে তানপুরাটা নিয়ে আসে রুমা। শাড়ির আঁচল দিয়ে তানপুরার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মৃদুকণ্ঠে বললে, এককালে এত ভালোবাসতাম এটাকে, এর গায়ে এতটুকু ধুলো-ময়লা সহ্য করতে পারতাম না। আর আজ— কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসে কেবল।

বিছানার ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে ম্যাল্‌কম। অদূরে তানপুরায় গাল ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে তারের ওপর আঙুল চালিয়ে টুং-টাং শব্দ তুলতে থাকে রুমা।

এক সময় ম্যাল্‌কম বললে, সেই গনটা গাও না রুমা—বলে দে সখী বলে দে, কোথায় গেলে শুনতে পাব ( সেই ) পাগল করা বাঁশির সুর।

রুমার হাতের টুং-টাং শব্দ বন্ধ হয় সহসা। মাথা তুলে ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে তানপুরাটা পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে ভারি কণ্ঠে জবাব দেয়, না সাহেব, ঐ গানটা আর নয়। ঐ গান আর কোনদিনই আমি গাইব না।

—কেন? বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে ম্যাল্‌কম।

—না। অন্য যে কোন গান গাইতে আমি রাজি, কেবল ঐটি ছাড়া। রুমার ভারী কণ্ঠস্বর আরও ভারী হয়ে ওঠে।

—কেন, কি হয়েছে?

রুমা আবার কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকে। তারপর একসময় মুখ তুলে সজল চোখে ম্যাল্কমের দিকে তাকিয়ে অভিমানী কণ্ঠে বললে, না সাহেব, ঐ গানটা আর কোনদিন গাইব না আমি। ওটা আজ আমার কাছে একান্তই অর্থহীন।

—কেন, অর্থহীন কেন?

—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অর্থহীন। জীবনের এতটা বয়স পর্যন্ত ঐ গানটি গেয়েও যখন সেই পাগল করা বাঁশির সুরের এতটুকু রেশ পর্যন্ত আমার কানে পেঁছল না, তখন আর ওটা না গাওয়াই ভাল।

—কিন্তু তুমি তো জান রুমা, ঐ গানটিই আমার সবচাইতে প্রিয়। ঐ গানটিই আমি সবচাইতে বেশি ভালবাসি।

—হ্যাঁ, আমি নিজেও এককালে ভালবাসতাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তা নয়। গানের কথাগুলোকে আমি ভালবাসি সুরকে ভালবাসি, কিন্তু কথা ও সুরের বাইরে যে আসল বস্তুটি রয়েছে সেদিকে আমার মন ছিল না। আর ছিল না বলেই সেই বাঁশির সুর আজও আমি শুনতে পেলাম না।

রুমার কথাগুলোকে কেমন যেন হেঁয়ালী বলে মনে হয় ম্যাল্কমের। কি সে বলতে চায়? কি তার বলার উদ্দেশ্য?

ম্যালকম আবার বললে, কথা ও সুর নিয়েই তো গান। তার বাইরে আবার আসল বস্তুটি কি?

একটু ম্লান হেসে জবাব দেয় রুমা, তার নাম ঐকান্তিকতা। কথা যতই ভাল হোক, সুর যতই চমৎকার হোক, মনের সেই ঐকান্তিকতা না থাকলে কথা ও সুরের জগৎ ছাড়িয়ে সেই গান কোন দিন কোন অপার্থিব জগতে গিয়ে পেঁছতে পারে না। আমার সেই ঐকান্তিকতা বোধহয় কোনকালেই ছিল না সাহেব, তাই আমার জীবনে ঐ গানটি কোনদিন সত্যি হয়ে উঠল না। বলতে মাথা নিচু করে রুমা। তার গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে তানপুরাটার ওপর।

ম্যাল্কম আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে। ঐ গানটি শোনার বড়ই ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু রুমা নারাজ। সে ঐ গান আর গাইবে না।

একসময় মুখ তোলে রুমা। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে মৃদুকণ্ঠে বললে, এই শেষবারের মতই গানটি গাইছি সাহেব, শোন।

তানপুরায় গাল ঠেকিয়ে গান গাইতে থাকে রুমা, আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে লালবাজারের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট মেজর ম্যাল্কম। চোখের পাতা ফেলতেও যেন ভুলে যায় সে। রুমার গলায় এই গানটি বহুবার শুনেছে সে, কিন্তু আজকের মত এমন অভিভূত হয়ে পড়ে নি কোনদিন। এ কোন্ বিস্ময় লুকিয়ে ছিল রুমার কণ্ঠে? রক্ত-মাংসে গড়া কোন মানুষের কণ্ঠে কেমন করে এমন সুরের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে? তবে কি একেই বলে সেই ঐকান্তিকতা? সেই ঐকান্তিকতার ছোঁয়ায় কি গান তার কথা ও সুরের মায়াজাল ছিন্ন করে অপার্থিব এক জগতের দিকে যাওয়ার মুহূর্তে এমন রূপ পরিগ্রহ করে?

পুরো একটি ঘণ্টা ধরে সঙ্গীতের সেই মায়ালোক সৃষ্টি করে চলল রুমা।

অবশেষে একসময় শেষ হল সেই সঙ্গীত। রুমা কিন্তু তখনও তানপুরার সঙ্গে গাল লাগিয়ে চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে আছে।

—রুমা—রুমা! ম্যাল্‌কম ডাকে।

কোন সাড়া নেই রুমার।

ম্যাল্‌কম আবার ডাকে, রুমা—রুমা!

তবুও রুমা নিরুত্তর।

ম্যাল্‌কম এবার হাত বাড়িয়ে রুমার একটা হাত ধরে আবার ডাকে, রুমা—রুমা।

সহসা রুমার দেহখানি থর থর করে একবার কেঁপে ওঠে। পরক্ষণেই সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পায় ম্যালকমের সারা মুখের ওপর একটা উৎকণ্ঠার চিহ্ন।

কয়েকটি মুহূর্ত। কিন্তু সেই কয়েকটি মুহূর্তই যেন কয়েক যুগ। রুমার মনে হয় যেন সে যুগ যুগ ধরে এমনিভাবে তাকিয়ে আছে ম্যালকমের দিকে। হঠাৎ কি যেন হল। ঠোঁটের কোণে একটু শান্ত হাসি ফুটে উঠল রুমার। পরমুহূর্তেই সে ম্যাল্‌কমের একখানি হাত চেপে ধরে ভাববিভোর কণ্ঠে বলে উঠল, একটা কথা রাখবে সাহেব?

—কি কথা রুমা? আবেগজড়িত কণ্ঠে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম।

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা মিলিয়ে যেতে না দিয়ে তেমনি সুরে বলতে থাকে রুমা, আজ রাতটা তুমি থাকবে আমার কাছে?

বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না ম্যাল্‌কমের। এ কোন্ রুমা? অনেকদিন আগে যে রুমা বাঈজীর কাছে একটি রাত কাটাবার প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ম্যাল্‌কম, আজ পর্যন্ত যে রুমা বাঈজীর অঙ্গস্পর্শ করে নি ম্যাল্‌কম, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে চরম বিপদের মুহূর্তে যে রুমা বাঈজী প্রতি-নিয়ত তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়ে এসেছে, তার মুখে আজ এ কী শুনছে ম্যাল্‌কম? ভোগের প্রবৃত্তিকে ত্যাগের নিবৃত্তি দিয়ে দমন করার কৌশল যার কাছ থেকে ম্যাল্‌কম আয়ত্ত করেছে সেই বাঈজী আজ হঠাৎ কিসের প্রলোভনে এমন নিচে নেমে আসতে চাইছে? তবে কি এতদিন ভুল করেছে ম্যাল্‌কম? রুমার গণিকাবৃত্তিকে বাইরের একটা আবরণ বলে মনে করে কি ভুল করেছে সে? আসলে সেটাই কি তার সত্যিকার পরিচয়?

ম্যাল্‌কমকে চুপ করে থাকতে দেখে রুমা তার হাতে আবার একটু চাপ দিয়ে প্রায় ধরা গলায় বললে, মাত্র একটি রাত কি তুমি থাকতে পার না আমার কাছে? কোনদিন তো তোমার কাছে কিছু চাই নি, সাহেব। আজ এইটুকু মাত্র চাইছি। রুমার কণ্ঠস্বরে যেন অনুনয় ঝরে পড়তে থাকে।

নিজের বিব্রতভাবটুকু কাটিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসে ম্যাল্‌কম। তারপর রুমার চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে না নিয়ে সহজ কণ্ঠে বললে, এ তুমি কি বলছ রুমা? এতে যে মেরিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় তা তো একদিন তুমিই শিখিয়েছিলে।

রুমা যেন আর ধৈর্য ধরতে পারে না। ম্যাল্‌কমের সম্মতি যেন এখনই

তার চাই।

ম্যাল্‌কম থামতেই রুমা বলে ওঠে, ঠিক বলেছ সাহেব। ওকথা একদিন আমি বলেছিলাম। কিন্তু আজ আমিই আবার অনুরোধ করছি তোমাকে। একটি রাতের জন্যে না হয় তোমার মেরিয়ার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে—

—তার মানে, মেরিয়ার সেদিনকার ব্যভিচারের এমনিভাবেই প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে?

—নিলেই বা। কি এমন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে তাতে?

ম্যাল্‌কম আর কিছু না বলে গুম হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। কি জবাব দেবে সে রুমাকে? তার একটি রাতের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে গেলে জীবনের হিসেব-নিকেশের অঙ্কগুলো যে সব গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

অধীর কণ্ঠে রুমা আবার বললে, বল সাহেব, জবাব দাও।

উত্তেজনাহীন সুরে ম্যাল্‌কম বললে, তাতে কি সত্যি সত্যিই তুমি খুশি হবে, রুমা?

হঠাৎ ম্যাল্‌কমের হাতখানি ছেড়ে দেয় রুমা। পরক্ষণেই সে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

—ওকি, অমন করে হাসছ কেন? বিব্রত সুরে বলে ওঠে ম্যালকম।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কে তার প্রশ্নের জবাব দেবে? রুমা হাসছে, খিল্-খিল্ করে অর্থহীন হাসি হেসেই চলেছে একটানা। হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়ছে বিছানার ওপর। পরমুহূর্তে সোজা হয়ে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পাগলের মত হেসে চলেছে।

—রুমা—রুমা, কি হয়েছে তোমার?

—কিছু না সাহেব, কিছু না। হাসতে হাসতেই জবাব দেয় রুমা, নিজের বোকামির কথা মনে করেই হাসি পাচ্ছে আমার।

—কিসের বোকামি?

—তোমাকে এখানে রাত কাটাতে অনুরোধ করার বোকামি।

—কেন, বোকামি কেন?

সহসা হাসি থামায় রুমা। হাসতে হাসতে লাল হয়ে ওঠা তার মুখখানার ওপর একটা অন্ধকারের ছায়া নেমে আসে। তারপর শান্ত চোখে ম্যাল্‌কমের দিকে তাকিয়ে চাপা সুরে জবাব দেয়, ওটা আমার মনের কথা নয়, সাহেব। এতক্ষণ তোমাকে আমি পরীক্ষা করছিলাম।

—পরীক্ষা?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, পরীক্ষা। ছলা কলায় তো আমাদের জুড়ি নেই। তাই ছলনার মাধ্যমে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। অনেক রাত হয়েছে, এবার তুমি ওঠো সাহেব। মেরিয়া হয়ত তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। বলতে বলতে রুমা জানালা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে বাইরের অন্ধকারের দিকে।

না, আর এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের। অতীতের স্মৃতিগুলো বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওখানে এলে। তাই সে এই

অঞ্চলটি সযত্নে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। অতীতের স্মৃতিচারণে কি লাভ হবে তার? কিছু না। কেবল শুধু শুধু মনটা ভারি হয়ে উঠবে।

মানিকতলা অঞ্চলে গাড়ি-ঘোড়া-পথচারীদের ভিড়। মোড়ে দাঁড়িয়ে দু'জন ট্রাফিক কনস্টেবল ডিউটি করছে। ট্রাফিকের লাল-নীল বাতি জ্বলছে-নিভছে। শ্যামবাজারের দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা মিছিল। হাতে তাদের লাল শালুর ফেস্টুন, মুখে তাদের দাবীর শ্লোগান।

হ্যাঁ, সেই ষোলই আগস্টও শহর কলকাতায় এমনি অনেক মিছিল বেরিয়েছিল। লাল শালুর বদলে সবুজ কাপড়ের ওপর চাঁদ-তারা মার্কা পতাকা ছিল তাদের হাতে। মুখেও ছিল তাদের এমনি দাবীর শ্লোগান—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—আল্লা হো আকবর।

ষোলই আগস্ট উনিশ শ' ছেচল্লিশ সাল—দি ডে অফ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। সাম্প্রদায়িকতার বিষ সেদিন গোটা শহরকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সেদিন মানুষের জীবনের মূল্য একটি কানাকড়িও ছিল না। মহানগরী কলকাতার সেই দুর্দিনে বিশেষ করে দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রথম দু'-তিন দিন ঐ লালবাজার যেন নিয়েছিল এক নীরব দর্শকের ভূমিকা।

পরবর্তীকালে কিন্তু দাবী ও পাল্টা-দাবীর অন্ত ছিল না। এক সম্প্রদায়ের দাবী ছিল যে, সেই ডাইরেক্ট এ্যাক্শনের দিনটিতে তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাই হামলা করেছিল প্রথমে। অন্য সম্প্রদায়ের দাবী ছিল যে, হাজার হাজার মানুষ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিলের পথে ভিন্ন সম্প্রদায়ের দোকান-পসার লুঠ করতে করতে চলেছিল পুলিশের চোখের সামনেই।

উত্তর কলকাতায় হাঙ্গামার সূত্রপাত হল এই মানিকতলা অঞ্চলেই একটা মিষ্টির দোকানে আগুন লাগানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সারা শহরে সেদিন বিভীষিকার রাজত্ব। আইন-শৃঙ্খলাহীন শহর কলকাতায় সেদিন সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্য। লুঠ ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে অমানুষিক প্রতিহিংসায় নরহত্যা। ঘাতকদের হাত থেকে সেদিন শিশু, বৃদ্ধ, নারী কেউই রেহাই পায় নি। লাঞ্ছিতা হয়েছে শত শত যুবতী। ধর্ষিতা হয়েছে পিতার চোখের সামনে কন্যা, পুত্রের চোখের সামনে মাতা। দলবদ্ধভাবে এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের এলাকায় ঢুকে তছনছ করে দিয়েছে তাদের ঘর-সংসার। ঠেলাগাড়িতে করে পাচার করা হয়েছে মৃতদেহের স্তূপ। ঠেলা-গাড়ির পেছনে রাস্তায় ঝরে পড়া মানুষের রক্ত চাটতে চাটতে এগিয়ে গিয়েছে রাস্তার কুকুরেরা। সেদিন হ্যারিসন রোডে কোন একটি কুলবধূর ওপর অমানুষিক লাঞ্ছনার কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও, ছড়িয়ে পড়ে নি এমন ঘটনারও অন্ত ছিল না।

মহানগরীর জীবনযাত্রা স্তব্ধ। রাস্তা-ঘাটে লোকজন নেই। বাস-ট্রাম বন্ধ। কেবল মহল্লায় মহল্লায় আগুনের কালো ধোঁয়া, আর মানুষের উৎকট চিৎকার। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে আল্লার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। অন্য সম্প্রদায়ও তেমনি আচরণ করেই বন্দনা করছে দেশমাতৃকাকে।

আল্লা কিংবা দেশমাতৃকা কেউই যে এতে খুশি হতে পারে না এ বোধ সেদিন কারুরই ছিল না। থাকলে বোধহয় মানুষ এমন অমানুষ হয়ে উঠতে পারত না সেদিন।

দিন-দুয়েক পরেই যেন একটু একটু করে জেগে ওঠে লালবাজার। প্রথম দু' দিনের একতরফের লড়াই তখন শেষ হবার মুখে। শুরু হয়েছে প্রতিরোধ ও পালটা জবাব। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত—এই জংলী মন্ত্রেই সেদিন মহানগরীর মানুষেরা উদ্বুদ্ধ। সংখ্যাগুরু এলাকায় সংখ্যালঘুদের আর্ত চিৎকার যেন এই দু'দিন পরে লালবাজারের কানে এসে পৌঁছায়। এবার একটা কিছু না করলেই নয়।

লালবাজারের কণ্ট্রোল রুমের শেষ প্রান্তে মন্ত্রী ও উঁচু পর্যায়ের অফিসারদের কক্ষে এসে বসেছেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী স্বয়ং। কণ্ট্রোল-রুমের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন সুরাবর্দী সাহেব। বাইরের বড় মেসেজ রুমে টেলিফোন কানে লাগিয়ে একের পর এক জরুরী বার্তা লিখে নিচ্ছিল অপারেটররা। কণ্ট্রোল রুমের অফিসার-ইন-চার্জের হাত ঘুরে সেই বার্তা চলে যাচ্ছে পাশের ঘরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। মিস্টার দোহার সঙ্গে আলোচনার পরে সুরাবর্দী সাহেবের জরুরী নির্দেশ চলে আসছে মেসেজ টেবিলে। সেই নির্দেশ আবার চলে যাচ্ছে খোদ কমিশনারের কাছে।

একটু একটু করে লালবাজার জেগে উঠতেই অফিসারদের ওপর এসে পড়ল ভয়ানক কাজের চাপ। এক সম্প্রদায়ের মহল্লায় অন্য সম্প্রদায়ের অফিসার পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না সুরাবর্দি সাহেব। কাজেই তথাকথিত নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের অফিসার চাই।

পুলিশ কমিশনার হার্ডউইকের নির্দেশে প্রধানত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টদের ওপর পড়ল সংখ্যাগুরু এলাকা থেকে সংখ্যালঘুদের উদ্ধারের দায়িত্ব। তাদের নির্দেশ দেওয়া হল—সুট্ অ্যাট্ সাইট। কাউকে নরহত্যা করতে দেখলে কিংবা আগুন লাগাতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি কর।

রাত দিন একটানা পরিশ্রম করতে হচ্ছে সার্জেণ্ট-মেজর ম্যাল্‌কমকে। কোমরে গুলিভর্তি রিভলবার ঝুলিয়ে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী সঙ্গে নিয়ে অত্যাচারিতদের উদ্ধার করতে ছুটতে হচ্ছে তাকে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কড়া পুলিশ পাহারায় খোলা হয়েছে উদ্ধারাশ্রম। দলে দলে নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ এসে আশ্রয় নিচ্ছে সেখানে।

এমনি এক দিনে লালবাজারে এডিশনাল পুলিশ কমিশনার নর্টন জোন্সের ঘরের টেলিফোন বেজে ওঠে। নর্টন জোন্স টেলিফোন তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে ওঠে জোড়াসাঁকো থানার অফিসার-ইন-চার্জের কণ্ঠস্বর, স্যার, কতকগুলো মৃতদেহ সমেত একটা লরী আটক করেছি।

প্রায় আঁতকে ওঠে নর্টন জোন্স, বাই জোভ, কোথায় ?

—চিৎপুর এলাকায় একটা মুসলিম রেসকিউ হোমে। একটা ম্যানহোলের মধ্য দিয়ে মৃতদেহগুলো পাচার করার চেষ্টা হচ্ছিল, স্যার !

—সঙ্গে ফোর্স আছে ?

—আছে স্যার।

—ডেডবডি সমেত লরীটাকে থানায় নিয়ে যান। আমি সি. পি.-কে খবরটা দিয়েই রওনা হচ্ছি।

—ডেডবডির মধ্যে দু'জন নেপালী কনস্টেবলের মৃতদেহও আছে, স্যার।

—ইজ ইট্ ?

—ইয়েস স্যার।

—কি করে ওদের আইডেণ্টিফাই করলেন ?

—ওদের কোমরের বেল্ট দেখে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নর্টন জোন্স। তারপর আবার নির্দেশ দেয়, অল রাইট। কনস্টেবলের মৃতদেহের খবর যেন ছড়িয়ে না পড়ে। আমি এখনই যাচ্ছি।

—ঠিক আছে, স্যার। টেলিফোন ছেড়ে দেয় জোড়াসাঁকো থানার অফিসার-ইন্-চার্জ।

খবরটা কিন্তু চাপা থাকে না। দেখতে দেখতে দুজন নেপালী কনস্টেবল-হত্যার খবরটি আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে পুলিশ মহলে। প্রথমে মৃদু গুঞ্জন ওঠে এক সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে নেপালী কনস্টেবলদের মধ্যে। পরক্ষণেই সেই গুঞ্জন বিক্ষোভে পরিণত হয়।

মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আর হাতে গুলিভর্তি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। আর যায় কোথায়! উত্তাল হয়ে ওঠে খোদ লালবাজার। কোথায় সেই নাটের গুরু ডেপুটি কমিশনার দোহা সাহেব? ধর তাকে। গুলি করে উড়িয়ে দাও তার মাথার খুলি।

সেই মুহূর্তে লালবাজারে উঁচু পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে একমাত্র দোহা সাহেবেই উপস্থিত। নিতান্তই তার বরাত মন্দ বলতে হবে। দেখতে দেখতে রাইফেল হাতে কনস্টেবলরা এসে চড়াও হয় তার ওপর। খড়-কুটোর মত ভেসে যায় ফোর্সের ডিসিপ্লিন। প্রাণের ভয়ে মুখখানা শুকিয়ে ওঠে দোহা সাহেবের। আর বোধহয় রক্ষা নেই। পুলিশ-বাহিনীর মধ্যে সবচাইতে বিশ্বস্ত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ নেপালী কনস্টেবলরাই যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে তখন তাদের রোষ থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। খোদ লালবাজারের মধ্যেই বোধহয় সেমসাইড গেম শুরু হয়ে গেল।

আর্মড ফোর্সের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার প্রিক্টন সাহেবের কোয়ার্টার লালবাজারের মধ্যেই। খবর পেয়ে চমকে ওঠে সে।—সর্বনাশ, এখন উপায় ?

বেশিক্ষণ ভাবনা-চিন্তার অবসর নেই প্রিক্টনের। এখনই হয়ত একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে। পোশাক পরার আর অবসর পেল না ভদ্রলোক। গেঞ্জি ও আণ্ডারওয়্যার পরেই ছিপছিপে চেহারার প্রিক্টন সাহেব তাড়াতাড়ি এসে হাজির হল নিচে।

অনেক সাধ্য-সাধনা, অনুরোধ-উপরোধের পরে একটু শান্ত হল কনস্টেবলরা! নেহাত এই সাহেবটিকে তারা পছন্দ করত বলেই তার কথামত নাটের গুরু দোঁহা সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে চলে এল তারা। আর ভয়ে নীল হয়ে ওঠা ঠোঁটের

ফাঁকে একটু ম্লান হেসে দোহা সাহেব কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে কেবল বললে, আই এ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ, মিস্টার প্রিক্টন।

শহর জুড়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা তখনও সমানে চলছে। সাম্প্রদায়িকতার যে দানবকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছিল সেই দানব তখনও লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মত উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। সেই মুহূর্তে তাকে বশে আনা তেমন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। সে তখনও নর-রক্ত পানে তৃপ্ত হয় নি। নারীমাংস-লোলুপতা তখনও ঘোচে নি তার।

রাউন্ড-দি-ক্লক ডিউটির মধ্যেও সার্জেণ্ট-মেজর ম্যালকমের মনটা ছট্‌ফট করে রুমার খবরের জন্যে। হতে পারে রুমার কথাই ঠিক, হতে পারে সে তার মুসলমান প্রতিবেশীদের পরিচিত, কিন্তু শহরের এই পরিস্থিতিতে সেই পরিচয়ের কি কোন মূল্য দেবে তারা? মানুষের জিঘাংসার কাছে পরিচয়ের চক্ষুলজ্জার যে কোন মূল্যই নেই।

কিন্তু ম্যাল্‌কমকে কে দেবে রুমার খবর? একটানা ডিউটির মধ্যে এক মুহূর্ত এমন ফুরসৎ নেই যে, এক ফাঁকে গিয়ে তার খবর নিয়ে আসে। তা'ছাড়া শহরের এই পরিস্থিতিতে ঐ এলাকায় তার একার পক্ষে যাওয়া উচিতও নয়। সে নিজে খ্রীস্টান বলেও নয়। গোটা শহর জুড়ে যেখানে মানুষের উন্মত্ত তাণ্ডব সেখানে পুলিশ বলে কেউ তাকে রেহাই নাও দিতে পারে।

মনের অস্বস্তি মনেই চেপে রেখে ডিউটি করে চলে ম্যাল্‌কম। শহর জুড়ে আগুন ও মানুষের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনির মধ্যে মাঝে মাঝে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে। ইচ্ছে হয় কোমর থেকে রিভলবার টেনে তুলে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে ঐ পৈশাচিক উল্লাস চিরতরে থামিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেয় নিজেকে।

দাঙ্গার চতুর্থ দিনে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না ম্যাল্‌কম। খবর চাই—রুমা বাঈজীর খবর চাই। সে যে বহাল তবিয়তে আছে সেই খবরটুকু পেলেই সে খুশি।

বিকেলের দিকে ডি. সি.-র পারমিশন নিয়ে পুলিশ-ভ্যানভর্তি ফোর্স সঙ্গে করে ম্যাল্‌কম বেরিয়ে পড়ে মানিকতলার দিকে। ডি. সি.-কে জানাল যে, ঐ অঞ্চলে তার যে নিকট-আত্মীয়টি থাকে তার একটা খবর নেওয়া প্রয়োজন। সঙ্গের হিন্দুস্থানী জমাদার তার মোটা গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে বললে, কুছ ডর্ নেহি, সাব। সাহাব লোগোকো কুছ ডর্ নেহি। ওলোগ আচ্ছাই হ্যায়।

পথে যেতে যেতে ভাবতে থাকে ম্যাল্‌কম—আর নয়। রুমা নিজেকে যতই কেন না নিরাপদ মনে করুক, আর একটি দিনও সে তাকে ওখানে থাকতে দেবে না। তেমন প্রয়োজন হলে আজই সে তাকে এই পুলিশ-ভ্যানে করে নিয়ে আসবে।

বড় রাস্তা ছেড়ে পাড়ার ভেতর প্রবেশ করে পুলিশ-ভ্যান। কেমন যেন খাঁ-খাঁ করছে এলাকাটা। এখানে-ওখানে পোড়া বাড়ির আগুন তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। পুলিশের অস্তিত্ব টের পেয়ে একদল হাঙ্গামাকারী তাড়াতাড়ি সরে

পড়ে গলি-ঘুঁজির মধ্যে।

না, রুমার বাড়িটা অক্ষতই আছে। বাঈজী বলেই বোধহয় সে রেহাই পেয়েছে, নইলে এতদিনে বাড়িটা পুড়ে সাফ হয়ে যেত।

কিন্তু এমন নির্জন কেন বাড়িটা? নিচের ভাড়াটেরাই বা গেল কোথায়? তবে কি বিপদের গন্ধ পেয়ে ওরা সবাই কোন নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেছে?

রাস্তায় পুলিশ-ভ্যান দাঁড় করিয়ে কয়েকজন বন্দুকধারী কনস্টেবল ও জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় উঠে যায় সার্জেণ্ট-মেজর ম্যাল্‌কম। হাতে তার উদ্যত রিভলভার। কিন্তু, এ কি? সিঁড়ির কাছে ঘরের জিনিসপত্র এমন ছড়ানো কেন? তবে কি—

হ্যাঁ, ঠিক তাই। রুমা ঘরে নেই। কোনদিনও আর সে ফিরবে না এই ঘরে।

ঘরের মধ্যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ম্যাল্‌কম। ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো। মেঝের ওপর চাপ চাপ শুকনো রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে কয়েকগাছা ভাঙা কাঁচের চুড়ি।

বুকের মধ্যে কে যেন শত সহস্র পিন ফুটিয়ে দিয়েছে ম্যাল্‌কমের। বুকের পাঁজর ভেদ করে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে একটা চাপা কান্না। কিন্তু কাঁদতে পারছে না ম্যাল্‌কম। রিভলভারসুদ্ধ তার অবশ হাতখানা ঝুলে পড়ে একপাশে। মাথা নিচু করে জলভরা চোখে সে কেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ঐ রক্তমাখা ভাঙা চুড়ির দিকে।

হাঙ্গামাকারীরা কেবল বাড়ি লুঠ করেই ক্ষান্ত হয় নি, একজন অসহায় স্ত্রীলোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতেও বাধে নি তাদের। হয়ত হত্যার আগে তারা তার চরম লাঞ্ছনাই করেছিল।

হিন্দুস্থানী জমাদার ম্যাল্‌কমের কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে ডাকে, সার্জেণ্ট-সাব!

ম্যাল্‌কমের কানে পৌঁছয় না সেই ডাক। তার চোখের সামনে সেই মুহূর্তে ভাসছে রুমার সুন্দর মুখখানা। তার কানের কাছে বেজে চলেছে রুমার সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বর · বলে দে সখী বলে দে, কোথায় গেলে শুনতে পাব (সেই৷ পাগল করা বাঁশির সুর।

সেদিন রাতের ঐ গানটিই বোধহয় রুমা বাঈজীর জীবনের শেষ গান। তার সেই শেষ গানটি সে শুনিয়েছিল লালবাজারের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট ম্যাল্‌কমকে। হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন ঘুরে ওঠে ম্যাল্‌কমের। দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমা হয় মুখে। জবাফুলের মত লাল হয়ে ওঠে চোখদুটো। পরক্ষণেই মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে সে চিংকার করে ওঠে, আই শ্যাল শুট দি হুলিগ্যানস —আই শ্যাল কীল দেম—কীল দেম। বলতে বলতে হাতের রিভলবার উঁচিয়ে দেয়ালের দিকে তাক করে পর পর দু'বার গুলি ছোঁড়ে ম্যাল্‌কম।

—ক্যা হুয়া সার্জেণ্ট-সাব—ক্যা হুয়া?

হিন্দুস্থানী জমাদার দু'হাতে ম্যাল্‌কমকে জাপটে ধরতেই ম্যাল্‌কম

রিভলবারটা দূরে ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিয়ে অবসন্ন ভঙ্গিতে কেঁদে ওঠে, আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং – আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং !

## চৌদ্দ

বিলেতে শ্রমিক মন্ত্রিসভা গভর্নর জেনারেল ওয়াভেলের ওপর আর ভরসা করতে পারলেন না। স্বদেশে ফেরত পাঠানো হল তাঁকে, আর তাঁর বদলে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

উনিশ শ' সাতচল্লিশের মার্চ মাস। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই বিবাদমান রাজনৈতিক দল দ‍ুটির সঙ্গে আলোচনা শ‍ুর‍ু করলেন তিনি। আর দেরি নয়, নিজেদের দেশের সমস্যায় জর্জর ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারতের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে পারলে যেন বাঁচে। এদেশে একদিন বণিকের যে মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই রাজদণ্ডের ভার বইবার ক্ষমতা আর নেই তাদের। শাসনের সঙ্গে শোষণ চালিয়ে দীর্ঘ আড়াইশ' বছর দেশটার যে হাল তারা করেছে তাতে এ-দেশ সম্পর্কে উৎসাহে এবার ভাঁটা পড়াই স্বাভাবিক। কাজেই দেশটার দায়-দায়িত্ব এদেশের নেতাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তল্পিতল্পা নিয়ে সরে পড়াই ব‍ুদ্ধিমানের কাজ।

আলোচনায় সফল হলেন মাউণ্টব্যাটেন। ম‍ুসলিম লীগ তো পা বাড়িয়েই ছিল, এবার কংগ্রেসও দেশ-বিভাগে রাজী হল। জয় হল জিন্না সাহেবের 'টু নেশন' থিওরীর। ঠিক হল, ক্ষমতা হস্তান্তর হবে পনেরোই আগস্ট মধ্যরাতে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে সেইদিন। জন্ম নেবে একটা নতুন দেশ—জিন্নাসাহেবের সাধের পাকিস্তান।

শহর কলকাতার নাগরিক জীবনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দেশবিভাগের দ‍ুঃখ খানিকটা ম্লান করে দিয়েছে স্বাধীনতার আনন্দ। বিশেষ করে ওপার বাংলার মান‍ুষের দ‍ুঃখই সবচাইতে বেশি। পিতৃপ‍ুর‍ুষের বাস্তুভিটা ছেড়ে আসতে হবে তাদের। কট্টর পাকিস্তানপন্থী কলকাতার ম‍ুসলিম মহলে অসীম আনন্দ - পাকিস্তান কায়েম হতে চলেছে এবার। তবে সেই আনন্দের মধ্যেও সামান্য একটু দ‍ুঃখ - মহানগরী কলকাতাকে কিছ‍ুতেই পাকিস্তানের ভাগে ঠেলে দেওয়া গেল না।

প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া কলকাতার ব্রিটিশ মহলে। এতদিনের সাধের জমিদারী এবার গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে এদেশে কোটি পাউণ্ড খাটিয়ে লক্ষ কোটি পাউণ্ড ঘরে ফিরিয়ে নেবার স‍ুযোগ হয়ত আর পাওয়া যাবে না। নির্বিচারে শোষণের দরজাটি এবার বন্ধ হয়ে যাবে চিরতরে। তাহলে আর এদেশে থেকে লাভ কি ? তার চাইতে সব কিছ‍ু বেচে দিয়ে এদেশ থেকে সরে পড়াই ব‍ুদ্ধিমানের কাজ।

প্রতিক্রিয়া সরকারী মহলেও—নাঃ, এদেশে চাকরি করা আর পোষাবে না। এতকাল যাদের চোখ রাঙিয়ে এসেছি, এবার থেকে তাদের চোখ রাঙানি সহ্য করতে হবে। এতকাল আমরা ছিলাম মাথার ওপরে। এবার থেকে ওরা

এসে আমাদের মাথার ওপর বসবে, চলতে হবে ওদের হুকুমমত—এ জিনিস কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তার চাইতে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ফিরে যাব দেশে।

হিন্দু-বিদ্বেষী কিছু কিছু ব্রিটিশ অফিসারের মনের কথা আবার অন্য ধরনের—ভারতবর্ষে থেকে হিন্দুদের সুপ্রিমেসি সহ্য করার চাইতে পাকিস্তানে গিয়ে চাকরি করা ঢের ভাল। ওদেশের মানুষ আমাদের মাথায় করে রাখবে।

কিন্তু মহানগরীর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহলে প্রতিক্রিয়া কোন্ ধরনের? ওদের মনের কথা কি? দেশের নাড়ির সঙ্গে সংযোগহীন এই সম্প্রদায়ের মানুষরা কি করবে? পারবে কি ওরা এ-দেশটাকে নিজেদের দেশ বলে ভাবতে? পারবে কি ওরা অতীতের সেই মেকি আভিজাত্যবোধ ভুলে গিয়ে এদেশের মানুষের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে? গায়ের সাদা চামড়া ও মুখের ইংরেজি বুলি সত্ত্বেও ওরা যে ব্রিটিশ তথা ইয়োরোপীয় সমাজের কোন অংশ নয় একথা কি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারবে ওরা?

লালবাজারের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টমহলে নেমে আসে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া। এর পরে চাকরি করা চলবে তো? সেই পুরানো দিনের প্রতিপত্তি ও দাপট যে থাকবে না সে বিষয়ে তারা স্থির নিশ্চিত। এখন থেকে কেবল মুখ বুজে কোনরকম চাকরিটুকু বজায় রেখে চলতে হবে। এর বেশি কিছু নয়।

বন্ধুমহলে সার্জেণ্ট গ্রাণ্ট সেদিন বললে, আমি তো ভেবে রেখেছি এদেশে আর থাকব না। অপ্‌শন দিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়ে সেখানেই চাকরি করব।

সার্জেণ্ট এণ্টনী জবাবে বলে ওঠে, সেখানে যে তোর জন্যে জামাই-আদরের ব্যবস্থা রয়েছে, তা জানলি কেমন করে?

—জামাই-আদর না থাক, এখানকার চাইতে অনেক ভাল থাকব। এখানে থাকলে পদে পদে ওদের বুটের ঠোক্কর খেতে হবে।

এণ্টনী আবার বললে, তুই অপ্‌শন দিয়ে চলে যেতে চাইলে তোকে কেউ ঠেকাতে আসবে না। তবে আমার ধারণা, কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে গেলেই যে খুব সুখে থাকবি তা নয়। আসলে এর পরে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন একটু সমঝে চলতে হবে আমাদের। তা'ছাড়া, এবার থেকে শুরু হবে কম্‌পিটিশন্।

—কি সব কম্‌পিটিশন্? এণ্টনীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ম্যাল্‌কম।

জবাব দেয় এণ্টনী, মনে করেছিস এর পরেও বুঝি কলকাতা পুলিশের সার্জেণ্টের চাকরিতে আমাদের একচেটে অধিকার বজায় থাকবে? মোটেই তা নয়। এবার থেকে ঐ বাঙালী ছেলেরাও এসে ঢুকবে এ লাইনে। ওদের সাথে কম্‌পিটিশন শুরু হবে আমাদের।

—কি বলছিস রে? বলতে থাকে গ্রাণ্ট, ঐ রোগা পটকা বাঙালী ছেলেগুলো আমাদের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে নাকি?

এণ্টনীর বদলে এবার জবাব দেয় ম্যালকম, বাঙালী ছেলেরা সবাই তো

আর রোগা পটকা নয়। তা ছাড়া ওদের পেটে আছে বিদ্যে, মগজে আছে বুদ্ধি। গায়ের জোরই তো সব নয়।

ম্যাল্‌কমের কথায় গ্র্যাণ্ট আর কোন জবাব দেয় না। তার বুলডগের মত থ্যাবড়া মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। ছোট চোখজোড়ায় নেমে আসে দুশ্চিন্তার ছায়া। এ কি বিপদের মুখে তাদের ঠেলে দিতে চলেছে বৃটিশ সরকার!

এমনই হয়। ইতিহাস এই কথাই বলে। দেশে রাজনৈতিক ওলটপালটের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় নিয়ম-কানুন। উত্থান-পতন ঘটে রাজকর্মচারী মহলে। এক রাজার আমলের নফর অন্য রাজার রাজত্বে হয়ত দখল করে মন্ত্রীর আসন। সেকালের প্রবল প্রতাপান্বিত মন্ত্রীর কপালে একালে হয়ত জোটে কারাবাস।

এই সময় সার্জেণ্ট নর্টন বলে ওঠে, আমাদের কপালে যা আছে তা তো হবেই, কিন্তু ঐ সব হোমরা-চোমরা বিলিতি আই. পি সাহেবদের কি দশা হবে?

জবাব দেয় এণ্টনী, ওরা আই. পি অফিসার। ওদের আর এমন কি হবে? আই. সি. এস-দের মত ওরা এদেশে যতদিন চাকরি করিবে ততদিন ওদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই বজায় থাকবে। আর চাকরি করতে ইচ্ছে না হলে চলে যাবে দেশে। সেখানে গিয়ে খাওয়া-পরার অভাব নিশ্চয়ই ওদের ঘটবে না।

—তেমন বুঝলে আমারও না হয় চাকরি ছেড়ে বিলেতে পাড়ি দেব। নর্টন বললে।

—সেখানে গিয়ে করবি কি? এণ্টনী জিজ্ঞেস করে।

—কেন, চাকরি করব।

—চাকরি যে পাবিই তার নিশ্চয়তা কোথায়? আরে বাপু, পেছনে ব্যাকিং না থাকলে কোন দেশে গিয়েই চাকরি যোগাড় করা যায় না। সবাই তো আর ম্যাল্‌কম নয়।

এণ্টনীর কথায় উপস্থিত সবাই একযোগে তাকায় ম্যাল্‌কমের দিকে। একটু অস্বস্তি বোধ করে ম্যাল্‌কম। গ্র্যাণ্ট জিজ্ঞেস করে, জনির কি তেমন কোন ব্যাকিং আছে নাকি বিলেতে?

মৃদু হেসে এণ্টনী জবাব দেয়, অনেকদিন আগে জনি নিজেই তো আমাকে বলেছিল যে, ওর স্ত্রীর কোন্ এক বান্ধবী নাকি লণ্ডনে আছে। জনির জন্যে একটা ভাল চাকরি ঠিক করে সেই মহিলাটি নাকি অনেকদিন থেকে ওদের সেখানে যেতে সাধাসাধি করছে। ওর স্ত্রী যাবার জন্যে সর্বদাই তৈরি, কেবল জনির নিজের জন্যেই যাওয়া হচ্ছিল না।

এণ্টনী থামতেই উপস্থিত সবাই একযোগে এমন দৃষ্টিতে ম্যাল্‌কমের দিকে তাকায় যেন, ওর মত বোকা সারা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এমন সুযোগ থাকতেও যে তার সদ্ব্যবহার না করে সে কেবল নির্বোধ নয়, দস্তুরমত অপদার্থ।

ম্যাল্‌কম চুপ করে থাকে। এণ্টনী আবার জিজ্ঞেস করে, কিরে, জনি, তোর

সেই সুযোগ কি এখনো আছে, না হাতছাড়া হয়ে গেছে ?

এবার মৃদুকণ্ঠে ম্যাল্‌কম জবাব দেয়, না-না, তেমন কিছু নয়। ওর সেই বান্ধবী কয়েকবার যেতে বলেছিল ঠিকই, কিন্তু নানা কারণে আর যাওয়া হয় নি। এখন সেখানে গিয়ে হাজির হলে চাকরি পাব কিনা কে জানে ?

ম্যাল্‌কমের নির্বুদ্ধিতায় নিজেকে আর সামলাতে না পেরে সার্জেণ্ট গ্র্যাণ্ট বলে ওঠে, ইউ আর এ ফুল - ফার্স্ট ক্লাশ ফুল !

ম্যাল্‌কম কিছু না বললেও এণ্টনী গ্র্যাণ্টকে ধমকে ওঠে, কি যা-তা বলছিস তুই ? ভুলে যচ্ছিস কেন যে, জনি সার্জেণ্ট-মেজর ? বন্ধু হলেও ওকে ওর প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে।

সার্জেন্ট গ্র্যাণ্ট তাড়াতাড়ি নিজের জিভখানা বের করে দু'হাতে নিজের কান স্পর্শ করে কৃত্রিম কাঁচুমাচু মুখে বলে ওঠে, আই এ্যাম সরি—রিয়েলি সরি। বেগ টু বি এক্সকিউজ্‌ড।

গ্র্যাণ্টের অঙ্গভঙ্গিতে উপস্থিত সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। ম্যাল্‌কমের নিজের ঠোঁটজোড়ায়ও ছড়িয়ে পড়ে একটু হাল্‌কা হাসি।

আজ অনেকদিন পরে ম্যাল্‌কমের মুখে হাসি দেখা গেল। রুমার মৃত্যুর দিন থেকে ম্যাল্‌কম যেন হাসতে ভুলে গেছে। শুধু তাই নয়, ইদানীং কথাবার্তাও বলে খুব কম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলে না কারুর সঙ্গে। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, মেজর সাহেবের পায়া ভারি হয়েছে, তাই আমাদের এড়িয়ে চলে।

ম্যাল্‌কমের চরিত্রের হঠাৎ পরিবর্তন কিন্তু চোখ এড়ায় না মেরিয়ার। কিন্তু চোখে পড়লেও সে এর কারণ অনুমান করতে পারে না। অবশেষে সে একদিন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেই বসে ম্যাল্‌কমকে, সত্যি করে বল তো, কি হয়েছে তোমার, জনি ?

—কই, কিছু না তো ! ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলতে বৃথা চেষ্টা করে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম।

স্বামীর মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে মেরিয়া আবার বললে, আমি জানি একটা কিছু হয়েছে তোমার। তবে বলতে না চাইলে তো তোমাকে দিয়ে আমি তা বলাতে পারি না। তোমার ওপর সে জোর আর আমার নেই। নিজেই একদিন তা নষ্ট করেছি। বলতে বলতে মেরিয়া ম্লান মুখে সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

ম্যাল্‌কম মেরিয়াকে ডাকে, শোন মেরি।

ঘুরে দাঁড়ায় মেরিয়া। বলতে থাকে ম্যাল্‌কম, তোমাকে বলা চলবে না তেমন কিছু সত্যিই ঘটে নি। বরঞ্চ খবরটা তোমার জানাই ভাল। আশা করি তাতে তুমি খুশিই হবে। রুমা—রুমা বাঈজী ইজ নো মোর—সে মারা গেছে। কথাটা বলে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থাকে ম্যাল্‌কম।

রুমা বাঈজী আর বেঁচে নেই—মেরিয়ার পক্ষে খুশি হয়ে ওঠার মত খবরই বটে। রুমা - রুমা বাঈজী—এই স্ত্রীলোকটির জন্যেই একদিন মেরিয়ার ছোট সংসারে নেমে এসেছিল এক ভয়ানক বিপর্যয়। স্বামীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ

করতে গিয়ে মেরিয়া নিজেই সেই বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কাজেই সেই রুমা বাঈজীর মৃত্যুতে মেরিয়ার খুশি হবারই কথা। কিন্তু কেন যেন খুশি হতে পারছে না মেরিয়া। রুমা নেই—হাসপাতালে তার স্বামীর মাথায় ওদের দেবতার ফুল ছুঁইয়ে যে স্ত্রীলোকটি তার মঙ্গল-কামনা করেছিল সে আর ইহজগতে নেই। তার প্রতিশোধ গ্রহণের দিনগুলিতে যে স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে বারে বারে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করেছিল বলে সে শুনেছে, সে চলে গেছে।

কিন্তু হঠাৎ কি করে মারা গেল রুমা? কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি? ম্যাল্কমের ক্লান্ত বিপর্যস্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করতে ঠিক ভরসা হচ্ছিল না মেরিয়ার। তাই সে কেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ম্যাল্কমের দিকে।

ম্যাল্কম একসময় চোখ তুলে তাকায়। মেরিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খানিকটা বিদ্রূপের সুরে সে আবার বললে, আশা করি খবরটা শুনে তুমি খুশি হয়েছ, মেরি।

মেরিয়া সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি করে মারা গেল?

—দাঙ্গায় নিহত হয়েছে রুমা। গুণ্ডারা তার বাড়ি লুঠ করেই ক্ষান্ত হয় নি, দে কিলড হার ব্রুটালি। একটা প্রচণ্ড আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা উচ্চারণ করে ম্যাল্কম।

—হাউ হরিব্ল! হাতের উল্টো পিঠে মুখ চেপে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে মেরিয়া। তারপর আর কিছু না বলে মাথা নিচু করে মন্থর পায়ে ফিরে যেতে যেতে মৃদু সুরে বলতে থাকে, ইয়েস ইয়েস, খুশি হয়েছি আমি—খবরটা শুনে খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু—

—কিন্তু কি? সহসা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ম্যাল্কম মেরিয়ার পথরোধ করে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে মেরিয়ার ওপর। রুমার মৃত্যুর জন্যে যেন এই মেরিয়াই দায়ী। তার দুটো কাঁধ চেপে ধরে প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে থাকে ম্যালকম, বল মেরি, বল—বল, কিন্তু কি?

ছল ছল চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় জবাব দেয় মেরিয়া, কিন্তু জান, খুশি হতে পারি নি তোমার কথায়। রুমার মৃত্যুর খবর আমাকে খুশি করবে জেনেও কেন তুমি আমার মুখ থেকে শুনতে চাইলে সে কথা?

মেরিয়ার চোখদুটোর দিকে একটু সময় স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে কি যেন চিন্তা করে ম্যাল্কম। দেখতে দেখতে মনটা তার নরম হয়ে ওঠে। মেরিয়াকে ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে এসে বসে নিজের চেয়ারে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় অনেকটা আপন মনেই বলতে থাকে, জান মেরি, মৃত্যুর মাত্র দিনকয়েক আগেই রুমা তার জীবনের শেষ গানখানি গেয়ে শুনিয়েছিল আমাকেই। সে তার ঐ শেষ গানখানি বোধহয় তুলে রেখেছিল আমারই জন্যে।

কিন্তু ম্যাল্কমের কথাগুলো শোনার জন্যে সেখানে তখন উপস্থিত ছিল না মেরিয়া। তার আগেই সে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে।

স্বার্থ—স্বার্থ স্বার্থ। গোটা দুনিয়াটাই স্বার্থের দাস। প্রতিটি মানুষই স্বার্থপর। কেউ বা লৌকিক স্বার্থচিন্তায় রাত-দিন মশগুল, কেউ বা পারলৌকিক স্বার্থের ভাবনায় বিভোর। স্বার্থ ছাড়া মানুষ এ জগতে এক পা-ও চলে না। রাজনীতির জন্যেই হোক, কিম্বা জাত-ধর্মের জন্যেই হোক, সর্বত্রই মানুষে মানুষে স্বার্থের সংঘাত। স্বার্থের প্রয়োজনে মানুষ রাতারাতি ভোল পাল্টাতে পিছপা হয় না। আজ যে শত্রু, স্বার্থের প্রয়োজনে সে-ই হয়ত কাল পরম মিত্র হয়ে ওঠে।

বিকেল প্রায় পাঁচটা। রাস্তায় অফিস-ফেরত যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। বাস-ট্রামে যাত্রীদের বাদুড়ঝোলা অবস্থা। ফুটপাথেও গিস্ গিস্ করছে মানুষ। সেই ভিড়ের মধ্যেই হ্যারিসন রোডের মোড়ের ফুটপাথে লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের স্বার্থপর চরিত্রের কথাই ভাবছিল বৃদ্ধ ম্যাল্কম। চালচুলোহীন এই শহরটাকে এককালে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই ভালবাসত। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থান ছিল এই শহর কলকাতা। তারা জানত, এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি মানে তাদের নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি। তাই তারা সেদিন শহর কলকাতাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করত। কিন্তু একালে পাল্টে গেছে সেই চিন্তাধারা। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর কাছে শহর কলকাতা এখন প্রায় মৃত। মৃতকে জাগিয়ে তোলার পরিশ্রম তাদের কাছে বোধহয় পণ্ডশ্রম। কাজেই যে ক'টা দিন পার বৃদ্ধ গাভীর মত এর দুধ দোহন করে নাও। দুধ বন্ধ হলেই একে তুলে দেবে কসাইদের হাতে। শাসকগোষ্ঠীর এখন চিন্তা বম্বে শহরকে নিয়ে, তাঁদের ভাবনা রাজধানী দিল্লীকে নিয়ে। দিল্লীকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সেকালের ইন্দ্রপ্রস্থের মত করে তুলতে হবে। তাই তো গোটা ভারতবর্ষ থেকে সম্পদ আহরণ করে দিল্লীর শ্রীবৃদ্ধির দিকে তাদের এমন প্রচেষ্টা।

কিন্তু বৃদ্ধ ম্যাল্কম ভুলতে পারে না এই গাভীটিকে। এককালে ওর দুধ খেয়েই যে সে বড় হয়েছিল সেকথা ভুলবে কেমন করে? তাই তো এই হতশ্রী শহরটার ওপর এত টান তার। তার বাল্যের মায়ের স্মৃতি, আর সর্বোপরি ঐ ভয়ঙ্কর লালবাজারের স্মৃতির টুক্রোগুলো যে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে এই শহরেরই আকাশে-বাতাসে। এই শহরের আকর্ষণ ছিন্ন করা কি তার পক্ষে সম্ভব? এই শহরের মাটির তলায় মহাত্মা ডিরোজিও কিংবা হিন্দু স্টুয়ার্টের মত চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়াই যে তার একমাত্র কামনা।

হ্যাঁ স্বার্থের প্রয়োজনে মানুষ রাতারাতি ভোল পাল্টাতেও পারে। উনিশ শ' সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট তেমনি ভোলই পাল্টেছিল লালবাজারের হোমরা-চোমরা ব্রিটিশ অফিসাররা।

হ্যারিসন রোডের এই মোড়েই সেদিন স্বাধীনতা দিবসের বিজয়-তোরণ তৈরির বিরাট ব্যবস্থা। এলো বাঁশ, দড়ি-কাপড়, তৈরী হবে স্বাধীনতাতোরণ।

হঠাৎ অন্য এক সম্প্রদায়ের একদল মানুষ এসে দাঁড়াল সেখানে। হাতে তাদের লাঠি। এসব স্বাধীনতা-তোরণ ফোরণ তৈরি করা চলবে না এখানে। জান কবুল, বাধা তারা দেবেই। বোধহয় আবার একটা দাঙ্গা বাধিয়ে তারা কলকাতা

মহানগরীকে হারানোর দুঃখ ভুলতে চায়। একটা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ধাক্কায় পাকিস্তান মিলেছে, আর একটা তেমনি ধাক্কায় হয়ত এই শহরটা মিলবে—এই বোধহয় ছিল তাদের ধারণা।

কিন্তু ওরা একটু ভুল করেছিল সেদিন। এই একটা বছরে গঙ্গা নদী দিয়ে অনেক—অনেক জলই বয়ে গেছে। দেশ-বিভাগের চৌহদ্দি তখন ঠিক হয়ে গেছে। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের হাতে তখন দেনা-পাওনার ফর্দ। কাজেই আর একটা প্রত্যক্ষ সংগ্রমের প্রস্তুতি তখন সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

খবর গেল লালবাজারে। অদ্ভুত ব্যাপার! চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল পুলিশ কমিশনার হার্ডউইক। কি, ওদের এতবড় স্পর্ধা! স্বাধীনতা-তোরণ তৈরি করতে ওরা বাধা দেবে?

এবার কিন্তু আর কোন মন্ত্রী কিংবা হোম অথবা চীফ্ সেক্রেটারীর নির্দেশ দরকার হল না হার্ডউইকের। স্রোতের গতি না বোঝার মত বোকা সে নয়। কাজেই হুকুম গেল এডিশনাল পুলিশ কমিশনার নর্টন জোন্সের কাছে—স্টপ দিস নুইসেন্স। প্রয়োজনে বাধাদানকারীদের গুলি করে উড়িয়ে দাও।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভ্যানভর্তি পুলিশ ফোর্স লালবাজারের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল হ্যারিসন রোডের দিকে।

পুলিশ-ভ্যানে বসে গায়ের রক্ত যেন টগ্ বগ্ করে ফুটছিল সার্জেন্ট-মেজর ম্যাল্কমের। না, স্বাধীনতা-তোরণ তৈরির বাধাদানকারীদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে তার এই রক্ত গরম নয় কিংবা শহরে আর একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি প্রচেষ্টার জন্যেও নয়। এ যেন তার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশের এক ভয়ানক পরিণতি। শোধ তুলবার একটা সুযোগ পেয়ে ম্যাল্কমের দেহের রক্ত যেন টগবগিয়ে উঠেছিল। রুমা বাঈজীর বাড়ীর দেওয়ালে নিষ্ফল গুলি-চালনার পরিবর্তে এবার তার হাতের রিভলবার এমনভাবে গর্জে উঠবে যে প্রতিটি গুলির বিনিময়ে একজন করে হাঙ্গামাকারীকে রাজপথের ধূলিশয্যায় লুটিয়ে পড়তে হবে।

পুলিশ ফোর্স দেখে থমকে দাঁড়াল বাধাদানকারীরা। পুলিশের এ্যাটিচ্যুড আজ যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তা'ছাড়া আজ আর কোন সুরাবর্দি সাহেব কিংবা মিস্টার দোহা এসে লালবাজার কণ্ট্রোলরুমের ভার গ্রহণ করবে না। সর্বোপরি, এদেশে বাস করতে হলে এখন থেকে 'লড়কে লেঙ্গে' আওয়াজ থামাতে হবে, নইলে এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটানো ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না। রাজনৈতিক প্রয়োজনে সৃষ্ট নতুন দেশটার প্রতি সহানুভূতি যতই থাক না কেন, সেই সহানুভূতি তো এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারবে না। কাজেই এক্ষেত্রে পিছু হটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অবশেষে বাধাদানকারীরা পিছু হটল। ঘটল ভোজবাজী। দু'দলই হাত লাগিয়ে তৈরি করল স্বাধীনতা-তোরণ। আগামী কালের জন্যে প্রস্তুত হল গোটা শহর। কোমরের রিভলবার কোমরেই গোঁজা রইল সার্জেন্ট-মেজর ম্যাল্কমের।

খবর পেয়ে ওপর মহলের বাহবা পাওয়ার আশায় সি. পি হার্ডউইক টেলিফোন তুলে হোম ও চীফ সেক্রেটারীকে খবর দিলে, সিচুয়েশন হ্যাজ বিন্ ট্যাক্টফুলি হ্যাণ্ড্ল্ড্। ইট ইজ পীসফুল নাউ।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল দুটি শব্দ— থ্যাঙ্ক ইউ!

বৃদ্ধ ম্যাল্কম লাঠিতে ভর দিয়ে হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে বৌবাজার হয়ে এসে দাঁড়াল লালবাজারের সামনে। সেই চির-পুরাতন দৃশ্য। অফিস ছুটি হয়েছে। বাসে-ট্রামে উপচে-পড়া মানুষের ভিড়। লালবাজারের গেটের কাছে ডিউটিরত ট্র্যাফিক কনস্টেবল। মাথায় তাদের লোহার সাদা হেলমেট। যে কোন ধরনের হঠাৎ আক্রমণ থেকে মাথা বাঁচাতেই এই আধুনিক ব্যবস্থা।

উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে চলতে চলতে লালবাজারের সামনে থমকে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ম্যাল্কম। গৌরবের জয়তিলক ও কলঙ্কের কালিমা কপালে মেখে ঠিক আগের মত গর্বোন্নত শিরেই দাঁড়িয়ে আছে লালবাজার। মহানগরীর সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ওই সমাজ-জীবনের প্রতি যেন ভ্রূক্ষেপহীন এই লালবাজার। আগ্রহ-অনাগ্রহ কিছুই যেন ওর নেই। আমি ছিলাম— আমি আছি- আমি থাকব, কেবল এই কথাগুলো ঘোষণা করেই যেন লালবাজার মহানগরীর মানুষের কাছে নিজের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

লালবাজারের মাথার ওপর পত্ পত্ করে উড়ছে জাতীয় পতাকা। নিজের পাকা ভুরুযুগলের ওপর শীর্ণ ফর্সা আঙুলের আড়াল করে ঘোলাটে চোখ মেলে ওই পতাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছাব্বিশ বছর পেছনে ফিরে যায় বৃদ্ধ ম্যাল্কম।

সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগস্ট। আজই রাত বারোটা বেজে এক মিনিটে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে রাজধানী দিল্লীতে। ব্রিটিশরাজের শেষ প্রতিনিধি গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের কর্তৃত্ব তুলে দেবেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর হাতে। শুরু হবে ভারতের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিশাল ভারতবর্ষের প্রতিটি জনপদের মানুষ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবে, সরকারী ভবনগুলোর মাথায় আর ইউনিয়ন জ্যাক নেই। তার বদলে সেখানে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

বিকেল পাঁচটা। একখানি জীপ গাড়ি বেরিয়ে এল লালবাজার থেকে। গাড়ির একমাত্র আরোহী এ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার নর্টন জোন্স। কড়া হাতে তাকে স্যালুট দেয় গেটের প্রহরীরা।

মহানগরীর প্রতিটি থানায় আজ যেতে হবে জোন্স সাহেবকে। নিজের মুখে থানার অফিসারদের শোনাতে হবে আগামী কালের জন্যে সরকারী নির্দেশ।

জোন্স সাহেব প্রথমেই এসে হাজির হয় জোড়াসাঁকো থানায়। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থানার অফিসার-ইন-চার্জ অভিবাদন করে তাকে।

জোন্স সাহেব ও. সি-কে বললে, কল দি আদার অফিসার্স— সবাইকে

ডাকুন।

ও সি-র ঘরে গম্ভীরমুখে বসে আছে নর্টন জোন্স। থানার অফিসারেরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে। জোন্স সাহেব অফিসারদের সম্বোধন করে বললে, লুক অফিসার্স, ইউ মাস্ট হয়েস্ট্ ইওর ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ টুমরো—কাল স্বাধীনতা দিবস, থানার ওপর তোমরা তোমাদের জাতীয় পতাকা অবশ্যই তুলবে।

জোন্স সাহেব 'আওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ' না বলে 'ইওর ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ' কথাটা বললে। ঠিকই বলেছে সে। রাজ্য-শাসনের শেষদিনে কোন্ বিলিতি সাহেব ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকাকে নিজের বলে ভাবতে পারে? তাছাড়া তার প্রয়োজনই বা কোথায়? লালবাজারের বিলিতি আই. পি. অফিসারদের প্রায় সকলেরই তো আজ চাকরির শেষ দিন। তারা প্রায় সবাই তো বিলেত চলে যেতে প্রস্তুত। এমনকি আগামী কাল পুলিশ কমিশনার হার্ডউইকের চেয়ারখানি অধিকার করে বসবে একজন ভারতীয় আই পি অফিসার। কিন্তু শত মানসিক উদ্বেগের মধ্যেও নিয়ম মেনে চলাটাই ব্রিটিশ চরিত্রের বিশেষত্ব। তাই রাজত্বের শেষ দিন জোন্স সাহেব নিজে বেরিয়েছে অফিসারদের সরকারী নির্দেশ শোনাতে।

জোন্স সাহেব থামতেই ও. সি জিজ্ঞেস করে, কিন্তু স্যার, থানায় ওপর এখন যে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে ওটা দিয়ে কি করব? ওটা কি লালবাজারে পাঠিয়ে দেব?

একমুহূর্ত চিন্তা করে নর্টন জোন্স। তারপর একটু ম্লান হেসে বললে, কীপ ইট ইন ইওর বক্স, মাই ফ্রেন্ড—ব্রিটিশ, রাজত্বের শেষ চিহ্ন হিসেবে ওটা তোমার বাক্সেই রেখে দিও। বাট ওয়ান থিং, আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ বলে ওটার যেন অপমান করো না। রিমেমবার, যারা অন্যের জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করে তারা নিজেদের পতাকাকেও কোনদিন সম্মান করতে পারে না। কথাটা বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় জোন্স সাহেব। তারপর অফিসারদের শেষ অভিবাদন গ্রহণ করে উঠে বসে অপেক্ষমান জীপে।

রাত বারোটা বেজে এক মিনিট। সেদিন মহানগরী কলকাতার কারুর চোখে ঘুম নেই। গোটা শহরের অধিবাসীরা নেমে এসেছে রাস্তায়। শহর জুড়ে সেদিন আনন্দ-উৎসব। আজ থেকে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক তারা। লাল-বাজারেও সেদিন আনন্দের ঢেউ। নতুন কমিশনারের নির্দেশে আকাশে রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করে স্বাগত জানানো হয়েছে জাতির এই বিশেষ দিনটিকে। লালবাজারের মাথার ইউনিয়ন জ্যাক্ নামিয়ে সেখানে তোলা হয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। মাঝ-আগস্টের মাঝ-রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সেই পতাকা অল্প অল্প উড়ছে। প্রায় দুশো বছর পরে সেকালের জমিদার হলওয়েল সাহেবের তৈরি 'টাউন গার্ড' লালবাজারের মাথার ওপর থেকে চিরতরে সরে গেল ব্রিটিশ পতাকা—ইউনিয়ন জ্যাক্।

## পনের

কেটে গেল একটি বছর। উনিশ শ' আটচল্লিশ সাল। একটার পর একটা সমস্যা এসে আছড়ে পড়ছে মহানগরী কলকাতার বুকে। খণ্ডিত বাংলার ওপার থেকে বাস্তুহারার ঢল নামে এই শহরে। জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে মহানগরীর পথ-ঘাট।

লালবাজারের নতুন আবহাওয়ায় যথারীতি চাকরি করে চলেছে সার্জেণ্ট-মেজর ম্যাল্‌কম। ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই চলে গেছে নিজের দেশে। দু' একজন অপ্‌শন দিয়ে চলে গেছে ওপার বাংলায়। লালবাজারের মুসলিম অফিসারদের অধিকাংশই চলে গেছে তাদের নতুন দেশে ডবল কিংবা ট্রিপল প্রমোশন নিয়ে। ওপার বাংলার পুলিশ অফিসারদের মধ্যেও একদল এসে ভিড় করেছে লালবাজারে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু লালবাজারে রয়ে গেল। অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ানোর চাইতে এখানে চাকরি করাই ভাল। দু'একজন পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢুকল গিয়ে বিলিতি সওদাগরী অফিসে।

দুটো বছর পার হয়ে গেলেও রুমার মৃত্যুশোক যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিল না ম্যাল্‌কম। ইদানীং মেরিয়ার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তার মনের ক্ষতের ওপর সামান্য প্রলেপ বুলিয়ে দিতে সমর্থ হলেও সারিয়ে তুলতে পারছিল না সেই ক্ষত। মেরিয়া কিন্তু ব্যাপারটা মনে মনে বুঝেছিল। আর বুঝেছিল বলেই ম্যাল্‌কমকে নিয়ে বিলেতে পাড়ি দেবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছিল। তার চোখের সামনে তখন মহানগরী লণ্ডন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। বিলেত গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার কল্পনায় সে তখন মশগুল। তাই সে প্রতিনিয়ত তাড়া দেয় ম্যাল্‌কমকে, জান জনি, এ মাসেই স্মিথ পরিবারের সবাই এখানকার ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে লণ্ডন চলে যাচ্ছে। তা, তুমি কি করবে ঠিক করেছ ?

আমতা-আমতা করে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, তাই তো ভাবছি। মাঝে মাঝে কিন্তু মনে হয়, বেশ আছি এখানে। অনিশ্চয়তার মধ্যে পা বাড়িয়ে লাভ কি ? ওদেশে গিয়ে কি তেমন কোন সমাদর পাব ?

—এখানে বুঝি যথেষ্ট সমাদর পাচ্ছ ?

—না, তা ঠিক নয়। সত্যি বলতে কি লালবাজারে আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টদের এখন প্রায় কোণঠাসা অবস্থা। নতুন নতুন বাঙালী ছেলেরা ঢুকছে। ওপর মহলেরও প্রায় সবাই বাঙালী। আসলে, এতকাল আমরা যে দাপটের সঙ্গে লালবাজারে চাকরি করে এসেছি সেই দাপট আর আমাদের নেই বলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি। কিন্তু তবুও অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে ভরসা পাই না।

ম্যাল্‌কম থামতেই মেরিয়া বলে ওঠে, সাহস করে এগিয়ে গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও তো কেউ কেউ বিলেত চলে গেছে। তারা তো কেউই ফিরে আসে নি। তাছাড়া মার্গারেট তো সেদিনও

চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, এখানে একবার এসে পড়লে চাকরির ব্যাপারে তেমন কোন অসুবিধেই হবে না। তাই বলছি, আর দেরি না করে চল বেরিয়ে পড়ি।

—তাই তো—

—না, তাই তো নয়। একটা কিছু ঠিক কর। চাকরিতে রেজিগনেশন দাও। পাওনা টাকা-পয়সা যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার চেষ্টা কর। এদিকে আমি পাসপোর্টের চেষ্টা করছি।

মেরিয়া থামতেই ম্যাল্‌কম মাথা নেড়ে বলে ওঠে না-না, এতদিন চাকরি করে রেজিগনেশন কিছুতেই দেব না।

—তবে কি করতে চাও তুমি?

—তেমন বুঝলে প্রিম্যাচিওর রিটায়ার করব। তাতে সারাজীবন অন্তত কিছু টাকা-পয়সা পেনশন হিসেবে পাওয়া যাবে।

—বিলেতে গিয়ে আমাদের কি এখানকার এই ক'টা টাকার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে?

—তা হয়ত হবে না। তবুও হাতের পাঁচ ছাড়ব কেন?

একটু ভেবে জবাব দেয় মেরিয়া, বেশ, তবে তাই কর।

মুখে বললেও কাজের বেলা তেমন কিছু করতে পারে না ম্যাল্‌কম। এদেশ, বিশেষ করে এই শহরটা ছেড়ে চলে যাবার কথা যেন কিছুতেই ভাবতে পারে না সে। জন্ম থেকে এতটা বয়স পর্যন্ত শত স্মৃতিবিজড়িত এই শহর ছেড়ে কোথায় গিয়ে সে শান্তি পাবে? হোক না ওদেশটা শতগুণে ভাল হোক না লণ্ডন শহরটা কলকাতার চাইতে লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ, তবুও কলকাতা কলকাতাই। তাছাড়া সেই পুরানো প্রশ্নটা তো আছেই। ওখানকার বিলিতি সমাজে কি তাদের ঠাঁই হবে? তার চাইতেও বড় কথা, ওদেশটাকে কি নিজের দেশ বলে কোনদিন ভাবতে পারবে ম্যাল্‌কম?

কিন্তু চাকরিতেও যেন ঠিক আগের মত নিষ্ঠা নেই ম্যাল্‌কমের। আজকাল কোনমতে চাকরিটুকু বজায় রাখাই যেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। এমনি-ভাবে গভর্নমেন্টকে হয়ত ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু চিরকালের কর্মদক্ষ সার্জেণ্ট-মেজর ম্যাল্‌কম নিজেকে ফাঁকি দেবে কেমন করে?

ঘরে-বাইরে এমনি এক অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটে ম্যাল্‌কমের। কিছুই ভাল লাগে না। তার নিজের জীবনে মেরিয়া এখন মন্দের ভাল। কিন্তু বিলেত গিয়ে মেরিয়াকে নিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ বোধ করে না সে। তার চাইতে এখানকার এই পরিচিত পরিবেশে তার ও মেরিয়ার জীবন যেভাবে কেটে চলেছে তাই ভাল।

ম্যাল্‌কমের মৌন সম্মতি পেয়ে মেরিয়া কিন্তু অনেকদূর এগিয়েছে। মার্গারেটকে চিঠি লিখে জানিয়েছে তারা শিগগিরই গিয়ে ওখানে পৌঁছচ্ছে। পাসপোর্টের দরখাস্তও করা হয়েছে। পাসপোর্ট যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার জন্যে হাঁটাহাঁটি করছেও প্রচুর।

দশচক্রে ভগবান ভূত। অবশেষে একদিন প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেণ্টের জন্যে দরখাস্ত করে বসল ম্যাল্‌কম। খবরটা জানাজানি হতেই বন্ধুরা ছেঁকে ধরল

তাকে। বললে, তাহলে তুই এবার সত্যি সত্যিই বিলেত চললি ?

ম্লান হেসে জবাব দেয় ম্যাল্‌কম, দেখা যাক।

লালবাজারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ম্যাল্‌কম যেদিন রাস্তায় এসে দাঁড়াল সেদিন একটা চাপা কান্না যেন তার বুকের মাঝখান থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। এই লালবাজারের সঙ্গে তার দীর্ঘ তেইশ বছরের সম্পর্ক মাত্র একটি কলমের খোঁচায় ছিন্ন করে দিয়েছে সে। সেদিন বন্ধুরা লালবাজারের বারে বসে স্কচ হুইস্কি দিয়ে তার বিদায়-সংবর্ধনা জানিয়েছিল। এখানকার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিলেত যাবার সুযোগ ঘটেছে বলে তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দু-একটা ঈর্ষাকাতর মন্তব্যও করে ফেলেছিল। অন্য কেউ হলে হয়ত এতে মনে মনে একটু গর্ব বোধ করত, কিন্তু ম্যাল্‌কমের তা মনে হয় নি। সেই মুহূর্তে তার বারে বারে কেবল মনে হচ্ছিল, জীবনের একটা মস্ত ভুল করতে চলেছে সে। চিরকালের মত এই শহর ছেড়ে চলে গিয়ে কোথাও সে শান্তি পাবে না। না—কোথাও না।

বিলেত যাবার সব ব্যবস্থা পাকা। পাসপোর্ট যোগাড় হয়েছে। বম্বে থেকে জাহাজের টিকিটও বুক করা শেষ। জিনিসপত্র গোছগাছও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেরিয়ার সেই গাম্ভীর্য আর নেই। সেই আগের মেরিয়া যেন ফিরে এসেছে তার মধ্যে। তার এতদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। অতীতের ভুল-ত্রুটি সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে বিলেত গিয়ে নতুন করে সংসার পাতবে তারা। সেখানে তাদের সংসারে ঘটবে এক নতুন অতিথির আগমন।

ম্যাল্‌কম কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর। চেষ্টা করেও তাকে যেন ঠিক তাতিয়ে তুলতে পারে না মেরিয়া। হেসে বলে, একবার জাহাজে চড়ে বসলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বম্বে রওনা হবার ঠিক আগের দিন হঠাৎ বেঁকে বসল ম্যালকম। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, ভেবে দেখলাম আমাদের বিলেত যাওয়া হবে না, মেরী।

– তার মানে ? কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না মেরিয়া।

—হ্যাঁ, আমাদের যাওয়া হবে না।

স্বামীর মুখের দিকে স্থিরচোখে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে মেরিয়া বলে ওঠে, ঠাট্টা করছ নাকি তুমি ?

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় ম্যালকম, না, ঠাট্টা নয়। আমাদের যাওয়া হবে না।

—কেন হবে না জানতে পারি কি ?

—আমার মন বলছে, যে সুখের আশায় আমরা ওদেশে ছুটে চলেছি তা আমরা ওখানে পাব না।

একটু সময় চুপ করে থেকে মেরিয়া বললে, দেখ জনি, এটা ছেলেখেলার বিষয় নয়। তাই যদি তোমার মনের ইচ্ছে তবে আগে সেকথা বল নি কেন ? চাকরিতেই বা ইস্তফা দিলে কেন ?

—ঠিক নিজের ইচ্ছেয় দিই নি, তোমার চাপে পড়েই দিয়েছি। এখন দেখছি দিয়ে ভুল করেছি।

—এই ভুল শোধরাবে কেমন করে ?

—পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিলেও এখানে অন্য একটা কিছু জুটিয়ে নিতে তেমন কোন অসুবিধে হবে না আমার।

মেরিয়া আবার যেন মনে মনে কি চিন্তা করে। তারপর হঠাৎ সে অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, সত্যি করে বল তো, এই কলকাতা ছেড়ে যেতে তোমার মন চাইছে না, তাই না?

—যদি বলি, তাই?

—তাহলে আমিও বলব তোমার রুমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলেই কলকাতা ছেড়ে তুমি যেতে চাইছ না। এই একটি মাত্র কারণ ছাড়া এই শহর ছেড়ে চলে না যাবার আর কোন কারণ থাকতে পারে না তোমার।

রুমার প্রসঙ্গ ম্যাল্কমের মনের পুরানো ক্ষতটাকে আবার খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলে। মেরিয়ার অনুমান পুরোপুরি সত্যি নয়। রুমার স্মৃতি তো বটেই, সেই সঙ্গে আরও কতশত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই শহরটার সঙ্গে যার খবর মেরিয়া রাখে না। ম্যালকম ভালবাসে, সত্যিকারের ভালবাসে এই জরাজীর্ণ হতভাগ্য শহরটাকে। এর মাটি, এর আকাশ-বাতাসের সঙ্গে কেমন যেন এক আত্মিক যোগ অনুভব করে সে। একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। মেরিয়া তো নয়ই। একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যে এই মহানগরী কলকাতাকে এমন ভালবাসতে পারে একথা কেউই হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু আসলে সেটাই সত্যি। তাই তো এই মায়াময় শহরটা ছেড়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জনপদে গিয়েও সে শান্তিতে বাস করতে পারবে না বলেই তার বিশ্বাস।

রুমার প্রসঙ্গ ম্যাল্কমকে হঠাৎ উত্তেজিত করে তুললেও কঠিন সংযমে নিজেকে শান্ত রেখে সে বললে, হ্যাঁ, তাই। রুমার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে বলেই কলকাতা ছেড়ে যেতে চাই না আমি।

এবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে মেরিয়া তাহলে আমার কথাও শুনে রাখ, জনি। তোমার ইচ্ছে হয় এখানে থাক, কিন্তু আমি যাবই। একাই যেতে হবে আমাকে। আমি চাই না, আমার পেটে তোমার যে সন্তান রয়েছে সে এই ইণ্ডিয়াতে জন্ম নেবে। সে জন্মাবে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। ইংল্যাণ্ড হবে তার জন্মভূমি। বাই বার্থরাইট সে হবে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী।

মেরিয়ার মত মেয়ে যে সত্যি সত্যি সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় একা বিলেতে গিয়ে বাস করতে পারে একথা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না ম্যাল্কম। তাই সে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, তাহলে তুমি একাই যেতে চাও?

—হ্যাঁ, চাই। আমার সন্তানের জন্যেই আমি তা চাই।

ম্যাল্কম চুপ করে ভাবতে থাকে, মেরিয়ার পেটে তার নিজেরই সন্তান। কিন্তু সন্তান যতক্ষণ মায়ের পেটে, ততক্ষণ তার ওপর অধিকার তার মায়ের। ভূমিষ্ঠ হলেই কেবল বাপের অধিকার জন্মায়। সেই অধিকার-বলেই মেরিয়া তার সন্তানকে পেটে নিয়ে চলে যেতে চাইছে বিলেতে। সেখানকার মাটিতে সে জন্মগ্রহণ করবে, সেখানকার জলহাওয়ায় সে বড় হয়ে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে—এই তার মায়ের ইচ্ছে।

কিন্তু সেই ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়ে মেরিয়া আজ তাকে ছেড়ে চলে যেতে

চাইছে। এমন এক অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে একটুও দ্বিধাবোধ করছে না। কিন্তু ওখানে গিয়ে কেমন করে চলবে তার? কে তাকে দেখবে? কে দেখবে তার সন্তানকে? কেবল কি মার্গারেটের আশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই মেরিয়া এমনিভাবে চলে যেতে চাইছে? না কি, এর পেছনে আর কারুর হাত আছে?

কথাটা মনে হতেই ম্যাল্‌কমের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই আমেরিকান ক্যাপ্টেন ইয়ংয়ের মুখ। বলা যায় না কিছু। হয়ত ঐ লোকটাই বিলেতে বসে মেরিয়াকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার সেই হাতছানি অগ্রাহ্য করতে না পেরেই হয়ত বিলেতে যাবার জন্যে এমনি পাগল হয়ে উঠেছে মেরিয়া। হয়ত সেই লোকটাই আশ্বাস দিয়েছে তাকে—এসো, চলে এসো আমার কাছে। স্বামী নামধারী ঐ ব্যক্তিটি তোমার সঙ্গে এলেও কোন ক্ষতি নেই। প্রয়োজন হলে তাকে ডিভোর্স করেই আমরা মিলিত হতে পারব। সন্তানের কথা বলছ? তাতেও কিছু অসুবিধে হবে না। যার সন্তান তার কাছেই থাকবে। তেমন দেখলে না হয় সন্তান-সহই গ্রহণ করব তোমাকে। তুমি এসো তাড়াতাড়ি চলে এসো।

কিন্তু তাই যদি হবে তবে সেদিন মেরিয়া ঐ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর নিজের দেশ আমেরিকায় চলে গেল না কেন? কিসের আশায় তাকে ছেড়ে দিয়ে মেরিয়া পড়ে রইল এখানে? কেনই বা সে সেদিন সুইসাইড করে নিজের জীবনের ওপর সমাপ্তির রেখা টেনে দিতে চেয়েছিল?

মেরিয়ার চরিত্র বাস্তবিকই দুর্বোধ্য ম্যাল্‌কমের কাছে। কিন্তু যতই তা দুর্বোধ্য হোক, তার কাছে এটা এখন জলের মতই স্বচ্ছ যে, মেরিয়া তাকে ছাড়াই বিলেত যেতে দৃঢ়সংকল্প। কোন বাধাই সে মানবে না।

না রাগ নয়, কোন দুঃখও নয়, একটা প্রচণ্ড অভিমানে ম্যাল্‌কমের মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে। মেরিয়া স্বার্থপর, মেরিয়া অকৃতজ্ঞ, স্বামীর ভালবাসার মর্যাদা সে দিতে জানল না কোনদিন। স্ত্রীলোকের জীবনের সবচাইতে বড় কলঙ্ক সত্ত্বেও একদিন মেরিয়ার সব কিছু দোষ ত্রুটি ক্ষমা করেছিল সে। আর সেই মেরিয়াই আজ একা বিলেত চলে যাচ্ছে। ম্যাল্‌কমের জন্যে এতটুকু চিন্তা নেই তার। এতটুকু ব্যথা বাজবে না তার বুকে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ম্যাল্‌কম মেরিয়াকে জিজ্ঞেস করে, ওখানে গিয়ে তোমার চলবে কেমন করে?

—একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিতে হবে। জবাব দেয় মেরিয়া।

—যদি কিছু না জোটে?

—একটা কিছু পথ বেছে নিতেই হবে।

—কোন্ পথ? নিজের রূপ-যৌবনের পথ? কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু সতর্ক হয়ে ওঠে ম্যাল্‌কম। মেরিয়াকে এমনিভাবে বলা উচিত হয় নি তার।

ম্যাল্‌কমের কথায় চমকে ওঠে মেরিয়া। ম্লান হেসে বললে, নিজের বেঁচে থাকার জন্যে তোমার রুমা বাঈজী যদি তার রূপ-যৌবন ব্যবহার করে থাকতে পারে, তাহলে তোমার সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে আমিও না হয় সেই পথই

ধরব।

রুমার প্রসঙ্গ এবার ক্ষিপ্ত করে তোলে ম্যাল্‌কমকে। চিৎকার করে সে বলে ওঠে, রুমার মত চরিত্রের আগে অধিকারিণী হও, তারপর ওর নাম উচ্চারণ কর। আর বারে বারে 'তোমার সন্তান' কথাটা দিয়ে কি বোঝাতে চাইছ আমাকে? তোমার রূপ-যৌবনের পয়সায় বেঁচে থাকার চেয়ে আমার সন্তানের মৃত্যুও ভাল।

—কি বলছ তুমি? শঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে মেরিয়া, নিজের সন্তানের মৃত্যু-কামনা করছ?

—হ্যাঁ, করছি। তেমনি সুরেই বলতে থাকে ম্যাল্‌কম, তোমার ঐ পাপের পয়সায় বড় হয়ে ওঠা সন্তানের সঙ্গে সেদিনে আর আমার কোন সম্পর্কই থাকবে না।

নিজেকে সামলে নিতে ম্যাল্‌কম খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে যেতে যেতে অপেক্ষাকৃত শান্তসুরে বললে, তার চাইতে বিলেতে গিয়ে তুমি কাউকে আবার বিয়ে করে সংসারী হয়ো, মেরী। তাতেও বরং আমার কিছু বলার থাকবে না।

মেরিয়া আর একটি কথাও না বলে ছল-ছল চোখে কেবল ম্যাল্‌কমের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই বিরাট মহানগরীতে ম্যাল্‌কম আজ একা—সম্পূর্ণ একা। মেরিয়া একাই বিলেত চলে গেছে। যাবার দিন হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেলের একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় স্থির হয়ে বসেছিল মেরিয়া। স্টেশনে পর্যন্ত আসে নি ম্যাল্‌কম। সেদিন সকাল থেকেই বাড়ি ছিল না সে। মেরিয়া মালপত্র নিয়ে একাই ট্যাক্সি চেপে এসেছিল হাওড়ায়।

রেলের কামরায় বসে অতীতের কথাই চিন্তা করছিল মেরিয়া। সে নিজেও এই কলকাতায় জন্মেছে। সুখ-দুঃখ ভুল-ত্রুটির মধ্যে এই শহরেই সে ম্যাল্‌কমের সঙ্গে একসঙ্গে ঘর করেছে প্রায় বারো-তেরোটি বছর। সেই ম্যাল্‌কম আজ স্টেশনে পর্যন্ত এলো না। এক নিদারুণ অভিমানে থেকে থেকে চোখের কোলে জল এসে পড়ছিল মেরিয়ার। রুমার এমন এক অবস্থায় ম্যাল্‌কম কি না এসে থাকতে পারত? এই ভাল। ম্যাল্‌কমের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ভালই করতে চলেছে মেরিয়া।

গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। চাঞ্চল্য জেগে উঠল যাত্রীদের মধ্যে। স্টেশনে যারা তাদের বিদায় জানাতে এসেছিল তাদের চোখও ছল-ছল করে উঠল আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায়।

মেরিয়ার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। কেউ বিদায় জানাতে আসে নি তাকে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। স্টেশনের লোকজন ও আলোগুলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে উল্টোদিকে।

হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে এক নির্জন জায়গায় একজন দীর্ঘাকৃতি লোকের ওপর চোখ পড়তেই চমকে ওঠে মেরিয়া। ম্যাল্‌কম—ছ' ফুট দু' ইঞ্চি দীর্ঘ ম্যাল্‌কম দাঁড়িয়ে আছে একটা আলোর নিচে। তার লম্বা হাত

দু'খানা অবসন্ন ভঙ্গিতে ঝুলে রয়েছে তার দেহের দু'পাশে।

কাছাকাছি আসতেই চোখাচোখি হল দু'জনের। কিন্তু কারুর মুখেই জেগে উঠল না কোন অভিব্যক্তি। গাড়ি চলে গেল।

লালবাজার।

নীল নয়, হলুদ নয়, এমনকি সবুজও নয়। লালবাজার।

লাল, শুধুই লাল। টকটকে গাঢ় লাল এই লালবাজারের রক্ত-রাঙা ইতিহাস। মহানগরী কলকাতার বুকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে একদিকে লক্ষ লক্ষ মুক্তি-পাগল মানুষ, আর অন্যদিকে লালবাজার। এই দু'য়ে মিলেই সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল সেই রক্ত-ঝরা ইতিহাস।

কলকাতার নগর-জীবনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রয়েছে এই লালবাজারের। তাই তো এর দেওয়ালে টাঙানো আছে নাগরিক চরিত্রের ব্যারোমিটার। সেই ব্যারোমিটারের ওপর চোখ রাখলে শহর কলকাতার নাগরিক জীবনের ধ্যান ধারণা, শোক-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা স্পষ্ট ছবি ভেসে উঠবে। আবার যদি সেই ইতিহাসের লাল পাতার ওপর চোখ বোলানো যায় তাহলে ভয়ে শিউরে উঠতে হবে পাঠককে। কি নিদারুণ অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে তাতে!

তাই তো লালবাজার একদিকে যেমন জনগণের আশ্বাস, অন্যদিকে তেমনি ত্রাস। জাগতিক নিয়মে সেই আশ্বাসটুকু উবে যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রকট হয়ে ওঠে কেবল সেই ভয়ঙ্কর ত্রাস। তাই তো একে কেউ ভালবাসে না, কেবল ভয় করে। তাই তো জনমানসে লালবাজার আজও ঠিক তেমনি ভয়ঙ্কর।

তবুও লালবাজার লালবাজারই। এর কোন বিকল্প নেই। শহর কলকাতার জন্যে সেই জব চার্নকের আমলে যে 'ভিলেজ ওয়াচ্‌ম্যানের' সৃষ্টি, জমিদার হলওয়েল সাহেবের 'টাউন গার্ডের' মাধ্যমে যা পুলিশ-বাহিনী রূপে প্রকাশিত, বেহালার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারীবাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আবীর-কুম্‌কুমের লাল রঙে রাঙানো সেই লালবাজার সেদিনও ছিল, আজও আছে, আর ভবিষ্যতেও থাকবে। লালবাজার ভয়ঙ্কর, আবার লালবাজার অনিবার্য এবং অপরিহার্যও।

সেকালের সার্জেন্ট-মেজর আর একালের বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের সঙ্গে আজ আর ঐ লালবাজারের কোন সম্পর্কই নেই। ইদানীং লালবাজারে কেউ এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধকে জানেও না, চেনেও না। তবুও বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম আজও লাঠিতে ভর দিয়ে মাঝে মধ্যে এসে দাঁড়ায় এই বাড়িটার সামনে। ঘোলাটে চোখ মেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওপরের ঐ তেরঙা পতাকাটার দিকে। নিজের শীর্ণ আঙুল দিয়ে পকেটের সেই পেনশনের সাতষট্টি টাকা তেত্রিশ পয়সা একবার অনুভব করে। তারপর একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে চলতে থাকে নিজের পথে।

বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম আজ একা—এই শহরে সে সম্পূর্ণ একা। দীর্ঘ পঁচিশ বছর

ধরে চলছে তার এই একাকিত্ব। সবাই ছেড়ে গেছে তাকে। ছেড়ে গেছে রুমা বাঈজী। কুটিল রাজনীতির বলি হয়েছে সে। ছেড়ে গেছে মেরিয়া। হয়ত বিলেতের মাটিতে নতুন স্বামী-পুত্র নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসার করছে সে। বেশ সুখেই আছে হয়ত। তাই থাক, সুখেই থাক ওরা। তার নিজের সঙ্গে সেদিন সম্পর্ক ছিন্ন করে ভালই করেছিল মেরিয়া। নইলে এখানে তার আর দুঃখের শেষ থাকত না।

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেল। পথ-পরিক্রমায় বেরোবার মুখে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডেস্টিটিউট্‌ হোমের ভাঙা বাড়িটার দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। একটি সুশ্রী যুবক কাকে যেন খুঁজছে।

—কাকে খুঁজছেন আপনি? দু'পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে বৃদ্ধ ম্যালকম।

লম্বা-চওড়া সুশ্রী যুবকটির গায়ে দামী পোশাক, মাথায় একটি বিলিতি ফেল্টের ক্যাপ। ম্যাল্‌কমের প্রশ্নে যুবকটি তার মাথার টুপি খুলে হাতে নেয়। বিকেলের দক্ষিণের হাওয়ায় তার মাথার সোনালী চুলগুলো অল্প অল্প উড়তে থাকে। স্পষ্ট বিলিতি উচ্চারণে যুবকটি জিজ্ঞেস করে, ইজ ইট দি হোম ফর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওল্ড মেন?

—ইয়েস। জবাব দেয় বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম।

যুবকটি আবার বললে, আমি এখানে একজন লোককে খুঁজতে এসেছি। আপনি কি বলতে পারেন, এখানে মিস্টার ম্যাল্‌কম বলে একজন লোক থাকেন কিনা?

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ঐ যুবকটির মুখে নিজের নামটা শুনে চমকে ওঠে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। কে এই যুবক? কি তার পরিচয়? কেন সে তাকে খুঁজছে? তবে কি –

ভাবনায় বাধা পড়ে ম্যাল্‌কমের। যুবকটি নিজেরে পরিচয় দিতে গিয়ে বলতে থাকে, আমি লণ্ডনে থাকি। কাজ করি ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজে। কোম্পানীর কাজে দুদিনের জন্য ক্যালকাটায় আসতে হয়েছে। আমি খবর পেয়েছি আমার বাবা নাকি এখানে থাকেন।

ইওর ফাদার! থর-থর করে কেঁপে ওঠে ম্যাল্‌কমের দীর্ঘ দেহটা। আনন্দমিশ্রিত এক প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ডটা এখনই যেন স্তব্ধ হয়ে যাবে। এমন দুর্বিষহ আনন্দ সে সহ্য করবে কেমন করে? সেই মুহূর্তে যেন তার চিৎকার করে বিশ্ববাসীকে শোনাতে ইচ্ছে করে আমি একা নই, আমি নিঃসঙ্গ নই। মস্ত এক সম্পদের অধিকারী আমি। আই এ্যাম দি ফাদার অফ এ সন।

যুবকটি আবার বললে, ইয়েস ইয়েস। মিস্টার ম্যাল্‌কম ইজ মাই ফাদার। তিনি ছিলেন ক্যালকাটা পুলিশের একজন সার্জেণ্ট।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে পুত্র এসেছে তার বৃদ্ধ পিতার খোঁজে। এমন একটা দিনের কথা ম্যাল্‌কম বোধহয় কোনদিন কল্পনায়ও আনতে পারে নি। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে, এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে তার জীবনে। তার ইচ্ছে হয় বলে—ইয়েস, ইয়েস মাই বয়, আই এ্যাম ম্যাল্‌কম। আই এ্যাম

ইওর ফাদার।

কিন্তু বাস্তবে কিছুই বলতে পারে না ম্যালকম। সহসা একটা প্রচণ্ড অভিমান তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নিজের প্রতি, গোটা বিশ্ব-সংসারের প্রতি তার এই সীমাহীন অভিমান। পঁচিশ বছর ধরে একটু একটু করে জমে-থাকা পর্বত-প্রমাণ এক অভিমানের শক্ত দেয়ালে মাথা কুটতে থাকে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। সেই মুহূর্তে তার যেন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় -না না, আমি একা — সম্পূর্ণ একা। এই পৃথিবীতে কেউ নেই আমার।

ম্যাল্‌কমের ভাব-ভঙ্গিতে কেমন যেন একটু সন্দেহ হয় যুবকটির। তাই সে কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, আপনি আমার বাবাকে চেনেন?

একটু সময় চুপ করে থেকে ম্যাল্‌কম খসখসে গলায় অস্পষ্ট সুরে জবাব দেয় হ্যাঁ, চিনতাম। একদিন ভালই চিনতাম তাকে। কিন্তু—

—কিন্তু কি? অধৈর্য্য কণ্ঠস্বর যুবকটির।

আবার একটু সময় স্থির হয়ে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। তার কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকে। কোটরগত নিষ্প্রভ চোখদুটো যেন আরও নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে। সহসা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের নুয়ে-পড়া দীর্ঘ দেহটাকে সোজা করে স্পষ্ট সুরে সে বলে ওঠে, কিন্তু সে মারা গেছে অনেক দিন আগে মারা গেছে।

মুখে আর কথা সরে না যুবকটির। তার সুন্দর মুখের ওপর নেমে আসে একটা অন্ধকার ছায়া। মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে সে। তারপর এক সময় মাথা তুলে অনেকটা আপন মনেই যেন বলতে থাকে, আমার মা লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে একটা গীর্জার নান্—সন্ন্যাসিনী। অনেক কষ্টে তিনি আমাকে মানুষ করেছেন। তাঁর বরাবরই ইচ্ছে, বড় হয়ে এই কলকাতায় এসে আমি আমার বাবাকে খুঁজে বের করব। কিন্তু তা আর হল না। পারলাম না তাঁকে খুঁজে বের করতে –

ম্যাল্‌কমের মুখে আর কথা সরছিল না। তবুও মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, হোয়াট্‌স ইওর নেম মাই বয়?

বিষণ্ণ হেসে জবাব দেয় যুবক, আমার নাম রোমিও। খুবই সেকেলে নাম তাই না? জানেন, আমার মা ইচ্ছে করেই আমার এই সেকেলে নাম রেখেছিলেন। শুনেছি, আমার মা যখন এই কলকাতায় থাকতেন তখন নাকি রুমা নামে তাঁর এক বাঙালী বোন ছিল। তাঁর সেই বোন রুমার নামের সঙ্গে মিলিয়েই আমার নাম রেখেছিল রোমিও।

আর একটি কথাও বলতে পারে না ম্যাল্‌কম। রোমিও হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে ওঠে, এক্সকিউজ মী! আমি এবার চলি। মেনি থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

রোমিও চলে যায়, আর সেদিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ ম্যালকম। হঠাৎ মনে হয় কে যেন একটা লোহার সাঁড়াশী দিয়ে তার বুকখানা চেপে ধরেছে। সেই প্রচণ্ড চাপে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। তীব্র ব্যথায় বুকখানা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চলেছে।

অতিকষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে ম্যাল্‌কম। রুমা ও মেরিয়া—মেরিয়া ও রুমা। ঠিকই বলছে রোমিও। বোনই বটে। দুই সহোদর বোন। একজন সেই পাগল-করা বাঁশির সুর শুনতে কোন্ সুরলোকে চলে গেছে। আর একজন ভগবান যীশুর অমৃতময় বাণীর মধ্যে আজও সেই একই বাঁশির সুরের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ম্যাল্‌কম নিজে? সে কেবল জীবনভর স্মৃতিচারণ করেই চলেছে। এই স্মৃতিচারণের শেষ নেই, সমাপ্তি নেই।

অনেকদিন পরে নিজের ভাঙা বাক্সটা খুলে বসে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম। তার পুলিশ-জীবনের অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে এই বাক্সে। একটা ছেঁড়া লিনিয়ার্ড, একটা পেতলের পুলিশ-ব্যাজ, গোটা কয়েক নিকেল-করা বোতাম।

বাক্সের জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে দুখানা ছবি বের করে ম্যাল্‌কম। সেকালের একখানা পুরানো ইউনিয়ন জ্যাক্ দিয়ে মোড়া ছিল সেই ছবি—রুমা ও মেরিয়ার ছবি।

কিন্তু না। খারাপ হয়ে গেছে ছবি দুটো। ঐ ছবি দেখে ওদের আর চিনতে পারা যাবে না। চোখের সামনে থেকে ওরা চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে।

যাক্, অদৃশ্য হয়েই যাক্। কাউকে চাই না তার। যারা চোখের সামনে থেকে চলে গেছে তাদের ছবি না থাকাই ভাল। ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধ ম্যাল্‌কম জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে নিজের নড়বড়ে দাঁত দিয়ে সেই ইউনিয়ন জ্যাকের পুরানো কাপড়খানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে থাকে। আর তার কোটরগত চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে থাকে সেই ছেঁড়া ব্রিটিশ পতাকার ওপর।

হাজার হাজার মাইল দূরে সমুদ্র-ঘেরা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। সমুদ্রের নোনা জল বাকিংহাম প্যালেস কিংবা ডাউনিং স্ট্রীটের সেই বিখ্যাত বাড়ির মাথার ওপরের ইউনিয়ন জ্যাককে স্পর্শ করতে না পারলেও লালবাজারের সার্জেন্ট-মেজর বৃদ্ধ ম্যাল্‌কমের চোখের নোনা জল কিন্তু ঐ ছেঁড়া ইউনিয়ন জ্যাককে স্পর্শ করে অনায়াসেই। এককালে ব্রিটিশের নিমক খেয়েছিল ম্যাল্‌কম। আজ বোধহয় সেই নিমক এমনি করেই সে শোধ করেছে।